[illegible] সংস্করণ।

কলিকাতা,

কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী-ষ্টীম-মেসিন প্রেসে

শ্রীঅরুণোদয় রায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০৪ সাল।

মডেল ভগিনী

চতু সংস্করণ।

মুখবন্ধ।

তৃতীয় সংস্করণ পাঁচহাজার ছাপা হইলেও, একমাস মধ্যে তাহা বিক্রয় হইয়া
য়। এবার মডেল ভগিনীর চতুর্থ সংস্করণ সাড়ে সাত হাজার মাত্র মুদ্রিত
'ল।

৫ই ফাল্গুন ১২৯৭।
কাতা, বঙ্গবাসী কার্য্যালয়, কলুটোলা।

শ্রী

মডেল ভগিনী

তৃতীয় সংস্করণের সমগ্র গ্রন্থের

মুখবন্ধ।

মডেল ভগিনীর এইবার সুলভসংস্করণ প্রকাশিত হইল। অক্ষর ক্ষুদ্র এবং
গজ পাতলা। মূল্য সস্তা করিতে হইলে পাতলা কাগজ এবং ক্ষুদ্র অক্ষর ভিন্ন
পায়ান্তর নাই। মূল্য অধিক বলিয়া যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে এ গ্রন্থ ক্রয় করিতে সক্ষম
নাই, তাঁহারা এইবার গ্রন্থপাঠে মনঃক্ষোভ নিবৃত্তি করিবার সুবিধা পাইলেন।

১৫ই অগ্রহায়ণ ১২৯৭।
লিকাতা, কলুটোলা, বঙ্গবাসী কার্য্যালয়।

মডেল ভগিনী।

প্রথম সংস্করণের প্রথম ভাগের

মুখবন্ধ।

এ গ্রন্থ উপন্যাস নহে, উপকথা নহে, তবে উপন্যাস নাম না দিলে, পাঠক বই পড়েন না; কাজেই মডেল ভগিনী উপন্যাস বলিয়া অভিহিত হইল।

বঙ্গের পূর্ব্ব-ইতিহাস অনেকেই লিখিয়াছেন, কিন্তু নব্যবঙ্গের ইতিহাস কেহই বড় একটা লেখেন নাই। নব্যবাঙ্গালীর জীবনচরিতও এপর্য্যন্ত কিছুই প্রকাশিত হয় নাই। মডেল ভগিনী গ্রন্থে নব্য-বঙ্গের ইতিহাস এবং নব্য-বাঙ্গালীর জীবন চরিত—একাধারে দুই পদার্থ দেখিতে পাইবেন।

মডেল ভগিনীতে অষ্টবজ্র আছে। চন্দ্রের সুবিমল সুধা, অগ্নির জলন্ত উত্তাপ সূর্য্যের প্রখর কিরণ, বসন্তের মলয় সমীরণ, হিমালয়ের উচ্চশৃঙ্গ, মাধবীলতা প্রিয়তম ভৃঙ্গ, ইন্দ্রের শ্রীমতী শচী, নরেন্দ্রের মিসেস পাঁচী—এ সমস্তই আছে।

স্ত্রী পুরুষ, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা— মডেল ভগিনী পাঠে পরম জ্ঞান লাভ করুন, দিব্যচক্ষু প্রাপ্ত হউন, সংসারে সাবধান হউন,—ইহাই গ্রন্থকারের প্রার্থনা।

কলিকাতা,
৭ঠা শ্রাবণ ১২৯৩।

শ্রী— —

মডেল ভগিনী

প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয় ভাগের

মুখবন্ধ।

বাঙ্গালা দেশে আজিও মহা-উপন্যাস লিখিবার রীতি প্রচলিত হয় নাই। আমাকেই সে পথ দেখাইয়া দিতে হইল। ইংলণ্ড হইতে এ প্রথা,—এ নূতন ঢঙ আমদানি করা হইল।

উপন্যাস তিনভাগে বিভক্ত না হইলে, ইংলণ্ডীয় নর-নারী-সমাজে তাহা প্রকৃত উপন্যাস বলিয়া গণ্য হয় না আজ কাল ইহাই ফ্যাশন। ইংরেজের পুচ্ছধারী বাঙ্গালী নর-নারীর নিমিত্ত মডেল-ভগিনীকে তিনভাগে বিভক্ত করিতে হইল। সত্ত্ব, রজঃ তমঃ—ত্রিগুণাত্মক না হইলে আদর্শ-গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয় না।

মডেল-ভগিনী প্রথম ভাগ স্বর্গে উঠিবার পাকা সিঁড়ি, দ্বিতীয় ভাগে কেবল স্বর্গ-ভোগ, তৃতীয় বা শেষভাগে মোক্ষফল লাভ।

কলিকাতা,
১২ই আশ্বিন ১২৯৩। } শ্রী

মডেল ভগিনী

প্রথম সংস্করণের তৃতীয় ভাগের

মুখবন্ধ।

মডেল ভগিনী তৃতীয় ভাগ মোক্ষধর্ম্ম-পর্ব্ব। সুতরাং উন্নত পাঠক পাঠিকার পক্ষে কালকূট-বিষ। পাঠে বিষম বিরক্তিকর ঘটে, ফলে কিন্তু করতলে সুধাকর।

বিষমুখ পয়ঃকুম্ভ বন্ধুর গৌরব—কয়জন করিতে জানে? সাধুর সমাদর কয়জন করিতে শিখিয়াছে? সুতরাং এরূপ আশা আছে, বহুলোকের নিকট মডেল ভগিনী তৃতীয় ভাগের আদর গৌরব হইবে না।

প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাঠে লোকের এখন বিরক্তি জন্মিতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতে ইহা প্রত্নতত্ত্ববিদের বিশেষ উপকারে আসিবে।

কলিকাতা,
১লা আষাঢ় ১২৯৭। } শ্রী——

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জ্যৈষ্ঠ মাস। দিবা দ্বিপ্রহর। রোদ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, বাতাস সাঁ সাঁ করিতেছে, মন খাঁ খাঁ করিতেছে। স্থলে, বাবুর বাগানে, দাড়িম্ব-পত্র যেন ঝলসিয়া গিয়াছে; কদম্বকাণ্ড যেন নীরস, নির্গুণ, নিশ্চলভাবে, পরমব্রহ্মের ন্যায় দণ্ডায়মান আছে। জলে, কমল-সরোবরে, তপন-সোহাগে তৃপ্ত হইয়া, কমলিনীকুল ফুটিয়া উঠিয়াছে। এদিকে নভোমণ্ডলে পাখী, প্রাণবঁধু জীবনধন জলকে "ফটী-ঈক জল" বলিয়া ডাকিতেছে। ওদিকে, তারকেশ্বরের মহান্তের হাতীটা অতি গরমে ক্ষেপিয়া উঠিয়া জলে পড়িয়া কমল-দলের অন্তরালে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে। স্বভাবের এই বিপরীত ব্যবহারে, বঙ্গভূমি চমকিত।

আরও কথা আছে। অতি-গরমে আম পাকিল, জাম পাকিল, লিচু পাকিল, কলা পাকিল,—চুল পাকিবে না কেন? হাতী ক্ষেপিল, কমলিনী ফুটিল, দাড়িম ঝলসিল,—বারি-পতন হইবে না কেন? ঘর গরম হইল, ভাই-ভগিনীর দেহ গরম হইল, ঘাম বাহিরিল,—কাপড় ভিজিবে না কেন?

কলিকাতার দালানগুলা যেন দাবানল জ্বলিতেছে। খোলার ঘর, ও আগুনের খাপরা। টীনের ছাদ তাতিয়া, তাঁহা তাঁহা করিতেছে। নূতন চুণকাম-করা সাদা দেওয়ালে মধ্যাহ্নতপনের তাপ লাগিয়া, গরিব পথিকের চক্ষু কেবল ঝলসিতেছে। যে

বুঝিলাম, সে ঘর ছেঁড়াজুতার উপযুক্ত ত' নহেই। তালতলার নূতন চটী তাহার সম্মান রাখিতে সক্ষম কি না, তদ্বিষয়েও সন্দেহ আছে। তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের চটী, বিদ্যাসাগরের চটী, ডাক্তার সরকারের চটী, এই ত্রিচটী ত তাহার কাছে ঘেঁসিতেই পারে না। মিঃ লালমোহন ঘোষের বিলাতী বুট, রাম-শ্যাম-নবীন-জ্ঞানী বাবুগণের ডসনের বার্ণিস বিনামা, সেই বিরাট, বিশাল বিস্তৃত ক্ষেত্রে বাহার দিবারই একমাত্র উপযুক্ত।

জুতা-বিভ্রাটের পরই, আসন-বিভ্রাট উপস্থিত। বসি কোথা? মেজেতে কার্পেটের উপরে এমন একটু জায়গা নাই যে, খানিক পা ছড়ায়ে বসা যায়। "ন স্থানং তিলধারণং" কেবল রাশীকৃত চৌকীতে, ঘরটা বোঝাই করা। তাই কি ছাই, সব সোজা রকমের কেদারা? স্থূল, সূক্ষ্ম, লঘু, গুরু,—ট্যাঙ্গা, গেঁড়া, চেপ্টা, চৌকা—নানা ঢঙের, নানা রঙের যেন নানা সঙ উপস্থিত। কোন কেদারাখানি এত মিহি যে, প্রাণখুলে ভর দিয়ে বসিতে ভয় হয়,—বুঝিবা এ দেহ-ভার অনুভব করিলে তৎক্ষণাৎ নিঃশব্দে অন্তর্দ্ধান হইবে। আবার কোন কোন কেদারা গোদা-গোদা মোটা-সোটা যেন "বজ্জর বাঁটুল,"—লোহার মুগুর মার, তবু ভাঙ্গিবে না,—স্বয়ং হিমালয় কবে দেখা করিতে আসিবেন বলিয়াই যেন সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। কোন কেদারায় বসিলেই, তিনি দুলিতে থাকেন;—নাগরদোলায় নায়ককে রস-পাকে দুলাইবার আয়োজন করিতেছেন! কোন চেয়ার ল্যাজবিশিষ্ট,—চারিহাত লম্বা, বুক চিতাইয়া পড়িয়া আছেন, তার উপর তুমি কেদারাগত হইয়া শোও;—পা দুটা আকাশে উঠিবে, কোমরটা পাতালে পড়িবে, ঘাড়টা ত্রিশূন্যে থাকিয়া রহিবে, মুখখানা আঠেকাঠে বদ্ধ হইয়া মোলার গোখরা সাপের ফুটন্ত চক্র গোছ সদাই ফণা ধরিয়া থাকিবে। কোন চৌকী বিলাতীকলের গদী আঁটা,—বসিলেই অতলস্পর্শ! চোরাবালিতে প্রাণ হারাবো নাকি? কোন খানির নির্ম্মাণ-কৌশল এইরূপ যে, দুজনে কেবল ঠিক্‌সোজা নড়ন-চড়ন-বিহীন হইয়, মুখোমুখী বসিয়া থাক,—ঈষৎ অঙ্গচালনা করিলেই উভয়ের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উভয়ের গায়ে ঠেকে। তখন ত্রাহি মধুসূদন! ফল কথা, স্বচ্ছন্দে বসিবার একটুকুও স্থান নাই।

দাঁড়াইয়া থাকিই বা কেমন করিয়া? দেওয়ালের পানে চাহিলে চোখ ঝলসি যায়। লাল, নীল, সবুজ, সাদা রঙের দেওয়াল-গিরি ঝল্ ঝল্ করিতেছে। মাঝে মা

ঐ কাপড়ের আড়ালে আদম এবং ইব, আদিম এবং অকৃত্রিম অবস্থায় বিরাজ করিতেছেন।

“অদ্বিতীয় স্বর্গে” আসিয়া যদি এরূপ ধাঁধা ঠেকে, এমন বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়, তবে তেমন স্বর্গে আমার কাজ কি? গা খুলে, পা মেলে, কাঁকাল চুলকাইতে চুলকাইতে গুড়ুকতামাক না খেতে পেলে কি আমাদের পোষায়? ওরূপ আটাকাটীতে বদ্ধ থাকা কি ভদ্রলোকের কাজ? স্বর্গে দণ্ডবৎ! নরকেও দণ্ডবৎ! ভাল মানুষের ছেলের সোজাসুজি কার্‌-কারবারই ভাল। অতএব বিদায়।

দ্বিতায় পরিচ্ছেদ।

বলি, ও হচ্চে কি? এই রকম ক'রে কি নভেল লেখে? সেই হল্‌দে ঘরের বর্ণনাটা, চলেছে ত চলিইছে! ছি!

উপন্যাসের প্রধান অঙ্গ, মেয়েমানুষ কৈ? সেই গুণবতী, জ্ঞানবতী, রসবতী, সুবতী প্রসন্নমূর্ত্তি নায়িকা কৈ? সেই হেসে হেসে ঢলে পড়া কৈ? সেই কেঁদে কেঁদে বুকভাসান কৈ? সেই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চম্‌কে-উঠা কৈ? সেই জেগে জেগে স্বপ্ন দেখা কৈ? আচ্ছা, না হয় নায়িকাই এখন নাই।

সেই জ্ঞানের সাগর, গুণের নাগর, রসের আকর নায়ক-প্রবরই কৈ? বসন্তকাল, আমের মুকুল, কোকিল, ভ্রমর, চাঁদ, পদ্ম, জ্যোৎস্না-রাত্রি, গোধূলি, প্রভাত-তপন, দীর্ঘ-নিশ্বাস, হা হুতাশ, বুকের ভিতর কুলকাঠের অগ্নি, চোখের ভিতর মন্দাকিনী, মুখের ভিতর বক্তৃতা-রাগিণী, কণ্ঠের ভিতর বীণাপাণি, কত আর লিখিবে লেখনী,—উপন্যাসের এ সমস্ত প্রত্যঙ্গ কৈ? এ কালিয়দমনের যাত্রার রাধাও নাই, কৃষ্ণও নাই; শুধু আখড়াই গাওনায় কতক্ষণ আর আসর থাকিবে বল?

রাগ করিবেন না। হাতে সবই আছে। কিন্তু ধীরে, ধীরে, ধীরে। যখন যেখানে যে ভাবে যেটি চাহিবেন, তখনি সেইখানে তাহাই পাইবেন। শিক্ষিতা, স্বাধীনতাপ্রাপ্তা,

ভাণ্ডার। জগৎশেঠের কুঠী। কি রকম নায়ক দরকার? খাগা, শুকো, নিম-খাস, চলন, রাশি—এই পাঁচ প্রকার নায়কই উপস্থিত। উপনায়ক, উপনায়িকা, প্রাণেশ্বর, প্রাণেশ্বরী, সখী, সখা আছে। আর ঐ পদ্মফুল, আমের মুকুল, কোকিল, ওসব ত' ধরিই না। আমের মুকুল ত বাগানভরা, পদ্মফুল ঠাকুরদাদার খাস-দিঘীতে দিন-রাতই ফুটে আছে,—কোকিল ত' গাছের পাখী, যাবে কোথা?

আছে সব। এখন এনে দিয়ে গুছিয়ে পরিবেশন করিতে পারিলেই হয়।

প্রথমে শাকান্ন; শেষে পায়সপিষ্টক। তাই প্রথমেই বসন্তবর্ণন এবং নায়িকার বিরহবর্ণন না করিয়া, জ্যৈষ্ঠ মাসের গরম্ রোদের কথা পাড়িয়াছিলাম।

গ্রন্থারম্ভ। সেই জ্যৈষ্ঠমাসের রোদে তাতিয়া পুড়িয়া, অনর্গল ঘাম ঝরাইতে ঝরাইতে এক প্রবীণ ব্রাহ্মণ কলিকাতার রাস্তা দিয়া হাঁটিতেছে। বামুনের বয়স অনুমান ৩৭।৩৮ বৎসর; শ্যামবর্ণ; মাথায় টিকি; পায়ে চটীজুতা; নাকে তিলক; স্কন্ধে মুড়ি-সেলাই চাদর, পরিধান থান ধুতি;—গায়ে পিরিহান নাই, মাথায় টেড়ি নাই, চড়নে গাড়ি নাই; ট্যাঁকে ঘড়ী নাই, হাতে ছড়ি নাই;—ব্রাহ্মণ তথাচ বেশ সতেজে রাজপথে চলিতেছে। সঙ্গে একটী মুটে,—মাথায় একটী সামান্য মোট করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে।

মুটে। হাম আউর কেতনা দর যায়গা,—বহুবাজার বোল্‌কে তোম্ হাম্‌কো লাল-বাজারমে লে যাতা হ্যায়।

ব্রাহ্মণ। নারে বাপু! রাগ করোনা,—একটু এগিয়ে বাহাদ্দি গলিতে ঢুক্‌লেই বাড়ী।

মুটে। সিয়ালদকা ষ্টেসনসে ছ পয়সাকা কেরেয়া আঁট পয়সা দস্তুর হ্যায়—হাম পয়সা নেহি ছোড়েগা।

ব্রাহ্মণ। বাপু! ছ পয়সা চুক্তি ক'রে, দু পয়সা বেশী বল কেন? তা পাবে না।

মুটে। তোমারা মোট লেও, পয়সা দেও, হাম্ আউর নেহি যাঙ্গে।

রক্ষা করুন! ক্ষান্ত হউন। আপনার আর উপন্যাস লিখে কাজ নাই। এ কি এ? কেবল ধাষ্টমো!—একটা বুড়ো ডোকরা বামুন, আর একটা নগদা মুটে।

মাপ করিবেন। প্রথমে শাকান্ন, শেষে পায়স-পিষ্টক,—ইহাই আমি জানি। আগে যে আপনারা দই-ক্ষীর-সন্দেশ খাবেন, তা আমি বুঝি নাই। মজুত সবই আছে; ভাল,—তাহাই হইবে। তবে দুঃখ এই, এ পরিচ্ছেদ অঙ্কুরেই এইখানেই শেষ করিতে হইল। আর ভাবনা এই, কেহ পাছে মনে করেন যে, আমি নভেল লিখিতে অক্ষম। আমি বিলক্ষণ জানি পরিচ্ছেদ যতই লম্বা হইবে, ততই লেখকের কৃতিত্ব অধিক। পদ্ধতি, প্রকরণ, ধারা, ধরণ সবই অবগত আছি। ইংরেজী, লাটিন, ফ্রেঞ্চ, গ্রীক কোটেসান দিতেও পারি, ভগবদ্গীতা, সাংখ্যদর্শন, ঋগ্বেদ-মন্ত্র উপযুক্ত স্থানে যোজনা করিতে শিখিয়াছি। অভাব কি? সন্ন্যাসী চক্রবর্ত্তী গাইয়ে, দাশরথি রায় ছড়া-কাটিয়ে; ব্যালেণ্টাইন ব্যারিষ্টার, পিকক বিচারক; সৈন্যাধ্যক্ষ নেপোলিয়ান, সুশিক্ষিত ফরাসী সৈন্য;—সুতরাং দিগ্বিজয়ের অভাব কি?

তবে এইবার হাত দেখাই।

এখনও কথা ফুরায় নাই। বুড়োমানুষ কিছু বেশী বকে।

সপ্তমে সুর চড়াইয়া বাধিলাম। দীপক রাগে তান ধরিলাম। হয় লেখক, না হয় পাঠক, উভয়ের মধ্যে একজন ভস্মীভূত হইবেই হইবে। তবে সুবিধা এই, দীপকে পুড়িয়া মরিলে তানসেনের মত মহাক্ষেত্রে সমাধি হবে, তদুপরি রসজ্ঞ ব্যক্তিগণের বার্ষিক উৎসব হবে, এবং সঙ্গীত-আচার্য্যগণ সেই গোরের মাটী নিয়ে মাথায় দিবে। অতএব সুবিধা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[সেই প্রকাণ্ড হরিতাল-রঙের হলে কি দেখিলাম? দেখিলাম, এক পীনোন্নত-পয়োধরা, আলুলায়িতকেশা, বিবিধবর্ণের বেশ-ভূষিতা বরবর্ণিনী রমণী একাকিনী সেই ল্যাজবিশিষ্ট চেয়ারে অধিষ্ঠিতা। তিনি শায়িতা, কি উপবিষ্টা, কি দণ্ডায়মানা, হঠাৎ কিছুই বুঝিবার যো নাই। উত্তমাঙ্গ ও পদদ্বয় ঈষৎ ঊর্দ্ধে উত্থিত এবং নিতম্বপ্রদেশ

মডেল ভগিনী
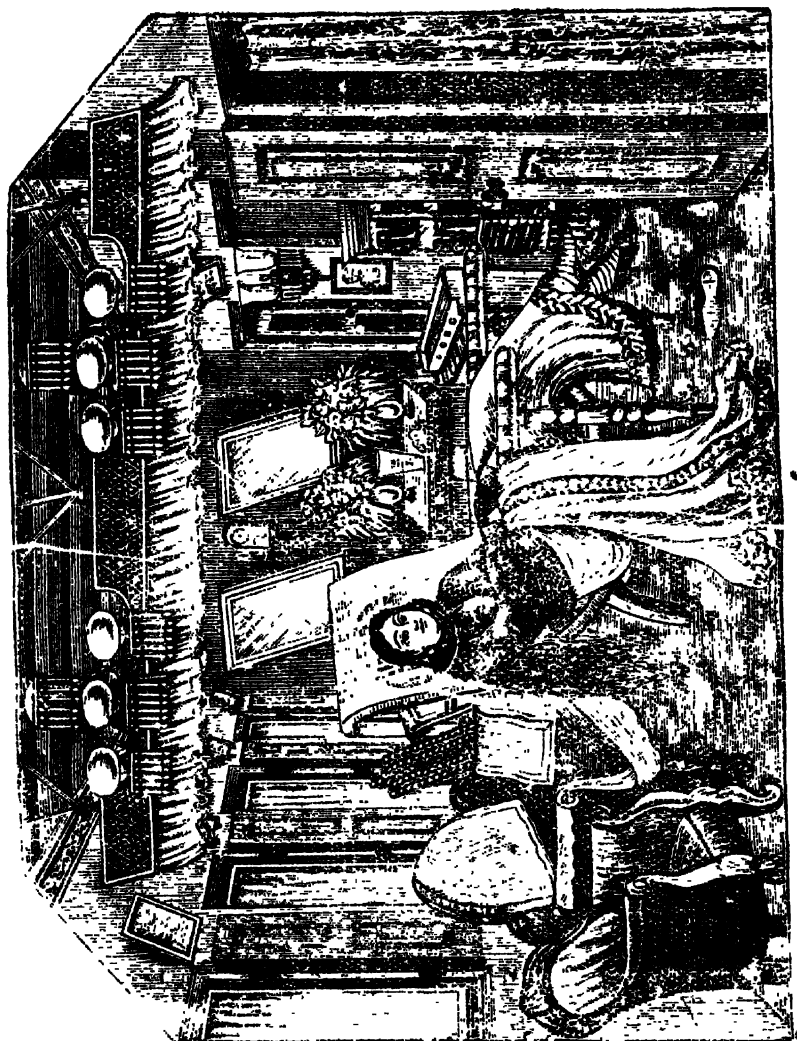
নিম্নভাগে কথঞ্চিৎ অবনমিত। ফল কথা, শোয়া, বসা এবং দাঁড়ানো,—এ তিনের সংমিশ্রণে যে ভাব দাঁড়ায়, ইহা তাহাই।

কমলিনীর কোমল অঙ্গ কুটিল আঙরাখায় পরিবৃত। স-টান সতেজ অঙ্গরক্ষণী দেহযষ্টিকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া, ছাঁদিয়া রাখিয়াছে। মরি, মরি! বিধাতার কি এই কঠোর লীলা! এমন কুসুমসুকুমার, মাখমে-গড়া, গৌরাঙ্গখানি, কার অভিশাপে, কি দোষে, ঐ কালো-জামারূপ-কারাবাসে এ গরমের দিনে পচিতেছে? কমলিনী ইন্দুমুখের ঘামবিন্দু, রেশমী রুমাল সাহায্যে মুছিয়া ফেলিতেছেন;—না জানি, তাহাতে হাতের কত কষ্টই হইতেছে।

ও হরি! এতক্ষণ দেখিতে পাই নাই;—পায়ে এষ্টাকিন্!! মাগী কে গো? এমন গুমট গ্রীষ্মে দিন-দুপুরে যে মেয়ে-মানুষ, এষ্টাকিন্ এঁটে ব'সে থাকৃতে পারে, তার কি অসাধ্য কিছু আছে?

বোধ করি, ওর কোন একটা বিলাতী ব্যারাম থাকিবে। এখনকার মা-লক্ষ্মীদের শরীরে একটা না একটা, রোগ লেগে আছেই। আহা! বড় ঘরের মেয়ে; লেখাপড়া শিখেছেন; কেতাবের সঙ্গে চোখের এক তিল বিচ্ছেদ নাই; কাজেই ওঁদের একটুতেই অসুখ করে। মা-লক্ষ্মীর দোষ কি? দোষ যত, তা আমার পোড়া কপালের!

শুন্ শব্দে কপি-কলের সাহায্যে টানাপাখা চলিতেছে। দ্বারে, জানালায় জলময়ী খস্‌খসের পরদা! তবু কেন তিনি পায়ে এষ্টাকিন্ এবং গায়ে জামা দিয়া ঘাম বাড়াইতেছেন?

বুঝি অতি লজ্জাশীলা হবেন! তাই কি? তবে ধনুকের ছিলার মত সুতীক্ষ্ণটান-বিশিষ্ট জামার রঙ্গভঙ্গ কেন? মাথায় কাপড়ও ত নাই। কেশকলাপ কেদারা ডিঙ্গাইয়া কার্পেট চুম্বন করিতে উদ্যত। সর্ব্বাঙ্গে ঘেরাটোপ; মাথাটী খোলা; এই বা কেমন লজ্জা? আর, এ নির্জ্জনে লাজ্জাই বা কাকে? বিধাতার বিচিত্রলীলা বুঝিতে পারিলাম না!

কমলিনী ক্ষীণ-মৃদু-পঞ্চমে বসন্তবাহার রাগিণীতে ডাকিলেন,—"বেয়ারা, বরফ-পাণি লে আও না!" বেহারা আসিয়া মা-লক্ষ্মীর সম্মুখস্থ টেবিলে এক গ্লাস বরফজল রাখিয়া গেল।

রমণী কথা কহিলেন না, নড়িলেন না—কেবল মিটিমিটি চাহিয়া রহিলেন।

অবাক্! ডেপুটী বাবুর বাড়ীতেই ঝা নাই নাকি? পরপুরুষ অমন হন্‌হন্ ক'রে এ'সে সুমুখে দাঁড়ালো; তবু একটু মাথায় কাপড় দিলে না গা?—সেই ত্রিভঙ্গ-ভাবেই খাড়া-শুয়ে রইল? মাগীকে ভূতে পায় নাই ত? জানিনা, কোন্ গন্ধর্ব্ব-কন্যা, কোন নাগকন্যা, অথবা কোন্ কিন্নরকন্যা, কলিকালে কলিকাতায় সমুদ্ভূতা হইয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে বেলা ২টা বাজিল। গ্রীষ্মটা যেন পেকে উঠিল। কমলিনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বারান্দার দিকে আসিয়া পা-চালি করিতে লাগিলেন। তাহাতে যেন মন স্থির হইল না। টেবিলের কাছে গিয়া এক চুমুক বরফজল খাইলেন; তাহাও যেন ভাল লাগিল না। টেবিলে শেলির কবিতাবলী ছিল; তাহা লইয়া দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়াই, মাঝখানটা খুলিয়া, মনে মনে পড়িতে লাগিলেন। অল্পক্ষণমধ্যেই শেলির উপর বিরক্ত হইয়া, কেতাব রাখিয়া দিলেন। তার পর, আপন পকেট হইতে ঘড়ী খুলিয়া দেখিলেন, বেলা আড়াইটা বাজিয়াছে। মুখ বাঁকান এবং নাক শিট্‌কান দেখিয়া বোধ হয়, তিনি ঘড়ীর উপরও বিষম চটিয়াছেন। তখন একটা কেদারায় বসিলেন। বসিয়া, কাগজ, কলম লইয়া কি লিখিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে কমলিনীর মা, পাশের কুঠারি হইতে আসিয়া তথায় উপনীত হইলেন। জননী প্রবীণা ব্রাহ্মণী; গৌরাঙ্গী; হাতে কঙ্কণ; কপালে সিন্দূর, মাথায় কাপড়। মা বলিলেন, "বাছা! দুপুরবেলা ঘরে এ'সে শুয়ে একটু ঘুমাওনা? ডাক্তার বোলে গেছেন, আহারের পর বিশ্রাম দরকার। সারাদিন লেখাপড়া করিলে, ব্যারাম যে বাড়বে।"

কমলিনী। দিনের বেলা ঘুম হয় না তো, আমি কি করিব? ঘুমের উপর তো জোর নাই?

মা। আমি তোমার ভালোর জন্যই বলি। দুপুর বেলা সহজ-প্রাণ আইঢাই করে,—তোমার ত অসুখ-শরীর। এস, আমার সঙ্গে এস—খানিক শোওসে।

কমলিনী। এখন আর শোব কখন্? চারিটার সময় মাষ্টার পড়াতে আস্‌বে যে; শোবার কি আর সময় আছে?

মা। এই ত দুটো বেজেছে বৈ ত না; চারটাকে এখন ঢের দেরী। মাষ্টার বাবু পড়াতে এলে, ঘুমে থেকে আমি তোমাকে উঠিয়ে দেবো।

কমলিনী। না,—তিনি রাগ কোর্‌বেন; আমার পড়া তৈয়ারি না হলে, তিনি যে রাগ করেন!

মা। বাছা, রোগ হ'লে আমাকেই ভুগ্‌তে হয়। শরীরটা আগে, না পড়া আগে? শিরঃপীড়াটা একটু কমে যাক্, তারপর দিন-রীত পড়ো।

কমলিনী। মা তুমি আমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিও না। এইরূপ দৌরাত্ম্যেই ত আমার মাথাধরা রোগ জন্মিয়াছে। হৃদয়কমল-উত্থিত নিগূঢ় ভাব-নিচয়ের গতি প্রতি-রোধ করিলে, ডাক্তারি মতে, সেই বদ্ধভাবরূপ বিষে শরীর দূষিত হয়। তখন মস্তিষ্কে বিকার উপস্থিত হয়। আর্য্যরমণীর ধমনীতে তখন শোণিতনিচয় ইতস্ততঃ প্রবল পরাক্রমে প্রধাবিত হয়। শিরঃপীড়ার ইহাই আদি এবং মূল কারণ। আপনি যদি আমাকে আর দুইবার "শোও, শোও" বলিয়া জেদ করেন, তাহা হইলে আমার এখনি মাথা ধরিবে।

মা। তা বাছা, তুমি যাতে ভাল থাক, তাই তুমি কর।

এই বলিয়া জননী প্রস্থান করিলেন। কন্যা আবার ঘড়ী দেখিলেন,—তিনটা বাজিতে এখনও দশমিনিট বিলম্ব। কাঁটা সরাইয়া দিয়া তিনটা বাজাইলে প্রকৃতই তিনটা বেলা হয় কি না,—গুম্ হইয়া একমনে তাহাই বোধ হয় তিনি ভাবিতে লাগিলেন। সূর্য্যের বশে ঘড়ী হইল কেন? ঘড়ীর বশে সূর্য্য চলিল না কেন? বিধাতার এমন কুনিয়ম কেন? ঘড়ীর অধীনতা, দাসত্ব, পরমুখপ্রেক্ষিতা, সাম্যনীতির মূলে কি কুঠারাঘাত করিতেছে না? সূর্য্য কি ব্রাহ্মণ, ঘড়ী কি শূদ্র?—তাই আজও এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতে ঘড়ী, সূর্য্যের পদানত থাকিবে? এ দাসপ্রথা, পাপপ্রথা এদেশে আর কত দিন চলিবে? এখানে কি কোন উইল্‌বারফোর্স আজও জন্মগ্রহণ করেন নাই? কমলিনী ভাবনা-সাগরে ডুব দিলেন!

ডুব দিয়া, পাতাল পানে তলাইয়া যাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার করপদ্মে এক প্রকাণ্ড চৌকো লেফাফা আসিয়া পৌঁছিল। খামের এক পার্শ্বে ইংরেজীতে কেবল এইটুকু লিখিত আছে;—

KAMALINI

55————————Lane, Calcutta.

ভিতরে বাঙ্গালা।—

"সুহৃদ্বরাসু !

পরমপিতা পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, হৃদয় পবিত্র করুন, দেহ সুস্থ রাখুন! চারিটার সময় তোমায় শিক্ষা দিবার জন্য যাইতে সক্ষম হইলাম না। চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি করি নাই,—অভাবনীয় বিবিধ যত্ন সত্ত্বেও, নির্দ্দিষ্ট সময়ে তথায় উপনীত হইতে পারিলাম না। অপরাধ ক্ষমা করিও। সন্ধ্যার একটু পরেই পৌঁছিব। তোমার পাঠে ব্যাঘাত দিলাম বলিয়া আমি দুঃখিত, কাতর এবং মর্ম্মাহত। আমার দোষ লইও না। এই পত্রের উত্তর দিয়া আমার মনপ্রাণ শান্ত করিলে বড়ই অনুগ্রহ করা হয়।"

তোমারই নগেন।—

রমণী এই পত্র পাইয়া অবশ্যই নিতান্ত ব্যথিতা হইলেন। অবশ্যই প্রথমত উষ্ণদীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন; কিন্তু দুঃখ এই, সে শ্বাসবায়ুর শব্দ কেহ শুনিল না।

কমলিনী ভাবিতে লাগিলেন, পত্রের উত্তর দি, কি না দি! খুব ক্রোধের বশীভূত হইয়া বলিলেন, আমি আর পত্র লিখিব না। কিন্তু তাঁহার সে রাগের সান্ত্বনা করিবার কেহই নাই দেখিয়া, তিনি আবার মনে মনে বলিলেন, আচ্ছা, এবার এই শেষপত্র লিখিলাম, আর কখন লিখিব না।

"সুহৃদ্বর !

আমি আপনাকে গুরুর মত দেখি। এ নারী-জন্মের আপনিই আমার শিক্ষক। গুরুদেব! অধীনীর প্রতি আপনার কৃপা কম হইল কেন? নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিয়া আপনি আমায় অমৃতময় বাক্যে উপদেশ দিবেন, সেই আশায় আমি বসিয়া আছি। আশায় নিরাশ হইলে বুক ভাঙ্গিয়া যায়। আপনার বিশেষ কাজ থাকিলে আসিয়া কাজ নাই। কারণ, আপনার কোনরূপ ক্ষতি হইলে আমার কষ্ট হয়। আমি আপনার রূপ কল্পনা করিয়া, আপনার মূর্ত্তি গড়িয়া, হৃদয়-রাজ্যে বসাইব। সেই মূর্ত্তিকেই গুরুদেব বলিয়া প্রণাম করিয়া, আমি শেলি পাঠ আরম্ভ করিব।"

চিরদুঃখিনী কমলিনী।

এই পত্র ভৃত্য লইয়া গেল। কমলিনী আবার সেই ল্যাজবিশিষ্ট চেয়ারে গিয়া শুইলেন। বাঁ হাতে কেতাব, ডান হাতে পেন্সিল, চক্ষু মুদ্রিত।

এমন সময় আর একখানি পত্র আসিয়া পৌঁছিল। পত্র দিয়া দ্বারবান্ জিজ্ঞাসিল, "ডাক্তার বাবুকা আদ্‌মী খাড়া হ্যায়, আপ বোলী ত জবাবকে ওয়াস্তে খাড়া রহে।" কমলিনী পত্র খুলিতে খুলিতে উত্তর দিলেন, "অবি রহেনে বোলো।"

দ্বারবান্ সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। সেই পত্রের অভ্যন্তর প্রদেশে এইরূপ লেখা ছিল।—

"প্রিয় ভগিনি!

অদ্য তোমার মাথাধরা ব্যারামটা কেমন আছে, জানিবার জন্য বড় উৎসুক হইয়াছি। অদ্য তোমাদের বাড়ী আমার যাওয়া দরকার হইবে কি? যাইব কি? অতি অল্প পরিমাণ মাথা ধরিলে, তৎক্ষণাৎ লিখিয়া পাঠাইও; আমি সকল কাজ ছাড়িয়া যাইব। তোমার দাদা কবে আসিবেন?"

তোমারই মহেন্দ্র।

কমলিনী ঝটিতি এই পত্রের উত্তর লিখিয়া দিলেন;—

"প্রিয় ভ্রাতঃ!

আপনার অনুগ্রহপত্র পাইয়া পরম প্রীত হইলাম। আমার উপর আপনার যেরূপ কৃপাদৃষ্টি, যেরূপ যত্ন, যেরূপ স্নেহ, তাহাতে আমার মাথাধরা ব্যারাম অচিরে আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। আপনিই এ জগতে আমার একমাত্র পরমবন্ধু; প্রকৃত শান্তি, সুখ, স্বচ্ছন্দ আপনিই আমাকে প্রদান করিলেন। কিন্তু এরূপ অনুগ্রহদৃষ্টি চিরদিন থাকিবে কি? ভগবন্! আমায় অভয় দিন।

ভগবানের ইচ্ছায় এখন একটু ভাল আছি। যদি বিশেষ মাথা ধরে, তবে ৭টার পর ডাকিতে পাঠাইব।"

তোমার দুঃখিনী।

বার বার তিন বার। তখন আর একখানি পত্র আসিয়া পৌঁছিল। পত্রাকৃতি বড়ই জমকাল,—চারিদিকে সোনায় হল্‌করা,—এবং শিরোদেশে উত্থানশীলা, বিবসনা পরীর ছবি। পত্রের অভ্যন্তর এবং বাহ্যপ্রদেশ হইতে, আতর-গোলাপের সুগন্ধ বাহির হইতেছে। পত্রখানি পদ্যে;—

"কেন ভালবাসি, কি দিব উত্তর ?
নীল নয়নের তারা, ফেটে পড়ে বারিধারা,
ভাসে মুখ, ভাসে বুক, ভাসয়ে কোদর।
কেন হায়! ভালবাসি কি দিব উত্তর!

হাসে চাঁদ গগনের কোলে,
হাসে ফুল এ মহীমণ্ডলে,
ঝরে মধু কমলের ফুলে,
বহে বায়ু বাসন্তী-হিল্লোলে,
গায় পিক সুধামাখা বোলে
নাচে শিখী ঘন-ঘটা দোলে:—
দাবানলে দহে শুধু অভাগা অন্তর
কেন ভালবাসি হায় কি দিব উত্তর!

ক্ষুদ্রমতি ক্ষুদ্রগতি বামন বজ্জুর অতি,
দেহ মোর অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ!
দূরে অই গুরুগিরি, ধাপে ধাপে ধীরি ধীরি,
কেমনে উঠিয়া পাব ত্রাণ॥
কাঁদি তাই দিবানিশি ভাবিয়া ঈশ্বর।
কেন ভালবাসি তোমা, কি দিব উত্তর!

পঙ্কজ প্রফুল্ল কেন অরুণ উদয়ে,
কুমুদিনী ফুটে কেন চাঁদ-মধু-পিয়ে,
বসন্তে কোকিল কেন কুহু কুহু করে,
মলয় অনিল কেন ঝুরুঝুরু ঝরে,
কমলিনী পানে কেন ধাইছে ভ্রমর,
কেন ভালবাসি প্রিয়ে! কি দিব উত্তর!

কি দিব উত্তর ?—চাই আকাশের পানে,
কি দিব উত্তর ?—চাই পাতালের পানে ;
কি দিব উত্তর ?—হেরি সুনীল সাগর ;
কি দিব উত্তর ?—হেরি হিমগিরিবর ;
চারিদিক্ অন্ধকার—ঘোর, ঘোরতর,
কেন ভালবাসি প্রিয়ে ! কি দিব উত্তর !

ব্রহ্মাণ্ড কাগজ যদি, মৈনাক লেখনী,
কালী তোয়নিধি কিম্বা নয়নের পানি,
সময় অনন্ত যদি, শ্রম নিশিদিশি,
তবে ত উত্তর দিব, কেন ভালবাসি।
কিম্বা যদি হ'তো দেখা,—বিরল বাসরে,
সুধাংশুবদনি ! শুধু অর্দ্ধদণ্ড তরে !
নখে কার, বুক চিরি, খুলিয়া অন্তর,
কেন ভালবাসি, তার, দিতাম উত্তর।

দেখাতাম হাড়ে হাড়ে তব নাম লেখা,
দেখাতাম ত্বকে ত্বকে তব ছবি আঁকা ;
দেখাতাম প্রেমতরী শোণিত-সাগরে,—
জীবাত্মা নাবিক তার আছে হাল ধরে ;
দেখাতাম হৃদিমূল—শরতের শশী,
তবে ত উত্তর হ'তো—কেন ভালবাসি।

এই শেষ-লিপি, তবে,—বিদায় ! বিদায় !
সাজিব সন্ন্যাসী, মাখি, ভস্মরাশি গায়।
গেরুয়া বসন পরি, করে, কমণ্ডলু ধরি,
ভ্রমিব ভারতমাঝে নগরে কাননে,—

নদীবক্ষে গিরিশৃঙ্গে, সাগরতরঙ্গভঙ্গে,
গাইব তোমার গান আনন্দ-আননে।
যাগ যজ্ঞ হোম জপ তপ যন্ত্র তন্ত্র,—
সেই নাম, সেই নাম, সেই নাম মন্ত্র,—
সে নাম সঙ্গের সাথী—সে নাম ঈশ্বর,—
কেন ভালবাসি প্রিয়ে! কি দিব উত্তর!

শ্রীনবঘনশ্যাম

এই পদ্যটী কেবল আপনার পাঠের জন্যই লিখিলাম। আপনি যদি ছাপাইতে অনুমতি দেন, তবে ছাপাইব। আর যদি লোকসমাজে প্রচার করা, ইহা আপনার অভিপ্রেত না হয়, তাহা হইলে ছিঁড়িয়া কুচি কুচি করিয়া ফেলিবেন। আজ দুই বৎসর পূর্ব্বে সেই অপূর্ব্ব গোলাপ ফুলটী আমার হাত হইতে ঈষৎ হাসিয়া, কাড়িয়া লইয়া আপনি কোমল নখ দ্বারা যেরূপ ধীরে ধীরে ছিঁড়িয়াছিলেন, এই পত্র সেভাবেই ছিঁড়িবেন। পনের দিন কলিকাতায় রহিলাম, তথাচ এক দিনও দেখা হইল না—সে সকলই আমার দুরদৃষ্ট! এখন দূর দেশে চলিলাম, কবে ফিরিব জানি না।"

শ্রীনবঘনশ্যাম।

কমলিনী, পত্র পাঠান্তে, প্রায় দশমিনিট কাল, আপন মনে গভীর চিন্তা করিলেন। শেষ উত্তর দিলেন,—

"ইহার উত্তর আজ নহে। আপনার কর্ম্মস্থানে, ডাকযোগে উত্তর পাঠাইব। এখন এইমাত্র বলিতে পারি, আমি নিরপরাধিনী অবলা।"

সংসারসুখ-বিরহিতা কমলিনী।

তৃতীয় পত্রের উত্তর দিয়া, কমলিনী নীরবে সোফায় গিয়া শুইয়া রহিলেন। ভৃত্যকে বলিলেন, "জোরসে পাঙ্খা চালাও।" তৎপরে তিনি নয়ন দুখানি বুজিলেন।

কি কর্ম্মভোগ! দেখিতে দেখিতে, আর একখানি পত্র আসিল। পত্রখানি, বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাসের লিখিত। যথা ;—

"মহিলা-কুল-গৌরবে!

রমণীতে বিজ্ঞান বুঝিবে, ইহা আমি কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই। কিন্তু তোমাকে

দেখিয়া, আমার সে ভ্রমান্ধকার দূর হইল। আজ একমাস মধ্যে শরীর-বিজ্ঞানে তুমি যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছ, তাহা অত্যদ্ভুত। আর রসায়নেও তোমার দৃষ্টি প্রখরা। আজ আমার শিক্ষা দেওয়া সার্থক হইল। কিন্তু একটা বড় অসুবিধা ঘটিয়াছে। সপ্তাহে কেবল একদিন বিজ্ঞান পড়িবার দিন নির্দ্দিষ্ট আছে; তাহাতে পড়া অতি অল্পই হয়। কিন্তু ইংরেজী সাহিত্য-পাঠ সপ্তাহে ছয় দিন হইয়া থাকে। একদিন সাহিত্য-পাঠ কমাইয়া, সপ্তাহে বিজ্ঞান পাঠ দুইদিন ধার্য্য করিলে ভাল হইত না কি? বিশেষ, সাহিত্য অপেক্ষা বিজ্ঞান কিছু গভীরতর বিষয়। চন্দ্রমুখি! এ বিষয়ে তুমি যাহা অনুমতি করিবে, তাহাই হইবে।"

অনুগত শ্রীনিত্যানন্দ দাস।

নিত্যানন্দ বাবু বহুকাল বিজ্ঞানচর্চ্চায়, দুচারগাছি চুল পাকাইয়া, ক্রমশ প্রবীণত্বে পা দিয়াছেন। কমলিনী এ পত্রের এই উত্তর দিলেন;—

"অদ্য আমার শরীর অসুস্থ। সুতরাং গভীর বিষয় আলোচনা করিবার অদ্য উপযুক্ত সময় নহে। কিন্তু আপনার কথা দিবানিশি আমার মনে জাগিয়া থাকিবে। শয়নে, স্বপনে, শ্রবণে, ভবনে—কেবল ঐ কথাই ভাবি। কারণ আপনার দ্বারা আমি যেরূপ উপকৃত হইয়েছি, অন্যের দ্বারা সেরূপ নহে;—আপনি ভিন্ন বিজ্ঞানের কঠোর অর্থ আর কে বুঝাইতে পারে?"

বিজ্ঞান-ভিখারিণী কমলিনী।

এমন সময়, উকীলবাবুর "ভেট" কমলিনার সম্মুখে উপস্থিত হইল। রজতথালে সন্দেশ এবং গোলাপফুলের তোড়া। পত্রখানি গালামোহর করা। উপরে লেখা আছে, 'অন্যের পাঠ নিষেধ।' কমলিনী সেই পত্রখানি মনে মনে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। পত্রবাহক এক টাকা বক্‌শীশ পাইয়া বিদায় হইল।

উপরি উপরি চারিখানি পত্র লিখিয়া কমলিনী নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। কোমল করপল্লব আড়ষ্ট হইল। আঃ, উঃ, গেলাম, বাঁচিনা, ইত্যাদি মিহি মিহি শব্দ তাঁহার মুখ-বিবর হইতে উত্থিত হইতে লাগিল। তথাচ চারিটা বাজিল না। এমত স্থলে ঘড়ীর কল খারাপ হইয়াছে, এরূপ অনুমান করাই যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং কমলিনী, দ্বারবান্‌কে গির্জ্জায় ঘড়ী দেখিতে পাঠাইলেন।

পাঠাইয়া, নিজ পাঠগৃহে প্রবেশ করিলেন। ঘরটী ক্ষুদ্র। মধ্যভাগে একটী ছোট টেবিল; তার দুধারে দুখানি কেদারা; পাশে একখানি বেঞ্চ। ঈষৎ দূরে খাট গদী আঁটা; ধপধপে চাদর বিছানো; তদুপরি সরু, মোটা, পাতলা,—নানা রকমের ৫।৬ টী বালিস। বইভরা দুইটী ছোট আলমারি। কাগজ, কলম, দোয়াত। ছবি, দেয়ালগিরি, ক্লকঘড়ী। কুঁজোয় কলের জল, বোতলে লাল ঔষধ, আলনায় বিলাতি তুয়ালে। ডিপেয় পান, খাতায় গান, বাক্সে হার্‌মোনিয়ম্।

কমলিনী সেই নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া আপন মনে মহাকবিতা রচনা করিবার উপক্রম করিলেন।

প্রথম সেক্ষপীয়র খুলিয়া, তাহা হইতে সুচিক্কণ কাগজে ইংরেজী কবিতা উদ্ধৃত করিলেন;—

To be, or not be, that is the question
Whether 'its nobler in the mind, to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles
And by opposing end them?—To die,—to sleep,—
No more, and, by a sleep to say we end
The heart-ache, and the thousand natural shocks
The flesh is heir to,—'tis a consummation
Devoutly to be wish'd. To die,—to sleep;—
To sleep! perchance to dream; ay, there's the rub;

এই পর্য্যন্ত লিখিয়া ইহার বঙ্গানুবাদ আরম্ভ হইল,—

হয়, কিনা হয়,—মরি কিম্বা বাঁচি,—প্রশ্ন
ইহাই এখন। হতভাগ্য কপালের
বিষমাখা-বাণ গায়ে ফোটে সদা,—
দুঃখের সমুদ্রঘোর, তরঙ্গ-সঙ্কুল!

উচ্চছন্দে রোধিব কি গতি তার? কিম্বা
অনন্ত-আলয়ে দিব—যত যত ক্লেশ!
মৃত্যু—নিদ্রা—আর কিছু নয়, ঘুমাইলে,—
হ্রাস হয়, হৃদয়বেদনা,—মাংসপিণ্ড
শরীরের শতেক যাতনা;—এই ফলে
পূর্ণ হয় মনের কামনা। মৃত্যু—নিদ্রা!—
নিদ্রা বুঝি অসার স্বপন। এইখানে,
হায়! হায়! কাঁচাবাঁশে ধরিলরে ঘুণ!

লেখা শেষ হইলে, কমলিনী কবিতাটীর প্রথম-আধখানা খুলিয়া, দ্বিতীয় আধখানা ঢাকিয়া টেবিলের উপর, অতি যত্নে রাখিয়া দিলেন। তথাচ সাহিত্য-শিক্ষক আসিয়া উপনীত হইলেন না। কমলিনী তখন জানেলার নিকট গিয়া উর্দ্ধমুখী হইয়া নীল আকাশপানে তাকাইলেন; আকাশ ভাল লাগিল না। দক্ষিণ দিকের গবাক্ষ দিয়া রাজপথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন:—জনতা বিষবৎ বোধ হইল। অবশেষে, সেই নিজন্ম নির্জ্জন ঘরে "সহজ-কেদারায়" শুইয়া, শেলির গল্প বুকে রাখিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অমানিশার পর পূর্ণিমা, শীতের পর বসন্ত, দুঃখের পর সুখ—ইহাই স্বভাবের সুনিয়ম। কবি বলিয়াছেন,—

দুখ সুখ সম্পদ বিপদ,
কালচক্রে ঘোরে পদে পদ।
তাহার মাঝেতে নর, করে বাস নিরন্তর,
শৃঙ্খলেতে যথা চতুষ্পাদ॥

কিন্তু দুঃখের পর কমলিনীর সুখ নাই কি? আরও দেখ। অতিগরমের পর, বারিবর্ষণে পৃথিবী শীতল হয়। ওয়াটার্লুর ঘোরতর সংগ্রামের পর, ইউরোপ-ভূখণ্ডে শান্তি বিরাজিত হয়। আর আজ, কমলিনীর হৃদয়ক্ষেত্রে যে, মহা-ওয়াটারলুর সংগ্রাম চলিতেছে, তাহার কি এখনও বিরাম হইবে না? নহিলে যে সংসার লয় হয়!

কাল পূর্ণ হইলে, দেখিতে দেখিতে ডসনের বাড়ীর জুতাবিশিষ্ট পদের শব্দ, কমলিনীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। কমলিনী কাণ খাড়া করিয়া, সেই অনুরাগে ধ্বনিত—জুতার সেই দুপদাপ, ধুপধাপ শব্দ শুনিতে লাগিলেন;—কাণ দিয়া সেই জুতা-মধু পান করিলেন। ক্রমে মনোমোহিনী, মধুময়ী জুতা-ধ্বনি নিকটবর্ত্তী হইল,—ঘনত্বভাব ধারণ করিল,—দুধ যেন ক্ষীরে পরিণত হইল। তখন সেই শব্দের প্রসূতি পুরুষবর, সেই নিভৃত কক্ষের দ্বারদেশে সুকোমল ধাক্কা দিয়া বলিলেন, "আপনি বোধ হয় একবার উঠিয়া, খিল খুলিয়া দিতে, আপত্তি করিবেন না!"

কমলিনী অতি ধীরভাবে ঝিঁঝিট-খাম্বাজে বলিলেন, "দিতেছি!—হা ঈশ্বর!"

খিল খোলা হইলে, সেই পরম পুরুষের মোহন মূর্ত্তি, নয়ন-পথের পথিক হইল। সে মূর্ত্তি কেমন?—

বদন মণ্ডল, চাঁদ নিরমল,
ঈষৎ গোঁফের রেখা।
বিকচ কমলে, যেন কুতূহলে,
ভ্রমর পাঁতির দেখা॥
আজানুলম্বিত, বাহু সুললিত,
কামের কনক আশা।
বক্ষ সুবিশাল, উপহাসে কাল,
অনন্ত প্রেমের বাসা॥

পুরুষের দীর্ঘ দেহে, রেশমের এক দীর্ঘ পার্শী-কোট বিলম্বিত। পরিধান,—ফরেসডাঙ্গার উৎকৃষ্ট কালাপেড়ে ধুতি। একগাছা খুব মোটা সোনার চেন, অর্দ্ধচন্দ্র রেখায় বুকে ঝুলিতেছে। অধর-ওষ্ঠ, লালবর্ণ। চোখ দুখানি, পটল-চেরা। মাথায়,

চেরা-সিঁথি। শরীর হৃষ্টপুষ্ট,—মাংসল, অথচ স-সার। মুখটীতে সদা হাসি-মাখানো। বয়স, পঁচিশ বৎসরের কম নহে। নাম, নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ইনি কলেজের অধ্যাপক এবং কমলিনীর সাহিত্য-শিক্ষক।

ছাত্রী এবং শিক্ষকে উভয়ে চারিচক্ষে শুভ সম্মিলন হইলে,—নিতান্ত ম্লানভাবে কঠোরক্ষীণস্বরে, ছাত্রী-কমলিনী, শিক্ষক-নগেন্দ্রকে বলিলেন,—"আপনি কি নিষ্ঠুর! নারীজাতিকে কষ্ট দিবার জন্তই বুঝি বিধাতা, পুরুষকে গড়িয়াছেন?"

নগেন্দ্র। তা, আপনি আমাকে সবই বলিতে পারেন। আমার হৃদয়, পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন না হ'লে কি এরূপ অবস্থা ঘটে? আমি অকৃতী, অধম, ভীরু, কাপুরুষ! আপনার নিকট আমি শত অপরাধে অপরাধী!

কমলিনী। রাগ করিলেন নাকি?

নগেন্দ্র। রাগ করি নাই, দুঃখ করিতেছি! ভারতের কুসংস্কার, ভারতের কুনীতি, ভারতের কুপ্রথা দেখিয়া কেবল কাঁদিতেছি।

ছাত্রী-রমণী, শিক্ষক-পুরুষের কান্নার কথা শুনিয়া, নিতান্ত ব্যথিত হইয়া, তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন;—"আসুন আসুন, চেয়ারে বসুন।"

তখন নরনারী উভয়েই টেবিলের উভয় পার্শ্বস্থিত সেই চেয়ারে উপবেশন করিলেন। ধরাধামে যেন রতিকাম আবির্ভূত হইলেন

চেয়ারে বসিয়াই, কমলিনী সেই সদ্যোজাত কবিতাটী লুকাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিলেন। নগেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসিলেন, (কবিতার কাগজ, মায় কবিতা, আধাআধি দেখা যাইতেছে)—"ও কি ও? কবিতা লিখিয়াছেন কি? দেখি, দেখি, কেমন কবিতা।"

ক। না, না, এ আপনার দেখে কাজ নাই? ও কিছু নয়?

ন। আপনিত, কখনো কিছুই আমার নিকট গোপন করেন না। যাহা আমার জানিবার কস্মিন্‌কালে সম্ভাবনা ছিল না, তাহাও আপনি আমাকে জানাইয়াছেন। আজ এ ভাব কেন?

ক। (একটু যেন অপ্রস্তুত ভাবে) আমি ত কিছুই লুকাইতেছি না! (একটু গম্ভীর ও বিজ্ঞভাবে) যদি লুকাইব, তবে সুমুখে রাখিব কেন? যদি সুমুখেই রাখিলাম, তবে চাপা দিয়া রাখিলাম না কেন? লুকাই নাই,—দেখাইব না, ইহাই উদ্দেশ্য।

কমলিনী ও নগেন্দ্রনাথ
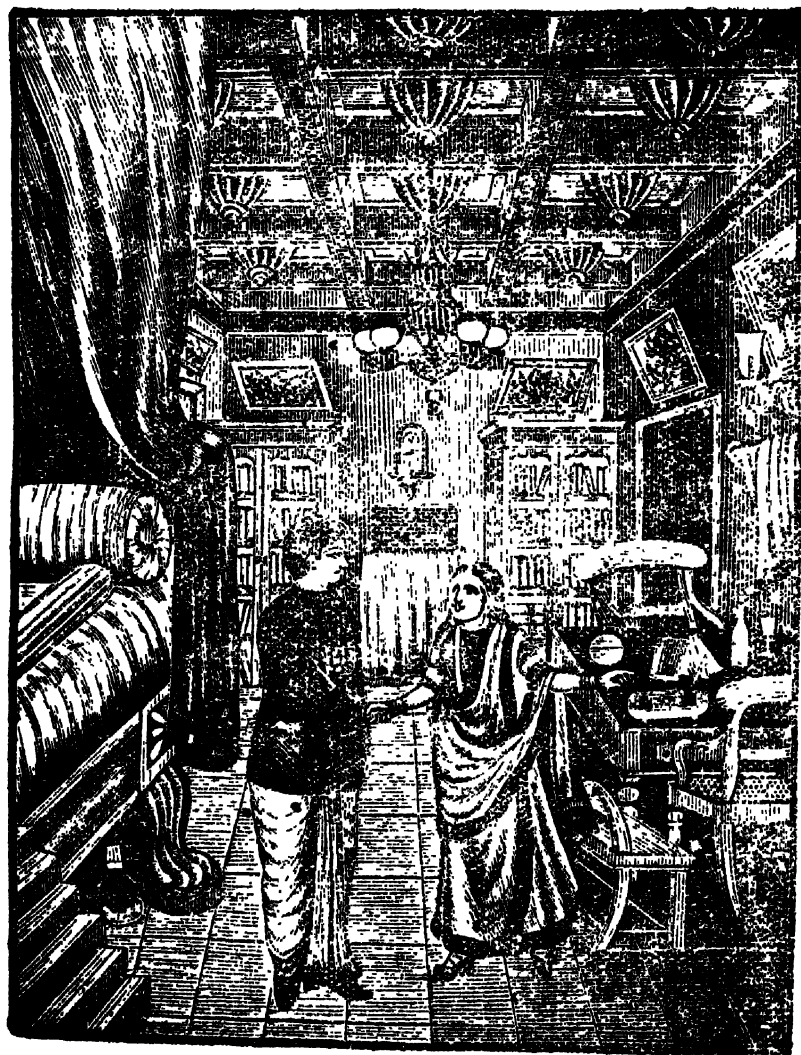
কবিতাটী তখনও আধা আধি খোলা ;—

ন। (একটু হাসি হাসি মুখে) আচ্ছা, আমি এই কবিতার কাগজ ধরিলাম, আপনি কাড়িয়া লউন।

ক। সে সাধ্য আমার নাই। আপনার উপর আমি বল প্রকাশ করিতে পারি না! আর বাধা দিব না। আপনি পড়ুন,—কিন্তু দেখিবেন ;—

ন। (কবিতা পাঠ করিতে করিতে)

হয়, কি না হয় মরি কিম্বা বাঁচি—

প্রশ্ন ইহাই এখন—;

অহহ! কি দুর্দ্দৈব! এ দারুণ বিষময় ভাব আপনার মনে উদয় হইল কেন? ও কোমল প্রাণে, ঐ প্রফুল্ল পঙ্কজবৎ পবিত্র নির্ম্মল-হৃদয়ে এমন কি আঘাত লাগিল যে, আপনাকে অদ্যই শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিন ভাবিতে হইল? কোন্ প্রেতাত্মা বিভীষিকা দেখাইয়াছে? কোন্ রাক্ষস গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে? কোন্ পশু আক্রমণ করিয়াছে? বলুন, শীঘ্র বলুন?

কমলিনী কথা কহিলেন না। নীরবে অধোবদনে রহিলেন। শেষে পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া চোখে দিলেন।

ন। আমার শরীর, মন, আত্মা দিয়া যদি আপনার অভাব পূরণ করিতে পারি, তাহাতেও আমি রাজী আছি। আপনি কাঁদিবেন না, চোখের রুমাল খুলুন,—কি হইয়াছে বলুন।

কমলিনী চোখের রুমাল, ডান হাত দিয়া আরও আঁটিয়া ধরিলেন। বদন-চাঁদখানিকে আরও অবনত করিলেন। ক্রমে মুখের সঙ্গে টেবিলের শুভসম্মিলন হইবার যোগাড় হইল।

তখন কাতর, গুণাকর মাষ্টার আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। শশব্যস্তে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কমলিনীর কর-কমল ধরিয়া বলিলেন, "একবার মুখ তুলুন, একটী কথা কহুন—"

এমন সময় সেই ক্ষুদ্র ঘরের দ্বারদেশের অদূরে পদশব্দ এবং মানবকণ্ঠধ্বনি শ্রুত হইল। কমলিনী এবং নগেন্দ্র বাবুর মুখ, চোখ, নাক, কাণ, সেই দিক্ পানে ফিরিল।

হঠাৎ অমনি রমণীরত্নের চোখ হইতে রুমাল খসিল, দেহের সেই অবনত ভাব ঘুচিল,—বামহস্তে নোটবুক এবং দক্ষিণ হস্তে পেন্সিল বিরাজিল। ওদিকে মাষ্টার বাবু, সম্মুখস্থিত সেক্ষপীয়রের হ্যামলেটখানি হাতে লইলেন এবং তাহাতেই মনঃসংযোগ করিলেন। এই সব পার্থিব কার্য্য, পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে সম্পাদিত হইল। এদিকে সেই শব্দ এবং অব্যক্ত কণ্ঠধ্বনি, ক্রমে যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল; মাষ্টারের হ্যামলেটে মনঃসংযোগ ততই অধিকতর বৃদ্ধি পাইল; কমলিনী নোটবুকে ততই বেগে মানে লিখিতে লাগিলেন।

তখন সেই মানব, গৃহ-দ্বারে ধাক্কা দিয়া বলিল,—"মাষ্টার মোশাই আজ একটা একৃষ্ট্রা ক'সে দিন না?"

মাষ্টার তখন তদ্গতচিত্ত ধ্যানমগ্ন যোগী; পূর্ব্ব হইতেই কমলিনীকে উদ্দেশ করিয়া পুস্তকের দিকে চাহিয়া বলিতেছিলেন,—"পৃথিবীতে যত কবি আছেন, তন্মধ্যে সেক্ষপীয়রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মিল্টন বলুন, বায়রন বলুন, টেনিসন বলুন, সেক্ষপীয়রের কাছে কেউ নয়।

ক। আমার মতে সব চেয়ে শেলি ভাল;—

ন। শেলিও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার কবিতার মহিমা আমি একমুখে বর্ণন করিতে অক্ষম। তাঁহার একএকটী কবিতার জন্য আমি এক মিলিয়ান পাউণ্ড পর্য্যন্ত দিতে পারি।

ক। আমি সর্ব্বস্ব দিতে পারি।

ন। ঠিক! ঠিক! আপনিই শেলির প্রকৃত মহিমা বুঝিয়াছেন।—এ জগতে কয়জন শেলি বুঝিতে পারে?

এই সময় সেই মানব গৃহের গুরুভার-বিশিষ্ট স্কীরিন বহু কষ্টে তুলিয়া, ধাক্কা দিয়া দরজা খুলিয়া, ঘরে ঢুকিল। নগেন্দ্র বাবু বলিলেন,—"এস এস,—বিপিনবাবু, কতক্ষণ? ব'স, ব'স।"

বিপিন পাশের বেঞ্চে বসিল। সেই পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক এণ্ট্রেন্স ক্লাসে পড়ে।

বিপিন, কমলিনীর ছোট ভাই। তাহার স্বতন্ত্র গৃহশিক্ষক আছে। তবে কোন কঠিন বিষয় হইলে, বিপিন অধ্যাপক নগেন্দ্রের নিকট হইতে বুঝাইয়া লইয়া যায়।

অদ্য বিপিনের গৃহশিক্ষক আসেন নাই, একৃষ্ট্রাও শক্ত। কাজেই বিপিন, ছুটীর পর ঘরে আসিয়াই, তাড়াতাড়ি নগেন্দ্র বাবুর নিকট একৃষ্ট্রা বুঝিতে আসিয়াছে।

বিপিন। মাষ্টার মোশাই! একৃষ্ট্রাটা বড় শক্ত, ক'সে দিন ত? আজ কেউ ক্লাসে এটা কস্‌তে পারে নাই। হেডমাষ্টার বোল্লেন, তোমরা বাড়ী থেকে ক'সে এনো।

ন। তাই ত, আমার বড় সর্দ্দি কোরেছে। কাল দিবো।

বি। না,—মাষ্টার মোশাই, পায়ে পড়ি মাষ্টার মোশাই, আজ বুঝিয়ে দিন না?

ক। হেঁরে বিপিন, তুই পাগল হলি নাকি? ওঁর অসুখ কোরেছে, সর্দ্দিতে মাথা কামড়াচ্চে,—দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌ না? একৃষ্ট্রার জন্য ভাবলে যে, ওঁর আরও অসুখ বাড়বে।

বি। (ক্ষুণ্ণভাবে, ঈষৎ ক্রন্দনের সুরে) মাষ্টার মোশাই কেবল দিদির পড়াটাই বো'লে দেবেন, আমাকে কিছু বোলবেন না!

এই বলিয়া বালক প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল।

ন। নাহে বিপিন বাবু! রাগ করো না। কৈ? তোমার একৃষ্ট্রা দেখি। কাল বৈকালে নিশ্চয় বোলে দিবো।

বালক একৃষ্ট্রা দেখাইল। নগেন্দ্র বাবু একৃষ্ট্রা কাগজে লিখিয়া, পকেটজাত করিলেন। বিপিনচন্দ্র তখন প্রফুল্লমনে কক্ষ হইতে বাহির হইল।

আপদ-বালাই বিদায় হইলে, নগেন্দ্রনাথ পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, "কমলিনি! আমার অন্তরে দাবানল জ্বলিতেছে। আপনি আমাকে প্রকাশ করিয়া বলুন, কিসে এরূপ দারুণ মনোব্যথা পাইলেন।"

ক। এমন জিনিস জগতে কি আছে, যাহা আপনাকে দেখাইব না, এমন কথা কি আছে, যাহা আপনাকে বলিব না; এমন ধ্যান কি আছে, যাহাতে আপনাকে ভাবিব না। কিন্তু অদ্যকার কথা বড় বিষম। আর ঐ ভয়াবহ কথা আপনাকে বলিয়াও কোন লাভ নাই। তাহাতে কেবল আপনার কষ্ট বৃদ্ধি হইবে। বাজার হইতে এখনি আমাকে বিষ কিনিয়া আনিয়া দিন, তাহাই সুধাবোধে আহার করিয়া, অদ্যকার এ দারুণ গাত্রজ্বালা নিবারণ করি।

ন। (অতি কাতর ভাবে) আপনি যদি ওকথা না বলেন, তাহা হইলে এখনি আমি বঙ্গোপসাগরের অনন্ত জলে ঝাঁপ দিব। আমার অন্তরাত্মা পুড়িয়া যাইতেছে; আপনি সেই কথামৃতে আমার প্রাণ শীতল করুন। যদি না বলেন, তাহা হইলে, অদ্যই নগেন্দ্রহীন জগৎ দেখিবেন।

ক। (আমি জলহীন মৎস্য দেখিতে পারি, চন্দ্রহীন পূর্ণিমা-রজনী দেখিতে পারি, বায়ুহীন পৃথিবী দেখিতে পারি, কিন্তু নগেন্দ্রহীন জগৎ দেখিতে পারি না। গুরুদেব! সখা! ভ্রাতা! মাথা না থাকিলেও যদি মানুষের কথা কওয়া সম্ভব হয়, চক্ষু না থাকিলেও যদি মানুষের দর্শন করা সম্ভব হয়, তথাচ আপনা ব্যতীত, আমার জীবিত থাকা সম্ভব নহে।)

ন। মরি! মরি! বিধাতার কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি! এমন বিদ্যা বুদ্ধি প্রতিভা কি নীরবে, নির্জ্জনেই বিলয় প্রাপ্ত হইবে?' পারিজাত কুসুম কি মরুভূমেই ফুটিবে, মরুভূমেই শুকাইবে? কমলে! ভগিনি!—

কমলিনী চোখে রুমাল দিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

বাহির হইতে এক নারীকণ্ঠ ডাকিতে লাগিল,—"কমল, ও-কমল, সন্ধ্যা হলো মা, কিছু খাবে এস মা!"

ক। (ঈষৎ ধীরে) বুড়ী মাগী জ্বলিয়ে খেলে। মায়ের ত আর কোন কথা নেই,— কেবল খেসে, আর ঘুমুসে। (উর্দ্ধস্বরে) মা, আজ আমার এখনও ক্ষুধার উদ্রেক হয় নাই। বিশেষ, মাষ্টার মোশাই পড়া দিচ্চেন,—এখনও পাঠ শেষ হতে দেরী আছে!

মাতা ঘরের নিকট আসিয়া ধীর-স্বরে বলিলেন,—"এ ঘরের পরদা যে ভারি, সহজে সরান যায় না।"

ন। (হামলেট গ্রন্থে চিহ্ন নিহিত করিয়া) বলুন দেখি,—**not a mouse stirring** অর্থ কি?

ক। **not** মানে না, **a** মানে এক, **mouse** মানে ছুঁচো, **stirring** মানে নড়ে চড়ে বেড়ায়,—অর্থাৎ একটী ছুঁচোও তথায় নড়েচড়ে বেড়াইতেছে না।

ন। ইহার ভাবার্থ কি বুঝিলেন?

ক। সদ্গন্ধে সে স্থান আমোদিত। ছুঁচো থাকিলেই দুর্গন্ধ উঠে,—একটাও ছুঁচো নাই;—সুতরাং সদ্গন্ধে মজলিস ভুর্ ভুর্ করিতেছে"।

ন। অতি সুন্দর অর্থ! কিন্তু অপরাপর টীকাকারগণ ইহার অন্য অর্থও করিয়া থাকেন,—

ক। তা করুন, তাতে আমার আপত্তি নাই।

ন। মহাকবি বায়রণের জীবনচরিত কতদূর পাঠ হলো?—তাঁহার জীবনের যে যে স্থান সামঞ্জস্য করিতে পারিবেন না,—আমাকে বলিবেন। আমি তৎক্ষণাৎ বুঝাইয়া দিব।

ক। বায়রণ একজন অতি পবিত্র প্রেমপরায়ণ মহোদয় পুরুষ। তিনি স্বর্গে গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার আত্মা আজও জীবিত আছে। তাঁহার জীবন্ত, সুন্দর কমনীয় ছবিটী কখন ভুলিব না,—

ন। ঠিক্, ঠিক্, ঠিক্।

জননী ইতিমধ্যে গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"মা, একটু কিছু খাওসে!"

ক। না,—কিছু খাবো না—কতবার এক কথা বল্‌বো? পড়া না সেরে, আমি খাবো না।

মা। মাথা টাথা ধরে নাই ত? আছ ভাল?

ক। (স্বগত) জ্বালিয়ে পুড়িয়ে থাক্ কর্‌লে! (প্রকাশ্যে) বেশ আছি, এখন কোন ব্যারাম নাই। (মাষ্টার মহাশয়ের প্রতি) Magazine শব্দের Derivation টা কি? ইহা আমাদের ভারতবর্ষীয় কথা নয় কি?

ন। সে কথা পরে বলিব। শব্দের উৎপত্তি, গতি, স্থিতি এবং প্রলয় অতি আশ্চর্য্যরূপে সংঘটন হয়।

ক। ঔপন্যাসিক সম্প্রদায়ের মধ্যে, এ মহীমণ্ডলে ভিক্টারহিউগো প্রধান নয় কি? তাঁহার "লা-মিজারেবল" যতই পাঠ করি, ততই আনন্দসাগরে ডুবিতে থাকি।

জননী তখন "আসি মা" বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

ন। চমৎকার বুদ্ধিমতী! আর কালবিলম্ব করিবেন না; সেই গুপ্তকথা প্রকাশ

ক। (যোড় হাতে) গুরুদেব! আমায় ক্ষমা করুন! সে কথা শুনিলে, আপনার কোমল হৃদয়-পদ্মে অধিকতর জ্বালা উপস্থিত হইবে। এ ভিখারিণীর মর্ম্মযাতনার অংশভাগী হইয়া আপনার লাভ কি?

ন। এখনি যদি শক্তিশেল বুকে লাগিয়া, আমার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া যাইত, তাহা হইলেও আমার এত অধিক যাতনা হইত না,—আমাকে যদি সেই গোপনীয় কথাও না বলেন, তাহা হইলেও, এত যাতনা হয় না; কিন্তু আপনার ঐ শেষ কথা,—"অংশ-ভাগী হইয়া আপনার লাভ কি?" ঐ কথারূপ ব্রহ্মাস্ত্রে আমার দেহ ভস্মীভূত হইতে আরম্ভ হইয়াছে,—আমি মরিলাম!

নগেন্দ্রনাথ তখন পকেট হইতে রুমাল লইয়া যথারীতি চোখে দিলেন।

কমলিনী দাঁড়াইয়া উঠিলেন, ধীরে ধীরে গজেন্দ্র-গমনে, নগেন্দ্রের পার্শ্বে গিয়া রুমাল খুলিয়া লইলেন, এবং নিজ অঞ্চলের কোণ দিয়া, অতি যত্নে তাঁহার চোখ মুছাইয়া দিলেন। নগেন্দ্র পকেট হইতে দ্বিতীয় রুমাল বাহির করিয়া, আবার চোখে দিলেন; কমলিনী আবার তাহা খুলিয়া লইলেন। শেষে ছাত্রী, শিক্ষকের দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "প্রভো! ক্ষান্ত হউন! অধীনীর অপরাধ হইয়াছে। ক্ষমা করুন। আমাকে আপনি অবিশ্বাসিনী ভাবিবেন না। আপনার কাছে কোন কথাই গোপন নাই। আজই হৃদয় বিদারণ করিয়া দেখাইব যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডমধ্যে কেবল এক ব্যক্তিই আমার হৃদয়ের অধিপতি হইয়া আছেন—"

ন। ধন্য! ধন্য! রমণী-রত্নমধ্যে আপনিই কহিনুর, রমণী-তারাগণমধ্যে আপনিই পূর্ণচন্দ্র, রমণী-পুষ্পমধ্যে আপনিই পারিজাত, রমণী-পর্ব্বতমধ্যে আপনিই হিমালয়, রমণী-নদী মধ্যে আপনি ঐরাবতী এবং রমণী-বৃক্ষমধ্যে আপনিই শাল্মলী তরু।

ক। আপনি প্রস্তুত হউন; সেই গূঢ় কথা কাণে কাণে বলিব।

নগেন্দ্রনাথ তখন আপন মুখ, গণ্ডদেশ, নাসিকা, কাণ,—কমলিনীর কমলমুখের নিকট লইয়া গেলেন। জগতে একবৃন্তে যেন মাণিকযোড় দুখানি চাঁদ ফুটিয়া উঠিল। নারীমুখ, নর-গণ্ডদেশে স্থাপিত হইল। সেই নিভৃত পবিত্র কক্ষে, সেই নিগূঢ় পবিত্র কথা, পবিত্র-মুখনিঃসৃত হইয়া পবিত্রকর্ণে পবিত্র-সুধাবৎ ঢালিত হইতে লাগিল।

হইতেও বোধ হয়, এ সুধা খাঁটি। নগেন্দ্রনাথ সুধাপানে পুলকে পূর্ণ হইয়া বলিলেন, "কমলিনি! আপনার কোন ভয় নাই। কথা গুরুতর বটে, কিন্তু এ নগেন্দ্র জীবিত থাকিতে, আশঙ্কার কোনও কারণ নাই। আপনার প্রফুল্ল-কমলবৎ মুখমণ্ডল এখন হাসিময় দেখিলেই নগেন্দ্র-জীবন শীতল হয়!—"

ক। হাসি?—মরুভূমে বরফ! পর্ব্বতে পদ্ম! গরলে অমৃত। অমানিশায় চাঁদ! আপনি অদ্য আমার নিকট হইতে নিতান্তই অপ্রাকৃতিক বস্তু প্রার্থনা করিতেছেন। আমার হৃদয়ে তরঙ্গ নাই,—বুদ্বুদ উঠিবে কিরূপে?

ন। (স্বগত) কমলিনীরই সাহিত্যপাঠ সার্থক হইয়াছে। (প্রকাশ্যে) সমস্তই যথার্থ, কিন্তু আমার মন বুঝে কৈ?

ক। সে যা হোক, কথার আর সময় নাই; এক্ষণে আমাদিগকে প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। কাল-বিলম্ব করিবেন না।

ন। অতি উত্তম কথা।

ক। বিপদের সময় সকল বন্ধুবান্ধবের সহিতই পরামর্শ করা উচিত। ৫টা বাজিয়া গিয়াছে। আপনি শীঘ্র ডাক্তার বাবুর বাসায় যান। মহেন্দ্র-বাবুকে অনতিবিলম্বে এখানে আসিতে বলুন। সেখানে আপনি তাঁহার নিকট এ গূঢ়-কথার কোনও উল্লেখ করিবেন না,—সমস্ত কথা আমি তাঁহাকে এখানে গুছাইয়া বলিব। আমি তাঁহাকে আসিবার জন্য পত্র লিখিয়া দিতেছি, আপনি দ্রুতপদে গমন করুন,—বড়ই সঙ্কটকাল!

নগেন্দ্র বাবু গমনোদ্যত হইলেন। কমলিনী চোখে রুমাল দিয়া দক্ষিণকরে নগেন্দ্রের হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"আপনি নিতান্তই যদি চলিলেন,— আমার সহায় থাকিবে কে? আমি নিতান্ত মন্দভাগিনী,—একাকিনী ঘরে থাকিতে আমার হৃদয় ভয়ে কাঁপিতে থাকে। আপনি আর একটু বসুন—আমি ডাক্তার-বাবুকে ডাকিবার জন্য চিঠি লিখিয়া লোক পাঠাইয়া দি—তিনি আসিলেই আপনি যাইবেন।

ন। আচ্ছা, তাহাই হউক।

তখন ভৃত্য, পত্র লইয়া ডাক্তার মহেন্দ্র-বাবুকে ডাকিতে গেল। ডাক্তারগৃহ একরশী পথমধ্যে অবস্থিত হইলেও,—ক্রমে ২৫ মিনিট সময় অতীত হইলেও, মহেন্দ্র-বাবু

মহেন্দ্র-বাবুকে পাঠাইয়া দিন। আর কল্য প্রাতঃকালে যেন আপনার সাক্ষাৎ পাই। সম্ভবত সেই সময় উকীল বাবুও আসিবেন। গুরুদেব! আপনিই আমার সহায়! আমাকে রক্ষা করুন,—এ সংসারে আমার আর কেহই নাই!"

নগেন্দ্রনাথ বীরপুরুষের মত, একটু মুরুব্বিআনা-ভাবে হাসিয়া বলিলেন, "এই নগেন্দ্রনাথের দেহের রক্ত-মাংস-অস্থি একত্র থাকিতে আপনার কোনও ভয় নাই—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

এইরূপে কমলিনীর সাহিত্য-শিক্ষক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অপরাহ্ণ সাড়ে চারিটা হইতে সন্ধ্যা পৌনে ছয়টা পর্য্যন্ত, পাঁচ কোয়ার্টার কাল, ছাত্রী-কমলিনীকে সাহিত্য-শিক্ষা প্রদান করিয়া, দ্রুতপদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কমলিনীর চারি প্রহরে চারি রকম বেশ। যথা,—প্রাতঃকালিক, দ্বিপ্রহরিক, বৈকালিক এবং নৈশিক। প্রভাতী বা সত্যযুগের পোষাক অতি সহজ,—একখানি নরুণপেড়ে কাপড়, মলমলের একটী পিরিহাণ এবং চটী জুতা। তার পর, ক্রমোন্নতি আরম্ভ হয়। কমলিনীর দ্বিপ্রহরিক এবং বৈকালিক—ত্রেতা এবং দ্বাপর-যুগের বসন-ভূষণ ক্রমশ বিচিত্র হইতে বিচিত্র-তর। অন্তিমে, নৈশিক বা কলিযুগের বস্ত্রালঙ্কার চরম উন্নতি প্রাপ্ত হয়।

ঘড়ী খুলিয়া ৬টা বাজিয়াছে দেখিয়া, কমলিনী সেই বৈকালিক বসন পরিত্যাগ করত, সেই অপূর্ব্ব নৈশিক পোষাক পরিধান আরম্ভ করিলেন। সে বসনের বিপরীত বাহার কেমনে বর্ণন করিব? লাল, নীল, পীত, সাদা, কালো, সবুজ, পেঁয়ুটে,—কত রঙের নাম করিব? আর জানিই বা কত? সে ঝকঝকে, রগরগে পোষাকের পানে, তাকায় কে?—যেন মেঘদর্শনে ময়ূর বিবিধবর্ণে রঞ্জিতপুচ্ছ প্রসারিত করিয়া মৃদু-মৃদু নাচিতেছে,—অথবা যেন রামধনু নবরাগে উদিত হইয়া আকাশপটে বিরাজ করিতেছে। ফলকথা, সে ব্যাপার একটা অনির্ব্বচনীয় 'যাচ্ছেতাই' কাণ্ড। তদীয় অঙ্গের কোন

বাহুতে বলয় ঝক্‌ঝক্‌ ঝকিতেছে; গলায় ভুবনভুলানা বেলফুলের মালা সুগন্ধ বিতরণ করিতেছে। শিরোপরি কুণ্ডলীকৃত কুন্তলে অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত গোলাপ যেন বলিতেছে,—'যতই সাধ, আজ আর কিছু মুটিব না। নব্যুন নিতম্বে দোদুল্যমানা মেখলা যেন নেচে নেচে বলিতেছে, "কোন মূর্খ বলে, ইহ সংসারে স্বর্গরাজ্য নাই?—পরকাল ত ভুয়াবাজী।" আর সেই অলক্তাঙ্গীর ধীর, মন্থর, গজেন্দ্রগমন—সেই হরিণনয়নীর বিলোল, বিলাসময় অপাঙ্গদৃষ্টি—সেই চন্দ্রমুখীর হাস-মাখানো রাঙ্গা রাঙ্গা অধরযুগলখানি—কমলিনীর এই তিন মহাসামগ্রী দেখিয়া মনে হয়, আমি উঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িনা কেন,—চরণপ্রান্তে প্রাণ সপিনা কেন,—মরিনা কেন?

এইরূপ বেশভূষায় ভূষিত হইয়া কমলিনী হঠাৎ একবার দ্রুতপদে ত্রিতলে, ছাদে উঠিয়া গেলেন। তথায় পাঁচ মিনিট কাল যেন মৃদুমধুর মলয়ানিল-সাহায্যে বসন্ত-ব্রততীর ন্যায় হেলিয়া দুলিয়া খেলিয়া, আবার তিনি নীচে নামিলেন। তখন নিজ নিভৃত কক্ষে গিয়া, সোফায় অর্দ্ধশায়িত হইয়া পকেট হইতে একখানি বাঁধান ক্ষুদ্র পুস্তক—খাতা বাহির করিয়া, বুকের উপর রাখিলেন। অবশেষে, বামকর দ্বারা কপাল টিপিয়া ধরিয়া, মাঝে মাঝে "আঃ, উঃ, মোলাম, গেলাম, মাথা গেল,—আর বাঁচি না" ইত্যাকার ধ্বনি করিতে লাগিলেন। কখন বা সেই গানের খাতা দেখিয়া তিনি মনে মনে গান মুখস্থ করিতে লাগিলেন;—

মহড়া।

যৌবন জনমের মত যায়;
সে তো আসা-পথ নাহি চায়
কি দিয়া গো প্রাণসখি, রাখিব উহায়॥
জীবন যৌবন গেলে আর;
ফিরে নাহি আসে পুনর্ব্বার;
বাঁচিলে বসন্ত পাব, কান্ত পাব পুনরায়॥

চিতেন।

গেল গেল এ বসন্ত কাল, আসিবে তৎকাল;
কালে হলো কাল এ যৌবন কাল,

কাল-পূর্ণ হ'লে রবে না,
প্রবোধে প্রবোধ মানে না।
আমি যেন রহিলাম তার আসার আশায়॥

অন্তরা।

হায়! ষোলকলা পূর্ণ হলো যৌবনে আমার,
দিনে দিনে ক্ষয় হয়ে বিফলেতে যায়।

অন্তরা।

কৃষ্ণপক্ষ-প্রতিপদে হয় শশিকলা ক্ষয়!
শুক্লপক্ষে হয় পুনঃ পূর্ণোদয়।
যুবতীর যৌবন হ'লে ক্ষয়,
কোটি-কল্পে পুনঃ নাহি হয়;
যে যাবে সে যাবে, হবে অগস্ত্য-গমনপ্রায়।

কন্যার শিরঃপীড়া উপস্থিত; জননীর কাণ সেই দিকে গেল। মাতা, কন্যার ঘরে গিয়া বলিলেন, "মা, কমল! আবার কি মাথা ধরিল?—একটা জলপটী কপালে দিয়ে দিব কি?"

ক। না, মা, তোমার দিয়ে কাজ নাই। ডাক্তার বাবুকে ডাকৃতে পাঠিয়ে দাও, তিনি এসে জলপটী দেবেন; অথবা রোগের অন্য কিছু ব্যবস্থা করিবেন।

মাতা। লাবেণ্ডারের শিশিটা ততক্ষণ দিব কি?

ক। আচ্ছা, তবে তাই দাও,—

জননী তখন; লাবেণ্ডারের শিশা লইয়া কন্যার হাতে দিতে গেলেন। দেখিলেন, কন্যার সম্মুখে একখানা পুস্তক খোলা।

মাতা দুঃখিতান্তঃকরণে বলিলেন, "দেখ বাছা! সকল সময়েই কি পড়িতে হয়? তোমার শরীরে দারুণ রোগ জন্মেছে। অমন ক'রে সারাদিন পড়্‌লে-শুন্‌লে রোগ আরাম হবে কেন, মা? তুমি আমার কোন কথা শোন না, তাই ত মা, তোমার অসুখ বাড়ে।"

ক। মা! তুমি বুঝিতে পারিতেছ না; সকল পুস্তক পাঠেই কিছু, মাথা ধরে

না—এ পুস্তকখানি শিরঃপীড়ার একরকম ঔষধ,—বরফবৎ ঠাণ্ডা! মা! তুমি ডাক্তার বাবুকে এ কথা জিজ্ঞাসা ক'রে দেখো।

মাতা। (ঈষৎ রাগভরে) আজই আমি ডাক্তার বাবুকে এ সব কথা জিজ্ঞাসা করিব। তিনি নিষেধ করিলে, তোমাকে একখানি কেতাবও পড়িতে দিব না,—

ক। তুমি যতই আমার সেবা শুশ্রূষা-করো, তোমার মেয়ে কিন্তু আর বাঁচিবে না,—এ দারুণ যন্ত্রণা আর কদিন সহিব? (মাথা টিপিয়া "আঃ, উঃ মোলাম" করণ।)

জননী শুনিয়াছিলেন, হার্‌মোনিয়ম্ বাজাইলে মাথা ধরা সারে। সেই বাদ্য-যন্ত্রের মধুর রবে শিরঃপীড়া উড়িয়া পলায়। ডাক্তার বাবুও মধ্যে মধ্যে মাথা ধরার জন্য এই ঔষধ ব্যবস্থা করিতেন। জননী অতি কাতরভাবে বলিলেন, "তবে মা, বিপিনকে একবার সেই হার্‌মোনিয়মটে বাজাতে ব'লব কি? মা, আমি বেঁচে থাকতে তোমার ভাবনা কি? তোমার জন্য আমি দশহাজার টাকা খরচ ক'রে ডাক্তার দেখাবো,—তুমি আমার একটি মেয়ে; তোমার কোন কষ্ট কি আমি দেখ্‌তে পারি মা?"

জননীর চোখ দিয়া এক আধ ফোঁটা জলও পড়িতে লাগিল।

ক। তবে এখন তাই বিপিনকে দিয়ে ওঘর থেকে বড় হার্‌মোনিয়মটা পাঠিয়ে দাও। আর, মা, তোমার পায়ে পড়ি, শীঘ্র ডাক্তার বাবুকে ডেকে আন্‌তে বল।

জননী প্রস্থান করিলেন। কমলিনী তখন সেই নির্জ্জন ঘরে আবার অন্য একটী গান মুখস্থ করিতে আরম্ভ করিলেন;—

মহড়া।

মনে রৈল সই মনের বেদন।
প্রবাসে যখন যায় গো সে,
তারে বলি বলি বলা হলো না;
শরমে মায় কথা কওয়া গেল না।

যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে,
নির্লজ্জা রমণী বলে হাসিত লোকে।
সখি ধিক্ থাক্ আমারে, ধিক্ সে বিধাতারে,
নারী-জনম যেন আর করে না।

চিত্তেন।

একে আমার এ যৌবন-কাল,
তাহে কাল বসন্ত এলো।
এ সময় প্রাণনাথ প্রবাসে গেল।
যখন হাসি হাসি সে আসি বলে,
সে হাসি দেখে ভাসি নয়নের জলে;
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, মন চায় ধরিতে,
লজ্জা বলে ছি ছি ধরো না।

মোহড়া।

তার মুখ দেখে, মুখ ঢেকে, কাঁদিলাম স্বজনি
অনা(য়া)সে প্রবাসে গেল সে গুণমণি।
এ কি সখি হলো বিপরীত, রেখে লজ্জার সম্মান,
মদন দহিছে এখন এ অবলার প্রাণ,
যদি সে হলো নিদয় লইল বিদায়,
তবে যেন সখি প্রাণও রহে না।

ডাক্তার বাবুকে ডাকিবার জন্য আর লোক পাঠাইতে হইল না। সেই অট্টালিকার ফটকের নিকটে ডাক্তার-মূর্ত্তি দেখা গেল। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায়। আকৃতি কিঞ্চিৎ খর্ব্ব রঙটা কেমন মেটে মেটে, খুড়া খুড়া। কোটরবাসী চোক-দুটী উজ্জ্বল নাকটী টিকলো সম্মুখভাগের দাঁত দুটী একটু উঁচু-উঁচু। গঠন খুব পাকা—হাড়েমাসে জড়িত, খুব শ্রমসহিষ্ণু এবং কর্ম্মক্ষম বলিয়া বোধ হয়।

মহেন্দ্র বাবুর পরিধান,—সাদা জিনের পেণ্টালুন, কালো আলপাকার চাপকান চোগা

এবং মাথায় মখমলের টুপী। বক্ষে সোণার চেন ঘড়ী। ডান হাতে পিচের ষ্টিক। আর, বাম হস্তে সেই মোহনবাঁশী—"ষ্টিথেস্‌কোপ।"

মহেন্দ্র বাবু শুধু ডাক্তার নহেন, এ বাড়ীর সহিত কি-একটু তাঁহার সম্পর্কও আছে। সেই সম্পর্কের বলে, তিনি কমলিনীর মাতাকে মা বলিয়া সম্বোধন করেন। জননীও তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় আদর, অভ্যর্থনা, স্নেহ করিয়া থাকেন।

মহেন্দ্র বাবু হাসিতে হাসিতে গৃহপ্রবেশ করিয়া সম্মুখে কমলিনীর মাতাকে বলিলেন, "মা, আজ আবার কি সংবাদ? বাড়ীর সকলে ভাল আছেন ত?"

মাতা। আমার কমলের আজ আবার অসুখ বেড়েছে। তুমি আমার পেটের ছেলের মত; তোমাকে আর বেশী ক'রে কি বল্‌বো?

ম। আমাকে আপনার কোন কথাই বলিতে হইবে না,—আমি প্রাণপণ যত্নেই দেখিতেছি! দেখুন, এই ৮ টাকা বিজিট দিয়া বাড়ুয্যেরা আমাকে খিদিরপুর লইয়া যাইতেছিল; পথে শুনিলাম, আপনাদের বাড়ীতে কি দরকার আছে, অমনি ফিরিলাম।

মাতা। বাছা, তোমার ধার আমি শুধিতে পারিব না—তুমি আমার কমলকে ভাল ক'রে দাও। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—কমল যে সারাদিনই বৈ পড়ে, এতে কি কোন দোষ নাই? আমি বলি কি—ঐ ২৪ ঘণ্টা লেখাপড়া ক'রেই বাছার আমার মাথা ধরে।

ম। (ঈষৎ ভাবিয়া) পুস্তক-পাঠ দোষের বৈকি?—কোনও পরিশ্রমের কাজ এখন ওঁর পক্ষে খারাপ।

মাতা। আমিও ত তাই বলি—এই মাত্র তার মাথা ধরেছে,—আর এখনি একখানা বৈ পড়ছিলো—

ম। না, না,—সকল রকম পুস্তক পাঠই যে দূষনীয়, তাহা নহে। কোন কোন গ্রন্থ আছে, তাহা পাঠ করিলে, মস্তিষ্ক শীতল হয়। আমি আজ তাঁহার হাত দেখিয়া, বাছিয়া বাছিয়া শীতল পুস্তকই ব্যবস্থা করিয়া দিব।

মাতা। তবে কমল আমার ঠিক কথাই বলেছিলো—

ম। শুধু পুস্তক পাঠ নহে, সংসঙ্গীতেরও আবশ্যক। বড় হারমোনিয়মটা সারান হয়েছে নয়?

মাতা। হাঁ, হয়েছে। বাছা,—কমল আমার কদিনে আরাম হবে ?

ম। মা, দেখুন,—রোগ ত একটা নয়। শুধু শিরঃপীড়া হলে, তিন দিনে আরাম [illegible] হয়, এ ইহা [illegible] রোগের কথা।

[illegible] আর [illegible] না ?

[illegible] দেখ [illegible] করিতে লাগিলেন।

ম আরাম হ'বে বৈকি ? তবে দুই দিন অগ্রপশ্চাৎ। তিন মাস আন্দাজ চিকিৎসা করিতে হইবে।

মাতা (মহেন্দ্র বাবুর হাতে ধরিয়া) বাছা, তুমি আমার পেটের ছেলের মত ; তোমার হাতে ধ'রে বল্‌চি, কমলকে শীঘ্র আরাম করে দাও।

ম। মা, আপনার কোন চিন্তা নাই।

এই কথা বলিয়াই ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ বেগে কমলিনীর কক্ষাভিমুখে ধাবিত হইলেন। মাতাও, ডাক্তার বাবুর কিছু জলখাবারের উদ্যোগে গেলেন।

মহেন্দ্র বাবু গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সেই পঞ্চদশবর্ষীয় বালক বিপিন-চন্দ্র হারমোনিয়মে আলাপ আরম্ভ করিয়াছেন। আর কমলিনী সোফায় সেই ভাবে শায়িত হইয়া, একটী ফুটন্ত মল্লিকার আঘ্রাণ লইতেছেন।

বাঙ্গালা ইংরেজের শুভাগমনের পর হইতেই উন্নতির আরম্ভ। এখন 'অতি-শিক্ষিত' বাঙ্গালীর বড়ার ঝাটী পর্য্যন্ত গীতবাদ্যানুরাগিণী। একবার একজন নব্যবাবু [illegible] গর্বভরে বলিয়াছিলেন,—"আমার সাত বৎসরের বালিকাটী উহম পিয়ানো [illegible] শিখেছে। নাচটা দ্যাও অল্প অল্প শিখিতেছে।" এই কথা শুনিয়া অন্য একজন ভারতভক্ত ভাবুক ভ্রাতা বলিলেন, "তবেই দেখিতেছি, ভারত-মাতার উদ্ধার আর সুদূর নয়।" এমত স্থলে, বিপিনচন্দ্র যে হারমোনিয়ম বাজাইতে পূর্ণ মাত্রায় সক্ষম হইবে, তৎপক্ষে কোনও সন্দেহ নাই।

মহেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসিলেন, "ভগিনি ! তুমি কেমন আছ ?"

ক। আমি আমার শরীরের অবস্থা কিছুই বুঝিতে সক্ষম নহি। মাথা বোঁ বোঁ ঘুরিতেছে। কখন যেন আমি ঊর্দ্ধে গগনমার্গে উঠিতেছি, কখন যেন নিম্নে পাতালে নামিতেছি, কখন বা পাশাপাশি গোপ্তা-চেপ্তা খাইতেছি।

ম। অদ্য মহৎ ঔষধ ব্যবস্থা করিব,—

ক। আমার সুচিকিৎসার জন্য আপনার ত তাদৃশ মন নাই! আমার প্রতি আপনার মন থাকিলে কি আমার এদশা ঘটে? আমি আর আপনার ঔষধ খাইব না।

বিপিন একমনে হারমোনিয়মই বাজাইতে লাগিলেন।

ম কেন, কেন, কি হয়েছে?

ক। থাক্, থাক্,—

ম। ভাই বিপিন! তোমাকে একটী বিশেষ কর্ম্ম করিতে হইবে। একটা প্রিস্ক্রপ্সন লিখিয়া দিতেছি, তুমি তাহা স্বয়ং লইয়া আমার ডিস্পেন্সরীতে যাও। কম্পাউণ্ডারকে বলিবে, এ ঔষধ সেখানে না পাওয়া গেলে, সে যেন বাথগেটের বাড়ী থেকে এনে দেয়।

সংসার-রস-অনভিজ্ঞ বালক বিপিনচন্দ্র, বিজ্ঞ ডাক্তার বাবুর আদেশমত, প্রিস্ক্রপ্সন লইয়া ঔষধালয়ে চলিলেন।

কমলিনী তখন চম্পক-অঙ্গুলি দ্বারা বেলফুলের একটী ছোট তোড়া ঘুরাইয়া ঈষৎ মুচ্‌কি হাসিয়া ডাক্তার বাবুকে বলিলেন, "আপনি যতই বলুন, আমি ত আর আপনার ঔষধ খাব না,—তবে বিপিনকে কেন আর কষ্ট দেন!—ডাকুন বিপিনকে।"

ম। প্রকৃতই বলিতেছি, ঔষধ ব্যতীত তোমার এ রোগ আরাম হইবে না!—তা, বোধ হয়, কোন অন্য ভাল ডাক্তার আছেন! কেন আমার ঔষধ কি খারাপ লাগে?

ক। ছি! ছি! ছি! ওকথা মুখে আনিবেন না। ইহজীবনে যদি কখন ঔষধ খাইতে হয়, তবে সে আপনার। কিন্তু ঔষধ আর খাইব না,—আমি ত মরিতে বসিয়াছি!

ম। কেন, কেন,—ব্যাপার কি বল দেখি? হঠাৎ এ ভাব কেন?

ক। আমি নিতান্ত দুঃখিনী—সংসারে আপনা ব্যতীত কাহাকেও কখন মনের কথা বলি নাই—কিন্তু আজ আর নয়! সেই বিভীষিকাময় দুর্দ্দিন আমার নিকটে উপস্থিত!

ম। ভগিনি! তুমি আমাকে বড় বিপদে ফেলিলে!—আমি করি কি?—যাই কোথা?—আমি কি আজ এতই অপরাধী যে, সে কথাটী শুনিতে পাইব না? কমলিনি! ইহা তুমি নিশ্চয় জানিও যে, তোমার মৃত্যুতে আমারও মৃত্যু—

ক। ছি! ছি! আপনি বলেন কি?—আমি মরিলে, পৃথিবীর ভার কমিবে মাত্র,—কিন্তু আপনার কোন অমঙ্গল ঘটিলে, এ ধরাধাম এক অত্যুজ্জ্বল রত্ন হারাইবে!

উভয়ে চারি মিনিটকাল নীরব! শেষে কমলিনী বরফ ভাঙ্গিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আপনার অগোচর আমার কিছুই নাই। আপনি সর্ব্বজ্ঞ। কিন্তু আমার নিকট আপনাকে এক সত্য প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে হইবে—"।

ম। বড়ই দুঃখিত হইলাম। তোমার নিকট সত্য কি? প্রতিজ্ঞা কি?—তুমি যে আমার নিকট স্বয়ং সত্য, স্বয়ং প্রতিজ্ঞা, স্বয়ং ঈশ্বর—তা কি তুমি জান না?—

ক। আজ সমগ্র ভারতবর্ষের সম্রাজ্ঞী হইলেও এত সুখী হইতাম না!—

ম। যাক্ ওকথা!—এখন সেই গোপনীয় কথা বল।

ক। আপনার নিকট নিবেদন এই, পৃথিবীর মধ্যে কাহাকেও এ কথা বলিবেন না! বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, বামন নপুংসক, পরমহংস পরমহংসা ঊর্দ্ধবাহু ঊর্দ্ধরেতা,—কোন মানবের নিকট নিগূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করিবেন না। অধিক কি, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে যত প্রকার জীব আছে,—ভূচর, খেচর, জলচর, উভচর—এ ধরাধামে যত রকম প্রাণী বাস করে,—তাহাদের মধ্যে কাহারও নিকট এই ভয়াবহ কথা ব্যক্ত করিবেন না,—আমার ইহাই নিবেদন।

মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, "যদি আমার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে আমার পরমাত্মাকেও একথা জানিতে দিতাম না।"

কমলিনী। সে কথা আপনাকে কাগজে লিখিয়া দেখাইব—কাণে কাণে বলিলে,—পাছে অন্য কেহ শুনিয়া ফেলে,—ইহাই আমার ভাবনা।

ম। তাহাই হউক।

কমলিনী, সেই গূঢ় কথা কাগজে লিখিয়া মহেন্দ্রনাথকে দেখাইয়া, তৎক্ষণাৎ সে কাগজ ছিঁড়িয়া পুড়াইয়া ফেলিলেন।

মহেন্দ্র বাবু প্রথমত, ঈষৎ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। শেষে বলিলেন,—"কমলিনি! তাহাতে তোমার কোনও ভয় নাই;—ইহা আমার পক্ষে ত সামান্য কথা!—আশঙ্কা দূর কর,—মনকে প্রফুল্ল কর—"

ক। আপনি সাহস দিলেই আমি প্রাণ পাই। আপনি অভয় দিলেই আমার মন প্রফুল্ল হয়।

ম। শিশায় সে ঔষধটা আছে কি?—একটু খেয়ে মনটাকে ঠাণ্ডা কর না?

ক। না, আজ আর থাক্।—

ম। একটু খেলেই শরীর পবিত্র, নির্ম্মল হবে! সর্ব্বরোগ দূরে পলাইবে। হৃদয় তখন প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় হেলিতে দুলিতে থাকিবে।

ক। আচ্ছা, তবে দিন—

ঔষধ সেবনান্তে, কমলিনীর কমনীয় মুখকান্তি অধিকতর শোভা প্রাপ্ত হইল। উজ্জ্বল চক্ষুদুখানি অধিকতর জ্বলিতে লাগিল। গোলাপী গণ্ডস্থল দুটী যেন বিকশিত গোলাপপুষ্পবৎ প্রতীয়মান হইল।

তখন মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, "মাথাধরার প্রধান ঔষধ কিন্তু সঙ্গীত!—সঙ্গীতে মানসিক ব্যাধি দূর করে—"

ক। আমি ত সঙ্গীতের সদাই প্রিয়তমা সখী। আপনি হারমোনিয়াম ধরুন—আমি ঈশ্বর-গান আরম্ভ করি।—

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল পোস্তা।

কে তুমি কাছে বসে থাক সর্ব্বদা আমার।
স্বভাব প্রকৃতিরীতি, মিষ্ট অতি, কি নাম বল তোমার।
প্রতিদিন এত করে, কেন ভালবাস মোরে
দয়াতে পূর্ণ হয়ে, কর কেবল উপকার।
রূপে গুণে অনুপম, দেখি নাই কোথা এমন,
মধুর আকর্ষণে, প্রাণ টানে তোমার পানে বারেবার?
নাই আলাপ, নাই পরিচয়, দেখিলে মন মোহিত হয়,
চিনেও চিনিতে নারি, একি দেখি চমৎকার।
সম্বন্ধে কে হও তুমি (তাইরে নারে নাইরে না)
যে হও সে হও তুমি, তুমি আমার আমি তোমার।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল পোস্তা।

গভীর অতলস্পর্শ তোমার প্রেমসাগরে ;
ডুবিলে একবার কেহ আর কি উঠিতে পারে ?
প্রেমিক মহাজন যারা, না পেয়ে কূল-কিনারা,
হইল চির-মগনা, ফিরিল না আর সংসারে।
কত সুখ প্রলোভন, প্রেম শান্তি মহাধন,
অনন্ত অগণন, রেখেছ সঞ্চিত করে।
নিত্য সুখ শান্তি দিয়ে, আনন্দে ভুলাইয়ে,
রেখেছ তাদের চিত্ত একেবারে মুগ্ধ করে॥

গান শেষ হইল না। আশা পূর্ণ হইল না। বিপিনও মহৌষধ লইয়া ফিরিল না। হঠাৎ তাল ভঙ্গ হইল। মহামজলিস্ ভঙ্গ হইল। সেই হল হইতে শব্দ উঠিল, "আসুন আসুন, বসুন বসুন।" কে যেন কাহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিতেছে। আজ সেই হলে দাঁড়াইয়া কোন ভক্ত ব্যক্তি গম্ভীরস্বরে বলিতেছেন, "হরি রক্ষা কর, হরি বোল! হরি!" কমলিনী তীক্ষ্ণবাণ-বিদ্ধ হরিণ-শিশুর ন্যায় অসার হইয়া পড়িলেন ; কেবল অধরপল্লব, নয়ন এবং ভ্রূ ঈষৎ স্পন্দিত হইতে লাগিল। আর, কর্ণবিবর উন্মুক্ত হইল,—মনে হইল যেন আত্মা কর্ণ দিয়া বাহির হইয়া সেই দিক্‌পানে ছুটিল। শেষে কমলিনী ভয়চকিতনেত্রে, কম্পিতস্বরে মহেন্দ্র বাবুকে বলিলেন, "ঐ, আসিয়াছে—ঐ, কথা বলিতেছে! আপনি অদ্যই শীঘ্র, উকীল বাবুর বাসায় যান। পরামর্শমতে, কল্য প্রাতে, অথবা বৈকালে, ডাক্তার সাহেবকে সঙ্গে লইয়া আসিবেন।"

এইরূপে ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় ছয়টার পর হইতে ৭ টা পর্য্যন্ত, কিছু কম এক ঘণ্টা কাল, কমলিনীর সুচিকিৎসা করিয়া গৃহ হইতে দ্রুতপদবিক্ষেপে, অন্য দ্বার দিয়া বহির্গত হইলেন।

কমলিনী তখন মাথায় একটা লাল কাপড় বাঁধিয়া বিকটরবে "আঃ, উঃ," করিতে করিতে সেই কক্ষস্থ খাটে পূর্ণমাত্রায় শয়ন করিয়া রহিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

হায়! হায়! হায়!—আবার ডোক্‌রা বামুন, আর নগদামুটে! কি আস্পর্দ্ধা! সেই বামুনটো এসে, একেবারে শুধু পায়ে, সেই হলে দাঁড়িয়েছে, চটীজুতা যোড়াটী বাহিরে খুলে রেখে এসেছে!—কি আহাম্মক! কি অসভ্য!

ব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়াই বিপিনকে সম্মুখে দেখিয়া, প্রথমে জিজ্ঞাসিলেন,—"কর্ত্তাবাবু ভাল আছেন? মা ভাল আছেন?"

হলে আর কেহই নাই—কেবল একা বিপিন। বিপিন প্রথমে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। সুতরাং সে সহসা ভাল মন্দ কিছুই উত্তর দিল না। ব্রাহ্মণ হাসিয়া বলিলেন, "বিপিন বাবু, চিনিতে পারিতেছ না? তোমরা তখন ছেলে মানুষ। চার বৎসর দেখ নাই, ভুলে যাবে বৈকি ভায়া?"

বি। চিনেছি,—চিনেছি, আপনি রায় মহাশয়?—(উচ্চরবে) ও-মা রায় মোশাই এসেছেন, জামাই বাবু এসেছেন।

এই কথা বলিতে বলিতে বিপিন অন্দরাভিমুখে দৌড়িল। ডেপুটী বাবুর অন্দর সদর প্রায় একই; সেই হলটী সদর, আর তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ কুঠারিগুলি অন্দর। সুতরাং সদর অন্দরে কিছু মাখামাখিভাব।

ভৃত্যগণ তখন "আসুন আসুন, বসুন বসুন" বলিয়া রায় মহাশয়কে সম্বোধন করিল। অন্দর হইতে বালক-বালিকাগণ দৌড়িয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিল। জননী কপাটের অন্তরালে থাকিয়া জামাতা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

রায় মহাশয় তখনও দাঁড়াইয়া মুখে বলিতেছেন, "হরিবোল, দীনবন্ধু, হরি রক্ষা কর।"

বিপিন ফিরিয়া আসিয়া, তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া পুনরায় বসিতে বলিল। বাস্তবিক রায় মহাশয় একটু বিপদে পড়িয়াছেন। মেজেতে বসেন, কি চেয়ারের উপরে বসেন,—ইহাই ঠিক করিতে পারিলেন না। চেয়ারে বসা তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় নহে। সেই হলের মেজেতেও বেশ উত্তম বিছানা—কার্পেট পাতা। সুতরাং কোথায় বসি,—এই ভাবনাতেই তাঁহার চিত্ত ঈষৎ দোলায়মান হইতেছিল। অবশেষে সকলকেই চেয়ারে উপবিষ্ট দেখিয়া, তিনি অগত্যা চেয়ারেই বসিলেন।

জামাতা। বিপিন বাবু, মোটটা ঘরে রেখে আসিতে বল ত?—একটু ভাল যায়গায় যেন রাখা হয়,—কারও যেন পা না ঠেকে,—উহাতে চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ আছে।—হরি রক্ষা কর!

মুটে। ঠাকুর, পয়সা দেও না,—কেংনা ঘড়ি হাম খাড়া রহেঙ্গা?

দ্বারবান্। চুপ্‌রও, গোল মৎ করো—হিঁয়াসে নীচু যাও—

রায়। পয়সা দিচ্ছি বাপু, একটু দেরী হয়েছে বটে,—পথ ভুলে অন্য দিকে যেয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু সে দোষ ত তোমারই।

এই বলিয়া তিনি ট্যাঁক হইতে ছয়টী পয়সা খুলিয়া দ্বারবানের হাতে দিলেন। মুটে ছয়টী পয়সা পাইয়া রাগে গন্ গন্ করিয়া এবং বিড়্ বিড়্ করিয়া দ্বারবানের হাতে ফেলিয়া দিল। দ্বারবান্, ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া তাহার গলাধাক্কা দিবার উপক্রম করিল। রায় মহাশয় ব্যাপার দেখিয়া, শশব্যস্তে উঠিয়া গিয়া বলিলেন,—"মের না বাপু,—ও ব্যক্তি ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণের গায়ে হাত তোলে কি?—পেটের দায়ে মুটেগিরি কচ্চে। এই লও, আর দুটী পয়সা,—উহাকে দিয়া বিদায় কর।"

মুটে হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ। গলায় মলিন পৈতা। উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের দুর্ভিক্ষ-মহোৎসবে সে, একবার প্রফুল্ল হইয়া, সেই শুভসংবাদ দিতে, কলিকাতা আসিয়াছিল। আজ প্রায় পাঁচ বৎসর সে ব্যক্তি কলিকাতায় মুটেগিরিরূপ মহাকাজে ব্যাপৃত আছে। এ পর্য্যন্ত তাহাকে কেহই ব্রাহ্মণ বলিয়া সম্মান করে নাই। মুটে বড় খুশী হইল। বলিল,—

"ঠাকুরজী, হাম ছয় পয়সা লেঙ্গে, আওর খাস্তি পয়সা নেহি মাঙ্গতা।" এই বলিয়া মুটে চলিয়া গেল।

মুটে-ঘটিত গোলমালে, ডেপুটী বাবুর খাস-খানসামা আসিয়া উপস্থিত হইল। খাস খানসামার গায়ে বুকে-বোতাম-আঁটা আচরাখা। পরিধান ফুলপেড়ে সিহি কাপড়। পায়ে শ্লীপার চটি। মাথার টেরি-সাঁথি। চোখ দুটী ঈষৎ লাল। খানসামা-বাবু আসিয়া, জামাই-বাবু ওরফে রায় মহাশয়ের কাছে গিয়া, গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনি এদিকে আসুন, বসুন.—মুটের সঙ্গে আপনার কথা ক'বার দরকার কি?"

রায়। কি, কপিল!—ভাল আছ?

খান্‌সামার নাম কপিলচন্দ্র দাস। জাতিতে সৎগোপ।—

কপিল। আজ্ঞে, আপনার ছিচরণ আশীর্ব্বাদে ভাল আছি। একটু পয়ের ধূলা দিন্।

এই বলিয়া ঢুলঢুলায়িত-আঁখি কপিল খান্‌সামা, রায় মহাশয়ের পদতলে গড়াইয়া পড়িল এবং পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল।

প্রণামকাণ্ড শেষ হইল। রায় মহাশয় আবার চেয়ারে বসিলেন। অপর একজন ভৃত্য কল্কেতে ফুঁ দিতে দিতে আসিয়া, তাঁহার হাতে হুঁকা দিতে গেল।

রায়। এ হুঁকায় ত আমি তামাক খাই না, আমার হুঁকা মোটে বাঁধা আছে। সেইটা লইয়া আইস।

ভৃত্য হুঁকান্বেষণে গেল।

রায়। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলো। সন্ধ্যা আহ্নিক কর্ত্তে হবে, একটু গঙ্গাজল ও কোশাকুশী চাই।

কপিল। গঙ্গাজল ত নাই। বেশ রেফাইন করা ভাল কলের জল আছে। খুব ভাল জল, তাতে খুব ভাল সন্ধ্যা আহ্নিক হবে!

রায়। পাগল! পাগল! তাও কি কখনো হয়? স্বর্গীয় সুধার সঙ্গে কখন কি হাড়ীবাড়ীর চিটাগুড়ের তুলনা হয়? সেই পবিত্র পাপক্ষয়কর জাহ্নবী-সলিলের সহিত তুলনা কার?

সুরধুনি মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং
স তরতি নিজপুণ্যৈস্তত্র কিং তে মহত্ত্বম্।
যদি চ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং
তদপি তব মহত্ত্বং তন্মহত্ত্বং মহত্ত্বম্॥

কপিল কিছুই বুঝিল না, কেবল মনে মনে হাসিল। প্রকাশ্যে বলিল, "আচ্ছা" তাই হবে, একটু পরে গঙ্গাজল আনিয়ে দিব। আপাতত আপনি একটু জলটল খান, রেলগাড়ীতে আপনার অনেক কষ্ট হয়েছে, তেষ্টাও পেয়েছে,—

রায় মহাশয় এইবার প্রাণ খুলিয়া হো হো হাসিয়া উঠিলেন। তাঁহার হাসিটা কিছু উচ্চ অঙ্গের ছিল। তিনি অন্তরের হাসি হাসিলে তাহা অনেক দূর ব্যাপ্ত হইত।

সুতরাং হাসির রবে অনেকে চমকিয়া উঠিল। ছোট ছোট ছেলেপিলে, যাহারা রায় মহাশয়কে দেখিতে আসিয়াছিল,—তাহারা ভয়ে পলাইল। কপিল খান্‌সামা, তাঁহার কাছে হইতে একটু সরিয়া দাঁড়াইল এবং অপরকে জামাই বাবুর নিকটে আসিতে ইঙ্গিতে নিষেধ করিল।

কপাটের অন্তরালে দণ্ডায়মানা বৃদ্ধা জননী কপাট ঠক্ ঠক্ করিতে লাগিলেন। শব্দ শুনিয়া কপিল বিদ্যুৎবেগে, গৃহিণীর নিকট গমন করিল।

মাতা। এবার জামাইকে কেমন বুঝ্‌চ?

কপিল। গতিক বড় মন্দ! সে ঝোঁক একটুকুও যায় নাই, বরং ঝোঁক বেড়েছে তাঁর সেই দালান-ফাটা হাসি শুনে, আর সেই কট্‌মট্‌ চাউনি দেখে অবধি আমার গা ঠাই ঠাই কাঁপচে। মা ঠাকরুণ! বল্‌ব কি, জামাই বাবু বদ্ধ পাগল হয়েছেন।

মাতা। সবই আমার অদৃষ্ট! বাছা কপিল, তুই এখন গিয়ে দেখ শোন, সেবা-শুশ্রূষা কর, তাহা হইলেই ঝোঁক কমে যাবে।

কপিল। মা, চেষ্টার কিছুই ত্রুটী করি নাই। তামাক সেজে নিয়ে গেলাম, তিনি বল্লেন, এ হুঁকায় খাবোনা; ... খেতে সাধ্‌লাম,—একেবারে একটা বিতিকিচ্ছি হেসে, তিনি আমায় যেন মাত্তে এলেন। শেয়ালদর ষ্টেশন থেকে, যে মুটে সঙ্গে এসেছিল, তার উপর ভয়ানক ঝুঁকে উঠেছিলেন; আমরা সব এসে না পড়্‌লে, তাকে মেরেই ফেল্‌তেন।

মাতা। গাড়ীতে এসে হঠাৎ মাথা গরম হয়ে থাকবে। একটু ঠাণ্ডা টাণ্ডা হলেই ভাল হবে।

কপিল প্রস্থান করিলে, জননীর চোখ দিয়া দরদরিত ধারে জল পড়িতে লাগিল। মাতা ভাবিতে লাগিলেন;—"আমার বড় সাধের একটী মেয়ে,—বড় আদরে মানুষ করেছি, বাছার শুকান মুখটী দেখিলে বুক কেটে যায়। তাতে জামায়ের ঐ অবস্থা হলো—"

জননীর নয়নজলে সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত হইল।

কপিল, ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, জামাতা, আপন ছোট খেলো হুঁকায় তামাক খাইতেছেন। ভাবিল, এমন সুন্দর, সুদীর্ঘ, রূপবাঁধান হুঁকা ফেলিয়া ঐ ক্ষুদ্রকায়

হুঁকার উপর ইহাঁর এত ভক্তি কেন? অথবা ছিটগ্রস্ত ব্যক্তির স্বভাবই বুঝি এইরূপ?

রায়। হরিবোল, হরি রক্ষা কর,—ওহে কপিল,—

কপিল খুব চালাক পুরুষ। সায়েস্তা খান্‌সামা। "ওহে কপিল"—এই কথাটী তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইতে না হইতেই, সে অমনি নিকটে যাইয়া, প্রায় তাঁহার গায়ে গা দিয়া, বলিয়া উঠিল,—

"কি আজ্ঞে কচ্চে, হুজুর, বলুন—"

রায়। গঙ্গাজলের কতদূর?

কপিল। আজ্ঞে, অনেকক্ষণ লোক গিয়েছে, এলো বলে।

রায়। সন্ধ্যার সময় হয়েচে, হরি রক্ষা কর।—তোমাদের পাঁজিখানা একবার, বিপিন! দাও দেখি?

দিদির ঔষধ আনার পর, বিপিন এক মনে আবার সেই একুইই কসিতেছিল; হঠাৎ রায় মহাশয়ের কথা শুনিতে পাইল না। জামাতা আবার বলিলেন,—"ও—বিপিন বাবু, শোন হে,—তোমাদের পাঁজিখানা কৈ?"

বিপিন। কি পাঁজি?

রায়। কি পাঁজি, আবার কি? এই যাতে তারিখ, তিথি, নক্ষত্র আছে,—শ্রীরামপুরে, বা গুপ্তপ্রেস, যাহোক হলেই হবে।

বিপিন। কৈ, আমাদের ত গুপ্তপ্রেস আল্‌ম্যানাক্ নাই, থাকার্স ডিরেক্টরী আছে।

রায়। ঘরে পাঁজি নাই কি হে?

কপিল খান্‌সামা ব্যস্ত হইয়া বলিল,—"আছে, আছে, দিদিবাবুর ঘরে পাঁজি আছে,—দেওয়ালে টাঙ্গান আছে। তিনি রোজ তারিখ দেখেন।"

রায়। পাঁজি আবার দেওয়ালে টাঙ্গান কিরূপ?

বিপিন। ও হো, সে যে ইংলিস্‌ম্যানস শীট অ্যালম্যানাক্—তাতে অনেক কথা আছে বটে।

রায়। আচ্ছা, সে পাঁজিতে যদি সব কথা থাকে, তবে তাই একবার না হয় নিয়ে এস।

কপিল। সে পাঁজি নিয়ে আসবার যো নাই,—একেবারে গজাল-আঁটা, দেওয়ালের সঙ্গে গাঁথা,—দেওয়াল ভাঙ্‌বে, তবু সে পাঁজি খসবে না—এমন দিদি বাবুর বন্দোবস্ত! আচ্ছা, আপনি না হয়, সে ঘরে চলুন. গিয়ে দেখে আসবেন! আসুন আমার সঙ্গে!—

রায়। এমন ত কথা কোথাও শুনি নাই, পাঁজির কাছে স্বয়ং যেতে হবে, পাঁজি নিকটে আসবে না।

বিপিন। সে যে সব ইংরেজীতে লেখা, উনি সে পাঁজি দেখেই বা কি করবেন?

কপিল। দিদি বাবু না হয়, ইংরেজীটা ওঁকে বুঝিয়ে দিবেন।

রায়। থাক্ থাক্, পাঁজি দেখ্‌বার তত দরকার নাই,—এখন সন্ধ্যার উদ্যোগ করে দাও,—গঙ্গাজল এলো কি? কোশাকুশী ধৌত করে রাখ।

কপিল, কোশাকুশী কাহাকে বলে, প্রকৃতই জানে না। ভাবিল, পাগলটা এলো-মেলো বকিতেছে। আন্দাজী বলিল, বাড়ীর ভিতর সে সব ধুয়েটুয়ে রাখা হচ্চে—

রায়। না হে, দেখ যেয়ে—হয়েচে কি না? শীঘ্র ঠিক ক'রে রাখ্‌তে বলো। সময় বুঝি উত্তীর্ণ হলো।

এইবার কপিল বিরক্ত হইল। মনে মনে বলিল,—"আঃ বুড়ো বামুন জ্বালাতন করিয়া মারিল। পাগলের কথা শুনে যাবো কোথা?" অন্দরাভিমুখে খানিক যেয়ে, কপিল থামের আড়ালে খানিক বসিয়া রহিল। উঠিয়া আসিয়া বলিল,—"সে সব ঠিক হয়েছে: মা ঠাকুরুণ কোশা ধুয়েছেন, দিদি বাবু কুশী ধুয়ে রেখেছেন।"

ব্রাহ্মণ তখন যেন একটু আশ্বস্ত হইয়া, গঙ্গাজল আগমন প্রতীক্ষায়, ধীরে ধীরে একমনে অথচ সতেজে আপন খেলো হুঁকায় টান দিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের অযত্নে কল্কের অগ্নি অভিমানে মলিন হইয়াছেন; সুতরাং তিনি আর ধূম দিতে রাজি নহেন। "গোড়ায় কাটিয়া আগায় জল' দিলে যে কোন ফল হয় না, তাহা বিদ্যাসুন্দরে একরূপ প্রমাণ হইয়াছে। অতএব সেই নজীরের বলে, এখানেও মোকদ্দমা ডিস্মিশ হইবার যোগ্য হয় হয় হইয়াছে,—এমন সময় কপিল খাব্‌সামা বিপদ-ভঞ্জন বারিষ্টাররূপে আসরে অবতীর্ণ হইয়া বলিলেন,—"কল্কেটা আমাকে দিন, ফুঁ দিয়ে দি, আগুন বুঝি ধরে নাই।" কপিল এই বলিয়া হুঁকা হইতে কল্কে খুলিয়া লইয়া ফুঁ দিবার জন্য থামের

আড়ালে গেল। তথায় সে ফুঁক দিল, কি মুখ দিল, তাহা অন্তর্যামী ভগবান্ ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারেন কি না সন্দেহ।

এদিকে সিঁড়িতে আবার ভগনের বাড়ীর জুতার দুপ্ দুপ্ শব্দ শ্রুত হইল। ওদিকে ভৃত্যের মুখের আদরে কল্কের অগ্নিও হাসিতে লাগিল। কপিল তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মণকে কল্কে দিতে আসিল। হুকার উপরে কল্কের অধিষ্ঠান হইলে, ব্রাহ্মণ যেমন হুকায় মুখটী দিয়াছেন, অমনি সেই জুতার শব্দ মানুষে পরিণত হইয়া, সেই জামাতা—সেই হিন্দু-ব্রাহ্মণ সম্মুখে দেখা দিল।

বিপিনচন্দ্র অমনি দাঁড়াইয়া উঠিল। বলিল, "বড়দাদা, মা আপনাকে আজ ডেকেচেন—"

কপিল শশব্যস্তে বড়দাদার হাতের ছড়ি এবং হ্যাট লইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল এবং যেখানে তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন, সেইখানে একখানা চৌকী আনিয়া কোঁচার দ্বারা তাহা ঝাড়িয়া দিল। বড়দাদা তথাচ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

প্রবীণ ব্রাহ্মণ, সে মূর্ত্তি দেখিয়াই অবাক্! বড় সাধে অধরপ্রান্তে হুঁকা লইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু জানি না, হঠাৎ সে সাধে কে বাদ সাধিল! ব্রাহ্মণ, সে বড়দাদা-মূর্ত্তি অবলোকন করিবামাত্র, অমনি অতি ব্যস্ত হইয়া সেই চুম্বিত-অধর-হুঁকাকে দক্ষিণ হস্তের সাহায্যে শূন্যে ধরিয়া রহিলেন। এই কার্য্য সমাধান্তে সেই বড়দাদা-জীবের আপাদ-মস্তক তিনি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রথমত দেখিলেন, মাথার সম্মুখ-ভাগের চুলে চেরা সিঁথি—পেটোপাড়া; চক্ষুর্দ্বয় লালবর্ণ,—ছল্ ছল্ ভাবে ভরা; গাল দুখানি কতকটা কালোগোলাপী,—যেন ছানাবড়ার পাকে ঢালা। কিন্তু সে মূর্ত্তির মুখের দিকে, তাঁহার দৃষ্টি অধিকক্ষণ রহিল না,—নিম্ন অবয়বে নয়ন নিপতিত হইল। সে নয়ন আর তিনি ফিরাইতে পারিলেন না—সেই কোমর অবধি বিলম্বিত কালোকোট; সেই আঁটাসাঁটা, পদদ্বয়ের সহিত বিষম-নিবদ্ধ পেণ্ট্লান, সেই হাঁটু পর্য্যন্ত উত্থিত বিলাতী বিনামা; সেই ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম অঙ্গভঙ্গি দেখিয়া ব্রাহ্মণের মন মজিয়া গেল। হাতের হুঁকা হাতে রহিল। ব্রাহ্মণের সেই সুতীক্ষ্ণ নয়নযুগল কেবল সেই মহামূর্ত্তিকে যেন গ্রাস করিল।

সেই অবয়বের নাম "ডি এন চাটর্জি এস্কোয়ার, বারিষ্টার অ্যাট-ল। আজ দুই বৎসর হইল, চাটর্জি সাহেব, বিলাত হইতে আসিয়া, ভারতবক্ষে শুভপদ অর্পণ করিয়াছেন।

চাটর্জি সাহেব শুধু বারিষ্টার নহেন,—বিশেষ কৃতবিদ্য বলিয়া পরিচিত। তাঁহার সর্ব্বশাস্ত্রে প্রায় সমান অধিকার। বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, প্রত্নতত্ত্ব, জ্যোতিষ, ধর্ম্মগ্রন্থ এবং সাহিত্য—ইংরেজীতে এ সমস্তই তাঁহার কণ্ঠস্থ। জাহাজ থেকে নামিয়াই তিনি বাঙ্গালীর পোষাকের উপর প্রথম বক্তৃতা দেন। বক্তৃতায় সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে প্রমাণীকৃত হয়, বাঙ্গালীর পক্ষে হ্যাটটা পরম উপযোগী। এদেশে সূর্য্যের উত্তাপ বড়ই ভয়ঙ্কর। হ্যাট মাথায় দিলে, মুখে আর রোদ লাগিবে না। বিশেষত চাষালোকের, বৈশাখের প্রখর রৌদ্রে হ্যাট মাথায় দিয়া লাঙ্গল ধরা, একান্ত উচিত। এই বক্তৃতায় তাঁহার নাম-পড়িয়া যায়। চাটর্জি, দ্বিতীয় বক্তৃতায় বিজ্ঞান-বলে প্রমাণ করিলেন,—পেঁয়াজ, মুর্গী, মহামাংস—এই তিনের একত্র রাসায়নিক সংযোগে এক মহাদ্রব্য প্রস্তুত হয়! বাঙ্গালী যদি সেই মহাদ্রব্যের লাড্ডু পাকাইয়া দুবেলা জল খায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বাঙ্গালী নীরোগ দেহে দীর্ঘজীবী হয়! তৃতীয় বক্তৃতায়, ঠিক হইল যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বানর ছিল। এইরূপে বক্তৃতায় বাহোবায় কিছুদিন অতিবাহিত হইল। তারপর রাষ্ট্র হইল, তিনি বোম্বাই হাইকোর্টে বারিষ্টারি করিবেন,—কলিকাতা হাই-কোর্টটা তাঁহার মতে খারাপ। কেহ কেহ এমনও বলিল যে, তিনি মুন্সেফীর জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। দুষ্ট লোকের কুটিল কথা শুনিবার দরকার নাই, চাটর্জি সাহেব কিন্তু সতেজে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

চাটর্জি দেখিতে দিব্য পুরুষ। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন--কোথাও একটু সাদার বিশ্রী দাগ মাত্র নাই। ঠিক যেন শিবনিবাসের বর্ণিসকরা সেই অনাদি শিবলিঙ্গ-মূর্ত্তি চিক্ চিক্ করিতেছে! অথবা দেবাদিদেব মহাদেবের সেই মূর্ত্তি, রঙে বুঝি আজ চাটার্জির নিকট পরাজিত হইল। তদুপরি আবার বনাতের কালকোট,—ওঃ! কি বাহার!

নবমেঘ যেন নবমেঘকে আলিঙ্গন করিয়াছে! পৃথিবী অন্ধকারময় হইল—দিবসে প্রদীপ জ্বালা বুঝি বা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। না,—তা নয়। আবার ঐ দেখ,—মাঝে মাঝে কিবা রমণীয়, কমনীয় দন্ত-বিকাশন! যেন মেঘের কোলে সৌদামিনী! অথবা যেন শারদীয়া জ্যোৎস্না মেঘের অন্তরালে থাকিয়া মাঝে মাঝে উকি মারিতেছে!

চাটর্জি সাহেব, বিপিন বাবুর যে কি রকম বড়দাদা, তাহা কেহ জানে না,—খুড়তুতা, মাসতুতা, কি পিসতুতা, অথবা গ্রাম-সম্পর্কে বড়দাদা, তাহা কেহই জানে না। তবে

এটা ঠিক,—অনেকেই চাটর্জিকে বড়দাদা বলিয়া সম্মান করেন। আর বিপিনের সেই স্নেহময়ী, সরলতাময়ী জননী চাটর্জিকে বিলাত যাইবার পূর্ব্ব হইতেই, "ছেলে ছেলে" বলিতেন। মাতার ঐ কেমন একটা বদ অভ্যাস,—ছেলে দেখিলেই ছেলে বলা, মেয়ে দেখিলেই মেয়ে বলা। কিন্তু "ইল্লৎ যায় ধুলে, স্বভাব যায় মো'লে।" সুতরাং জননীর মৃত্যু পর্য্যন্ত এ দারুণ দোষ থাকিবে। সে যাহা হউক, চাটর্জির বাসা দূরে হইলেও জননী প্রতি সপ্তাহে দুইবার, না হয় একবার, আহারাদির জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিতেন।

চাটর্জি-সাহেব, বাঙ্গালা কথা এক রকম ভুলিয়া গিয়াছেন। বুঝিতে পারুক, আর না পারুক—প্রায় পনের আনা লোকের সঙ্গে তিনি ইংরেজীতে মনের ভাব বদল করেন। যেখানে নিতান্ত উপায় নাই—সেখানে তাঁহার ভাষা হিন্দী। তবে কদাচিৎ দু-একস্থলে ব্যতিক্রম আছে—তখন ভাষা, বাঁকা-বাঁকা বাঙ্গালা। যথা,—কমলিনীর মাতা, আহারের সময় চাটর্জিকে যদি বলেন, "বাছা, আর একটু খাও", চাটর্জি বাঙ্গালায় উত্তর দেন, "হামি আর খাইতে পারব না।"

চাটর্জি সেই প্রকাণ্ড হলে দাঁড়াইয়া, চারিদিক্ কট্‌মট্ চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া, বিপিনের দিকে মুখ ফিরাইয়া কথা আরম্ভ করিলেন। বলা বাহুল্য, সেকথা ইংরেজীতে।

এইবার বড় বিষম সমস্যা আসিল। এ গ্রন্থ বাঙ্গালা, বিষয় বাঙ্গালা, গ্রন্থকার বাঙ্গালী, পাঠক বাঙ্গালী, সুতরাং কেমন করিয়া এস্থলে রাশি রাশি ইংরেজী কথা তুলিয়া স্থান অপরিষ্কার করিব? অগত্যা তাঁহাদের সেই ইংরেজী কথা-বার্ত্তার নিম্নে অনুবাদ দিতে হইল। কিন্তু অনুবাদে মূলভাষার সৌন্দর্য্য থাকে না—তাই মনে দুঃখ রহিল, ইংরেজী-অভিজ্ঞ পাঠককে চাটর্জির ইংরেজী-ভাষার উপর আদব-কায়দা শুনাইতে পারিলাম না।

আর এক কথা বলি। রায় মহাশয় ইংরেজী-অনভিজ্ঞ। চাটর্জির সহিত বিপিনের যে কথাবার্ত্তা হইল, রায় মহাশয় তাহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিলেন না।

চাটর্জি। কে ঐ খালি পায়ে, উলঙ্গ কুৎসিত জীব, বাঁদরের ন্যায় কেদারার উপর বসিয়া আছে?

রাধাশ্যাম, চাটার্জ্জি-সাহেব ও বিপিন

বিপিন। আমার ভগিনীর স্বামী (হসব্যাণ্ড)।

চাটর্জি। সে কি কথা? তুমি কি আমাকে তামাসা করিতেছ? সত্য কথা বল! কোন ভয় নাই।

বিপিন। (হাসিয়া) বড়দিদির ত উনিই স্বামী।

চাটর্জি। হায়! ইহা বড় শোচনীয় সত্য কথা! তাহা কখন হইতে পারে না, হওয়া সম্ভব নয় এবং হইবেও না—মিঃ রায় পাগল বলিয়া ত সুবিখ্যাত।

বিপিন। না, না, প্রকৃত পাগল নন—তবে পাগলের দিকে একটু ঝোঁক আছে।

চাটর্জি। হা স্বর্গ! এই কি তোমার বিচার? যিনি সৌন্দর্য্যের খনি, পবিত্রতার আধার, সন্নীতির সারভাগ এবং স্ত্রীশিক্ষার আদর্শস্বরূপা,—হা ঈশ্বর!—সেই স্বর্গীয়া রমণীর উপর আপনার এরূপ নিষ্ঠুরতা কেন? হায়! প্রিয়ভগিনী! হায় কমলিনী! তোমার কিবা বিনয়নম্র, সুন্দর সুমিষ্ট কথা! প্রতিবেশী পুরুষের চক্ষুর নিকট তুমি শুকতারাবৎ সদাই সমুদিত!

বড়দাদার মুখভঙ্গী, অঙ্গচালনা এবং বক্তৃতার তেজ দেখিয়া বিপিনের একটু ভয় হইল—বুঝিল, দাদা প্রকৃতিস্থ নাই—ভাবের বে-ভাব ঘটিয়াছে। বিপিন তখন অতি বিনীতভাবে বড়দাদাকে বলিল, "দাদা, আমরা হলের ওপাশে গিয়া বসিগে চলুন—"

চাটর্জি। আচ্ছা, ঐ পাগল পিশাচ একাকী থাকুক—উহার সঙ্গ পরিত্যাগ করাই বুদ্ধিমানের উচিত।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর, চাটর্জি সাহেব, ভ্রাতা বিপিনের গলা ধরিয়া, কতকটা প্রেমালিঙ্গনের ভাব দেখাইয়া, টলিতে টলিতে, হলের অপর পার্শ্বে চলিয়া যাইতে লাগিলেন।

চাটর্জি পশ্চাৎপদ হইবামাত্র, রায় মহাশয়, নাকে কাপড় দিলেন।

ওদিকে চাটর্জি সাহেব, সৎগন্ধ ছড়াইতে ছড়াইতে, হলের অপর প্রান্তস্থিত এক সোফায় গিয়া বসিয়া পড়িলেন। বিপিন, অন্যমনস্ক বশতঃ বাঙ্গালায় বলিয়া ফেলিল,—"বড়দাদা, শোবেন কি?" বড়দাদা তখন বিরাট বিক্রমে বলিয়া উঠিলেন,—"ছি! ছি! ছি! পুনরায় তুমি সেই অসভ্যের জঘন্য ভাষা ব্যবহার করিতেছ? বল,—কতবার

আমাকে তোমার চরিত্র সংশোধন করিতে হইবে? সভ্যজাতির ভাষার সহিত ভ্রাতৃভাব জন্মাইবার সতত চেষ্টা করিবে? যদি তুমি জগতের উন্নতি করিতে ইচ্ছা কর, তবে প্রথমত তোমার সেই নীচকুলোদ্ভবা মাতৃভাষা ভুলিয়া যাও। তুমি এখন বালক, তুমি কি তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের পথে চলিয়া, তোমার ভবিষ্যৎ আশা, স্বাস্থ্য এবং কার্য্যকরী ক্ষমতা নষ্ট করিবে?—যখনই তুমি সুবিধা পাইবে, তখনই তুমি ইংরেজীতে কথা কহিতে অভ্যাস করিবে—অধিক আর কি বলিব?—তুমি ইংরেজীতে চিন্তা করিবে, ইংরেজীতে স্বপ্ন দেখিবে, ইংরেজীতে নিদ্রা যাইবে। এখন হইতে ক্রমান্বয়ে এইরূপ কার্য্য আরম্ভ করিলে, ভবিষ্যতে আর কেহই তোমার কথা শুনিয়া, তোমাকে নিগার বাঙ্গালী বলিয়া ঠিক করিতে পারিবে না।"

দাদার সাক্ষাতে অন্যমনস্কে বাঙ্গালা কথা বলিয়া ফেলিয়া, বিপিন বড়ই অপ্রতিভ হইল; মুখ হেঁট করিয়া রহিল। কিন্তু দাদা তখন স্বর্গসুখ উপভোগ করিতেছেন,—তাঁহার মন-ঘুড়ি কখনও শূন্যে উড়িতেছে, কখনও নীচে পানে নামিতেছে, কখন বা মধ্য-পথে খেলিয়া বেড়াইতেছে। সুতরাং তাঁহার বাক্যালাপের বিশ্রাম নাই, মুখ-খোলায় অবিরল খৈ ফুটিতে লাগিল। বিপিন বড়ই বিপদে পড়িল। উঠিবার যো নাই;—আদর করিয়া দাদা, বিপিনের হাত দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিয়াছেন।

এদিকে রায় মহাশয়, হুঁকাটী ধরিয়াই রহিলেন। কপিল সে ভাব অবলোকন করিয়া বড়ই বিস্মিত হইল। কল্কেতে এত করিয়া ফুঁ দিয়া ধরাইয়া দিলাম, আর বামুনটা মুখের কাছে লইয়া গিয়া, হুঁকাটা সরাইয়া ফেলিল। কি আশ্চর্য্য! ব্যাপার কি? অথবা পাগলে সবই সম্ভবে।

হলের দূরপ্রদেশে, চাটার্জি-সাহেব অবস্থিত হইলে, ব্রাহ্মণ কপিলকে বলিলেন,—"কপিল, হুঁকাটা রাখো—"

কপিল। কেন মোশাই, কি হলো? আপনি কি তামাক খান না?

রায়। না হে, আর খাবোনা,—দরকার নাই। গঙ্গাজল এসেছে কিনা দেখ।

কপিল। (যোড়হাতে) আজ্ঞে, তামাকটা খারাপ কি? বলেন ত, ভাল তামাক আনাই। অধীনের বড় অপরাধ হইয়াছে। আপনি আমার মা বাপ!

এই বলিয়া আরক্তলোচন কপিল সেই গম্ভীর-মূর্ত্তি ব্রাহ্মণের পায়ে ধরিল।

এইবার ব্রাহ্মণ ঈষৎ কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"আঃ, ওকি কর্‌চো? হুঁকাটা আগে রাখো না।"

এই বলিয়া রায় মহাশয় পা সরাইয়া লইলেন। কপিল অগত্যা উঠিয়া, হুঁকা লইয়া রাখিয়া দিল।

তখন জামাতা অনেকক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিলেন। রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে আট্টা। তিনি কপিলকে বলিলেন, "তোম্মাদের বুঝি আজ আর গঙ্গাজল আসিবে না; আচ্ছা গঙ্গা ত কাছে, আমি ঘাটে গিয়াই সন্ধ্যা করিয়া আসি—"

কপিল। তা কি হয়!—আপনি এই এলেন—জলটল খা'ন, একগ্লাস বরফ-লেমনেট্ খান,—এর মধ্যে এত রাত্রে অন্ধকারে গঙ্গার ঘাটে বেড়াতে যাওয়া কি? গঙ্গা কি কাছে? এখান থেকে এক ক্রোশের উপর। আপনি গেলে, মা আমাকে বড়ই বক্‌বেন—

রায়। না, না,—আমি শীঘ্র আস্‌চি—

এই বলিয়া জামাতা চাদর কাঁধে ফেলিয়া গমনোদ্যত হইলেন।

কপিল। করেন কি মোশাই?—রক্ষা করুন, আপনি খানিক থাকুন, আমি মাকে একবার এ কথা বলে আসি—

রায়। পাগল, পাগল!—একথা মাকে বল্‌বার কোন আবশ্যক নাই।

এই বলিয়া রায় মহাশয় ধীরপদে যাত্রা আরম্ভ করিলেন।

কপিল মহাসঙ্কটে পড়িল। ব্রাহ্মণকে আগুলিয়া ধরিতে তাহার সাহসে কুলাইল না;—পাছে পাগল-বামুনটা, তাহাকে কামড়াইয়া দেয়। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কপিল খানিক চুপ করিয়া রহিল; পরে রায় মহাশয় যখন ফটক পার হইয়াছেন, তখন কপিল ঊর্দ্ধশ্বাসে অন্দরাভিমুখে দৌড়িল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে কর্ত্রীকে গিয়া বলিল, "মা ঠাকুরুণ! সর্ব্বনাশ হয়েছে! জামাই বাবু পালিয়েছেন—তাঁকে ধর্‌তে গেলেম, তিনি আমাকে কামড়াতে এলেন,—"

মা। (ভয়চকিতনেত্রে) বলিস্ কি? বলিস্ কি?—দেখ শীগ্‌গির দেখ্;—তিনি কোথা পালালেন?

কপিল। মা, আসুন, দেখ্‌বেন,—ঐ দিকে, ঐ দিকে, ঐ ঐ:—

কপিলের কঠোর কণ্ঠরবে গৃহ জাগিয়া উঠিল। ভৃত্য, বেহারা, দ্বারবান্‌,—যে যেখানে ছিল, সকলে একত্র হইল। মহা হুলস্থূল! সকলেই হলে দাঁড়াইয়া কেবল গোল করিতে লাগিল।

মাতা। (ধীরভাবে) কপিল, তুমি বাছা দেখ ত, তিনি কোন্ দিকে গেলেন—রাস্তায় যেয়ে তিনি কারো সঙ্গে এখনি হয় ত মারামারি করবেন,—শীঘ্র যাও,—পাঁড়ে, তুমিও সঙ্গে যাও,—সকলেই গিয়ে তাঁকে খুঁজে নিয়ে এস,—

গৃহিণীর আজ্ঞাপ্রাপ্তি মাত্র, পাঁড়ে দারোয়ান, ভৃত্য, খানসামা, ঘেসেড়া,—সকলেই জামাই-অন্বেষণে দৌড়িল।

গোল শুনিয়া চাটর্জি-সাহেব বিপিনকে ইংরেজীতে জিজ্ঞাসিলেন,—

"ইহা কি বিষয়ক গোলমাল এবং ইহার বীজ-কারণই বা কি?—এমন সময় কাহার আবির্ভাব হইল?—"

বিপিন। ভগিনীর স্বামী পলাইয়াছেন। কপিল তাঁহাকে ধরিতে গিয়াছে।

চাটর্জি। আ—আ—কপিলের এই ন্যায়ানুরাগ-পূর্ণ, বীরোচিত কর্ম্মে, আমি সাহায্য প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। ভাই! ভাবিও না, হৃদয়ে এমন কথা স্থান দিও না যে, আমি কপিলের বিজয়-গৌরবের অংশভাগী হইবার জন্য লালায়িত হইয়াছি। রণজয়ের পর, কপিল সম্মানসূচক, মূল্যবান যে সকল উপাধি এবং উপহার পাইবে, তাহার একটীরও আমি ভাগ লইব না। কপিল, সেনাপতিত্বে বরিত হইয়াছে, সেনাপতিই থাকুক; আমি তাহার অধীনে লেফটনেণ্ট হইয়া কাজ করিব!

এই কথা বলিয়া চাটর্জি-সাহেব, শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার উপক্রম করিলেন।

বিপিন একটু ভীত হইয়া, সাহেব-বড়দাদার হাত ধরিয়া বলিল,—"আপনার আর সেখানে যাবার দরকার নাই—কপিলই, জামাই বাবুকে ফিরিয়ে আনবে এখন।—"

চাটর্জি! এঃ—ছিঃ—তোমার ইংরেজী-উচ্চারণটি বড়ই দূষণীয়, ভ্রমপূর্ণ। তোমার ইংরেজী কথাও ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ এবং প্রচলিত পদ্ধতি-বিরুদ্ধ। আমার ভাই হইয়া, আজও তুমি মহারাণীর ইংরেজী শিখিতে পারিলে না? যদি কোন ইংরেজ এখানে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে তোমার মূর্খতা দেখিয়া তিনি হাস্যসংবরণ করিতে

পারিতেন না এবং সে সময় আমিও তোমাকে তাঁহার নিকট, আমার ভ্রাতা বলিয়া পরিচয় করিয়া দিতেও সক্ষম হইতাম না।

চাটর্জি ক্রমশ আপনা আপনি বকিতে বকিতে নীরব হইলেন। অবশেষে নয়ন-যুগল মুদ্রিত হইল—চৈতন্য লোপ হইল। চাটর্জি ফুরাইল। বিপিন, নাগপাশ-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মায়ের নিকট দৌড়িয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

এদিকে, ব্রাহ্মণ স্কন্ধে চাদর ফেলিয়া, ভাগীরথী অভিমুখে, গুটি গুটি চলিয়াছেন। সমস্ত দিন অনাহার হয় নাই। রাত্রি তিনটার সময় উঠিয়া, আট ক্রোশ পথ হাঁটিয়া বেলা ৯ টার সময় তিনি ষ্টেশনে পৌঁছেন। সেখানে স্নানাহ্নিক করিয়া, একটু জল খাইয়াছিলেন। পাকাদি করিয়া আহার করিতে সময়ও হয় নাই, সুবিধাও হয় নাই। তিনি বেলা সাড়েদশটার সময় রেলগাড়ি চাপিয়া বৈকালে সাড়ে চারিটার সময় শিয়ালদহে অবতরণ করেন। ব্রাহ্মণ,—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পরিশ্রমে বড়ই কাতর হইয়াছেন। ধন্য শরীর! রাত্রি তিনটার সময় উঠিয়া ৮ ক্রোশ পথ হাঁটা,—তার পর সমস্ত দিন অনাহার—অবশেষে, রাত্রি সাড়ে আটটা বাজিয়াছে, ব্রাহ্মণের এখনও পরিশ্রমের বিরাম নাই,—একক্রোশ পথ হাঁটিয়া গঙ্গাভিমুখে চলিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ পরম-হিন্দু। সন্ধ্যা ব্যতীত জলগ্রহণ করেন না। কোন্ সুব্রাহ্মণ করিয়া থাকেন? ওষ্ঠাগত-প্রাণ হইলেও সেই কঠোর-তপা, তেজস্বী ব্রাহ্মণ, গঙ্গাজলে সন্ধ্যাকৃত্য না করিয়া, কখন কি জলগ্রহণ করিতে পারেন? ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ব্রাহ্মণ, তাই ধীরে ধীরে শুষ্কমুখে, সেই প্রসন্নপুণ্যসলিলা, জননী জাহ্নবীসদনে জীবন জুড়াইতে যাইতেছেন। গলি হইতে বাহির হইয়া, তিনি রাজপথের ফুটপাত ধরিয়াছেন মাত্র, এমন সময় কপিল খানসামা সদলবলে উপনীত হইল।

কপিল। ফিরুন ঠাকুর, ফিরুন!—আমাদের দফা সারলেন আর কি? চলুন, ঘরে চলুন,—এরাত্রে আপন মনে কোথায় যাচ্চেন বলুন দেখি?

কপিল এবং তাহার সহচরদিগকে দেখিয়া ব্রাহ্মণ চমকিত হইলেন। কপিলের কথা শুনিয়া অধিকতর বিস্মিত হইলেন! ক্ষণেক নীরব রহিলেন।

কপিল ইত্যবসরে আবার বলিল,—

"পায়ে পড়ি ঠাকুর, ঘরে চলুন,—রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে আর খুঁজিতে পারি না।—"

তখন ব্রাহ্মণ অতি গম্ভীরভাবে, ঈষৎ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "কপিল, তুমি পাগল হলে নাকি? ছি! আর মাতলামো করো না,—ঘরে যাও, আমি সন্ধ্যা-আহ্নিক করে আসচি।—"

কপিলকে পাগল ও মাতাল বলাতে তাহার কিছু রাগ হইল। তাহার ইচ্ছা যে, সে স্বয়ং ব্রাহ্মণের টীকি ধরিয়া টানিয়া আনে, কিন্তু সহসা সে কাজ করিতে ভরসা করিল না; প্রকাশ্যে ব্রাহ্মণকে বলিল,—"আরে ঠাকুর, আর জ্বালাতন করো না, ভালোয় ভালোয় আমার সঙ্গে ঘরে চলো।—"

ব্রাহ্মণ। আঃ কি কর!—আবার ভোর মাতলামী! যাও যাও, আর আমাকে বিরক্ত করো না।

ব্রাহ্মণের তেজঃপুঞ্জ-কলেবর, সেই জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু দেখিয়া, সেই ধীরগম্ভীর বাক্য শুনিয়া কপিল নিতান্তই ভীত হইল; ভাবিল, পাগলের হাতে শেষে প্রাণ হারাবো নাকি? তখন সে একটু দূরে দাঁড়াইয়া, পাঁড়েজীকে কাণে কাণে বলিল, "তোম সাম্‌নেকো পথ আগুলো, হাম পশ্চাৎমে থাক্‌বো।" দারবান্ দৌড়িয়া গিয়া ব্রাহ্মণের পথ রুদ্ধ করিল; মেথেড়া তাঁহার ডানপাশে দাঁড়াইল; আর একজন উড়ে খান্‌সামা পশ্চাতে রহিল,—সেই উড়ের পশ্চাতে সেনাপতি কপিল-খান্‌সামা স্বয়ং অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পাঁড়ে, পথ রুদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণকে বলিল,—

"ঠাকুরজী! আপ এৎনা রাৎমে কাঁহা যাতেঁহেঁ; রেলগাড়ীমে আপকে বহুৎ তক্‌লিফ হুয়া! হামারা সাৎ ডেরা পর চলিয়ে।

ব্রাহ্মণ। দেখো, ম্যয়নে দিক্ মৎ করো ; হামারা ওবিয়ৎ মান্দি হ্যায়—তোম্‌ভো ব্রাহ্মণ হ্যায়—গঙ্গাকা কিনারাপর্ সন্ধ্যা করকে হাম্ বাসাপর্ যাঙ্গে।

কপিল পশ্চাৎ হইতে বলিতে লাগিল,—"পাঁড়েজী ; তোম্ কি রকম লোক হ্যায়—হাম বল্‌চি, তোম ঠাকুরকো ধরাধরি করকে ঘরমে নিয়ে চল।"

ব্রাহ্মণ তখন বিষম বিব্রত হইয়া, সেই জলদ-গম্ভীর স্বরে, বিরক্তি সহকারে তীব্র-বাক্যে বলিলেন,—"দুর্ব্বৃত্ত ! পুনরায় যদি মাতলামো কর, তাহা হইলে উপযুক্ত দণ্ড পাইবে—"

কপিল এই সময় একটা ভয়ানক গোলযোগ করিয়া উঠিল,—"বাবারে, মেলেরে, মেরে ফেল্লেরে, কে আছিস্‌রে, আমাকে ধর্,—কনেষ্টবল, কনেষ্টবল"—কপিলের চীৎকারে রাজপথ প্রতিধ্বনিত হইল। এইরূপ গোলমালে পথে লোক জমিয়া গেল। ব্রাহ্মণ একটু চঞ্চলচিত্ত হইলেন ; মনে ভাবিলেন, একি ! কি ? কিন্তু তিনি কপিলের দিকে আর অগ্রসর না হইয়া, দ্রুতপদে গঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সম্মুখসমরে ভঙ্গ দিয়া, বিপক্ষ পলাইল দেখিয়া, কপিল হাঁকাইয়া উঠিল ;—ক্রমে একটা হাঁকাহাঁকি আরম্ভ করিল,—"ঐ যায়, ঐ পলায়, ধর্ ধর্, ধ্যায়া পাঁড়েজী তোম্ কি করতা হ্যায় ; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্যায়া মজা দেখতা হ্যায় ?" পাঁড়েজী ভাঙ্গাভাঙ্গা সুরে, আস্তে আস্তে উত্তর দিল,—"হাম্ কেয়া করে ভেইয়া, আংরেজকে মুলুক্‌মে ভদ্দর আদ্‌মিকো হাম পাকড়নে নেহি সেকেঙ্গে।"

কপিল আরও ভয়ঙ্কর চেঁচাইতে লাগিল। সম্মুখে সেই ঘোড়ার ঘেসেড়া। সে, জাতিতে মুসলমান। নাম, বকাউল্লা। তাহাকে কপিল বলিল, "তোম্ বাবুকো নিমক খেয়ে ক্যায়া মজা দেখ্‌চো ; পাগলকো জল্‌দি পাকড়ে নিয়ে এসো—"

ব্রাহ্মণ এই অবকাশে দ্রুতপদবিক্ষেপে দুই-রসী পথ অগ্রসর হইয়াছেন ; মুখকমল শুকাইয়াছে ; শরীর হইতে অবিরল ঘাম বাহির হইতেছে।

ঘেসেড়া, কপিলকে বলিল, "হুকুম মিলেত হাম আবি পাকড় লে-আনে সেক্তা হ্যায়

কপিল। হুকুম ত হাম বরাবরই দিচ্চি ; তুমি যদি জল্‌দী না পাকড়ো, হাম মা ঠাকুরাণীকে বলে দিয়ে তোমারা নোকরিমে জবাব দিবো।

ঘেসেড়া এই কথা শুনিয়া, ব্রাহ্মণকে ধরিতে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল। কপিল তাহার

পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধর্ ধর্ রবে ছুটিল। মহা হুলস্থুল কাণ্ড। ব্যাপার দেখিয়া পাঁড়েজীও তাহাদের অনুসরণ করিল। উহাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় একশত দর্শক ধাবিত হইল! সেই লোকমণ্ডলী, ব্রাহ্মণের সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র ব্রাহ্মণ ফিরিয়া চাহিলেন। অমনি বকাউল্লা ঘেসেড়া, সেই ক্ষুৎপিপাসাশ্রমাতুর ব্রাহ্মণের দক্ষিণহস্ত সজোরে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিল। ব্রাহ্মণ অতি তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"নরাধম, পাপিষ্ঠ যবন! আমার হাত ছাড়িয়া দে।" এই কথা উচ্চারণ করিয়া, ব্রাহ্মণ বলপূর্ব্বক হাত ছাড়াইবার উপক্রম করিলেন। ঘেসেড়া গোখাদক,—দিল্লী-বাসী। বয়স ত্রিশ বৎসর। সে বালককালে জুয়া খেলিত। ষোল বৎসর বয়সে নৌকার দাঁড়ি ছিল। এই সময় ডাকাতি অপরাধে তাহার দশ বৎসর মেয়াদ হয়। দ্বীপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া, সে আর দেশে যায় নাই। কলিকাতায় ঘেসেড়া-গিরিরূপ মহাব্রতে নিযুক্ত আছে। বকাউল্লা গেটে জোয়ান—শরীর যেন লৌহ। ব্রাহ্মণ বল প্রকাশে বকাউল্লার হাত ছিনাইয়া লইবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া, সে, ক্রোধভরে তাঁহার হাত ছাড়িয়া, একেবারে তাঁহার গলা জাপ্টাইয়া ধরিল। ব্রাহ্মণের মুখ অবনত হইল। বকাউল্লার দারুণ করাঘাতে, তাঁহার গলদেশে বিষম আঘাত লাগিল। ব্রাহ্মণ যন্ত্রণায়, অধীর হইয়া "হরি, হরি, প্রাণ যায়, প্রাণ যায়" বলিয়া উঠিলেন। কপিল মহা আনন্দে, লম্ফে ঝম্ফে হাঁকাহাঁকি করিয়া বলিয়া উঠিল,—"ঘেসেড়াজী, আচ্ছা শক্ত করে ধরো, যেন পালায় মৎ, কুচ্ ভয় করো না।" ব্রাহ্মণ অতি কাতরকণ্ঠে বলিলেন,—"দুরাচার যবন! তুই সর্ব্বনাশ করিলি,—যজ্ঞোপবীত স্পর্শ করিলি,—আমাকে ছেড়ে দে।—"

ব্রাহ্মণের চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ জল পড়িতে লাগিল। মুখে অন্য কোন কথা নাই, কেবল বলিতে লাগিলেন, "আমায় ছেড়ে দে! আমায় ছেড়ে দে!"

গোলযোগ দেখিয়া, একজন কনষ্টেবল দূরে দাঁড়াইয়া একপাশ হইতে মিটি মিটি চাহিয়া, উকি ঝুকি মারিতে লাগিল। তাহাকে দেখিয়া কপিলের আরও সাহস বাড়িল! কপিল বলিল,—"কনেষ্টবলজী, এ আদমী পাগল হ্যায়,—রাস্তামে লোকজনকে মার্‌তা হ্যায়। বাবুর হুকুম্‌মে হাম পাগলকো ধরে নিয়ে যাচ্ছি।"

কনষ্টেবল। কোন্ বাবু?

কপিল। ডেপুটী বাবু, ৫৫—নং গলিমে র‍্যয়তা।" তোম পচ্ছন্তা নেহি?

কনষ্টেবল। ওহো, হাম সমজ লিয়া? বাবু বড় ওমদা আদমী হ্যায়। পূজামে হুয়া একরূপেয়া বক্‌শীশ মিলা। ও পাগলা, বাবুকে কোন্ লাগ্‌তা?

কপিল। বাবুকে ঐ পাগল জামাই হ্যায়। ছেলেবেলাসে পাগল, হামকো গালমে আজ কামড়ায় দিয়া।

কনষ্টেবল। জল্‌দি জল্‌দি বাউরাকো ঘরমে লে যাও,—তালা বন্দ করো।

এইরূপে কনষ্টেবল, কপিল এবং পাঁড়েজীর সাহায্যে, সেই ঘেসেড়া, ব্রাহ্মণের গলা এবং হাত ধরিয়া গৃহাভিমুখে টানিয়া আনিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ আর কথা কহিলেন না, নীরবে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে তিনি কেবল একবার মুখফুটিয়া ঘেসেড়াকে বলিয়াছিলেন,—"ঘাড় ছেড়ে দাও, আমি ত তোমাদের সঙ্গেই যাইতেছি।"

এই কথা শুনিবামাত্র কনষ্টেবল-প্রভু ক্রোধভরে বলিয়া উঠিলেন,—"ক্যায়া বাউরা বক্ বক্ কর্‌তা হ্যায়, গোলমাল করেগা তো হাম তুনে হাজতমে লে যাগা।" মুখে এই মধুরবাণী বলিয়া, কনষ্টেবল ব্রাহ্মণের পিঠে একটী সুমিষ্ট ধাক্কা প্রদান করিলেন। সেই মৃদুমন্দ মনোহর কনষ্টেবল-করস্পর্শে ব্রাহ্মণের পৃষ্ঠ-প্রদেশ ঈষৎ ফুলিয়া উঠিল, সর্ব্বশরীর শিহরিল, মাথা ঘুরিল! ব্রাহ্মণ নীরব; পৃথিবী অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন; তাঁহার গলদেশ-বিলম্বিত যজ্ঞোপবীত মুসলমান বকাউল্লার বামকরস্পর্শে কলঙ্কিত হইতেছে দেখিয়া, তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহার গণ্ডস্থল বহিয়া আবার জল পড়িল। কিন্তু উপায় কি? বকাউল্লা তাঁহার ডান হাত ধরিয়া রাখিয়াছে এবং বাঁ হাতের সাহায্যে সে, গলা টিপিয়া ও পৈতা চাপিয়া ধরিয়াছে। ব্রাহ্মণ তখন নিরুপায় ভাবিয়া, নিজ বামকর দিয়া ধীরে ধীরে, বকাউল্লার হাত হইতে পৈতা ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিলেন। ঘেসেড়ার হাতে ঈষৎ টান পড়িল। ঘেসেড়া চমকিয়া উঠিয়া চীৎকার করিল,—"বাউরা, হামারা হাত ছিন্ লেকে ভাগতা হ্যায়—"

কপিল। কেয়া হোয়েচে,—ছেড়ে দাও মৎ, পাক্‌ড়ো পাক্‌ড়ো,—

কনষ্টেবল তখন দৌড়িয়া গিয়া, পশ্চাৎ হইতে ব্রাহ্মণের কোমর জড়াইয়া ধরিল। সেই উড়ে-খানসামাটা গিয়া তাঁহার বাঁ হাতটা দৃঢ়রূপে চাপিয়া রাখিল।

ব্রাহ্মণ রাধাশ্যামের লাঞ্ছনা।

ঘেসড়া বজ্র-কড়াটিপনি দিয়া গলা টিপিয়া ধরিল। মর্ম্মাহত কাতর ব্রাহ্মণ—“ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ!” রবে এক গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। এই সময় স্বয়ং কপিল দৌড়িয়া গিয়া, সজোরে ব্রাহ্মণের তলপেটে এক লাথি মারিয়া বলিল,—“চল্ বেটা, বিটল বামুন! ঘরের কাছে এসে, মন্তর আউড়ে আবার ন্যাক্‌রা জুড়ে দিলে!”

ব্রাহ্মণের মুখ শাকবর্ণ হইল। সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। চক্ষুর্দ্বয় কপালে উঠিল। ব্রাহ্মণ মূর্চ্ছিত হইয়া কনষ্টেবলের গায়ে ঢলিয়া পড়িলেন। কনষ্টেবল এইবার মহা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রাণপণে চাপিয়া ধরিল। ব্রাহ্মণের দেহ স্থির, নিশ্চল, অসাড়, অনড়; তাঁহার মুখ কেবল ঝুলিতে লাগিল।

কপিল বলিল,—“বুজরুক্ বামুনটো কল্লা কচ্চে। ঠেলেঠুলে এখন ঘরে ঢোকাতে পাল্লে হয়। তারপর আমি ওকে একবার দেখ্‌বো।”

এইরূপ গোলমাল করিয়া, ধরাধরি করিয়া ক্রমে তাহারা, ব্রাহ্মণকে লইয়া, গৃহদ্বারের নিকটে আসিয়া পৌঁছিল।

ব্রাহ্মণ আরও বিবর্ণ হইলেন,—মুখ দিয়া ফেন উদ্গত হইতে লাগিল। পাঁড়েজী তখন বিষম ব্যাপার কতকটা বুঝিয়া, উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—“তোমলোক ক্যা কর্‌তা হ্যায়? ব্রাহ্মণতো মর্‌নেকে মাফিক্ হুয়া,—ছোড় দেও উস্কো, ছোড় দেও।” এই কথা বলিতে বলিতে পাঁড়েজী, কনষ্টেবল এবং ঘেসেড়াকে সরাইয়া দিয়া, স্বয়ং গিয়া ধরিল। দেখিল, ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা নাই, দেহভার শিথিল, মুখ লুটাইয়া পড়িয়াছে। অমনি সে, আস্তে ব্যস্তে তাঁহাকে ভূতলে শোয়াইল এবং আপন কোলে তাঁহার মাথা তুলিয়া লইল।

কনষ্টেবল। (ধীরে ধীরে) হামারা মালুম্ হোতা হ্যায়, ব্রামন্ কুচ নেশা কিয়া—দারু আরু পিয়া—

মুখ হইতে এই মধুরবাণী নির্গত করিয়া, কনষ্টেবল হঠাৎ দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

পাঁড়েজী, কপিলকে উদ্দেশ করিয়া বলিল,—“ভেইয়া জল্‌দি থোড়া পানি লে-আও! মা-জীকো খবর্ দেও, ছোট্‌ বাবুকো খবর্ দেও,—বাত আচ্ছা হ্যায় নেই,—”

কপিল কতক পাঁড়েজীকে শুনাইয়া, কতক আপন মনে, নাকিসুরে বলিতে লাগিল ;—"

"আমি আর পারি না বাবু! সন্ধ্যাবেলা অবধি খেটে খেটে আমার প্রাণ উচ্ছুগ্‌গু হলো—ঘুরে ঘুরে নাড়ী পাক পেয়ে গেলো। বৈকালে সেই একটু জল খেয়েচি বৈত নয়,—এতখানি রাত হলো, না খেয়ে আর খাটবোই বা কত? তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্চে—"

পাঁড়েজী একটু রাগ করিয়া বলিল,—"ক্যায়া জি, তোম্ বক্‌বক্ করতা? দেখতেহোঁ নেহি, জামাই বাবুকে মুঁহসে পনি নিকলতা? জল্‌দি খবর দেও,—ঠাণ্ডা পানি লে আও—" এই কথা বলিয়া পাঁড়ে স্বয়ং দ্বারদেশ হইতে ভীতিব্যঞ্জক বিকটস্বরে ডাকিল,—"ছোটু বাবু, আপ্ জল্‌দি আইয়ে—"

কপিল কি করে! অগত্যা পা পা করিয়া ধীরে ধীরে গৃহপ্রবেশে উদ্যত হইল। যেন সে বড় কাহিল, কতদিন খায় নাই, টেলিলে পড়িয়া যায়!

এমন সময় ডেপুটীবাবুর গৃহে একটা মহা গোল উঠিল,—"ওমা, আমার কি হলো গো, বাছা আর কথা কয় না কেন গো"—এই বলিয়া গৃহমধ্যে এক মহাক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল। দালানের উপরে দুপ্ দাপ্ জুতার শব্দ পাওয়া যাইতে লাগিল। উপরতলে কাহারা যেন এঘর ওঘর দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। ক্রন্দনধ্বনি মধ্যে গৃহিণীর গলা পাইয়া পাঁড়েজী ভাবিতে লাগিল ;—"ক্যায়া জানে, অন্দরমে আউর কোন্ ফসাদ হুয়া।"

কপিল খান্‌সামা দ্বিতলে কান্নার গোল শুনিয়া মনে মনে গভীর চিন্তা করিতে লাগিল, "আমি উপরে যাই, কি, না যাই। উপরে যে রকম গোল উঠেছে, অবশ্যই কোন বিপদ ঘটে থাকবে। আমাকে দেখ্‌তে পেলেই সবাই ঠুঁটো হয়ে বসে থাকবে ; আর আমায় ফরমাস কোরে কোরে, আমার প্রাণটাই বার করে নেবে, নীচে থাকলেই বা সোয়াস্তি কৈ?—পাঁড়ে বেটা তিক্ত করে মারবে। আমি কোথাও যাবো না—নীচের ঘরে চুপে চুপে লুকিয়ে বসে থাকি।"

কপিলচন্দ্র এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় বিপিন বাবু সিঁড়ি হইতে দ্রুতপদে দপ দপ শব্দে নিমেষ মধ্যে নামিয়া আসিয়া, কপিলকে দেখিয়া, অতি

ব্যগ্রভাবে বলিলেন,—"কপিল, [কপিল, সর্ব্বনাশ হয়েছে, শীঘ্র উপরে যা, উপরে যা—"

কপিল। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) অ্যাঁ, কি হয়েছে, ছোট বাবু!—কি হয়েছে ছোট বাবু!—কপিলের চক্ষের আর পলক পড়িল না।

বিপিন। বড়দিদির "ফিট" হয়েছে, কিছুতেই চেতনা হচ্ছে না—মা বড় কাঁদ্‌ছেন। তুই যেয়ে দিদির চোখে জলের ঝাপ্টা দিয়া দেখ দেখিন? আমি ডাক্তার বাবুর বাড়ী যাচ্চি—

এই কথা বলিয়া বিপিন চলিল।

কপিল। বলেন কি, ছোটবাবু! বলেন কি, ছোটবাবু! সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ!

এই কথা বলিতে বলিতে কপিলও অন্দরাভিমুখে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল। যেন মদমত্ত ঐরাবতের বল তাহার শরীরে তখন উপজিল। সে, উপরে উঠিয়া, ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায়, লম্ফ-ঝম্ফ দিয়া, বেগে কমলিনীর গৃহে প্রবেশ করিল। সে কক্ষ তখন লোকে লোকারণ্য এবং কলরবে পরিপূর্ণ। কপিল অতিশয় কোপ প্রকাশ করিয়া প্রথমে বলিল,—"মা ঠাকুরুণ! কোরেচেন কি? এ ঘরে এত গোল কেন? এত লোক কেন? নিশ্বাসের গরমে যে দিদিবাবুর ব্যারাম বাড়্‌বে। সকলে সরে যাও,—তফাৎ তফাৎ!—"

ছেলে পিলে সকলকে সরাইয়া দিয়া, কপিল বাঁ হাতে এক কুঁজো জল লইয়া, কমলিনীর শিয়রে উপবেশন করিল এবং কুঁজো হইতে জল লইয়া ধীরে ধীরে কমলিনীর চোখে, মুখে, ঝাপ্টা মারিতে লাগিল।

জননী জিজ্ঞাসিলেন, "কপিল, জামাই কোথা গেলেন?"

কপিল ইশারায় উত্তর দিল। হাত নাড়িয়া, মুখভঙ্গি করিয়া দেখাইল,—এখন কথা কহিবেন না, কথা কহিলে দিদিবাবুর ব্যারাম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। গৃহিণী নীরব হইলেন। কপিল উঠিয়া, দাঁড়াইয়া, আস্তে আস্তে বলিল;—"মা! এ কি কোরেচেন? দিদিবাবুর গায়ের বডির বোতাম খুলে এখনও দেন নাই? তাইতে এখন ফিট যায় নাই, আপনি শীঘ্র একখানা পাখা নিয়ে আসুন।"

জননী তখন পাখা আনিতে গৃহান্তরে গমন করিলেন।

এদিকে কপিল দিদিবাবুর জামার বোতাম-খোলা কার্য্যে নিমগ্ন হইল। দিদিবাবু:

নড়ন-চড়ন নাই, কথাবার্ত্তা নাই, যেন এলাইয়া পড়িয়া আছেন;—মুদ্রিত নয়নযুগল কড়িকাঠ পানে; হস্তদ্বয় মরা-মানুষের হাতের মত বিছানায় ছড়াইয়া আছে; রাঙা পা দুখানিও তাই। গৃহিণী পাখা লইয়া আসিয়া কপিলের হাতে দিলেন। কপিল হুহু শব্দে পাখা চালাইতে লাগল; সেই পাখা-নিঃসৃত (?) বায়ুর সাহায্যে কমলিনীর সুকোমল গাত্রস্থিত বস্ত্রগুচ্ছ চঞ্চল হইয়া বেড়াইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে জলছিটা-বর্ষণ কার্য্যও চলিল। তথাচ কমলিনার ফিট ঘুচিল না! জননীর চোখের জলও কমিল না!

পাঠক! এখন কোন্ দিক্ দেখিবেন? সেই দ্বারস্থিত, ভূপতিত, মর্ম্মাহত, মূর্চ্ছিত ব্রাহ্মণের পরিণাম দেখিবেন?—না, কমলিনার শুশ্রূষা দেখিবেন? কোন্ পথে যাবেন?

প্রথমভাগ সমাপ্ত।

মডেল ভগিনী।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পাঠক! একদিকে হিন্দু-ব্রাহ্মণের চরম অবস্থা; অন্যদিকে শিক্ষিতা মহিলার উন্নতির চরম সোপান; একদিকে "অসভ্যতা, কুসংস্কার," অন্যদিকে "সভ্যতা, সুসংস্কার"—কোন্ দিক্ দেখিবেন, কোন্ পথে যাইবেন?

আমরা গ্রন্থকার-মানুষ। বুঝি ভাল। জ্ঞানও অনেক, বিদ্যাও অগাধ। তাই বলিতেছি, এখন, ও-দুপথের কোন পথেই যেয়ে কাজ নাই। এ সঙ্কটকালে, একটা মাঝামাঝি সোজা পথেই যাওয়া ভাল।

ডেপুটী বাবু কে? সেই জামাই বাবু ব্রাহ্মণই বা কে? আর সেই মহিলা-কুল-পঙ্কজ-সবিতা কমলিনীই বা কে? কেউ কিছু জান কি? হু হু করে গল্প পড়ে গেলেই ত হয় না? আগে বোঝ, তবে ত শিখিতে পারিবে?

ডেপুটী বাবু চিরকাল ডেপুটীগিরিই করেন! কেহ কেহ তাঁহাকে "আজন্ম-ডেপুটী" বলেন। বস্তুত অনেক প্রবীণ পুরুষ বলিয়া থাকেন, "আমরা ত ইঁহাকে ছেলেবেলা থেকেই ডেপুটী দেখিতেছি।" তিনি ৫৮ সালের সিপাহী যুদ্ধের পূর্ব্বে, কি পরে, রাজকাজ আরম্ভ করিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত তাহার মীমাংসা হইল না। আরও

একটা গুরুতর বিষয়ের আজও কেহ মীমাংসা করিতে পারিল না ;—ইংরেজী বিদ্যেটা তাঁর কোন্ কালের ?—এন্‌ট্রেন্স-এলে-বিয়ে কালের, না সেই জুনিয়ারি সিনিয়ারি কালের ? নব্য তত্ত্বানুসন্ধায়ী প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এ বিষম সমস্যা পূরণ করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সফলকাম হন নাই। অবশেষে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে এ বিষয়ের ওকালতনামা দিবারও কথা হয়। এরূপ শুনা গিয়াছে, উপযুক্ত ফী পাইলে, ডাক্তার মিত্র, ভাষা-বিজ্ঞান এবং শব্দ-বিজ্ঞানের সাহায্যে, একথা প্রমাণ করিয়া দিতে রাজী আছেন।

যাইহৌক, ডেপুটী বাবুর হাতের ইংরেজী লেখাটী অতি পরিষ্কার। গোটা গোটা সতেজ ছাঁদ—যেন মুক্তা বর্ষিয়া যায়। এতখানি তাঁর বয়স হইল, টানা-লেখা, ভাঙা-লেখা কাকে বলে, তা তিনি জানেন না। অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যেমনই তাড়াতাড়ি লিখুন না কেন, সেই গোটাগোটা হরপই তাঁর কলমের মুখ দিয়া বাহির হইবে। তবে তাড়াতাড়ি লেখাটা তাঁর অভ্যাস কম। তিনি বলিতেন, "মানুষের কাজ অল্প, সময় অধিক ; আমরা অনেকটা সময় বাজে কাজে বৃথা নষ্ট করি, সুতরাং অনর্থক সময় নষ্ট না করিয়া, ধীরে ধীরে যত্ন করিয়া লিখিয়া, সেই সময়টা পূরণ করিলে সময়ের সদ্ব্যবহার করা হয়।"

তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা যে কত দূর হইয়াছিল, তাহাত আমরা এক্‌তরফা প্রমাণ করিতেও অক্ষম হইলাম। সে দোষ অবশ্যই তাঁহার নহে, দোষ আমাদের নিজ-জ্ঞানের এবং নিজ-শিক্ষার। তবে এটা এক রকম বুঝা গিয়াছে,—হায় তিনি অতি পণ্ডিত, না হয় তিনি অতি মূর্খ, অথবা মাঝামাঝি "অতি-পণ্ডিত-অতি-মূর্খ।"

ডেপুটী বাবুর জ্ঞানের পরিচয় নাই বা পাইলাম ; তাঁহার বাপকে বিলক্ষণ জানি। বাপের নাম নরহরি ঘোষাল। নিবাস কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত কোন পল্লীগ্রামে। নরহরি তালুকদার ; তালুকগুলি সমস্তই পত্তনিবিলি আছে, খাসে একখানিও রাখেন নাই। তিনি গোলমাল প্রিয় লোক নহেন। নায়েব, গোমস্তা, নগ্দী, চৌকীদার প্রভৃতিকে লই একটা মহা হাঙ্গাম করিতে ভাল বাসেন না। একমাত্র গলায়-পড়া-কুটুম্বের ছেলে তাঁহার কারপরদাজ ; ভৃত্য একমাত্র ;—দরোয়ান-গিরি এবং খানসামা-গিরি—এ উভয় কাজই তাহার জেম্মা ; এবং একমাত্র স্বয়ং তিনি। এই তিন

জনের দ্বারা বিষয়কর্ম্ম নির্ব্বাহিত হয়। কোন গোলযোগ নাই,—সন সন, মাস মাস, কিস্তি কিস্তি যথানিয়মে পত্তনিদারগণের নিকট হইতে খাজনা আদায় হয়। বেশ সুখ স্বচ্ছন্দ। যেমন করিয়া হউক, তাঁহার শালিয়ানা মাত আট হাজার টাকা মুনফা আছে।

নরহরির পুত্রও একমাত্র। তিনি ৩৮ বৎসর বয়সে, "হলোনা হলোন" করিয়া বহুযত্নে, এই পুত্র-রত্ন লাভ করিয়াছিলেন। পুত্রের নাম শ্রীরামদাস। উপন্যাস-লেখিত নরনারীগণের চরিত্র একটু স্বতন্ত্র। পরিদৃশ্যমান মানবকুল অপেক্ষা তাঁহাদের সকল বিষয়ই একটু উচ্চ অঙ্গের। সুতরাং শ্রীরামদাস জন্মিবার পরদিন হইতেই, শুক্লপক্ষ-শশিকলার ন্যায় প্রতিদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন; তাঁহার অঙ্গের আভায় দশদিক্ উজ্জ্বলীকৃত হইতে লাগিল। তাঁহার কথা সুধাবৎ মধুর হইল, নয়ন খঞ্জন গঞ্জন হইল। ওষ্ঠাধর বিম্বফলের ন্যায় টুকটুক্ করিতে লাগিল। হস্তাঙ্গুলির দশ নখে দশ চন্দ্র হাসিল—কেশকপাল পার্ব্বতীয় মৃগীর চামরকে নিন্দা করিল। অধিক আর কত বলিব, সংসারে যে সকল উপকরণ একাধারে খুজিয়া পাওয়া যায় না, তৎসমস্তই সেই পুত্র-রত্নে নিহিত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এ হেন শ্রীরামদাসই আমাদের ডেপুটী বাবু। তিনি বাল্য-বিদ্যাটা গ্রাম্য-পাঠশালেই শেষ করেন। দ্বাদশ বৎসর বয়সের বক্ষে যখন তিনি পদাঘাত করিলেন, তখন গ্রামের সমস্ত ভদ্র প্রবীণ ব্যক্তি, নরহরিকে একবাক্যে বলিলেন, "শ্রীরামকে আর এ পাড়াগাঁয়ে রাখা উচিত নয়; আপনার সন্তান যেরূপ সুলক্ষণ-সম্পন্ন, তাহাতে ভবিষ্যতে উনি একজন বড়লোক হবেন। অতএব শ্রীরামকে ইংরেজী শিক্ষার্থ কলিকাতায় পাঠান উচিত।"

বিজ্ঞ প্রতিবেশিমণ্ডলীর কথায় বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করা ভদ্রতাবিরুদ্ধ; সুতরাং নরহরি ঘোষাল, পুত্রকে ইংরেজী-জ্ঞানলাভার্থ কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। বহুদিন

ধরিয়া শ্রীরাম, ইংরেজীর গূঢ় মর্ম্মনিচয় অভ্যাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ের কলিকাতার ইতিবৃত্তটা কিছু তিমিরাচ্ছন্ন। কেমন স্কুলে, কার কাছে, কি প্রণালীতে তিনি পড়িতেন, তাহা ইতিহাসে লেখে না। লোকে জানিত, তিনি কেবল ইংরেজীভাষায় পরমতত্ত্ব লাভ করিতেছেন। তবে শ্রীরামদাসের তাৎকালিক জীবনের একটা মহাঘটনা দেশীয়দের স্মৃতিপথে আজও অঙ্কিত আছে। বিদ্যাশিক্ষার চতুর্থ বৎসরে শ্রীরাম কলিকাতা হইতে পিতাকে পত্র লেখেন,—"আপনি ডাকের পত্রে, বা অপর কোন পত্রে শ্রীরামদাস ঘোষাল, এইরূপ শিরানামা লিখিবেন না! শুধু, শ্রীরামচন্দ্র ঘোষাল লিখিলেই যথেষ্ট হইবে। কলেজের বড় সাহেবের অনুমতি অনুসারে কলেজে আমার ঐ নামই প্রচলিত হইয়াছে।" নরহরি পত্র পাইয়া ভাবিলেন,—"হঠাৎ সাহেব ছেলের আমার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া দিল কেন? বুঝি ইংরেজীশিক্ষার এইরূপই নিয়ম হইবে!"

এদিকে তখন শ্রীরামকে লইয়া একটা বিভীষণ হৈ হৈ পড়িয়া গিয়াছিল। দূরে, অদূরে, কাছে, সম্মুখে, যেমন অবস্থাতেই হউক, শ্রীরামচন্দ্র নয়নপথের পথিক হইলেই, ছাত্রগণ অমনি রামায়ণের সুরে গাইয়া উঠিত,—

শ্রীরামের দাস আমি অঞ্জনানন্দন।
ল্যাজ-সাটে কাঁপে মোর এ তিনভুবন॥

ইহার পরই অন্য এক দল ছাত্র গাইত;—

ঘরেতে কৈশরী ছিল দুর্জ্জয় বানর।
না মেনে পবনা ধরে অঞ্জনার কর॥

আর এক দল গাইত;—

রামদাস নামে আমি বিদিত সংসার।
মুখটী পুড়িয়া দিলে রাবণ লঙ্কার॥

বালকগণ এই সকল কথা বলিতে না বলিতে, শ্রীরামের মন-আগুন একেবারে ধূ ধূ জ্বলিয়া উঠিত; রাগে ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দে নিশ্বাসবায়ু বহিত। ছিন্নকণ্ঠ কপোতকে ধড়ফড় করিতে দেখিয়াছি, উত্তপ্ত তৈলে খল্সে মাছের ছটফটানি দেখিয়াছি, ঘূর্ণীবায়ুর বিষম

বিক্রম দেখিয়াছি, পদ্মা নদীতে প্রবল জলের প্রলয়-পাক দেখিয়াছি, কিন্তু এমনটা কখনও দেখি নাই,—শ্রীরামের তদবস্থার সেই অলৌকিক প্রক্রিয়া কখনও দেখি নাই। রেগে চোখ কপালে তুলে, দাঁত কিড়িমিড়ি করে, শ্রীরাম যে কোন্ দিকে ছুটোছুটি করিয়া, কোন্ পথ দিয়া, তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে, নিরপেক্ষ দর্শকমণ্ডলী তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিত না। সে লম্ফ, ঝম্প, দম্ফ, কম্প; সে অগ্রগমন, সে নরদৌড়ন, সে বিদ্যুদ্বেগে পথ-পরিবর্তন, সে মৌখিক গভীর গর্জ্জন,—সেই কলিকালের মহাকুরুক্ষেত্র,—বর্ণনার জিনিস নহে, অনুভূত হইবারও উপাদান নহে, কেবল স্বচক্ষে ফ্যাল্ ফ্যাল্ দেখিবার সামগ্রী। শ্রীরাম দৌড়িবার কালে উচ্চরবে বলিতেন, "শ্যালারা, জানিস্ না বুঝি, এখনি এক চড়ে, মেরে গুঁড়ো করে ফেলবো—" বালকগণ "ধল্লেরে ধল্লেরে" বলিয়া দৌড়িয়া পলাইত। শ্রীরাম বলিতেন, "শ্যালারা পালালি কেন? একবার দাঁড়িয়ে থেকে মজা দেখ্‌তে পাল্লি না—" বালকগণের ত মারামারি করা ইচ্ছা নয়, কেবল শ্রীরামকে রাগাইয়া উন্মত্তপ্রায় করাই তাহাদের একমাত্র অভিলাষ। বালকগণের পলায়ন দেখিয়া শ্রীরাম ভাবিতেন, তিনি অদ্বিতীয় বীরপুরুষ, তাঁহার ভয়ে সকলে রণে ভঙ্গ দিল। এই ভাবিয়া "শ্যালার শ্যালারা" রবে তাহাদের পিছু পিছু ছুটিতেন। তাহারা দৌড়িয়া আরও খানিক দূরে গিয়া, আবার সেই অনির্ব্বচনীয় কবিতা আবৃত্তি করিত। যে সকল ছোট ছোট ছেলে দ্রুত দৌড়িতে পারিত না;—ভাল মন্দ কিছুই বুঝিত না, দলে থাকিয়া কেবল হাসির সময় হাসিত, গোলের সময় গোল করিত,—শ্রীরাম তাহাদিগকে সম্মুখে পাইয়া, উত্তম মধ্যম প্রহার করিতেন।

ক্রমে উভয় পক্ষেই অত্যাচারের বৃদ্ধি হইল। শ্রীরাম একদিন চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে, ক্রন্দনের উচ্চরব তুলিয়া কলেজের বড় সাহেবের পায়ে ধরিয়া বলিলেন,—"আমাকে রক্ষা করুন, আমি মারা যাই; সকলে একযোট হয়ে, আমাকে মেরে ফেল্লে।" বড় সাহেব অতিদয়ালু, অমায়িক লোক,—শ্রীরামের কান্না দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল। কিন্তু একটা বড় বিপদ্ ঘটিল, শ্রীরামের কি হইয়াছে, কেন সে কাঁদিতেছে, তাহার কিছুই তিনি বুঝিতে পারিলেন না। সাহেব যতই জিজ্ঞাসেন, "শ্রীরাম কি হয়েছে?" শ্রীরামের কান্নার সঙ্গেই কথা জড়াইয়া যায়। "অ্যাঁ অ্যাঁ! ঐ ওরা বলে, 'ঘরেতে কেশরী ছিল'—অ্যাঁ অ্যাঁ"—অমনি চক্ষু ফাটিয়া, গণ্ডস্থল

বহিয়া, বক্ষ ঝরিয়া, শ্রীরামের জল পড়িতে থাকে। সাহেব ত এক ঘণ্টায় কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সেদিন বাপু-বাছা করিয়া, গায়ে হাত বুলাইয়া তিনি শ্রীরামকে বাসায় পাঠাইয়া দিলেন। তিন চারি দিন তদারকের পর, একজন বাঙ্গালী শিক্ষকের সাহায্যে, অবশেষে সাহেব প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কয়েকটী বালকের ১০৲ টাকা করিয়া জরিমানা করেন। এইরূপ প্রকাশ ছিল যে, শ্রীরামই গোপনে ঐ জরিমানার টাকা বালকগণকেই প্রদান করিয়াছেন! এমন কথাও প্রকাশ হইয়াছিল, বালকগণ গোপনে শ্রীরামকে ভয় দেখাইয়াছিল,—"যদি তুমি আমাদের জরিমানার টাকা না দাও, তাহা হইলে আমরা প্রত্যহ রাত্রি দশটার পর আসিয়া তোমার বাটীর ধারে দাঁড়াইয়া, ঐ আসল রামায়ণ আবৃত্তি করিব।" শেষে এ কথাও প্রকাশ হইয়া পড়িল, শ্রীরাম গোপনে একদিন সর্ব্বসমক্ষে বলিয়াছিলেন,—"আমি উহাদিগকে ভয়ে টাকা দিই নাই; বন্ধুতার অনুরোধে পরোপকার জন্য ঐ টাকা দিয়াছিলাম।"

যাহা হউক, এই গোলযোগের অব্যবহিত পরে শ্রীরাম একদিন প্রিয়বয়স্যগণের পরামর্শে কলেজের বড় সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিলেন, "আমার নাম শ্রীশ্রীরামদাস ঘোষাল নহে, আমি কেবল, রামচন্দ্র ঘোষাল। অতএব রেজেষ্টরি খাতায় আমার সাবেক নাম কাটিয়া, হালের নামটী যেন লেখা হয় এবং সকলে আমাকে যেন আজ হইতে রামচন্দ্র ঘোষাল বলিয়া ডাকে।" সাহেব দরখাস্ত পড়িয়া তথাস্তু বলিয়া হুকুম দিলেন। সর্ব্ব-গোলযোগ কাটিয়া গেল। পৃথিবী নীরব হইল। এতদিনের রামদাস, রামচন্দ্র হইলেন। দারবিণের ইভোলিউসন-থিওরি সফল হইল এবং লোকে যে তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে "ছিরাম ছিরাম' বলিয়া খেপাইত, তাহাও ঘুচিল। এই নিমিত্তই শ্রীরাম, বিষ্ণু! রামচন্দ্র পিতাকে লিখিয়াছিলেন, পত্রের শিরোনামায় যেন তাঁহার নাম রামচন্দ্র ঘোষাল লিখিত হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দূর হউক, বাজে কথা। এখনও অনেক আসল কথা বাকি। রামচন্দ্র বার বৎসর কাল কলিকাতায় ইংরেজী পড়েন। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ শিক্ষাদীক্ষাও পাইয়াছিলেন; "উনবিংশ শতাব্দীর" সেই সবে সূত্রপাত; সুতরাং সদ্বংশ, সদালাপ, সুনীতি, সুরুচি; এসবের কতকটা তিনি আভাসও পাইয়াছিলেন। কেমন করিয়া ইংরেজীতে বক্তৃতা করিতে হয়, তাহাও তিনি একটু আধটু শিখিয়াছিলেন।

পল্লীগ্রামে নামডাক উঠিল, রামচন্দ্র লেখাপড়ায় অদ্বিতীয় হইয়াছেন; জ্ঞান এবং বিদ্যাবুদ্ধিতে তাঁর যুড়ি মেলে না। পিতা মাতা আশা করিতে লাগিলেন, কোম্পানী ডাকিয়া লইয়া গিয়া রামচন্দ্রকে কবে রাজতক্তে বসায় আর কি! কিন্তু আজকাল করিয়া প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল, তথাচ রাম রাজপাটে বসিলেন না।

পুত্র রামচন্দ্র, পূজার সময় বাটীতে আসিলে, পিতা নরহরি, রাজতক্ত-সম্বন্ধে অনেক কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। পুত্র প্রায় এক প্রহরকাল ধরিয়া পিতার কথার উত্তর দেন। সেই ইংরেজী ধরণের উত্তর, সেই ইংরেজীর বুকুনি মিশানো কথা, পিতা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। নরহরির বুদ্ধিহীনতা দেখিয়া রামচন্দ্রের কিঞ্চিৎ দুঃখ হইল; তিনি মনে মনে বলিলেন, "হায়! হায়! কি আপশোষ, নরহরি কি আহাম্মক! অদ্য আমার জ্ঞানের পরিচয় পাইবার জন্য তাহাকে ঈশ্বর এক সুবিধা দিয়াছিলেন, কিন্তু নরহরির দুরদৃষ্ট বশত, সে (নরহরি) আজও আপনাকে সুখী করিতে পারিল না। এই সমাজনীতি-মিশ্রিত রাজনীতির কথাগুলি কি আমার অদ্য বৃথাই গেল? বেণাবনে কি মুক্তা ছড়াইলাম?" ফল কথা, ইংরেজী-বিদ্যার সাহায্যে, রামচন্দ্রের দিব্য জ্ঞান জন্মিয়াছিল। তাঁহার মতে, "পিতা-জাতীয় লোকগুলা স্বভাবত মোটাবুদ্ধি। অনুদারচিত্তে তাহারা কেবল টাকা রোজগারের চেষ্টা পায়, খায় দায়, থাকে তাহারা সমাজতত্ত্ব জানে না, রাজনীতির গূঢ় মর্ম্ম বুঝে না, কেবল পেট

ভরিলেই পৌষ মাস। বিশেষ, তাঁহার নিজ পিতা ত অতি বোকা। জমিদারীর মুনফাটী, কড়ায় গণ্ডায় আদায় করা ছাড়া, এ সংসারে সে আর কিছুই বুঝে না। এ ঘোরতর রাজনীতির আন্দোলন কালে, এ সমাজবিপ্লব সময়ে, রামচন্দ্রের কলিকাতার বাসাখরচ যে মাসিক ৫০৲ টাকায় কুলায় না, তাহা কি সে বুঝিতে পারে? নরহরির তেমন হেড কৈ, তেমন প্রতিভা কৈ?"

রামচন্দ্র অগত্যা সেই রাজভক্ত-সম্বন্ধিনী কথা, নরহরিকে আবার অনর্গল বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। নরহরি এবার অগত্যা সে' কথার এইরূপ ভাব বুঝিলেন, চাকুরি করা,—পরাধীনতা, দাসত্ব। রামচন্দ্র এ ধরাধামে কাহারও তোষামোদ করিবেন না, স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবেন। "মনে করিলেই অদ্যই আমার চাকুরি হইতে পারে। একটু মুখের কথা খসানর অপেক্ষামাত্র! গবর্ণর সাহেবের এই একটা ভয় হইয়াছে; তিনি আমার কাছে চাকুরির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলে, পাছে আমি চাকুরি না লইয়া তাঁহার অপমান করি। গবর্ণের ইচ্ছা, আমি অগ্রে তাঁহাকে চাকুরির কথা বলি। কিন্তু প্রাণ থাকিতে তাহা আমি পারিব না। এতদিনের পরিশ্রমলব্ধ, প্রতিভা-অর্জ্জিত লেখাপড়াটা কি এক দিনে এক মুহূর্ত্তে মাটী করিব?"

পিতা অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া, ধীরভাবে পুত্রকে বলিলেন, "তুমি যদি গবর্ণর সাহেবকে না বল, আমি ত বলিতে পারি। আমার সঙ্গে ত তাঁর কতকটা জানা শুনা আছে।"

পুত্র। (উচ্চরবে)—"তা হবে না, তা হবে না, তাতে আরও অপমান।"

পিতা। আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এমন করে বোলবো যে, তাতে তোমার কিছুই অপমান হবে না। সাহেবকে খুসি করে ছেড়ে দিব।

রামচন্দ্র অস্ফুটস্বরে এই ভাবে বলিলেন, "কি অনুদারতা, সঙ্কীর্ণতা, পরমুখ-প্রেক্ষিতা!"

নরহরির সঙ্গে ও-অঞ্চলের অনেক সাহেবসুবোর আলাপ পরিচয় ছিল। দরবারে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইত। নরহরি জমীদার,—নগদ টাকাও অনেক। সাহেবেরা তাঁহার বড় খাতির করিতেন; তিনিও সাধ্যপক্ষে যথানিয়মে তাঁহাদের মন যোগাইতেন। ভারতীয় লোকের কষ্ট হইলে অথবা পৃথিবীর অপর প্রদেশীয় কোন জাতির দুর্গতি ঘটিলে,

সাহেবগণের চোখ দিয়া যখন জল পড়িত, তখন দপ্তরীসম্প্রদায় চাঁদার খাতা তৈয়ারি করিতে বিব্রত থাকিত। খাতা প্রস্তুত হইলে, স্থানীয় সাহেব সর্ব্ব অগ্রে, সম্মানপুরঃসর তাহা নরহরির নিকট পাঠাইয়া এইরূপ পত্র লিখিতেন, "মাই ডিয়ার নরহরি! আপনি আদর্শ জমীদার, আপনার দস্তখত দেখিয়া, সকলে দস্তখত করিবে, তাই প্রথমেই আপনার কাছে খাতা পাঠান হইল।" নরহরি ভাবিতেন, "ইংরেজরাজ্যে বাস করিতে হইলেই, সময়ে সময়ে এইরূপ টেক্স দিতেই হইবে, সংসারধর্ম্মের ইহা এক রকম নিত্য-নৈমিত্তিক খরচ।" সুতরাং তিনি তাহাতে অকাতরে সই করিতেন। দুই শত টাকার কম তাঁহার দস্তখত ছিল না। সাহেবগণ এই নিমিত্ত তাঁহার উপর বড়ই সদয় ছিলেন এবং এই অনুগ্রহের ফলস্বরূপ তিনিও শেষে রায়বাহাদুর উপাধি পান। বলা বাহুল্য, মূর্খনরহরির চেষ্টায় পণ্ডিত-রামচন্দ্র অবশেষে ডেপুটী মাজিষ্টর হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রামচন্দ্র ডেপুটী হইয়া প্রথম চারি বৎসর কাল বনে বনে ভ্রমণ করিলেন। কখন জলপাইগুড়ি, কখন রাঁচি, কখন বালেশ্বর—বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্ব্বত, নদনদী কিছুই তিনি বাকি রাখিলেন না। ডেপুটী বাবু যেন চর্‌কী ক্রমে ঘুরিতে লাগিলেন। পিতা নরহরির মন, ইহাতে শান্তি লাভ করিল না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এ কি রকম চাকুরি হইল? ছেলে যে এক স্থানে সুস্থির হইয়া বসিতে পায় না। কিন্তু ছেলে ওদিকে নিজগুণে সময়ের কেবল সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তিনি যেমন কেন অনুর্ব্বর-ক্ষেত্রে পতিত হউন না, তাঁহার শুভাগমনে, সে দেশ অমনি ফলফুলে সুশোভিত হইত। তথায় যাইয়া সর্ব্বাগ্রে একটী বালিকাবিদ্যালয় খুলিতেন এবং তাহার সম্পাদকীয় গুরুভার নিজ কোমল কাঁধে গ্রহণ করিতেন। একটী সভাও স্থাপিত হইত। সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল,—এখানে রাজনীতি এবং ধর্ম্ম বিষয়ে কোন বক্তৃতা হইবে না। সেই সভার সর্ব্ব-অধিবেশনেই তিনি স্বয়ং সভাপতিরূপে বরিত হইতেন।

তথায় স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-অধিকার, স্ত্রী-স্বাধীনতা, মদ্যপান, ভ্রাতৃভাব, স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি বিবিধ-বিষয়িণী বক্তৃতা হইত। , বস্তুত, সে মরুময় দেশে তাঁহার অনুগ্রহ-দৃষ্টিতে আশাবৈতরণী নদীর স্রোত বহিত, শুকান কাঠ মঞ্জরিত, বন্ধ্যা গাছে ফল ধরিত,—দেশ উন্নতির চরম মার্গে উঠিত।

মধ্যে মধ্যে রামচন্দ্র পিতাকে পত্র লিখিতেন, আমার এ উচ্চপদে প্রকৃত অনুষ্ঠানের সহিত থাকিতে হইলে, মাসিক দুই শত টাকায় কুলায় না। নরহরি বিব্রত হইলেন। যে সাহেবকে ধরিয়া পুত্রের ডেপুটীপদপ্রাপ্তি হইয়াছিল, আবার তিনি সেই সাহেবকে গিয়া ধরিলেন। পুত্রের কিছু বেতন বৃদ্ধি এবং একটী ভাল যায়গায় বদলী করা,—সাহেবের নিকট নরহরির এই দুই প্রার্থনা ছিল। নরহরির নানাগুণে সাহেব চিরবশীভূত ছিলেন। প্রার্থনা তৎক্ষণাৎ মঞ্জুর হইল। কিন্তু সাহেব শেষে বলিয়া দিলেন, "তোমার ছেলেকে সাবধানে কাজ-কর্ম্ম করিতে বলিবে; এবং মধ্যে মধ্যে আমার সহিত দেখা করিতে বলিবে। ছয়মাস মধ্যে বেতন বাড়িবে।"

পণ্ডিত-রামচন্দ্র, মূর্খ পিতার চেষ্টায় হুগলীতে বদলি হইলেন। পাঁচ বৎসর অজ্ঞাতবাসের পর রামচন্দ্র যেন স্বদেশে আসিলেন, খনির তিমির-গর্ভ হইতে রত্নখানি পৃথিবীর উপরে উঠিয়া যেন হাসিতে লাগিল; সমুদ্র-মন্থনে যেন উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়া, নিবিড় পাতাল-প্রদেশ হইতে ধরাধামে উত্থিত হইল; অথবা গোপিনীমনোমোহন, রাধাবিনোদন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যেন বিষময় পাঁকময় কালিয় হ্রদ হইতে, কালিয় দমনপূর্ব্বক পাড়ে উঠিলেন; অথবা যেন মহাকবি দ্বৈপায়ন, কুজ্ঝটিকার অন্তরালে জন্ম গ্রহণ করিয়া, রোদ উঠিলে, লোকসমাজে দেখা দিলেন; অথবা পৃথিবীপতি রাজা দুর্য্যোধন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে হ্রদমধ্যে লুকাইবার পর, ভীমের বাক্যে আবার যেন ডাঙ্গায় উঠিয়া গা ঝাড়িলেন;—(আপনারা সকলে অনুমতি করেন ত, এইরূপ খানিক বর্ণন করিয়া যাই। আমার মন-টিয়াপাখী ডাকিয়া উঠিয়াছে। আঙ্গুলের ডগ সুড়সুড় করিতেছে. কলমরূপ মহা অশ্বের লাগাম টানিয়া রাখিতে পারিতেছি না—কুপথ বিপথ ভেদ করিয়া পাহাড়-জঙ্গলের উপর দিয়া, নদনদী সাঁতার কাটিয়া তেজস্বী কলম-ঘোড়া কোন স্বর্গপানে ছুটিয়াছে, তাহার কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না। এমন সুবিধা, এমন আসর আর পাইব না। এই ক্ষেত্রেই আমি মহা

ঔপন্যাসিক বলিয়া পরিচিত হইতে পারিব—একবার অনুমতি দিন।—না দেন, নাই না দিলেন; জগৎ অদ্য এক মহা কৌস্তুভমণি হারাইল, তাতে আমার ক্ষতি কি?)

রামচন্দ্র হুগলীতে আসিয়া বলিলেন, এইবার নিজের এলিমেণ্টে আসিলাম, উপযুক্ত ব্যক্তি উপযুক্ত স্থানই পাইলেন। এইবার কর্ম্মক্ষেত্রের অধিক প্রসর পাইব। দেশের উন্নতি করিয়া এইবার মনের সুখ হইবে। এতদিন কেবল কাদা ঘেঁটে বেড়াইতেছিলাম, মাছ ধরিতে পারি নাই।

রামচন্দ্র, গঙ্গার ধারে জাঁকালো-গোছ বাসা ভাড়া লইলেন। মাতর্গঙ্গে! উনবিংশ শতাব্দীর "শিক্ষিত-লেখকগণ" তোমাকে কুলকুল-নাদিনী বিশেষণে কেবল বিশেষিত করেন। মা! কুল-কুল-কুল-কুল রব ছাড়া কি আর তোমার কোন গুণ নাই? তোমার গর্ভস্থ বড়লোকের বড় বাড়ীর বড় পোস্তায় থপাস থপাস্ শব্দে তরঙ্গাঘাত ছাড়া, কি তোমার কোন কাজ নাই? বাইজী লইয়া, বন্ধু লইয়া, মদ লইয়া, মাংস লইয়া তোমার বক্ষে বৈকালে সখের পানসী ভাসানো ভিন্ন কি বাবুগণ আর কোন আমোদ পান না? শৈলসুতে, ধূর্জ্জটিজটা-বিভূষিতে, জহ্নুকন্যে, প্রসন্ন-পুণ্যসলিলে, ঈশ্বরি!—আমি মূঢ়মতি মূর্খ, অকিঞ্চন,—তোমার মহিমা আমি কি বুঝিব? কিন্তু শিক্ষিত ডেপুটী-রামচন্দ্র, বন্ধুগণকে বলিতেন,—"গ্যাঞ্জেস্ বড়ই বাহারে নদী, জলস্রোতের শব্দটাও বেশ, জ্যোৎস্না রাত্রে নৌকা করে বেড়াতেও খুব মজা।" বন্ধুগণ অবশ্যই একবাক্যে উত্তর করিতেন,—"অতি ঠিক কথা! কিছু পয়সা না থাকিলে, গঙ্গার ধারে এরূপ বাড়ী লওয়া বৃথা। আপনার মত লোকের পক্ষেই এরূপ অট্টালিকা এবং গঙ্গা একমাত্র উপযুক্ত। শুনিয়াছি, বিলাতের টেম্‌স নদী অপেক্ষাও গঙ্গানদী ভাল।"

রামচন্দ্র। তাও কি কখন হয়? ইণ্ডিয়ার নদীর সঙ্গে কি ইংলণ্ডের নদীর তুলনা সম্ভবে? আহা! টেম্‌সের কি অনির্ব্বচনীয় ভাব! উপরে কত শত পল, নীচে রেলপথ! অমন নদী কি আর জন্মে?

তখন অধিকাংশ-বন্ধু, তাঁহার মতে মত দিয়া বলিত, "তা ত হবেই, এদেশী নদী-গুলো কি আর নদী? না আছে একখানা পারাপারের ষ্টীমার, না আছে একটা পুল!

ঘোলা হয় যে, মুখে করে কার সাধ্য? শীতকালে জলটা বরফের মত এত ঠাণ্ডা যে, স্নানের সময় ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়িতে হয়। গঙ্গাজলে সুখটা কি, এবং ওতে আছেই বা কি? মড়া ভাসে,—কুকুর-শেয়াল-গরু মরে ভেসে যায়, মড়া পোড়ান ছাইগুলো যেয়ে জলে মেশে, আর সহরের যত ময়লা সবই ঐ জলে! ছি! ও-জল কি খেতে আছে, না উহাতে স্নান করিতে আছে?”

রামচন্দ্র। তা বটে। তবে কি না, এক জায়গায় অনেকটা জল সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাই পরম লাভ।

বন্ধু। হায়, হায়, হায়! আপনি মনে করেছেন, বার মাসই গঙ্গার জল আপনার ঐ পোস্তায় এসে লাগবে? এ ভাদ্দর মাস, ভরা গাঙ, তাই এখন আপনার বারান্দার গায়ে জল!—এর পর, কোথায় বা জল, আর কোথায় বা বারান্দা!—চৈত্র মাসে গঙ্গাটী ঠিক্ হাড়গোড়-ভাঙ্গা দ হয়ে উঠ্‌বে,—দেখ্‌লে আপনার ঘৃণা হবে।

রামচন্দ্র। বলেন কি? বার মাস এমন ভাবে কি জল থাকবে না?

বন্ধু। আরে রাম! গঙ্গা আর ক দিন? হুগলী কালেজের সম্মুখে একটা চড়া পড়েছে, দেখেন নাই? গঙ্গা আর ২৫ বছর বৈ ত নয়?

হুগলী আসিয়া, প্রতিবেশী বন্ধুবর্গের সহিত আলাপে কয়েকদিনের মধ্যেই রামচন্দ্র গঙ্গামাহাত্ম্য বিলক্ষণ বুঝিয়া লইলেন। তবে কি না, তিনি নিতান্ত পরোপকারী এবং দয়ালু, তাই অনুগ্রহ করিয়া গঙ্গাতীরে বাস করিতে লাগিলেন

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের মহাধূম। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্রই কেশব বাবুর নাম। ঘরে, বাহিরে, হাটে, মাঠে, রেলগাড়ীতে, বিয়ে-বাড়ীতে—যেখানে যাই, সেইখানেই কেশব বাবুর কথা! কালী, দুর্গা কিছু নয়; শিব, কৃষ্ণ কেহ নয়; দুর্গোৎসবটা কুসংস্কার; কালীপুজাটা পৈশাচিক প্রক্রিয়া; শ্রীকৃষ্ণ ননীচোরা—গোপিনী-কুলললনার কুল-কলঙ্ক।—চারিদিকে ইত্যাকার ধ্বনি উঠিল। বিবাহের মন্ত্র নাই,

বামুনদের কেবল ওটা বুজ্‌রুকি!—আইনমত রেজেষ্টরী না হইলে, বিবাহ পাকা হয় না। পৈতাগাছটা, মানবদেহের ভারমাত্র! গাছে তুলা হয়, সেই তূলা পিঁজে সূতা হয়, সেই সূতাসমষ্টি একত্র করে, পাক দিয়া পৈতা হয়—সে পৈতার আবার মাহাত্ম্য কি? নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণগণ সেই দড়ীগাছটা—এক তিল বিশ্রাম নাই, দিন রাতই গলায় দিয়া রাখে! ব্রাহ্মণের এই চির-গলায়-দড়ী কেবল এই অসভ্য কুসংস্কারাপন্ন ভারতেই সম্ভবে! অতএব ফেলো পৈতা! শালগ্রাম-বিগ্রহগুলি, ভাদ্রমাসের একটানা গাঙে, ভাটার সময় ফেলিয়া দাও,—যেন বঙ্গোপসাগর পার হইয়া, গড়াইতে গড়াইতে সেগুলি মাদাগাস্কার দ্বীপে গিয়া ঠেকে! জাতিভেদ বন্ধ হইয়া যাক্। হাড়ী, ডোম, চণ্ডালের সহিত ব্রাহ্মণের পার্থক্য না থাকে। যার যাকে ইচ্ছা, সে তাকে বিবাহ করুক,—উচ্চ নীচ ভেদ নাই। যার যেরূপ ইচ্ছা, সে সেইরূপ পরের উচ্ছিষ্ট খাউক—মুসলমান, ম্লেচ্ছ, মুদ্দফরাস বিচার নাই। জলচর, স্থলচর, উভচর, খেচর—চরাচরে যতপ্রকার জীব আছে, সমস্তই মনুষ্যের আহার্য্য। এটা খেতে আছে, ওটা খেতে নাই, ইহাকে বিবাহ করিতে আছে, উহাকে বিবাহ করিতে নাই,—হিন্দুগণের এইরূপ কুসংস্কারেই ভারত মাটী হইয়াছে। রেলওয়ে-কেরাণিগণ, এইবার আশা করিল, কেশব বাবুর নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনে, ভারত নিশ্চয় উদ্ধার হইবে। অনেক স্কুলের বালক আশা করিল, মুসলমানের দোকানের পাঁউরুটী আর লুকাইয়া কিনিতে হইবে না। কোন কোন কুলমহিলা আশায় বুক বাঁধিলেন, এইবার তাহারা প্রকাশ্যে ফাউলকারী রাঁধিবেন। অধিকাংশ নীতিজ্ঞ রোচিক পুরুষ বুঝিলেন, এইবার স্ত্রীজাতির উন্নতি বা উর্দ্ধগতি হইবে, গৃহস্থের মেয়ে স্বাধীনতা পাইবে, বেশ্যার দমন হইবে!

ডেপুটী রামচন্দ্র এ সুযোগ ছাড়িলেন না। কেশব বাবুর নামে স্বতই তাঁহার হৃদয় গলিতে লাগিল। তিনি সকলের সম্মুখে বলিতেন, "আহা! অমন লোক আর হবে না, তিনি মহাপুরুষ! কর্ত্তা ঈশ্বরের অবতার!" প্রতি শনিবার কাছারির কার্য্যশেষে রামচন্দ্র কলিকাতায় কেশব বাবুর নিকট গমন করিতেন। সমস্ত রবিবার কেশব বাবুর সঙ্গে উপাসনাদি করিয়া, সোমবারে কাছারির সময় হুগলী পৌঁছিতেন। এইরূপ কয়েক মাস কলিকাতা আনাগোনা করিয়া, রামচন্দ্র কেশব বাবুর ধর্ম্মের সারভাগটুকু ছাঁকিয়া বাহির করিয়া লইলেন। প্রকৃতপক্ষে রামচন্দ্র একটী ধর্ম্ম-হাঁস। তরঙ্গ-বিক্ষোভিত,

অগাধ ধর্ম্ম-দুগ্ধের আটলাণ্টিক-ওসেন হইতে তিনি সকল ক্ষীরটুকুই গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধিক আর কি বলিব, বঙ্গে। মহাকবি হেম বাবুর মত তিনি ধর্ম্ম-নবনীর সরটুকুও অতি-মিহি ন্যাকড়ায় ছাঁকিয়া লইলেন। সেই সারের সার, অতিসার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, রামচন্দ্র অনন্যমনে, হুগলীতে তাহার প্রক্রিয়া আরম্ভ করিলেন,—ধর্ম্ম-সৌরভে হুগলী আমোদিতা হইল। সেই কুল-কুলনাদ বিশেষণে বিশেষিতা গঙ্গানদী সেই অতি-সার ধর্ম্মের সুগন্ধ ভাসাইয়া জলপথে দিগ্‌দিগন্তে লইয়া গেল; জগৎ-প্রাণ অনিল, ব্যোমপথে সেই মহাগন্ধ, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামনিচয়ে পৌঁছাইয়া দিল; আর স্বয়ং রামচন্দ্র স্থলপথে প্রতিবেশী-মণ্ডলীর ঘরে ঘরে তাহা বহন করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ডেপুটী বাবু আজ নেহাইত নূতন ব্রাহ্ম নহেন; অনেকদিন হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের গন্ধটুকু তাঁহার নাকে গিয়াছিল। কলিকাতায় পঠদ্দশায় যখন তাঁহার "রামদাস" নাম ছিল, তখন তিনি মধ্যে মধ্যে অতর্কিত-ভাবে এক আধটা সমাজে যাতায়াত করিতেন; চোখ বুজিবার সময় চোখ বুজিতেন; কিন্তু কেবল আঁধার দেখিতেন। সুখ বা মজা কিছুই পাইতেন না। তখন ব্রাহ্মধর্ম্মের তত রগড় উঠে নাই; ধূমধামও থাকে নাই। ধর্ম্মের প্রাণ যে বক্তৃতা, গান, বাজনা, মেয়েমানুষ,—তখন সুব্যক্ত ভাবে এসব কিছুই ছিল না। ছিল কেবল, স্তিমিত নয়নযুগ্ম; কাজেই তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাল লাগে নাই। নিরামিষ চোখ বুজিয়া বিরক্ত হইয়া, কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি এ ধর্ম্মব্রত ত্যাগ করিলেন। ছাড়িলেন বটে, কিন্তু ঝোঁক একটু যেন রহিল। ব্রাহ্মধর্ম্মই হউক, বা কোন নবীনা রমণীই হউক,—কাহারও সহিত গুপ্তপ্রণয়-আলাপ করিতে গিয়া, বিফল-মনোরথ হইলেই যে, হঠাৎ পূর্ব্ব আসক্তি একেবারে লোপ হয়, তা নয়। রামচন্দ্র ডেপুটীপদ পাইলেও, ব্রাহ্মস্মৃতি-মধু তাঁহার হৃদয়-কমলে সঞ্চিত ছিল। কোন মজলিসে, বৈঠকে বা খোস-আলাপে ব্রাহ্মকথা উত্থিত হইলে, তিনিতৎসম্বন্ধে দুটা কথা গাহিয়া

দিতেন। কখন বা প্রভাতকালে, নির্জ্জনে, আপন মনে এই মধুর-রসাত্মক সুললিত ব্রাহ্মগীতিটী গাইতেন ;—

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

কত আর নিদ্রা যাও ভারত-সন্ততিগণ।
নয়ন খুলিয়ে দেখ, শুভ-উষা আগমন।
অধীনতা-অন্ধকার, ত্রাপ তাপ দুর্নিবার,
মঙ্গল-জলধি-জলে হতেছে চির মগন।
সযতনে ধীরে ধীরে, প্রাতঃসমীরণ-স্বরে,
ডাকেন ভারত-মাতা পরি' উজ্জ্বল বসন ;
উঠ বৎস প্রাণসম, যত পুত্র কন্যা মম,
কাল রাত্রি অবসানে উদিল সুখ-তপন।
বিশাল বিশ্ব-মন্দিরে, সত্য-শাস্ত্র-শিরে ধ'রে,
বিশ্বাসেরে সার ক'রে, কর প্রীতির সাধন ;
নর নারী সমুদয়ে, এক পরিবার হয়ে,
পরব্রহ্মে পূজ তাঁরে, যা হতে পেলে এদিন।

কিন্তু হুগলী আসার পরই, ফুল ফুটিল ; এই সময় রামচন্দ্রের হঠাৎ প্রকৃতির পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। কলেবরটী, কে যেন নতন করিয়া গড়িয়া দিল। ইতিপূর্ব্বে তিনি উচ্চবংশ, উচ্চজাতি এবং উচ্চপদের অহঙ্কার করিতেন ; বলিতেন, ব্রাহ্মণের মধ্যে তিনি সর্ব্বপ্রধান কুলীন ; 'বেঙ্গল-আরিষ্টক্রাশীর' মধ্যে তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথম,—কৃষ্ণনগরে রাজগণ টাকা কর্জ্জের জন্য সদা তাঁহাদের দ্বারস্থ থাকিতেন ; এবং তাঁহার বর্ত্তমান পদটী যে সর্ব্বোচ্চ, তাহা ত ডেপুটী নামেই প্রকাশ। এই ত্রি-কারণনিবন্ধন তিনি সকল সময় সকলের সহিত কথা কহিতেন না, সকল সময় সকলকে চিনিতে পারিতেন না, সকল সময় সকলকে অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে বলিতেন না। তাঁহার গৃহের বৈঠকখানায় এক আসনেই তিন রকম ভাঁজ ছিল। প্রথমে মেজের উপর মাদুর পাতা ; তার উপর সতরঞ্চ ; সতরঞ্চটী মাদুর অপেক্ষা কিছু ছোট ; সুতরাং খানিকটা

মাদুর বাহির হইয়া থাকিত। যত বাজে লোক সেই বহিস্থ মাদুরে বসিত; সতরঞ্চের উপর সাদা ধপ্‌ধপে একখানি লঙ্ক্লথের চাদর—চাদরটী আকৃতিতে সতরঞ্চের ছোট। আর ঐ চাদরের উপর সাটিনের একটি শয্যা। তাহার দৈর্ঘ্য ৩॥০ হাত, প্রশস্ততা ২ হাত। উহাই ডেপুটী বাবুর বসিবার খাস আসন। কিন্তু আজকাল ডেপুটীবাবুর সে ভোগ আর নাই। অসভ্য পূর্ব্বপুরুষের সেই বনিয়াদি গদিয়ানি বিছানার পরিবর্ত্তে এখন তাঁহার বৈঠকখানা টেবিল, চেয়ার, কোচে পূর্ণ। তামাক খাইবার সট্‌কা ও হুকার বদলে চুরোট-পাইপ অধিষ্ঠিত। অধিক কি, ডেপুটী বাবুর নিজ সাজসজ্জারও ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। সে রেলপেড়ে ধূতি, সে শান্তিপুরে চাদর আর নাই। এখন ঘরে আটপৌরে পরেন—ঢিলে ইজার, আর ফুলো কামিজ। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহারা জ্ঞানের অধিক বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইল। কোন ভদ্র লোক নিকটে আসিলে, ইতিপূর্ব্বে তিনি নিজ মান-হানি আশঙ্কায়, তাঁহার সহিত হঠাৎ কথা কহিতেন না; আজ তিনি কিন্তু দূরে অদূরে লোক দেখিলেই যাচিয়া যাচিয়া কথা কহিতে লাগিলেন। যেমন কোন লোক হউক না, তাঁহার বাসায় গেলেই, তাহাকে "আসুন, আসুন, বসিতে আজ্ঞা হউক—" ইত্যাদি মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। সদাই তিনি মুখে এইরূপ বুলি ধরিলেন,—"সাম্য, সাম্য, সাম্য,—ঈশ্বরের সৃষ্ট মানুষ সব সমান,—পরম-পিতা পক্ষপাতী নহেন যে, তিনি ব্রাহ্মণ শূদ্র ভেদ করিয়াছেন—সকলেই এক—"

এই সময় একদিন গার্হস্থ্য নাপিত বাবুকে কামাইতে আসিল। বাবু অমনি তাহাকে আস্তে ব্যস্তে "আসুন আসুন, আপনি এইদিকে বসুন" ইত্যাদি কথা বলিয়াই নিজপার্শ্বস্থ চেয়ারখানি সরাইয়া দিলেন। তারপর "ক্ষুরাদি এই টেবিলের উপর রাখুন,—অনেক পথ চলিয়া আসিয়াছেন, একটু সুস্থির হউন, খানিক বিশ্রাম করিয়া শ্রান্তি দূর করুন—" নাপিতের উপর বাবুর মধুর সম্ভাষণ-রূপিণী এইরূপ বক্তৃতা একটানাই চলিতে লাগিল। নাপিত ত অবাক্। সে দুইমাস ছুটী লইয়া বাড়ী গিয়াছিল। দুই মাস মধ্যে ডেপুটী-বাবুর হঠাৎ এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া, সে যেন একেবারে হতবুদ্ধি হইল। পরিবর্ত্তন কি একটা? বাবুর বিছানায়, পোষাকে, চেহারায়, জ্ঞানে,—সর্ব্বত্রই বিসদৃশ ভাব! পরামাণিক পূর্ণমাত্রায় বিস্মিত এবং কতকটা ভীত হইয়া যোড়হাতে বলিল, "আমি গরীব, আপনার দোয়ারে দুটী অন্ন করে খাই—চাকরকে মাপ করুবেন।—"

ডেপুটী ও পরামাণিক।

ডেপুটী বাবু। চাকর কি? এ সংসারে চাকর কে কার? আমরা সকলেই সেই এক নিরাকার ঈশ্বরের সন্তান—আত্মপর কোন ভেদ নাই—সকলেই সহোদর ভাই—তোমাতে আমাতে কোন উচ্চনীচ সম্বন্ধ নাই—তুমি যদি আমাকে চাকর বল, তাহ'লে আমিও তোমার চাকর—এস ভাই, তবে তোমাকে একবার ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করি।—

নাপিত। বলেন্ কি, হুজুর!—আপনি মা বাপ, আপনি এমন কথা বল্‌লে আমি যাবো কোথায়—আপনি আমায় ক্ষমা করে, পায়ের ধূলা দিন—নইলে আমি পাপে পচে মর্‌বো,—

তখন নাপিত, সেই ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ডেপুটী বাবুর পায়ের ধূলা লইতে উদ্যত হইল।

বাবু। করো কি, করো কি? আমি কিসে তোমার চেয়ে বড়? কখনই না। তুমি আমার ধর্ম্মনষ্ট করিও না। আমার সমস্তই সমভাব, সমস্তই ভ্রাতৃভাব। তুমি আগে আমার পায়ের ধূলা দাও, তার পর তোমায় আমি পায়ের ধূলা দিতে পারি।

নাপিত, ভয়ে কাঁপিয়া উঠিয়া জিহ্বা কাটিল,—মুখে বলিল,—"শ্রীহরি, শ্রীহরি! মধুসূদন, মধুসূদন!—"

নাপিত তথাচ থামিল না। সে, ব্রাহ্মণডেপুটীবাবুর পদধূলি লইতে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাবু সবেগে চেয়ার হইতে উঠিয়া নাপিতের হাত ধরিয়া বলিলেন,—"ক্ষান্ত হও, এস, এস, বন্ধু এস, একবার ভ্রাতৃভাবে সমানে সমানে প্রেমালিঙ্গন করি—"

নাপিত তখন "গেলাম, মোলাম" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। এবং ভয়ে বিহ্বল হইয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে প্রকৃতই ভূতলে পড়িয়া গেল! মহাহুলস্থূল কাণ্ড। বাবুর পুরাণ ভৃত্যটী দৌড়িয়া আসিল। খানসামাটী জাতিতে সৎগোপ,—এবং বহুকাল ধরিয়া ঐ সংসারের চাকর। পুত্র—রামচন্দ্র যখন ডেপুটীপদ পাইয়া, দেশবিদেশ ভ্রমণে নিযুক্ত হইলেন, তখন পিতা—নরহরি ঐ বিশ্বাসী কার্য্যদক্ষ ভৃত্যটীকে রামচন্দ্রের সঙ্গে দেন। খানসামা হরিভক্ত লোক; তিলক কাটে, নামাবলী গায়ে দেয়, সদা হরিবোল হরিবোল করে। এ দোষ তার পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে। বাবু কিন্তু আজকাল খানসামাকে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন,—"তুমি নাকে ঐ সাদা পদার্থ মাখ কেন? মাথার মধ্যস্থলে, সমগ্র চুল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ লম্বা একগোছা চুল রাখ কেন?—ছি! ওগুলা বড়ই অসভ্যতার চিহ্ন।" প্রবীণ ভৃত্য প্রথম প্রথম বাবুর এসব কথায় কাণ দিত না,—শেষে বাড়াবাড়ি

দেখিয়া, মনে ভাবিল, বাবুর কোন একটা আন্তরিক রোগ জন্মিয়া থাকিবে। অদ্য এই নাপিত-ঘটিত ব্যাপার দেখিয়া মনে মনে বলিল,—“ওঃ—আজ বুঝি সেই রোগটা অধিক মাত্রায় চাগাড় দিয়াছে!—ক্রমে হলো কি? কর্ত্তা মোশাইকে. দেশে, একথা না বলে পাঠালে ত আর চলে না”—প্রকাশ্যে বলিল,—“বাবু, বাবু, কি হয়েছে, আপনি অমন করিতেছেন কেন?—”

খানসামাকে দেখিয়া নাপিত একটু সাহস পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, “আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমায় তুমি রক্ষা কর।”

বাবুও তখন গতিক বড় সুবিধা নয় দেখিয়া, চেয়ারে গিয়া বসিয়া বিশ্রামসুখ লাভ করিতে লাগিলেন। নাপিত ইত্যবসরে বাবুকে দূরে দেখিয়া, “দোহাই ধর্ম্ম, আমি কোন পাপের পাপী নহি” বলিয়া, ভাঁড় ফেলিয়া, বেগে, লম্ফ-ঝম্ফে তথা হইতে পলাইল। শুনা যায়, নাপিত, ভাট পাড়া হইতে বিধান আনিয়া নিজপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল। বলা বাহুল্য, সেই দিন হইতে সে আর ডেপুটী বাবুর বাসার ত্রিসীমানায় পদার্পণ করে নাই। তাহার আরও একটী বাতিক জন্মিল,—ভাল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত দেখিলেই সে এই কথা জিজ্ঞাসিত,—“কোন ব্রাহ্মণ আমার পায়ের ধূলা নিতে এসেছিলেন; তা আমি প্রায়শ্চিত্ত করেছি, দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ-ভোজনও করিয়েছি—গরীব মানুষ কোথা কি পাবো,—এতে আমার পাপ ক্ষেয়ানত হয়েছে ত?”

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চিন্তা-মগ্ন হইল—বাবুর খান্‌সামা। রোগ নিরাকরণের জন্য সে, তার পরদিনই লুকাইয়া খাঁচড়াপাড়ায় বৈদ্যবাড়ী গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ইত্যবসরে এক মহাসুবিধা ঘটিয়া গেল। যে ব্যক্তি ধর্ম্মকর্ম্মের প্রধান শত্রু ছিল, সে নিপাত হইল। যে অশিক্ষিত, অসভ্য, বর্ব্বর, বৃদ্ধ ব্যক্তি এত দিন ডেপুটীবাবুর পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, পিতৃকুলে কেবল কলঙ্ক লেপিতেছিল,—সেই নরহরে—সেই

ব্রাহ্মধর্ম্মটা স্বর্গে উঠিবার পাকা সিঁড়ি! ডেপুটী বাবু যেমন সেই সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দেন, অমনি সেই বুড়ো বাপ্‌টা ঠিক খেঁকি কুকুরের মত খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করিয়া বাবুকে কামড়াইতে আসিয়াছিল। কিন্তু পশুরাজ সিংহ, দুর্ব্বল কুকুরের কথা শুনিবেন কেন? সুতরাং পিতার নিষেধ সত্ত্বেও কেবল নিজগুণে রামচন্দ্র সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিয়া দাঁড়াইলেন। আবার যেমন তিনি দ্বিতীয় ধাপে উঠিবার উপক্রম করিলেন, সেই কুকুররূপী বাপ্‌টাও আবার খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ আরম্ভ করিল।

পিতাকে কুকুরের সঙ্গে তুলনা আমাদের নিজের নহে। একদিন ডেপুটী বাবু, তাঁহার গুরুদেবকে বলিয়াছিলেন "বাপ তো আমার হাড় জ্বালাইল, বিরক্ত করিয়া মারিল।" গুরুজী উত্তর দিলেন, 'Let the dog bark" অর্থাৎ "কুকুরকে খেউ খেউ করিতে দাও।"

কিন্তু অদ্য সেই নিরাকার ঈশ্বরের রাঙাপদের কৃপায়, শীঘ্রই ডেপুটী বাবুর অস্থি-যন্ত্রণা দূর হইল। চারিদিকে শান্তি, শান্তি, শান্তি! সুপ্রভাত, সুপ্রভাত, সুপ্রভাত! পিতার মৃত্যুসংবাদে তিনি প্রকৃতই হাতে হাতে স্বর্গ পাইলেন। যেদিন প্রাতে তিনি পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইলেন, সেইদিন তৎক্ষণাৎ কলিকাতাবাসী গুরুজীকে এইরূপ পত্র লিখিলেন,—"আর ভয় নাই। ঈশ্বর আমাদের সহায়। ধর্ম্মপথের কণ্টক ঘুচিয়াছে। যাহার জন্য এতদিন আমি হাড়েনাড়ে জ্বলিতেছিলাম, জীবন্মৃতবৎ ছিলাম, পরমব্রহ্মের করুণাকটাক্ষে, এতদিনে সে ব্যক্তি পরলোক গমন করিয়াছে। বিগত বুধবার জ্বররোগে নরহরির মৃত্যু হইয়াছে। পিতাটা অতিশয় পাপী ছিল—তাহার উদ্ধারের জন্য অনুতাপ আবশ্যক। কবে অনুতাপ করিতে হইবে, দিন স্থির করিয়া লিখিলেই, কালকাতা গিয়া আপনার সহিত একত্র অনুতাপ করিব।"

সপ্তাহকাল মধ্যে চারিদিকে রাষ্ট্র হইল, রামচন্দ্রের পিতার মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু কুসংস্কারাপন্ন হিন্দুর ন্যায় তিনি কাচা গলায় দিলেন না, খালি পায়ে বেড়াইলেন না, একবেলা হবিষ্যান্নও খাইলেন না;—কেবল সভ্যসমাজ-অনুমোদিত সুপ্রথা অবলম্বন করিলেন। একমাসকাল কালো কাপড় সর্ব্বদা পরিয়া রহিলেন এবং কালো কোটের উপর এক কালো রঙের ফিতা বসাইয়া দিলেন। উচ্চ-হৃদয়ের কি অপূর্ব্ব ভাব! পিতৃ-বিয়োগজনিত এক ফোঁটা জলও একদিন তাঁহার চোখ দিয়া পড়িল না।

প্রতিবেশী প্রিয়বন্ধুগণ পরস্পর বলাবলি করিল, "বাবুর মত এমন পবিত্র, স্বর্গীয় আত্মা ত কখনও দেখি নাই—পিতার মৃত্যু হইল, তথাচ তিনি একদিনও কাঁদিলেন না—তাঁহার চিত্ত কি মহান্।" নগেন নামক একটী ছোক্‌রা বি, এ, পাশ করিয়া হুগলী-কলেজে এম, এ, পড়িতেছিলেন,—তিনি সংস্কৃতে কবিতা আওড়াইয়া বলিলেন,—

"বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ॥"

এ সংবাদে কাঁদিল কেবল, সেই পুরাণ পৈতৃক খান্‌সামা। সে বেটা দিনে খায় না, রেতে ঘুমায় না, কেবল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। খান্‌সামা-চিত্তের এরূপ দৌর্ব্বল্য দেখিয়া, অনবরত ক্রন্দনধ্বনি—ঘ্যানঘ্যানানি শুনিয়া, রামচন্দ্র বড়ই বিরক্ত হইলেন। তিনি ভৃত্যকে বলিলেন,—"তুমি একবার বাড়ী যাও, সেখানে গিয়া শুধরাওগে, শোক-তাপ দূর করগে,—এখানে আর তোমার এখন থেকে কাজ নাই। প্রভুর কথায় ভৃত্য কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় হইল।

এইবার রামচন্দ্র নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ আরম্ভ করিলেন। প্রথমত, বাটী গিয়া, কৃপণ পিতার সিন্দুকে যে নগদ টাকার রাশি ছিল, তাহা হস্তগত করিলেন। গ্রামের লোক অনুমান করিত, বুড়ো নরহরির হাতে নগদ লক্ষ টাকার কম ছিল না। সে অনুমান সমূলক, কি অমূলক, তাহা রামচন্দ্রেই জানিলেন,—আর জানিলেন, স্বয়ং অন্তর্যামী ভগবান্। যোদ্দা, বাটী আসিয়া, ডেপুটী বাবু অধিকতর হৃষ্টচিত্ত হইলেন। তাঁহার গণ্ডস্থল দুটা যেন ফুলিয়া উঠিল, ঈষৎ লালও হইল। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি দেখিয়া গ্রামের লোক চমকিল!

বহুদিন পরে ডেপুটী বাবু স্বদেশে, স্বগ্রামে আসিয়াছেন শুনিয়া, তাঁহার গুরুদেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। গুরুকে দেখিয়া রামচন্দ্র প্রণাম করিলেন না। "আসুন বসুন"—একথা বলিয়াও তাঁহাকে তিনি সম্ভাষণ করিলেন না। পৈতৃকগুরু বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া একদৃষ্টে শিষ্যের পানে চাহিয়া রহিলেন। যে গুরুদেবকে দূরে দেখিলেই, বৃদ্ধ নরহরি সসম্ভ্রমে উঠিয়া, অগ্রগামী হইয়া, ধূলাতেই গড়াগড়ি দিয়া, প্রণাম করিতেন, পদধূলি লইয়া আপন মাথায় দিতেন, সেই গুরুদেব আজ পুত্র-রামচন্দ্রের নিকট খাড়াভাবে দণ্ডায়মান—সম্মান, গৌরব, ভক্তি, প্রণাম করিবার কেহই

নাই। গুরুদেব ঈষৎ লজ্জিত, চকিত এবং ভীত হইলেন। কোথায় যাই, কোথায় বসি, কি করি, কাহাকে বলি,—এই ভাবনাতেই তাঁহার হৃদয় আন্দোলিত হইতে লাগিল। শেষে রামচন্দ্রের চক্ষু-যুগলে চসমা সুশোভিত দেখিয়া, গুরু স্থির করিলেন, রামের বুঝি কোন চক্ষুদোষ জন্মিয়া থাকিবে, বুঝি লোক ঠাওরাইতে তাহার কষ্ট হয়,—তাই রাম আমাকে চিনিতে না পারিয়াই, সম্ভাষণ করে নাই। তখন গুরু প্রকাশ্যে রামকে বলিলেন, "রাম, তুমি আমায় ঠাওরাইতে পার নাই কি? শারীরিক কুশল ত?"

রামচন্দ্র অতি মিহিস্বরে (যেন কতকাল খান নাই) ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসিলেন, "কে তুমি? তোমার নাম কি? বাড়ী, কোথায়?—একি! তোমার গলদেশে সাদা সূত্র কয়েক গাছি ঝোলান কেন? গলরজ্জু দেখিয়া আমরে অন্তর কাঁদিতেছে। তুমি কি রাজদণ্ডে দণ্ডিত? তোমার উদ্ধারের নিমিত্ত আমি এখনি পরম পিতারদ নিকট অনুতাপ করিতে রাজি আছি।"

গুরু অবাক্, স্থিরদৃষ্টি।

পাড়ার একটা ধড়িবাজ লোক, বাবু গ্রামে আসা অবধি বাবুর সঙ্গ লইয়াছিল। কয়েক দিন কেবল মিছিরির বুকুনি দেওয়া মাথমে পালিস করা, কথা কহিয়া সে বাবুর মনস্তুষ্টি করিতেছিল। গুরুর প্রতি ব্যবহার দেখিয়া, সে লোকটা পর্য্যন্ত একটু লজ্জিত হইয়াছিল। সে বাবুকে বলিল,—"মহাশয় যা আজ্ঞা কচ্চেন, সমস্তই ঠিক,—ইহা অতি সৎকথা! কিন্তু উনি আপনার গুরুদেব, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন—"

রাম। গুরু কে? গুরু ত আমার কলিকাতায়! তিনিই কি ছদ্মবেশে আমার জ্ঞান-পরীক্ষার জন্য, পল্লীগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছেন?

সেই ধড়িবাজ লোকটার নাম নিতাইচরণ হাজরা—জানিতে কায়স্থ। নিতাই বলিল, "হুজুর! ইনি আপনাদের পৈতৃক গুরু।"

রাম। ওঃ হোঃ—সেই ব্যক্তি! উঁহার সহিত আমার অনেক কথা আছে। উঁহাকে আপাততঃ কিছু ইংরেজী শেখানো দরকার! কুসংস্কার দূর হইলে, উঁহাকে কলিকাতা লইয়া গিয়া, আমি মুক্তি দিব। আজ ওকে তুমি যেতে বল—আমার সময় নাই; নচেৎ, অদ্য হইতেই ওকে এ বি, সি, শিখাইতে আরম্ভ করিতাম।

গুরুদেব রামের কথা শুনিয়া, বিস্ময়সাগরে ডুবিয়া গেলেন। তাঁর মুখ দিয়া আর কথা সরিল না।

নিতাই গুরুকে বলিল,—"ঠাকুর! আজ তুমি যাও,—এখন, ও এখানে কিছু হবে না—হুগলীতে যেয়ে বাবুর সহিত সাক্ষাৎ ক'রো—"

রাম। নিতাই, তুমি ঠাকুর বলিলে কাকে? তুমি কি আজও ঠাকুর-দেবতা মানো নাকি? ছি! পোত্তালকতা মহাপাপ!

নিতাই। আজ্ঞে—আজ্ঞে—ঠিক্ বলেছেন—আমি আর পুতুল পূজা করিব না,—

গুরুদেব মনে মনে বলিলেন, "মনে করিছিলাম, কেবল রামই পাগল হয়েছে,—এখন দেখছি, রাম একা নয়,—নিতাই শুদ্ধ বয়ে গেছে,—"

এই বলিয়া গুরু অন্দরাভিমুখে মেয়েদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন।

রাম। (নিতাইকে)—একি এ!—পুরুষ মানুষ, বাড়ীর মেয়েদের কাছে যায় যে! পাড়াগাঁয়ে এত উন্নতি হয়েছে নাকি? বেশ, বেশ!! বঙ্গের গৃহে গৃহে স্ত্রী-স্বাধীনতা আবশ্যক! আমি মনে করেছিলাম, পিতার মৃত্যুর পর, পিসীমাকে হুগলীতে এনে স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রদান করিব—কিন্তু সেই ব্রহ্ম-কৃপায় পিসীমা স্বয়ংই স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়া—অকাতরে পরপুরুষকে ঘরে প্রবেশ করিতে দিতেছেন। সাধু পিসীমা সাধু!

নিতাই। আজ্ঞে, সকলই সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ঘটছে।

রাম। ছি! ছি! ছি!—কেষ্ট কেহে? সেটা গয়লার বেটা—ননীচোরা, কুরুচিপূর্ণ ছোঁড়া বৈত নয়! তাকে তুমি ঈশ্বর বলে সম্বোধন করতে লজ্জা বোধ কর না?—আমার সঙ্গে থাকা তোমার কর্ম্ম নয়, এখনও তোমার কুসংস্কার ঘুচিল না,—

নিতাই। আজ্ঞে, মাপ করবেন—আমি ভুলে বলেছি—

রাম। অমন জিহ্বা তুমি কেটে ফেল—এখনি আমার সাক্ষাতে কেটে ফেল।

তখন নিতাই অগত্যা দন্ত দ্বারা জিহ্বা কাটিয়া মা কালীবৎ রামচন্দ্রের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিল। রামচন্দ্র বলিলেন,—"এইবার তোমাকে শেষবার মাপ করিলাম; তুমি বল যে, নিরাকার ব্রহ্ম বৈ আমি আর কাহাকেও জানি না; তাঁরই চরণকৃপায় আমি বেঁচে আছি।" নিতাই কালীরূপ ছাড়িয়া বলিল,—"নিরাকার ব্রহ্মের চরণকৃপায় আমি বেঁচে আছি।"

রাম। অতি উত্তম! অতি উত্তম!

ওদিকে গুরুদেব অন্দরে প্রবেশ করিলে, পিসীমা দৌড়াদৌড়ি আসিয়া গুরুর পাদ-পদ্মে প্রণিপাত করিলেন।

গুরু অতি চিন্তামগ্নভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—"মা, রামের ত অবস্থা খারাপ দেখিতেছি; তার মেজাজের ঠিক নাই বোধ হইতেছে।"

পিসীমা। আমিও কদিন কেমন কেমন রামকে দেখিতেছি—"রাম আজিকালি যে সব কথা বলে, তাতে ঠিক মনে হয়, রামকে কেউ অষুদ করেছে।" এই কথা বলিতে বলিতে পিসীর চোখ দিয়া এক ফোঁটা জল পড়িল। ক্রমে রাম বাবুর স্ত্রী, কন্যা, পুত্রদ্বয় আসিয়া গুরুকে প্রণাম করিল। গুরুদেব সস্নেহে সকলকে কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন বাড়ীশুদ্ধ সকলেই, রামচন্দ্রের কিসে মতিস্থির হয়, তদ্বিষয়ে গুরুদেবের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দশ দিন কাল পল্লীগ্রামে বাস করিয়া, গ্রামবাসিগণকে নিজগুণের বিশেষ পরিচয় দিয়া, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে চমকিত করিয়া রামচন্দ্র সপরিবারে হুগলীতে আসিলেন। এ পর্য্যন্ত রামচন্দ্রের স্ত্রী, কন্যা বা পুত্রগণ সহর দেখেন নাই। তখন সেই নিতান্ত পাড়া-গেঁয়ে অশিক্ষিতা স্ত্রীকে শিক্ষা দিতে রামচন্দ্র মনস্থ করিলেন। স্ত্রীটী প্রকৃতই লক্ষ্মী-রূপিণী, পতি-অনুগামিনী, সতী-সাধ্বী সহধর্ম্মিণী। পতি যা বলেন, তাহাই প্রফুল্ল মনে করেন। কারণ স্ত্রী জানেন, পতি পরমগুরু। হিন্দুরমণী জানেন—,

সকল তীর্থের ফল ঘরে বসি করতল,
পতিপদে ভক্তিবল যার।
পৃথিবী পবিত্র যার, পায়ের ধূলায় আর,
কবি কি মহিমা কবে তার॥

হিন্দু-রমণী আরও বুঝিয়াছেন,—

স্বামী বনিতার পতি, স্বামী বনিতার গতি,
স্বামী বনিতার বিধাতা।
স্বামীই পরম ধন, স্বামী বিনা অন্যজন,
কেহ নহে, সুখমোক্ষদাতা॥

তবে স্ত্রীর একদোষ, তাঁহার বিষয়বুদ্ধি বড় কম। কেহ এক পয়সা ভিক্ষা করিতে আসিলে, তিনি হয় ত তাহাকে একটা আধুলি দিয়া বসেন। নিমন্ত্রণ করিয়া প্রতিবেশী মহিলাগণকে খাওয়াইতেছেন; পরিবেশনে তাদের পাতে তিনি সন্দেশ ঢাল্‌চেন ত ঢাল্‌চেনই পাড়ার যদি কোন স্ত্রীলোক কাঁদিল, তাঁর অমনি চোখে জল আসিল। কোন দুঃখিনী, যদি আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "মা, আমার কাপড় নাই; তিনি তৎক্ষণাৎ নিজ বস্ত্রখানি দিলেন। আবার তিনি ছেলেবেলা হইতেই বড় আদুরী, শ্বশুর খাশুড়ী লক্ষ্মীরূপিণী বলিয়া তাঁহাকে কিছুই বলিতেন না,—সকল সময়ই সকল আবদার সহিতেন। যে বৎসর তিনি স্বামীর ঘর করিতে প্রথম শ্বশুরবাড়ী আসেন, সে বৎসর নরহরি অতি সামান্য পণে নিলামে দুই হাজার টাকা মুনফার এক সম্পত্তি কেনেন। তাই নরহরি সদাই বলিতেন, "মা আমার স্বয়ং লক্ষ্মী।"

সেই সতী-সাধ্বী পতিব্রতার নাম অন্নপূর্ণা। কিন্তু কেবল সতীসাধ্বী হইলে কি হইবে? তাঁর যে দোষ ঢের। অন্নপূর্ণার সর্ব্বাঙ্গ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। নাকে তিলক, গলায় তিনকণ্ঠী তুলসীর মালা, হাতে শাঁখা; অধিক কি, সীঁথির অগ্রভাগে সুরকির গুঁড়াবৎ কি একটা লাল পদার্থ সদাই সন্নিবেশিত। অশিক্ষিতা স্ত্রীর এই সব ব্যাপার দেখিয়া, রামচন্দ্র বড়ই বিরক্ত হইলেন। ঘরে পেঁয়াজ আসিলেই স্ত্রীটা নাকে কাপড় দেয়। বাজারের জলখাবার খায় না। মুসলমানের দোকানের পাঁউরুটি যে স্থানে থাকে, সে স্থানটায় গোবরজল ছড়া দেওয়া হয়। রামচন্দ্র নিজ অন্দরের সমাজ-সংস্করণে বড়ই অকৃতকার্য্য হইয়া পড়িলেন। বিপদ উদ্ধারের জন্য কলিকাতায় গুরুজীকে পত্র লিখিলেন। গুরুদেব সেই পত্রের এইরূপ উত্তর দিলেন,—"ভাই হে! ভাবিও না। একটা বন্য ঘোড়াকে ব্রেক্ করিতে ছয় মাস লাগে, একটা বন্য মানুষীকে সোজা করিতে যে এক বৎসর লাগিবে, তৎপক্ষে আর সন্দেহ কি? তুমি একবার কলিকাতা

আসিলেই এ বিষয়ের সুযুক্তি এবং ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া দিব।" রামচন্দ্র যথানিয়মে কলিকাতা গিয়া শনিবার রাত্রে ঈশ্বরের নিকট অনেক কান্নাকাটি করিলেন, দুঃখ দূরের জন্য অনেক গান গাইলেন এবং স্ত্রীর সুমতি হইবার জন্য গুরুমুখ-নিঃসৃত ইংরেজীতে এক বক্তৃতা শুনিলেন। তার পর গভীর নিশীথে, গুরুশিষ্যে নিভৃতে বসিয়া এ বিষয়ে গূঢ় পরামর্শ করিলেন। কিরূপে স্ত্রী-শাসন করিতে হয় এবং স্ত্রীকে সৎপথে রাখিতে হয়, গুরুদেব তাহার প্রক্রিয়া একটা কাগজে লিখিয়া রামচন্দ্রের হস্তে দিলেন।

প্রাতের গাড়ীতে ডেপুটী বাবু হুগলী আসিলেন। আহারাদির পর কাছারি যাইবার সময় তিনি স্ত্রীকে বলিয়া গেলেন, "তোমার সঙ্গে আজ আমার একটা বিশেষ কথা আছে।" কাছারি হইতে যথানিয়মে প্রত্যাগত হইয়া সন্ধ্যার পর স্ত্রীকে বলিলেন,—"প্রাণেশ্বরি! তুমি কি আমায় ভাল বাস না?"

অন্নপূর্ণা। আজ যে ভারি আদর দেখ্‌চি! এই-ই বুঝি তোমার বিশেষ কথা? ছেলেপিলে এখনও খায় নাই। কি বল্‌তে হয় শিগ্‌গির বল—

রামচন্দ্র। (গম্ভীরভাবে) তুমি যদি আমায় ভাল বাসতে, তা হলে আর রাগ করে এখনি চলে যেতে চাইতে না। আমার সে অদৃষ্ট কৈ? (দীর্ঘনিশ্বাস)।

অন্নপূর্ণা। (হাসিয়া) আজ যে বড়ই বাড়াবাড়ি দেখ্‌চি! হয়েচে কি?

রামচন্দ্র। না,—আমি কিছু তোমাকে বল্‌তে চাই না—

অন্নপূর্ণা। রকম্ দেখো!—বলইনা কি হয়েচে?

রামচন্দ্র এইরূপ কতকটা আসর গরম করিয়া লইয়া, বলিতে আরম্ভ করিলেন—"প্রিয়তমে! তুমি অবশ্যই জান, পবিত্র প্রেম, ভালবাসাই সংসারের সার বস্তু। কিন্তু তুমি আমার একটা কথাও শোন না কেন? আমি যা চাই, তা আমাকে দাও না কেন? আমি যা ভাল বাসি, তা তুমি ঘৃণা কর কেন? আমাকে যদি তুমি ভাল বাসিতে, তা হলে কি আমার কথা তুমি এরূপ অগ্রাহ্য করিতে পারিতে?"

অন্নপূর্ণার চোখ ছলছল্ করিতে লাগিল। সেই সরলা সহধর্ম্মিণী ভালমন্দ কিছুই জানেন না; হঠাৎ তাঁহার উপর এরূপ বাক্যবাণ নিপতিত হওয়ায় তিনি একেবারে যেন মরমে মরিলেন। বিশেষত অন্নপূর্ণা বড় সুশীলা ও শান্তস্বভাবা—একটু 'হাবা-গোবার' মত। তিনি স্বামীকে যে কি কথা বলিয়া উত্তর দিবেন, তাহা ভাবিয়া

পাইলেন না। ক্ষণেক উভয়েই নিঃস্তব্ধ রহিলেন। অবশেষে রামচন্দ্র বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"এই দেখ, সেদিন কলিকাতা হইতে একজন বন্ধু, ভাল পেঁয়াজ এবং কাঁকুড়া উপহার পাঠাইয়া দিলেন। তুমি কি না সেই পেঁয়াজগুলো নিয়ে, টেনে ফেলে দিলে—স্বামীর মনে এত কষ্ট দেওয়া তোমার উচিত হইয়াছিল কি?"

অন্নপূর্ণা। তোমার দুটী পায়ে পড়ি, পেঁয়াজ ঘরে এনো না—ওর গন্ধে নাড়া উঠে যায়।

রামচন্দ্র। আচ্ছা, পাঁটার মাংসে ত গন্ধ নাই। তবে মাংস হাঁড়াতে রাঁধিতে দাও না কেন? সেদিন একজন মান্যবর বন্ধু স্বয়ং মাংস রাঁধিলেন; তুমি ঘরের থালা পাথর না দিয়ে আমাদিগকে কলাপাতে ভাত খাওয়ালে। তুমি যদি আমাকে ভাল বাসিতে, তা হলে কি আর এমন করিতে?

অন্নপূর্ণা একটু অপ্রস্তুত হইলেন। হঠাৎ কোন কথার উত্তর দিতে পারিলেন না। রামচন্দ্র বলিলেন,—"হাঁসের ডিম্‌টায় দোষ কি? সেদিন হাঁসের ডিম ভাতে দিতে বললাম; তুমি কিন্তু হুকুম করে, ডিম ভাতে দিলে, হাঁড়ী এবং ভাত উভয়ই নষ্ট হবে; অতএব অন্য একটা পাত্রে ডিম সিদ্ধ করিয়া দাও। শেষে খেতে যেয়ে দেখি, কলাপাতে করিয়া ডিম দেওয়া হইয়াছে। আমাকে এত তুচ্ছ তাচ্ছল্য করা তোমার উচিত হয় কি? আমি যে জিনিস খাই, তাহা ছুঁইলে যদি তোমার দোষ ঘটে, তাহা হইলে আমাকে ছুঁইলেও তোমাতে দোষ বর্ত্তিতে পারে।"

অন্নপূর্ণা এইবারে বড়ই কাতর হইলেন। দুই চক্ষুর কোণ দিয়া টপ্ টপ্ বড় বড় ফোঁটা পড়িতে লাগিল। তিনি যোড়হাতে বলিলেন,—"আমি স্বহস্তে তোমাকে সকল জিনিস রেঁধে দেব, কিছুতেই কষ্ট বোধ করবো না। কিন্তু একটী বিষয়ে তুমি আমাকে ক্ষমা করো—আমাকে ওসব কিছু কখন খেতে বলোনা।"

রামচন্দ্র তখন মনে মনে বড় সন্তুষ্ট হইয়া, পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া অন্নপূর্ণার চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিলেন,—"মিছামিছি কাঁদ কেন? প্রিয়তমে! চুপ কর, চুপ কর—"

কিন্তু আবার হু হু জল পড়িতে লাগিল। রামচন্দ্র আবার চোখ মুছাইয়া দিলেন। অন্নপূর্ণা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"তুমি যাহা খাবে, আমি তাহা স্বহস্তে অবশ্যই

বাঁধিয়া দিব। তুমি নরকে যাইতে বলিলে আমি নরকে যাইব—আমার এ সংসারে আর কে আছে? ছেলে দুটী ছোট, তাই ভয় হয়, আমি মোলে, তাদের কষ্ট হবে,—নচেৎ তোমার কোলে মাথা দিয়ে মরার চেয়ে আমার আর সুখ কি?"

রামচন্দ্র মনে মনে বুঝিলেন, গুরুদেবের ঔষধ কতকটা ধরিয়াছে। প্রকাশ্যে বলিলেন, "স্বামী স্ত্রী একই পদার্থ। কোন ভেদ নাই। প্রেয়সি! তোমার হৃদয় এবং আমার হৃদয় এক। তুমি আর চোখের জল ফেলিও না;—তুমি জান, তোমার ক্রন্দনে আমারও ক্রন্দন।"

স্ত্রী, তখন অঞ্চল দিয়া নিজ মুখ-চোখ মুছিলেন। স্বামী তখন স্ত্রীর হাত ধরিয়া বলিলেন, "দেখ প্রিয়তমে! আমরা অন্ধকারে ডুবিয়া আছি। এইবার তুমি আমার কথা ভাল করিয়া বুঝ।"

অন্নপূর্ণা। এ সংসারে তোমা বৈ আর আমার কে আছে? তোমার কথাই বেদ, তোমার কথাই ব্রহ্ম।

রামচন্দ্র। ভাল করিয়া মন দিয়া শুন। ইংরেজ এদেশে আসা অবধি আমাদের জ্ঞানচক্ষু ফুটিতে আরম্ভ হইয়াছে। হিন্দুরা বড়ই কুসংস্কারাপন্ন। পাথরকুঁচিকে তারা দেবতা বলিয়া মানে। দেখ, মাংস খাইলে দেহে বল হয়, হিন্দুদের সে মাংস খাইতে নিষেধ—আরও দেখ, মুর্গী অতি উপাদেয় জিনিস,—অতীব স-সার, সুমিষ্ট এবং সুহৃদ্য।—কিন্তু হিন্দুরা বলে, সে মুর্গী খাইলে জাতি যায়। কেন বল দেখি, জাত যায়? জাতই বা কি, যাবেই বা কি? আর এই সব পুষ্টিকর সামগ্রী খাই না বলিয়াইত আমরা এত দুর্ব্বল। নহিলে কি আজ ইংরেজ আমাদের রাজা হইতে পারিত? হিন্দুদের শাস্ত্র সমস্তই ভুয়াবাজী। আজকালিকার বড় বড় পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ইহাই মত।

অন্নপূর্ণা। শাস্তর মিছে বলো না!

রামচন্দ্র। (হাসিয়া) প্রিয়ে! তুমি যদি শিক্ষিতা হইতে, তাহা হইলে এ কথা কখনই তোমার মুখ দিয়া বাহির হইত না। তোমরা কেবল ভ্রমরূপ অন্ধকারে পড়ে আছ।

অন্নপূর্ণা। সে আবার কি রকম?

রামচন্দ্র। এই বোঝ—লেখা পড়া জানিলে, উত্তম জ্ঞান জন্মিলে, সমস্ত ভ্রমই দূর হয়।—মনটী ধপ্‌ধপে পরিষ্কার হয়। এই দেখ, পূর্ব্বে ত আমি তোমাদেরই মত অজ্ঞান ছিলাম—পেঁয়াজ, রুসুন, পাঁটার দিক্ দিয়া পথ চলিতাম না; মুর্গী দেখিলে তখন আমার গা শিহরিয়া উঠিত! কিন্তু যেই জ্ঞানটী লাভ হইল, অমনি সব ভ্রম ঘুচিল। প্রেয়সিরে! তুমি যদি একটু তলাইয়া বুঝ, তাহা হইলে আজ আমি অনেক কথা বলি। আচ্ছা, আমরা মাছ খাই ত! মাছ তুমিও খাও, আমিও খাই, সকলেই খায়। মাছ জলজীব। মাছ-হত্যা, জীবহিংসা। মাছ-ভক্ষণ, জীবদেহ-ভক্ষণ। আর মুর্গীও তাই—স্থলজীব। মুর্গীহত্যা, জীবহিংসা। মুর্গী-ভক্ষণ জীবদেহ ভক্ষণ। কিন্তু এমনি মজাটী দেখ, শাস্ত্রে মাছ খাইতে বিধি আছে, আর মুর্গীর বেলায় ঘোরতর নিষেধ!—মুর্গী খাইলেই জাত যায়। ছিঃ! এই কি তোমাদের শাস্ত্র! এইরূপেই ত স্বর্ণ-ভারত শ্মশান হইয়াছে।

অন্নপূর্ণা একমনে একভাবে নীরব রহিলেন।

রামচন্দ্র, স্ত্রীর হাত ধরিয়া, হো হো হাসিয়া বলিলেন,—"বোধ হয় তোমার হৃদয়-আকাশ হইতে কিছু কিছু অজ্ঞান-অন্ধকার এইবার দূর হইতেছে। প্রিয়ে তুমি যেমন বুদ্ধিমতী, তাহার উপর সেইরূপ যদি লেখাপড়া শিখিতে, তাহা হইলে তোমার দ্বারাই মহাপ্রলয় উপস্থিত হইত! আমার গুরুদেব তোমার ন্যায় এইরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধিমতী একটী রমণী সেদিন খুঁজিতেছিলেন। আহা! তাঁর ন্যায় অমন মহাত্মন্ ব্যক্তি পৃথিবীতে আর নাই। সেই দেবতুল্য পুরুষ কেশবচন্দ্রসেন অতিশিক্ষিত এবং অতিজ্ঞানী বলিয়াই তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।"

অন্নপূর্ণা। তা, আমরা মেয়েমানুষ—এত লেখাপড়া কেমন ক'রে শিখ্‌বো!—আমরা কি আর এত সাত-সতের বুঝি!

রামচন্দ্র। হা, হা, হা,!—প্রাণরে! তোমার উদরে যে এত জ্ঞান, তা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না।

সেই পতিগতপ্রাণা সহধর্ম্মিণী, শিক্ষিত স্বামীর নিকট হইতে প্রত্যহ এইরূপ উন্নতি-বিধায়িনী শিক্ষা পাইতে লাগিলেন। অন্নপূর্ণার ক্রমেই মনের আঁধার ঘুচিতে লাগিল। কালোমেঘ, তাঁহার হৃদয়-আকাশ হইতে অল্পে অল্পে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতে আরম্ভ হইল

প্রথম মাসে উচ্চশিক্ষার হাতেখড়ি দিয়া অন্নপূর্ণা বুঝিলেন, নবমীতে লাউ খাওয়া নিষেধটা বড়ই কুবিধি। দ্বিতীয় মাসে উচ্চশিক্ষার প্রথমভাগ ধরিয়া বুঝিলেন, পেঁয়াজে গন্ধ ব্যতীত, আর কোন দোষ নাই। গলায় তিনকণ্ঠী তুলসীর মালা কেবল অঙ্গভার। অন্নপূর্ণা তৃতীয় মাসে উচ্চশিক্ষার বোধোদয় আরম্ভ করিলেন। এবার দিব্যজ্ঞান লাভ হইল। তাঁহার মনে মনে এই ভাব উদয় হইল,—"কেন রমণীকুল চিরদিন পুরুষের পদানত থাকিবে? পিঞ্জরাবদ্ধ শুক পাখীর ন্যায় কেন অন্দরের ভিতর পচিবে? চতুর্থ মাসে এইভাব স্পষ্টীকৃত হইল। অন্নপূর্ণা, স্বামীর আদেশক্রমে, আধ-ঘোমটা দিয়া, স্বামীর বন্ধুগণের সাক্ষাতে স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে বাহির হইতে লাগিলেন। পঞ্চম মাসে আরও উন্নতি। কেবল একটী ভৃত্যের সাহায্যে, ছেলেপিলে সঙ্গে লইয়া, তিনি কলিকাতা আসিয়া যাদুঘর, পশুবাটিকা, কেল্লা, গড়ের মাঠ দেখিয়া বেড়াইলেন। ষষ্ঠ মাসে প্রত্যহ বৈকালে স্বামীর সহিত নৌকার ছাদে উঠিয়া, সর্ব্ব-জনচক্ষুর গোচরী-ভূত হইয়া গঙ্গা-নদীর হাওয়া খাইলেন। সপ্তম মাসে তাঁহার মুর্গীতে ঘৃণা রহিল না। অষ্টম মাসে, তাঁহার গৃহে মুষ্টিভিক্ষা বন্দ হইল। নবম মাসে ব্রাহ্মণী-রন্ধনীর বদলে বাবুর্চ্চি পাকশালা অধিকার করিল। দশম মাসে অন্নপূর্ণা সঙ্গীতবিদ্যায় মন দিলেন। একাদশ মাসে একজন মুসলমান ওস্তাদজী আসিয়া তাঁহাকে ঈশ্বরসঙ্গীতের তান-লয়-মান শিখাইতে লাগিল। দ্বাদশ মাসে শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে, অন্নপূর্ণা বেশভূষায় ভূষিতা হইয়া ঈশ্বরানুরক্ত ভ্রাতৃগণের সমক্ষে স্বয়ং হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান গাহিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে ঘোর দুর্দ্দিন ঘুচিল। বহুদিনের বদ্ধমূল গাঢ়তর অন্ধকারময় আকাশ নির্ম্মল হইল। সুসভ্যতার শরচ্চন্দ্র হাসিতে লাগিল। কৌমুদীরাশি উছলিয়া পড়িল। পুলকপূর্ণ রামচন্দ্র বলিলেন. "ধন্য গুরুদেবের বীজমন্ত্র! অথবা কর্ত্তা বুঝি স্বয়ং ঈশ্বর।"

কিন্তু ঐ যে এক আধটু মেঘ এখনও রহিয়াছে। যতই কেন উচ্চশিক্ষা দাও না,—সে মেঘটুকুত আর কিছুতেই কাটিতেছে না। সেই সর্ষপ-প্রমাণ কালো মেঘটুকুর জন্য রামচন্দ্র বড়ই বিব্রত হইলেন। কিন্তু গুরুদেব তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "ওটুকু থাক্—চন্দ্রের কলঙ্কই শোভা।"

অন্নপূর্ণা স্বামীর শিক্ষাসহবতে, স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য, ক্রমশ সর্ব্বস্বই ছাড়িলেন,—ছাড়িলেন না কেবল সীঁথার সিন্দুর এবং হাতের 'নোয়া'। উচ্চতম শিক্ষার উচ্চতম শাখায় উঠিয়াও অন্নপূর্ণার এ নিদারুণ কুসংস্কার রহিল,—নির্ম্মল নীলাকাশে এ গুরুগাঢ়তম মেঘবিন্দু রহিল,—ইহাই রামচন্দ্রের মর্ম্মযাতনা। শেষ গুরু-উপদেশে মনকে শান্ত করিলেন,—

"ফুল্ল কুসুমে কীট, মৃণালে কণ্টক, চন্দ্রে কলঙ্ক থাকাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত।"

নবম পরিচ্ছেদ।

গোলাপ-ফুলটী কুঁড়ী, কি আধ-ফুটন্ত, অথবা ষোলকলাপূর্ণ—আমি ত কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না। আপনারা কেউ যদি পারেন ত দেখুন।

আশ্বিনে, নির্ম্মল নীল নভোমণ্ডলে নবীন নধর নিশানাথ হাসিতেছেন; নিম্নে নির্ম্মলসলিলা ভাগীরথী, জ্যোৎস্না মাখিয়া, পুলকে স্ফীত হইয়া কলস্বরে লীলাখেলা করিতেছেন; আর মধ্যপথে সেই গঙ্গাগর্ভস্থ হর্ম্ম্যের দ্বিতল বারান্দায়, ফুলরাশি-বেষ্টিত হইয়া, ফুলকামিনীবৎ এক ত্রয়োদশবর্ষীয়া "বালিকা" ফুলের মালা গাঁথিতেছেন। ঐ দেখুন, ঐ বুঝুন—যা করিতে হয়, করুন।

এ কি,—বালিকা, না যুবতী? অথবা বুঝি—

শৈশব যৌবন দুহুঁ মিলি গেল।
শ্রবণক পথ দুহুঁ লোচন লেল॥
বচনক চাতুরী লহু লহু হাস।
ধরণীয়ে চাঁদ করত পরকাশ॥
মুকুরে লেই অব করত শিঙ্গার।
সখীরে পুছই কাঁহা হৃদিহার॥

সেই ক্ষীণাঙ্গী "বালিকার" দর্পণে ঘন ঘন মুখ দর্শন, সেই সম্মুখস্থিত ফটোগ্রাফচিত্রে—সেই কোটীকাম-বিনিন্দিত মোহনমূর্ত্তি পরমপুরুষ পানে—নবীনার ঘন ঘন কুটিল কটাক্ষ, সেই যুঁই-বেল-গোলাপ-রজনীগন্ধা লইয়া মালা-গাঁথা-ছলে বালিকার সেই ফুল-খেলা, পূর্ণচন্দ্রের ঝলমলায়িত কৌমুদীরাশি লইয়া রঙ্গভূমে সেই লীলাতরঙ্গ, এই সব দেখিয়া মনে হয়, আমি এই মহাকাব্যময় অনন্ত ক্ষীরোদসমুদ্রে কেবল ডুবিয়া থাকি। ইচ্ছা হয়,—সেই মহাকবিতায় কেবল কথা কহিয়া কোকিলকণ্ঠ হই, সেই মহাকবিতার সুধা পান করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হই ;—আর শয়নে, স্বপনে, জাগরণে সদাই আমার রসনা যেন সেই মহাকবিতার গান করে। সাধ হয়, যেন কবিতায় তাঁহাকে ডাকিয়া বলি,—

ওলো ধনি! প্রাণধন!
শুন মোর নিবেদন,—
সরোবরে স্নান হেতু
যেয়োনা লো যেয়োনা!
যদ্যপি বা যাও ভুলে,
অঙ্গুলে ঘোমটা তুলে,
কমল-কানন পানে,
চেয়োনা লো চেয়োনা!
মরাল মৃণাল লোভে,
ভ্রমর কমল ক্ষোভে,
নিকটে আইলে ভয়,
পেয়োনা লো পেয়োনা!
তোমা বিনা নাহি কেহ,
ঘামে পাছে গলে দেহ,
বায়ে পাছে ভাঙ্গে কটী,
ধেয়োনা লো ধেয়োনা!

আবার, কখন বা মনে হয়, সংসার-উদ্যানের প্রফুল্লিত বকুলতলায় বিরলে বসিয়া বালিকার হাতে ধরিয়া গান গাই,—

আমার নিকটে রবে, মরম আমারে কবে,
এমন শিখাব কথা সুধাবৃষ্টি করিবে।
আঁচড়িয়া দিব কেশ, বনাইয়া দিব বেশ,
থাকুক মুনির মন দেবমন ভুলিবে॥
হাব ভাব লীলা হেলা, শিখাইব নানা খেলা,
আসিতে আমার আছে কাহারে না ডরিবে।
যত দোষ লুকাইব, যত গুণ প্রকাশিব,
বড় দায়ে ঠেক যদি আমা হ'তে তরিবে॥

এই বালিকাই আমাদের সেই পূর্ব্বপরিচিতা কমলিনী। এখন বালিকাকাল। বাল্যলীলার চরম খেলা খেলিতেছেন।

কমলিনী, রামচন্দ্রের ঔরসে অন্নপূর্ণার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ভূভার-হরণের জন্য শক্তিরূপিণী কমলিনী ধরাধামে অবতীর্ণা হন।

অষ্টমবর্ষে কমলিনীর বিবাহ হয়। বৃদ্ধ নরহরি বহু অনুসন্ধানের পর, সুপাত্র দেখিয়া, পৌত্রীকে যথাবিধি দান করিয়া, গৌরীদানের ফললাভ করেন। পুত্র রামচন্দ্র তখন ধর্ম্মরস ঈষৎ লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। কন্যার এ বিবাহে তাঁহার সম্পূর্ণ অভিমতি বা সহানুভূতি ছিল না। তবে পিতা কর্ত্তা, কৃতিমান্, আর তিনি বিদেশী, অকৃতিমান্;—কাজেই রামচন্দ্র, নরহরির কাজে বাধা দিতে সক্ষম হন নাই।

কন্যার বিবাহে অন্নপূর্ণার হর্ষে বিষাদ ঘটিয়াছিল। জামাতা বহুগুণ-বিশিষ্ট হইলেও তিনি দ্বিতীয় পক্ষের বর। মায়ের মনটা কেমন খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল। তবে বরের গুণাবলীর কথা শুনিয়া, তাঁহার হৃদয় কতকটা শান্তিলাভ করিল।

বরের নাম রাধাশ্যাম রায়। বয়স ত্রিশ বৎসর। বংশ উচ্চ, সম্ভ্রান্ত বরের বাপ একজন মহাপণ্ডিত বলিয়া দেশবিখ্যাত। তাঁহার ব্যবস্থা, ভাব,— সর্ব্বমান্য। বহুদূর হইতে তাঁহার নিমন্ত্রণপত্র আইসে। সেই প্রবীণ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আপন টোলে রাধাশ্যামকে নানাশাস্ত্রে শিক্ষা দেন। প্রথম-পত্নী-বিয়োগের পর, পাঁচিশ বৎসর বয়সে, রাধাশ্যাম কাশীধামে দর্শন পড়িতে যান। তথায় দর্শনপাঠের সঙ্গে সঙ্গে [illegible] যোগ

অভ্যাস করেন। তিন বৎসর পরে তিনি গৃহে প্রত্যাগত হন। তার পর দুই বৎসর মধ্যে এই বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়।

রাধাশ্যাম পরম-বৈষ্ণব। তবে সম্প্রদায়-বিশেষের মত নাস্তিক-বৈষ্ণব নহেন। কোন কোন বৈষ্ণব এমনও আছেন, যিনি কালী দুর্গা দেখিলে ঘৃণায় নাসিকা বিকৃত করেন।—তারকেশ্বরের চরণামৃতকে কুকুরের প্রস্রাবের সহিত তুলনা করেন।—ভগবতীর প্রসাদকে কাকবিষ্ঠা বলেন। এ সব কথা শুনিলেও পাপ আছে। এই মুগ্ধ বৈষ্ণব-দলের সহিত রাধাশ্যামের কোন সংস্রব ছিল না।

নরহরিও বৈষ্ণব ছিলেন। প্রত্যহ স্নানের পর চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের কতকাংশ পাঠ না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। কৃষ্ণকথায় তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িত। তিনি রাধাশ্যামের গুণে মোহিত ছিলেন;—বলিতেন, এমন নাৎজামাই আর পাইব না। নরহরির জীবদ্দশায় রাধাশ্যাম তিনবার শ্বশুরগৃহে আসেন। তখন দাদাশ্বশুরের অন্তরাত্মায় আনন্দ-লহরী বহিত; উভয়ে কৃষ্ণকথায় দিন কাটাইতেন। রাধাশ্যামের মুখে শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা, চৈতন্যচরিতামৃত-পাঠ শুনিয়া বৃদ্ধ নরহরি বড়ই প্রীত হইতে—যেন ইহকালে স্বর্গ-সুখ ভোগ করিতেন।

কালক্রমে নরহরির মৃত্যু হইল। ওদিকে রাধাশ্যামের পিতা বহুদিনব্যাপী রোগ-শয্যায় শায়িত হইলেন। বৃদ্ধবয়সের রোগ—প্রত্যহ বৈকালে একটু জ্বর হয়, একটু আধটুকু খুকখুক কাসেন, আহারে অরুচি! শরীর দুর্ব্বল হইতে লাগিল। এক মনে, এক ধ্যানে, রাধাশ্যাম, এ অন্তিমকালে পিতার সেবা করিতে লাগিলেন। পিতার সংসারে আর কেহই নাই;—রাধাশ্যামের মা বহুদিন পরলোক গমন করিয়াছেন। পিতা এক দিন নিজ জীর্ণ-উত্তপ্তবুকে পুত্রের হাত রাখিয়া বলিলেন, "বাপধন! চলিলাম। দেহের ভোগ এখনও কতদিন আছে বলিতে পারি না, তুমি একাকী; দিনরাত আমার সেবায় তোমার বড় কষ্ট হইয়াছে। আমি বলি, ভাল দিন দেখিয়ে চিঠি লিখে বৌকে আমার, ঘরে নিয়ে এস। উভয়ে একত্র আমার সেবা করিবে,—দেখে, আমার বড় আনন্দ হবে।"

পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, পিতার জবানী, রাধাশ্যাম, রামচন্দ্রকে হুগলীতে এক চিঠি লিখিলেন। কিন্তু সে পত্র আজও আসিয়া পৌঁছিল না।

রাত্রি প্রায় আটটা। সেই ফুলবালা কমলিনীর এখনও ফুলখেলা শেষ হইল না।

এমন সময় এক জন বৃদ্ধা ঝী আসিয়া বলিল,—"ও, নাৎনি!—বেলী রাত হয়ে পড়্‌লো, শীগ্‌গির দেনা বাছা, এই বেলা মালা নিয়ে যাই!—

কমলিনী। সন্দেশ থালে সাজান হয়েচে ত?

ঝী। সে সব অনেক ক্ষণ ঠিক্ করে রেখেছি!

কমলিনী ঝীকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, "তুই আর ১৫ মিনিট পরে এলেই মালা পাবি,—এখন যা।"

ঝী অগত্যা চলিয়া গেল।

কমলিনী কখন কাঁচি লইয়া, কখন ছুঁচ আল্পিন লইয়া, কখন বা ছুরি কাঁচি লইয়া মোহন মালা গাঁথিতে লাগিলেন।—

ভাল মালা গাঁথে ভাল মালিয়া রে।
বনমালি মেঘমালি কালিয়া রে॥
মোহন মালার ছাঁদে, রতিকাম পড়ে ফাঁদে,
বিরহ-অনল দেই জ্বালিয়া রে।
যখন যেদিকে চায়, ফুল বরাষিয়া যায়,
মোহ করে প্রেমমধু ঢালিয়া রে॥
নাসা-তিলফুল পরে, অঙ্গুলী-চম্পক ধরে,
নয়ন-কমল কামে টালিয়া রে।
দশন-কুন্দের দাপে, অধর-বান্ধুলী চাপে,
ভারত মজিল ভাল ভালিয়া রে॥

ক্রমে একগাছি, দুগাছি করিতে করিতে চারিগাছি মালা গাঁথা হইল। কমলিনী যে মালাটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিলেন, সেইটীই ঝায়ের থালে সাজাইয়া দিলেন। মালার গায়ে টীকিট-আঁটা। তাহাতে অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা আছে,—

চিকণ গাঁথনে বাড়িল বেলা।
তোমার কাজে কি আমার হেলা॥
না জানিয়া কষ্ট দিয়াছি মরি।
ক্ষম অপরাধ আমি তোমারি॥

তখন অপর তিনগাছি মালা কমলিনী বাক্সের ভিতর বন্ধ করিয়া রাখিলেন।

এখন বঙ্গসাহিত্যবিদ্ সুধী-সমাজে কথা উঠিতে পারে, তের বছরের বালকা, কবিতা লেখে কেমন করিয়া? কেমন করিয়া যে লেখে, তা ভগবান্ই বলিতে পারেন। কমলিনী স্বহস্তে কবিতা লিখিলেন, পাঠাইলেন,—আর আমি কি সে কথা বলিতে পারিব না? কিন্তু খবরের কাগজে, সাময়িক পত্রে, মাঝে মাঝে দেখিতে পাই—সম্পাদক নোট করিতেছেন, অমুক কবিতাটী কোন চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালকের লেখা—অমুক গীতিটী কোন বোধোদয়-পাঠিকার লেখা।

সে যাহোক, ঝাঁ'ত মালা লইয়া ভেট দিতে গেল।

আহারের সময় হইলে ডেপুটী-বাড়ী ঘণ্টা বাজিত। ঠিক সাড়ে আটটার সময়, আহারীয় ঘণ্টাধ্বনি হইল। কমলিনী ত্বরাত্বরি ভোজনগৃহে গিয়া আহারাদি করিয়া আসিলেন। প্রথমত নিজ কক্ষে গিয়া, তিনি খাটের উপর দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। রাত্রি দশটার মধ্যে নিদ্রাদেবীর কোমল কোলে সকলে ঘুমাইল। ডেপুটী বাবুর গৃহ নীরব—নিঃস্তব্ধ, অবনী স্থির গম্ভীর। লোক-কোলাহল ফুরাইল। কেবল সেই চাঁদটার বিরাম নাই—সেই ঝক্‌ঝকে ঝলমলে আলোর, সমস্ত রাত্রির জন্য, সে যেন সদাব্রত খুলিয়াছে; আর বিরাম নাই—গঙ্গাটার; কল্‌কল্-কলকণ্ঠের একটানা-সুর সমভাবেই চলিয়াছে। কাব্য-প্রিয়া কমলিনী এ কবিতাময়-কালে ঘুমাইলেন কি জাগিয়া রহিলেন,—তাহা কে বলিতে পারে?

দশম পরিচ্ছেদ

এমামবাড়ীর ঘড়ীতে "ঢঙ্‌ঢঙ্‌" করিয়া মহাশব্দে রাত্রি একটা বাজিল। সেই এক ঘায়ে সহর পূর্ণ হইল। যেন হিমালয়-শিখর হইতে শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাইলেন। তবে রাত্রিকাল, হুগলীবাসী নিদ্রিত; কাজেই সে শব্দের গুরুত্ব বড় কেহ অনুভব করিলেন না।

জ্যোৎস্না-আলোকে দেখা গেল, ডেপুটীবাবুর অট্টালিকার বারন্দার ঠিক নীচে, গঙ্গাগর্ভে একখানি পান্‌সী বাঁধা রহিয়াছে। "মালিনী-মাসী-গোছ" একটা ঝী, শুভ্র-বসনে দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ির দ্বারে, স্থির-ভাবে দাঁড়াইয়া আছে! দোয়ার খোলা।

ডেপুটী বাবুর বাড়ীর পার্শ্বেই বাগান। বাগানটী খুব বড়ও নয়, খুব ছোটও নয়। বাগানটী আম-বাগানও নয়, লিচু-বাগানও নয়, সখের ফুল-বাগানও নহে। অথচ সবই আছে। উদ্যান-অধিকারী বড় হিসাবী লোক। বাগানের প্রথম ভাগটা, দেশী বিলাতী বিবিধ ফুলগাছে বিভূষিত। দ্বিতীয় থাকে, দুই সার কলমের আমগাছ। তার পর, কয়েকটী বড় বড় আঁটীর আমগাছ। আমের পরই কাঁঠাল গাছ। কাঁঠাল ফুরাইলে, লিচু গাছ আরম্ভ। তার পর, জাম, বাতাপি লেবু, কমলা লেবু, পাতি লেবু, দাড়িম, পেয়ারা, আতা, কুল (দ্বিবিধ), খেজুর, তাল, নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষনিচয় যথানিয়মে সন্নিবেশিত। অবশেষে দুঝাড় বাঁশ, বাবলাগাছ এবং অন্তিমে গঙ্গার ধারে খানিক শর-বণও আছে। এ ছাড়া, বাগানের মাঝে মাঝে, উপযুক্ত স্থানে, সুবিধামত পুঁই-মাচা লাউ-মাচা আছে; পুনকে শাক, পালঙ্ শাক এবং নটে শাকের ক্ষেৎ আছে;—অধিক কি, পানের বরোজও একটী আছে।

এ উদ্যানটীর সঙ্গে ডেপুটী বাবুর কোন সম্পর্ক নাই। কেবল ফুলের সুগন্ধ উপভোগ করিবার তাঁহার অধিকার আছে। যিনি ডেপুটীর বাসার মালিক, তিনি বাগানেরও মালিক। সেই জ্যোৎস্নামাখা শারদীয় গভীর নিশীথে, সেই উদ্যানমধ্যস্থ অট্টালিকা নীরব, উদ্যান নীরব, সেই শুভ্র-বসনা শুভদর্শনা ঝী নীরব, পান্‌সীর দাঁড়ী মাঝা নীরব।

ও—কি—ও!!! দুইটী লোক—মাল-কোঁচা-মারা, হাতে এক এক গাছি মোটা ছোট লাঠি—বাঁশতলা থেকে দ্রুতপদে আসিতেছে নয়? দেখিতে দেখিতে আরও দুটী লোক, বড় আমগাছটা হইতে ধীরে ধীরে নামিল। ইহাদের মধ্যে একজনের হাতে হাতীর দাঁতের বাঁধান মোটা বেতের ছড়ি,—অপরের হাতে একটা পিস্তল। ঐ যে লিচুতলা থেকে আরও একজন লম্বা লাঠি ঘাড়ে করিয়া হন হন্ আসিতেছে। এমন সময়—ইহারা কে গো? ডাকাত নাকি? ডাকাত ত চেরা-সিঁথি কেন? কাহারও হস্তাঙ্গুলীতে হীরকাঙ্গুরীয় চন্দ্রালোকে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে! কাহারও অঙ্গে

টাট্‌কা ইস্তিরি-করা ডবলব্রেষ্ট কামিজ,—তাহার উপর বেল ফুলের মালা দোদুল্যমান তৎকালে কেহ বা অমনি পকেট হইতে শিশা বাহির করিয়া ল্যাভেণ্ডার জল একটু মাথায় দিল।

সেই ঝী, গঙ্গাভিমুখ-গৃহদ্বার খুলিয়া যাঁহার প্রতীক্ষায় নীচে দাঁড়াইয়াছিল, নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে সেই পুরুষ, দ্বিতল হইতে সিঁড়ি দিয়া নিম্নে অবতরণ করিলেন। তাঁহার বাম হস্তে একটী গোলাপ ফুল, দক্ষিণ হস্তে একগাছি মিহি-ছড়ি। সেই পুরুষ যেমন ভূতলে পদার্পণ করিলেন, অমনি চেরা-সিঁথি-কাটা পাঁচ জন ডাকাত, বাগান হইতে নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া নিমেষ মধ্যে, তাঁহার উপর পড়িল। যেন ক্ষুধিত ব্যাঘ্রনিচয় মেষশাবকের উপর পতিত হইল। পুরুষ ভীত, কম্পিত-কলেবর,—ভীতিব্যঞ্জক ভাঙ্গাভাঙ্গা স্বরে বলিলেন,—"তোমরা কি চাও, তোমরা কি চাও!" ঝী চেঁচাইয়া উঠিল,—"ওগো, বাবাগো, ডাকাতে আমাকে কেটে ফেল্লে গো।"—ডাকাতদল কোন কথা না কহিয়া, প্রথমে সেই বাবুর হাতে এক মিঠেকড়া-লাঠি বসাইয়া দিল। তাঁহার হাত হইতে সেই গোলাপ ফুলটী এবং সরু ছড়িটী ভূতলে পড়িয়া গেল। অমনি সকলে মিলিয়া তাঁহার উপর কেহ কীল, কেহ লাথি, কেহ ঠোনা, কেহ জুতা বর্ষণ করিতে লাগিল। "রক্ষা কর, রক্ষা কর" বলিয়া বাবু ভূতলে পড়িয়া গেলেন। নাক দিয়া তাঁহার হু হু রক্ত বাহির হইতে লাগিল। এই কার্য্য বোধ হয়, অর্দ্ধ মিনিটের মধ্যে সম্পাদিত হইল।

ঝায়ের চীৎকার, পান্‌সীর মাঝাদের চীৎকার এবং বাবুর চীৎকার—এই তিন চীৎকার একত্র হইয়া এক মহা কোলাহল উত্থিত হইল। ডাকাত, ডাকাত, ডাকাত রবে ভাগীরথী প্রতিধ্বনিত হইল! মাঝারা ভয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, নৌকাতেই বসিয়াই রহিল। ঝীটা খুব পাকা—সে কেবল বলিতে লাগিল, "ওগো বড় কর্ত্তা, তুমি একবার নীচে নেমে এসো,—আমাদের ডাকাতে কেটে ফেল্লে।"

এইরূপ হাঁকাহাঁকিতে প্রতিবেশিমণ্ডলী, কনষ্টেবল ডেপুটী বাবু এবং তাঁহার ভৃত্যগণ—সকলেরই ঘুম দূর হইল। পাড়ার কয়েকজন লোক বাগানের দূরস্থ ফটকের গোড়ায় আসিয়া হো হো করিতে লাগিল। দুইটা কনষ্টেবল সেই ফটকে ধাক্কা দিয়া কেবল বলিতে লাগিল, "জল্‌দি দরোজা খোল্‌ দেও।"—কিন্তু সে কথা শুনেই বা কে?

আর ফটক খোলেই বা কে? ওদিকে স্বয়ং ডেপুটী বাবু, দুই জন ভৃত্য-সমভিব্যাহারে ত্রিতলের ছাদে উঠিয়া বন্দুকে গুলি পূরিয়া, বাগানের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি এখনি গুলি করিয়া সকলের প্রাণবধ করিব। বল, কে আমার বাড়ী ডাকাতির চেষ্টা করিতেছে? যার এত সাহস, সে আমার সম্মুখে এখনি আসুক। এই গুলি করিলাম,—করিলাম— রিলাম!! কিন্তু কৈ ডাকাত? কৈ ডাকাত? বস্তুত, আর কাহাকেও তখন সেখানে দেখা গেল না। ডাকাতদল যে কোথায় হঠাৎ কোন্ দিক দিয়া পলাইল, তাহার কেহই ঠিক করিতে পারিল না। নিয়ে আর কেহই নাই, কেবল সেই ঝী এবং সেই আঘাত-প্রাপ্ত, ভূপতিত মূর্চ্ছিত বাবু। ঝী তখন ডেপুটি বাবুকে ছাদের উপর দেখিয়া, একটু সাহস পাইয়া হাঁকাহাঁকি করিয়া বলিল, "অ, কর্ত্তাবাবু, একবার নেবে আসুন—দেখুন সে, ঘনশ্যাম বাবুকে ডাকাতরা খুন করে গেছে।"

ডেপুটী বাবু। (উচ্চরবে) অ্যাঁ, ডাকাতরা কি পালিয়ে গেছে?—কোন্ দিকে গেল, তুই বল্‌তে পারিস্?

ডেপুটী বাবুর একজন অনুচর-ভৃত্য বলিল, "ডাকাত কি আর এখানে থাকে? যে আপনার বন্দুক! ঐ বন্দুক দেখেই তারা পালিয়েছে—"

ডেপুটী বাবু তখন ঈষৎ হাস্য করিয়া, ভৃত্যগণ-সমভিব্যাহারে নীচে নামিলেন। বাগানের ফটক খোলা হইলে, বিস্তর লোক একত্র হইল। কনষ্টেবল, ইন্‌স্পেক্টর, শেষে পুলিস সাহেব আসিলেন। পাড়ার সকলে বলাবলি করিল, "কি আশ্চর্য্য কাণ্ড! ডেপুটী বাবুর বাড়ী ডাকাতি! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা?"

সেই ভূপতিত মূর্চ্ছিত বাবুটীর নাম নবঘনশ্যাম নন্দী। মুখে জল দিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া তোলা হইল। তিনি অচিরে সংজ্ঞা লাভ করিলেন। দেখা গেল, প্রহার সাংঘাতিক নহে। কেবল নাক দিয়া রক্ত পড়িতেছে। কতকটা ভয়ে কম্পিত হইয়া তিনি মূর্চ্ছা যান। ডান হাতের গাঁট তাঁহার বিষম ফুলিয়াছে— এবং তাহাই বড় কন্ কন্ করিতেছে। চোখে, মুখে, নাকে, কপালে ঠাণ্ডা জল দেওয়াতে এবং অনবরত পাখার বাতাস করাতে, তিনি অনেকটা সুস্থ এবং প্রকৃতিস্থ হইলেন।

ওদিকে উদ্যানে ডাকাত এখনও লুকাইয়া আছে কি না—তাহারই অনুসন্ধান চলিল। বাঁশবন, শরবণ, কলাবন—সমস্ত বন খোঁজা হইল। কেহ বা পুলিস সাহেবের হুকুমে বড় বড় আমগাছে উঠিয়া দেখিতে লাগিল,—গাছের মগ্‌ডালে ডাকাত বসিয়া আছে কি না? কেহ বা পেয়ারা গাছ নাড়া দিতে লাগিল;—ডাকাত থাকে ত ঝরিয়া পড়িবে। কেহ খেজুর গাছে ঢিল মারিতে লাগিল। এত অনুসন্ধানেও ডাকাত মিলিল না। পুলিস সাহেব ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া অনুচরগণের প্রতি বলিলেন, "তোমরা বড়ই অকর্ম্মণ্য!—এই বাগানের মধ্যে তোমরা কি ডাকাতির কোন চিহ্নও পাইলে না?" তখন আবার মসাল জ্বলিয়া, লণ্ঠন লইয়া, চিহ্ন-অনুসন্ধান হইতে লাগিল। বাঁশবনের কাছে একজন কনষ্টেবল একটা রুমাল কুড়াইয়া পাইল। আনন্দ-কোলাহলে, সকলে সেই রুমাল আনিয়া পুলিস-সাহেবকে দিল।

অতি ধীর, গম্ভীরভাবে, অথচ হর্ষোৎফুল্ললোচনে স্বয়ং পুলিস-সাহেব সেই রুমাল পরীক্ষা করিতে লাগিলেন! ডেপুটী বাবু, পুলিস-সাহেবের বাম পার্শ্বে গিয়া বসিলেন। ইনস্পেক্টর বাঙ্গালী। তিনি ঈষৎ দূরে দাঁড়াইয়া সাহেবের উপদেশমত রুমালের বর্ণন লিখিতে লাগিলেন। সে লেখার মর্ম্মানুবাদ এইরূপ;—

(১) রুমাল রেশমী। দেখিতে হইবে, কোথাকার রেশম? কোন্ হাটে, বাজারে বা দোকানে, কাহাকর্ত্তৃক, কোন্ তারিখে, কাহাকে বিক্রীত হইয়াছিল? যে ব্যক্তি রেশম খরিদ করে, সে কোন জাতি? ঘর কোথা? তার রুমাল-বয়নের কারখানা আছে কি না?

(২) রুমালবিক্রেতা কে? কবে কোন্ তারিখে কাহাকে সে বিক্রয় করে? মূল্য কত?

(৩) রুমাল ধোপাবাড়ী গিয়াছিল। ধোপার চিহ্ন। সে কোথাকার ধোপা? কোন্ জাতি? বয়স কত? কাহার কাহার নিকট হইতে সে কাপড় কাচিতে লয়? কত দিন সে এ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে?

(৪) রুমালের চারি কোণে চারিটী ফুল আছে। ফুলের আকৃতি *। কোন্ কোন্ শিল্পী এদেশে এরূপ ফুল তৈয়ারি করে?

(৫) রুমালের চারিধারে বড় বড় বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা আছে—"মনে রেখো ভুলোনা।" কোন্ কোন শিল্পী ইহার কারিকর?

(৬) রুমালের এক কোণে বাঁধা একখানি বাঙ্গালা হাতের-লেখা-কাগজ পাওয়া গেল। তাহাতে দুইটী কবিতা লেখা আছে। একটী কবিতা কালো কালীতে, অপরটী রাঙ্গা কালীতে লেখা।

(ক) কালো কালীর কবিতা;—

বঁধু! কি আর বলিব আমি!
মরণ জীবনে জনমে জনমে,
প্রাণনাথ হয়ো তুমি॥ ১॥

তোমার চরণে আমার পরাণে,
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া, এক মন হৈয়া,
নিশ্চয় হৈলাম দাসী॥ ২॥

ভাবিয়াছিলাম, এ তিন ভুবনে,
আর মোর কেবা আছে।
রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই,
দাঁড়াব কাহার কাছে॥ ৩॥

একুলে ওকুলে, দুকুলে গোকুলে,
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া, শরণ লইনু,
ও দুটী কমল পায়॥ ৪॥

না ঠেলহ ছলে, অবলা অখলে,
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু, প্রাণনাথ বিনে,
গতি যে নাহিক মোর॥ ৫॥

(খ) রাঙ্গা কালীর কবিতা ;—

রাই! তুমি সে আমার গতি!
তোমার কারণে, রসতত্ত্ব লাগি,
গোকুলে আমার স্থিতি ॥ ১ ॥

নিশি দিশি সদা, বসি আলাপনে,
মুরলী লইয়া করে।
যমুনা সিনানে, তোমার কারণে,
বসে থাকি তার তীরে ॥ ২ ॥

তোমার রূপের, মাধুরী দেখিতে,
কদম্ব তলাতে থাকি।
শুনহ কিশোরি, চারি দিক হেরি,
যেমন চাতক পাখী ॥ ৩ ॥

তব রূপ গুণ, মধুর মাধুরী,
সদাই ভাবনা মোর।
করি অনুমান, সদা করি গান,
তব প্রেমে হৈয়া ভোর ॥ ৪ ॥

(৭) এই কবিতা দুটী কাহার হাতের লেখা দেখিতে হইবে এবং ইহার অর্থ কি, উদ্দেশ্য কি, বুঝিতে হইবে। যদি সহজে কাহার হাতের লেখা ঠিক করা না যায়, তবে এই কবিতা দুইটী লিথোগ্রাফ করিয়া ছাপাইয়া থানায় থানায় পাঠাইতে হইবে।

রুমালের বর্ণন লিপিবদ্ধ হইলে, পুলিস-সাহেব, নবঘনশ্যামের এজেহার গ্রহণে উদ্যোগী হইলেন। ঘনশ্যাম বলিলেন, "অদ্য আমি বিকলাঙ্গ, অসুস্থ এবং অপ্রকৃতিস্থ ; সব কথা গুছাইয়া এখন বলিতে পারিব না।" পুলিস-সাহেব বলিলেন, "আচ্ছা, আপনি অল্প স্বল্প যা পারেন, তাই আজ বলুন। কারণ অদ্য রাত্রি হইতেই আমি অনুসন্ধান আরম্ভ করিব। আমার প্রিয়বন্ধু রামচন্দ্র বাবুর বাড়ী ডাকাতি হইয়াছে, আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না।" ডেপুটী রামচন্দ্র বাবু বলিলেন,

"ঘনশ্যাম বাবু আমার বিশেষ বন্ধু এবং সাধু-চরিত্র।" এইরূপ কথাবার্ত্তার পর ঘনশ্যাম বাবুর সংক্ষিপ্ত এজেহার গৃহীত হইল ;—

"আমার নাম শ্রীনবঘনশ্যাম নন্দী। জাতি কায়স্থ ; বয়স ২৪ বৎসর। নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত——গ্রামে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধিধারী। আমি ওকালতী পরীক্ষা দিব। কলিকাতায় পড়ি। আমি জমিদার।

"আমি শিরঃপীড়া-রোগগ্রস্ত। ডাক্তারের পরামর্শে হুগলীতে আমি বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আজ তিন মাস আসিয়াছি। আমার বাসা বাবুগঞ্জে। রাত্রে, চন্দ্রালোকে, গঙ্গার বায়ু-সেবন, আমার চিকিৎসকের ব্যবস্থা। আমি প্রত্যহ এইরূপ ভাবে চিকিৎসিত হই। ইহা ব্যতীত দিবসে অন্যান্য ঔষধও সেবন করি।

"অদ্য আমি বায়ু-সেবন করিয়া বাঁশবেড়ে হইতে ফিরিতেছি। পথে অসহনীয় প্রস্রাব-পীড়া হইল। মাঝাদিগকে বলিলাম, ডেপুটী বাবুর বাটীর সম্মুখে নৌকা থামাও। আমি ধীরে ধীরে তীরে উঠিয়া আসিতেছি, দেখিলাম, একদল ডাকাত লাঠি, সড়কি, বন্দুক, ছোরা লইয়া ডেপুটী বাবুর বাটী আক্রমণার্থ বেগে ধাবিত হইতেছে। আমি "কেও, কেও" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম। কার্য্যে বাধা পাইয়া, তাহারা অগ্রে আমাকেই আক্রমণ করিল। তারপর মহাগোলযোগে সকলে জাগিয়া উঠিল। বেগতিক দেখিয়া ডাকাতরা পলাইল।

"ডাকাতদের চেহারা কৃষ্ণবর্ণ। ঝাঁকড়া চুল। মুখ কালীচুণ-মাখা। তাহাদিগকে দেখিলে বোধ হয় চিনিতে পারি।

"আমাকে মারিয়া ফেলা তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তাহারা গৃহপ্রবেশের চেষ্টায় ছিল ; আমি তাহাদের কার্য্যে বাধা দেওয়ায়, আমাকে প্রহার আরম্ভ করে।"

ঘনশ্যাম বাবুর এজেহার লইয়া পুলিস-সাহেব মন্তব্য লিখিলেন "কালো চেহারা, ঝাঁকড়া চুল এবং মুখে-কালী চুণ-মাখা লোকের অদ্য হইতে বিশেষ অনুসন্ধান করা আবশ্যক।"

তার পর ঝীয়ের এজেহার লওয়া আবশ্যক হইল। কিন্তু ঝী তখন পলাইয়া গৃহিনী অন্নপূর্ণার আশ্রয় লইয়াছে। ঝাটা বলিতেছে, "মা! তোমরা আমাকে কেটে ফেলো, তাতে রাজী আছি ; কিন্তু আমি মেয়েমানুষ ;—সাহেবের সুমুখে দাঁড়িয়ে কথা ব'লতে পারবো না।"

অন্নপূর্ণা। আচ্ছা, তুই এখন থাম্। আমি তাঁকে ডেকে আগে জিজ্ঞাসা করি—তারপর, তোর যাতে ভাল হয়, তা কর্‌বো।

ঝী। (কাঁদ কাঁদ সুরে) আমরা গরীব দুঃখীর মেয়ে, গতর খাটিয়ে খেতে এসেছি! আমি কোন দোষের দুষী নই। তা, আমি লাজ-শরমের মাথা খেয়ে, সাহেবের কাছে কেমন ক'রে দাঁড়াবো গো! আমার পোড়া অদেষ্টে কি শেষে এই ছিলো?

ঝীয়ের নাকে কাঁদার নিবৃত্তি নাই। সে একটানা সুর বুঝি অনন্তকালেও থামিবে না। বুঝি সে সুরের তাল নাই, ফাঁক নাই, সোমের ঘরও নাই! বুঝি সে অনন্ত একটানায় কখন জোয়ার-ভাটা নাই!

গৃহিণীর আদেশক্রমে কর্ত্তা অন্দরে আসিলেন। অন্নপূর্ণা রামচন্দ্রকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেন। ডেপুটী বাবু উত্তর দিলেন, "তার আর ভাবনা কি? আমি সাহেবকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিতেছি।"

এই বলিয়া, রামচন্দ্র বহির্বাটীতে আসিয়া সাহেবকে বলিলেন, "আমার ঝিটী অতি লজ্জাশীলা; সে, আপনার সাক্ষাতে বাহির হইতে সঙ্কুচিত হয়। যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে, তবে তাহার এজেহার আমি লিখিয়া লইয়া প্রাতে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব।"

পুলিস-সাহেব। ইহতে আমার কিছুই আপত্তি হইতে পারে না। আপনি তাহাই করিবেন।

পুলিস-সাহেব এইরূপ ডাকাতির তদারকের প্রথমপর্ব্ব শেষ করিয়া, রাত্রি প্রায় ৪ টার সময়, সদলে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। উদ্যানে প্রায় সহস্রাধিক লোক একত্র হইয়াছিল। স্বনগ্রাম বাবু খুন হন নাই এবং ডেপুটী বাবুর লোহার সিন্দুক ভগ্ন হয় নাই,—দেখিয়া তাহারা দুঃখিতান্তঃকরণে স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেল। এ গোলমালে বোধ হয় সহরের পনের আনা লোক জাগ্রত হইয়াছিল। জাগেন নাই, কেবল সেই ডেপুটী-কন্যা শ্রীশ্রীমতী কমলিনী। সকলে চলিয়া গেলে, কমলিনীর গৃহের দ্বার ঠেলিয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"মা. কমল, ওমা কমল—উঠ মা—"

কমলিনী আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া, খিল খুলিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কি হয়েছে, মা, কেন মা আমাকে উঠাচ্চ?"

অন্নপূর্ণা। মা, ঘরে আজ ডাকাত পড়েছিলো—তা ভাগ্যে—

কমলিনী। বলো কি মা? বলো কি মা?—আমি কি তার কিছুই জানিতে পারিলাম না?—

অন্নপূর্ণা। তুমি মা, সমস্ত দিন পড়াশুনা কর—পরিশ্রম হয়, তাই খুব ঘুমিয়ে পড়েছিলে—

কমলিনী। "ডাকাত কি মা!—ডাকাত! ডাকাত!!"—বলিতে বলিতে ভয়ে ঠাই ঠাই কাঁপিয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। অন্নপূর্ণা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নগরে আজ মহা কোলাহল। ঘরে ঘরে লোক ডাকাতির গল্প করিতেছে। কেহ বলিতেছে, পুলিস-সাহেবের বুকে ছোরা মেরে ডাকাতেরা পালিয়েছে। কেহ আস্ফালন করিতেছে, "ডাকাতদের এক এক গাছ লাঠি ঠিক্ ১৮ হাত লম্বা! সে লাঠির কাছে এগোয় কে?" কোন নবীনা ভামিনী, ঘনশ্যামের উদ্দেশে দুঃখ করিতেছেন, "আহা! পরের ছেলে হাওয়া খেতে এসেছিলো,—ডাকাতরা তাকে কিনা আধখুন ক'রে ফেলে গেল গা!" একজন প্রবীণা বলিলেন, "আহা! রাত্রে ডাকাতে ডেপুটী বাবুর সর্ব্বস্বটী লুঠে নিয়ে গেছে, প'রবার কাপড়টী নাই! পেতে শোবার মাজুরি খানি নাই! ভিজিয়ে খাবার একটি বাটি পর্য্যন্ত নাই! কি দুঃখ গা! ভগবানের এতই কষ্ট কি দিতে হয়?"

অন্যদিকে কেবল হাসি, আর কৌতুক। একজন প্রতিবেশী ভট্টাচার্য্য তালে তালে হাততালি দিতে দিতে গাইতে লাগিলেন;—

প্রভাত হইল বিভাবরী,
বিদ্যারে কহল সহচরী,
সুন্দর পড়েছে ধরা, শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা,
সখী তোলে ধরাধরি করি॥

সেই সুরে সুর দিয়া অন্য জন গাইলেন ;—

লুকায়ে প্রণয় কৈনু, কুলকলঙ্কিনী হৈনু,
আকুল পরাণ মোর অকূল পাথারে।
সুজন নাগর পেয়ে, আগু পাছু নাহি চেয়ে,
আপনি করিনু প্রীতি কি দূষিব তোরে॥
লোকে হৈল জানাজানি, আদালতে কাণাকাণি,
আপনা বেচিয়া এত কে সহিতে পারে।
যায় যা'ক জাতি কুল, কে চাহে তাহার মূল,
ভারতে সে ধন্য শ্যাম ভাল বাসে যারে॥

তৃতীয় ব্যক্তি গাহিল,—

চল হে ডাকাত ধরি গিয়া!
রমণীমণ্ডল ফাঁদ দিয়া।
তেয়াগিয়া ভয় লাজ, সকলে করহ সাজ,
সে বড় লম্পট কপটিয়া।
জানে নানা মত খেলা, দিবস রেতের বেলা,
চুরী করে বাঁশী বাজাইয়া॥
সে বটে বসন-চোরা, তাহাকে ধরিয়া মোরা,
পীতধড়া লইব কাড়িয়া।
সদা ফিরে বাঁকা হয়ে, আজি সোজা করি লয়ে,
ভারত রহিবে পহরিয়া॥

ঠাকুরবাড়ীতে, অতিথিশালায়, আদালতগৃহে, কলেজে, স্কুলে—হাটে, মাঠে, গৃহে, গোঠে—সর্ব্বত্রই ঐ ডাকাতির কথা। কেহ বীররস, কেহ আদিরস, কেহ বা রৌদ্ররসে ডাকাতির রূপগুণরস বর্ণন করিতেছে! ডাকাতিটাকে কেহ বলিতেছেন, মহাকাব্য; কেহ খণ্ডকাব্য; কেহ বা গীতিকাব্য বলিতেছেন। এমনও লোক আছেন, যিনি বলিতেছেন যে, ইহা কেবল রামায়ণ-মহাভারতের একত্র সমাবেশ! অথবা কবিরঞ্জন-ভারতচন্দ্রের শুভ সম্মিলন! কিংবা যেন কালিদাস-সেক্সপীয়রের প্রেম-আলিঙ্গন! ফল কথা, কোন

রকম বর্ণনাতেই কেহই তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছেন না। শেষে একজন রসিক পুরুষ বলিয়া ফেলিলেন, এটা—ভগবদ্গীতা। দেখা গেল, যেন ইহাতে অনেকের মন কতকটা আশ্বস্ত হইল।

এই ডাকাতি ব্যাপারে হুগলী-ব্রাঞ্চস্কুলে, আজ মহাকুরুক্ষেত্র-কাণ্ড। তখন শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর দাস ব্রাঞ্চস্কুলের হেডমাষ্টার বা অধিপতি ছিলেন। বীরেশ্বর বাবুর প্রচণ্ড প্রবল প্রতাপ। তাঁহার দস্তে, বাঘে বলদে এক ঘটে জল খায়। দীর্ঘাকার, হৃষ্টপুষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ,—তাঁহার সে বিভীষণ মূর্ত্তির পানে চায় কে? তাঁহার এক একটা হুঙ্কারে, দু-দশটা বালক মূর্চ্ছা যাইত। পদভরে মেদিনা কাঁপাইয়া, তিনি কোন ক্লাস দিয়া চলিয়া গেলে, বালকগণ অমনি অবনত-বদনে, ভয়ে চক্ষুর্দ্বয় মুদিয়া ফেলিত।

বালক-শাসনের তাঁহার নানারূপ প্রহরণ ছিল। প্রথম দন্তকিটিমিটি এবং তীব্র চাহনি। দ্বিতীয়, গভীর চীৎকার এবং ঠেলিয়া দেওয়া—"যাঃ ক্লাসে যেয়ে স্থির হয়ে বোসগে।" তৃতীয়, কাণমলা, চড়, চাপড়, ঘুষা, কীল, চুল ধরে টানা। চতুর্থ, চাবুক। পঞ্চম, হাতা।

হাতাটা কি রকম অস্ত্র, কেহ বুঝিলেন কি? বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র এবং বীরেশ্বর বাবুর হাতা—বোধ হয় একই জিনিস। হাতা ধাতব নহে, দারুনির্ম্মিত। স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা ইহার শিল্পী কিনা, তাহা সম্যক্‌রূপে অবগত নহি। ইহার নির্ম্মাণকৌশল বড়ই বিচিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। দৃশ্যত ঠিক সাধারণ লৌহ-হাতার ন্যায় বলিয়াই উহার নাম হাতা হইয়াছে। সুগোল, সুলম্বা, বার্ণিস-করা, ফুলকাটা, প্রায় দেড় হাত পরিমিত সেই হাতার বাঁট। বাঁটের অগ্রভাগ এবং শেষভাগ হাতীর দাঁতে বাঁধান। বাঁট শেষ হইলে, প্রফুল্ল আস্যবৎ চক্রাকার, মেহগ্‌নী কাঠের এক চক্রদণ্ড। সেই চক্রদণ্ডে ঝাঁজরীর ন্যায় প্রায় শতাধিক ছিদ্র। সেই হাতা-হস্তে, বীরেশ্বর বাবুর বিরাট-মূর্ত্তি দর্শন করিলে মনে হইত, দণ্ডধারী যম ইহাঁর কাছে কোথায় লাগে?

হাতা-ব্রহ্মাস্ত্র, বৎসরের মধ্যে কদাচিৎ কখন, কালেভদ্রে প্রয়োগ করিতে হয়। গুরুতর অপরাধে, গুরুতর দণ্ড। যে বালকের রোগ, এ দণ্ডেও না দূর হয়, সে স্কুল হইতে দূরীভূত হয়।

হাতার প্রয়োগ—অঙ্গের কোন্ অংশে?—কর-কমলে। হাতার দিন, একঘণ্টা পূর্ব্বে স্কুলের ছুটী। সমুদায় বালক এবং শিক্ষকগণ যথানিয়মে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, ব্রাঞ্চস্কুলে সেই সুবৃহৎ হলে দাঁড়াইয়া, বসিয়া, হাতার প্রক্রিয়া নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন।

বেলা প্রায় ৩টা। বালকগণ আজ আমোদ করিয়া বলিতেছে, "অরে, আজ হাতা হবে রে!" শিক্ষকগণ, একঘণ্টা পূর্ব্বে ছুটী হইবে বলিয়া শীঘ্র শীঘ্র পাঠ শেষ করিতেছেন। দ্বারবান্ ফটক খুলিয়া দিবে বলিয়া, ফটকের নিকট দণ্ডায়মান। মালীটা জলের ঘরে চাবী দিবার যোগাড়ে আছে। আর, দপ্তরী-সাহেব টুপিটী ঝাড়িয়া, পুনরায় মাথায় দিবার উপক্রম করিতেছে। এমন সময় তিনটা বাজিল। বীরেশ্বর বাবু ঘণ্টাধ্বনি করিতে লাগিলেন। আবৃত্তির ঘণ্টার ন্যায়, তাঁহার নিকট একটা ঘণ্টা থাকিত। স্কুল বসিবার এবং ছুটী হইবার কালে সেই ঘণ্টা তিনি স্বয়ং স্বহস্তে টুং-টুং-টুং রবে প্রায় পাঁচ মিনিট কাল বাজাইতেন। দেখিতে দেখিতে প্রায় পাঁচশত বালক, নয়জন শিক্ষক এবং দুই জন পণ্ডিত, সেই হলে একত্র হইলেন।

বিরাট দরবার। বেত্রহস্তে বীরেশ্বর বাবু বজ্রহস্ত দেবরাজের ন্যায় উচ্চাসনে সমাসীন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে নবীন দ্বিতীয় শিক্ষক এবং বামপার্শ্বে বৃদ্ধ প্রধান পণ্ডিত অবস্থিত। অন্যান্য শিক্ষকগণ তাঁহাদের পশ্চাতে বসিয়াছেন। সম্মুখে বালকমণ্ডলী নীরব, নিস্তব্ধ; স্বয়ং গাম্ভীর্য্য-মূর্ত্তি যেন সভায় সমুদিত।

তখন সর্ব্বজনসমক্ষে অপরাধী আনীত হইল। আদেশ মত, সে, হেডমাষ্টারের অদূরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার চেহারা পাতলা ছিপ্ ছিপে গৌরবর্ণ; ডবলব্রেষ্ট কামিজ; সোনার বোতাম; এলবার্ট টেড়ি; গোঁফের ঘোরকৃষ্ণবর্ণ রেখা; আঙটী;—ইত্যাদি তাঁহাতে সমস্তই আছে। ঐ ব্রাঞ্চস্কুলে থাকিয়াই তিনি উপরি উপরি দুইবার এনট্রেন্স ফেল হন। ইহার পূর্ব্বে চুঁচুড়া ফ্রীচার্চ্চ হইতে কতবার তিনি প্রবেশিকা-সাগর পার হইতে চেষ্টা করেন, তাহার হিসাব পাওয়া দুষ্কর। একটী বালক সে বৎসর নূতন এনট্রেন্স পাশ করিয়া, হুগলী কলেজে এলে পড়িতেছিল। সেই বালকটী বলিল, "আমি যখন এ, বি, সি, পড়ি, উনি তখন এনট্রেন্স ক্লাসে উঠেন; উনিই আমাদের তখন মানে বলে দিতেন।"

সে যাহা হউক, অপরাধী কৈলাসচন্দ্র বীরপুরুষের ন্যায় নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া, একদৃষ্টে

আপন মনে চাহিয়া রহিলেন, যেন কিছুতেই দৃক্‌পাত নাই, যেন আজ কিছুই ঘটে নাই, যেন সংসার-সমুদ্রে ঘোর তরঙ্গ-তুফান উঠে নাই।

যেমন অপরাধী নির্ভয়, নিরুদ্বেগ; বিচারকও সেইরূপ অথবা তদপেক্ষা ভয়ঙ্করী নির্ভয়া মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। বীরেশ্বর বাবুর আরক্ত লোচনদ্বয় ধ্বক্‌ধ্বক্ জ্বলিতেছে; হস্তস্থিত হাতা-অস্ত্র ঘন ঘন ঘুরিতেছে; দক্ষিণপদের জুতা ঘন ঘন ক্ষিতিতল ঘর্ষণ করিতেছে; আর তাঁহার মুখের সেই ভৈরব ভঙ্গীতে জীবকুল বিভীষিকা দেখিতেছে। বীরেশ্বর বাবু ঘোর বাজখাঁই-রবে কৈলাসচন্দ্রকে বলিলেন, "দেখ কৈলাস, তুমি আজ গুরুতর অপরাধ করিয়াছ—তোমার শাসন আবশ্যক।"

নির্ভয় কৈলাস ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন,—"আমার অপরাধ নাই; আমাকে অনর্থক দণ্ড দিবেন কেন?"

তখন বীরেশ্বর বাবু যেন আষাঢ়ের নব মেঘবৎ গম্ভীর গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন; শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্রের ন্যায়, তাঁহার হাতা বোঁ বোঁ শব্দে ঘুরিতে লাগিল। হেড-মাষ্টারের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিষম দুলিতে লাগিল; চেয়ার নড়িয়া উঠিল। কটুকষায়িত লোচনে রুক্ষস্বরে কৈলাসকে পুনরায় বলিলেন, "দেখ্, কৈলেসা, আজ তোর হাড়গোড় চূর্ণ করে ফেল্‌বো!—তোর মুখ থেঁতো কর্‌বো—নাক্ দিয়ে একসের রক্ত বার্ ক'রে ফেল্‌বো।"

কৈলাস এবার যোড়হাতে অথচ নির্ভয়ে ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনি আমার অপরাধের প্রমাণ লইয়া আমাকে ফাঁসি দিন্। দোষ করিলে অবশ্যই দণ্ড লইব।"

বীরেশ্বর। আজ তিন মাস হইল। আমি স্কুলের সকল শ্রেণীতে লিখিত নিয়ম প্রচার করিয়াছি যে, উপর তিন ক্লাসের ছাত্রগণ স্কুলমধ্যে কোন কারণে (শিক্ষকের অনুমতি ব্যতীত) নিম্ন ক্লাসের ছাত্রগণের সহিত মিশিতে বা কথা কহিতে বা বেড়াইতে পারিবে না। অদ্য তুমি বিপিনের সহিত মিশিলে কেন? কথা কহিলে কেন?

কৈলাস। (যোড়হাতে) এ নিয়মের আমি বিন্দু-বিসর্গও জানি না। আমি আপনার নিয়ম জ্ঞাত থাকিলে লঙ্ঘন করিব কেন?

বিরেশ্বর। কিঃ—স্কুলের সকলেই ও কথা জনিল, আর তুমি তাহা জান না?—পাষণ্ড! বদ্‌মাইস্! তুই জান্‌লিস্, এখনি তোর হাড়-এক-যায়গায় মাস-এক-যায়গায় করে ফেল্‌বো!

কৈলাস। (যোড়হাতে) আপনি রেজিষ্টরি খাতা দেখুন!—যেদিন আপনার সে নিয়ম প্রচার হয়, সেদিন নিশ্চয়ই আমি অনুপস্থিত ছিলাম। যাহা করিতে নাই, তাহা আমি করিব কেন?

বীরেশ্বর বাবুর ইঙ্গিতে দ্বিতীয় শিক্ষক, রেজষ্টরি বহি আনিয়া দেখিলেন, কৈলাসের কামাই প্রকৃত। যেদিন সে নিয়ম প্রচার হয়, সেদিন কৈলাস অনুপস্থিত। তখন দ্বিতীয় শিক্ষক একটু যেন অপ্রতিভ ভাবে, বীরেশ্বর বাবুর কাণে কাণে বলিলেন, কৈলাস যথার্থই বলিয়াছে যে, সেদিন সে উপস্থিত ছিল না।

কথা কাণে কাণে সংগোপনে বলা হউক, কিন্তু ধূর্ত্ত কৈলাস সমস্তই বুঝিলেন। তখন তিনি যোড়হাতে ক্রন্দনের সুরে চোখের জল ফেলিবার উপক্রম করিয়া—অথচ সতেজে, বলিতে লাগিলেন, "আপনি সুবিচার করিয়া দেখুন—আমি দোষী হই, আমাকে মারিয়া ফেলুন, তাহাতে আপত্তি করিব না। আপনি রেজষ্টরিবুক্ আনিয়া দেখুন,—আমি সেদিন অনুপস্থিত ছিলাম কিনা;—সেদিন যদি আমি উপস্থিত হইয়া থাকি, তবে এখনই, এই মুহূর্ত্তেই আমাকে এই স্থলে ফাঁসি দিন্। আমি কোন অপরাধ কখন করি নাই, কেবল দুষ্টলোকে আমার নামে মিথ্যা বদনাম রটায়।"

(কৈলাসচন্দ্রের, রুমালে মুখ ঢাকিয়া, ক্রন্দন-ধ্বনি।)

বীরেশ্বর বাবু মনে মনে ঈষৎ অপ্রস্তুত হইলেন। গম্ভীরভাবে, নরম সুরে, প্রকাশ্যে বলিতে লাগিলেন, "আচ্ছা, সে কথা যাউক। তুমি আজ বিপিনকে অতি কটূ কথা বলিয়া গালি দিয়াছ কিনা বল? তুমি বড়ই গর্হিত আচরণ করিয়াছ। তোমাকে আজ ঘোরতর শাস্তি দিব।"

কৈলাসচন্দ্র তখন মুখের রুমাল খুলিয়া ফেলিলেন। তাঁহার উজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয় হইতে যেন প্রখর রশ্মি বাহির হইতে লাগিল। তেজে যেন বক্ষঃস্থল ফুলিয়া উঠিল। ক্রোধে যেন মুখ রক্তবর্ণ হইল। সেই বিরাট সভার চারিদিকে কটমট চাহিয়া, ভীষণ ভ্রূ-ভঙ্গীতে সভ্যমণ্ডলীকে যেন ভয়াবনত করিয়া, তিনি বক্তৃতার সুরে বলিতে আরম্ভ করিলেন;— "সকলে বিচার করিয়া দেখুন, আমার কোন দোষ নাই। আমি ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, যেদিন, ঐ নিয়ম প্রচারিত হয়, সেদিন আমি স্কুলে উপস্থিত ছিলাম না। এক্ষণে আমার বিনীতভাবে প্রার্থনা যে, হেডমাষ্টার মহাশয় রেজেষ্টরি খাতা খুলিয়া

বীরেশ্বর ও কৈলাসচন্দ্র।
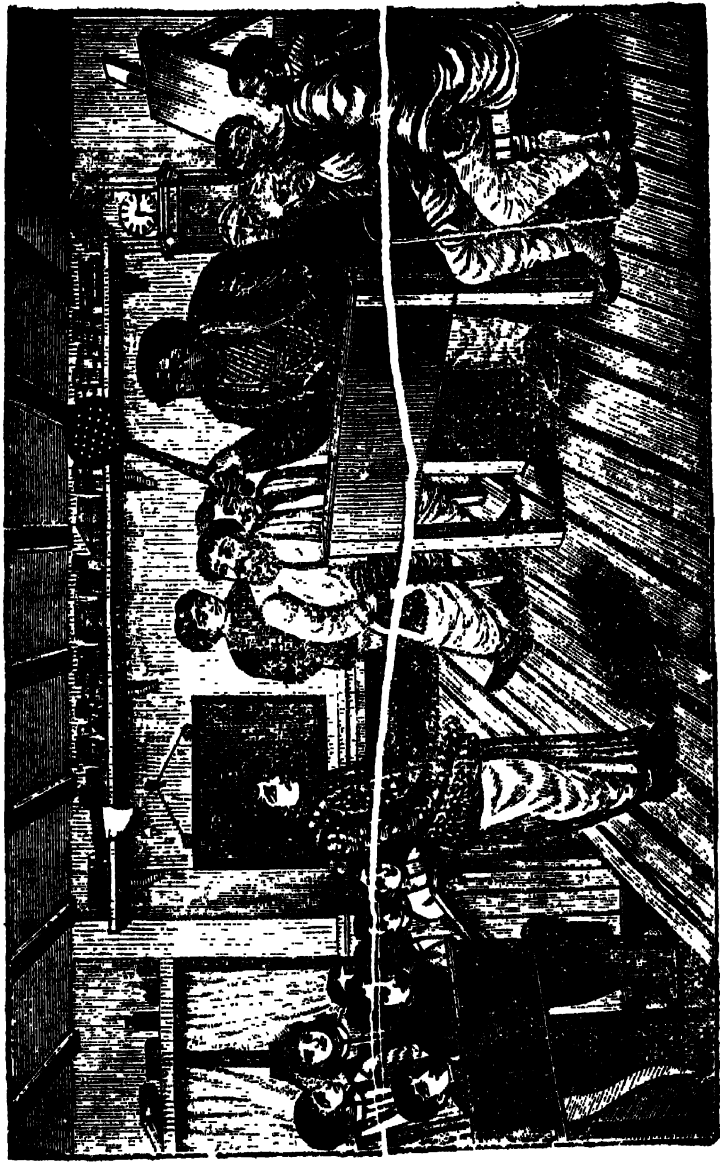
সর্ব্বজনসমক্ষে প্র চার করুন, প্রকৃতই আমি সেদিন স্কুলে আসি নাই। যদি তিনি এ কথা প্রকাশ করিতে সাহসী না হন, তাহা হইলে বুঝিব, আমার অদৃষ্ট মন্দ,—অন্যায় বিচারে, বিনাদোষে দণ্ডিত হইলাম।"

এই কথা শুনিয়া, রক্তচক্ষু বীরেশ্বর বাবু ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া উঠিলেন। হঠাৎ, বিনামেঘে বজ্রপাতের ন্যায় সেই বিকটধ্বনিতে বালকমণ্ডলী চমকিয়া উঠিল। চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে বীরেশ্বর বাবু সেই হস্তস্থিত হাতাচক্র, টেবিলের উপর সজোরে নিক্ষেপ করিলেন। নাসারন্ধ্রদ্বয় দিয়া ঘন ঘন প্রলয়-নিশ্বাস বহিতে লাগিল। ক্রোধে, ক্ষোভে, মোহে দেহ যেন ফুলিয়া উঠিল। হিরণ্যকশিপু বধের জন্য আসরে যেন নরসিংহ অবতার অবতীর্ণ হইলেন!

বীরেশ্বর বাবুর সেই সর্ব্বলোক-ভয়প্রদ, অমানুষ চীৎকারটা কি?—"চুপ রও—বদ্‌মাইস, পাজি, নচ্ছার! ফের যদি কথা কহিবি, তবে এই হাতা ক'রে তোর মাথা ভেঙ্গে ফেলিব—"

এই বলিয়া, তিনি হাতা লইয়া টেবিলে এক ভীষণ আঘাত করিলেন। তদ্দণ্ডেই হাতা ঘুরাইতে ঘুরাইতে, পুনরায় সেইরূপ বিকটরবে তিনি বলিলেন, "তুই যদি আর একটী টুঁ শব্দ কর্‌বি, ত তোর এখনি জিব্ উপুড়ে ফেল্‌বো।"

কৈলাসচন্দ্র নীরব, নিথর, নিশ্চল,—অবনত-বদন, যোড়হস্ত।

পার্শ্বস্থিত বৃদ্ধ পণ্ডিত, বীরেশ্বর বাবুর কাণে কাণে কি কথা বলিলেন। এই গুপ্ত কথাবার্ত্তার পর, বীরেশ্বর বাবু একেবারে যেন শান্তমূর্ত্তি হইলেন। তিনি ঝিমু আওয়াজে ডাকিলেন, "বিপিন, বিপিন, এদিকে এস।" অতি মিহি-সুরের অনুকরণ করিলেও, চীৎকারে গলা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, বীরেশ্বর বাবুর আওয়াজ বড়ই মোটা বলিয়া বোধ হইল।

বিপিনচন্দ্র হৃষ্টপুষ্ট বালক; নবীন নধর গঠন; শুক্লপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধনশীল; বয়স দশ এগার বৎসরের অধিক নহে।

বিপিনকে কেহ চিনিতে পারিলেন কি? কমলিনীর ছোট ভাই,—সেই বিপিন! গৃহ-শিক্ষক নগেন্দ্রের কাছে বিপিনের সেই একুষ্টা বুঝাইয়া লইবার কথা মনে আছে কি? বিপিন তখন এন্‌ট্রেন্স ক্লাসে পড়ে! এখন সে মেধাবি বালক। হুগলী ব্রাঞ্চস্কুলের থার্ডইয়ার ক্লাসে অর্থাৎ ষষ্ঠশ্রেণীতে পড়িতেছে।

আদেশ মত, বিপিন সম্মুখে আসিলে, বীরেশ্বর বাবু ধীরভাবে বলিলেন, "বিপিন, কৈলাস তোমাকে কি কু-কথা বলিয়াছে, তাহা তুমি বল।" বিপিন বালকমাত্র—বিরাট-সভার রঙ্গভঙ্গ দেখিয়া, সে থতমত খাইল; মুখ দিয়া তাহার আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। বীরেশ্বর বাবু, বিপিনের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "বিপিন, তোমার কোন ভয় নাই; যাহা জান, তাহা স্পষ্ট করিয়া বল।"

বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয়ও বিপিনের উদ্দেশে বলিলেন, "তা, কোন দোষ নাই, তুমি বল।"

বিপিনের চোখ ছল ছল করিতে লাগিল। শরীর যেন ঈষৎ দুলিতে লাগিল। কথা কয় কয়, যেন সে আর কহিতে পারে না; মুখ ফোটে ফোটে, যেন আর ফুটিতে পারে না।

বীরেশ্বর বাবু ধীর অথচ একটু কড়া স্বরে আবার বলিলেন, "বিপিন, তুমি যা বলিবে, শীঘ্র বল—আর বিলম্ব করিও না।"

তখন কাঁদ-কাঁদ বিপিন, আধ-আধ কথায়, ভাঙা-ভাঙা স্বরে, জড়াইয়া জড়াইয়া, আস্তে আস্তে বলিতে লাগিল, "ঐ, উনি, আমাকে আজ বড় বিশ্রী কথা বলেছেন। আমি মালীর ঘরে জল খেতে গেছি,—আর উনি আমার সঙ্গে সঙ্গে যেয়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন,—

"ওরে বিপিন, তোর বড়-দিদিকে কোন্ ডাকাতে ধল্লে রে!—ঘনশ্যাম ডাকাত ধরেছে নয় রে?" তার্ পর "আরে, ছি ছি ছি" বলে, উনি হাততালি দিতে লাগ্‌লেন!"

এই কথা বলিয়া বিপিন কাঁদিতে লাগিল।

বীরেশ্বর। তুমি কেঁদোনা, কেঁদোনা,—যা কিছু বলিবার আছে, এই বেলা বলো।

বিপিন কাঁদিতে লাগিল, কিছুই বলিতে পারিল না।

বীরেশ্বর। কৈলাস তোমার গায়ে চিঠি ছুড়ে মেরেছিলো নয়?—সে চিঠি কৈ?

বিপিন। সে চিঠি বাবার কাছে। আমি আজ দুপুর বেলা যখন "জল খেতে" বাসায় গেছলুম, তখন সে চিঠি মাকে দেখাই। মা, বাবাকে কাছারি থেকে ডেকে পাঠালেন। বাবা সে চিঠি নিজে রেখে দিয়েছেন, আমাকে ফিরে দেন নাই।

বিপিন যে ক্লাসে পড়ে, সেই ক্লাসের মাষ্টার রতিকান্ত বাবু, বীরেশ্বর বাবুকে বলিলেন, "সে চিঠি বিচারের সময় আবশ্যক হইবে বলিয়া, ডেপুটী বাবুর কাছে থেকে আনা হয়েছে।"

বীরেশ্বর। কৈ সে চিঠি? আমাকে দাও।

রতিকান্ত বাবু সে পত্র, হেডমাষ্টারকে হাতে হাতে অর্পণ করিলেন। বীরেশ্বর বাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন, "অদ্যকার বিষয় বড় গুরুতর। কৈলাস অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত দুরাচার হইয়া উঠিয়াছে। ভদ্রলোকের কুলে কলঙ্ক অর্পণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। উহার উপযুক্ত কঠোর দণ্ড আবশ্যক।—এই বালক বিপিনচন্দ্র অতি সুশীল এবং সুবোধ। শিশু বলিয়া এবং নিকটে বাসা বলিয়া প্রত্যহ ১টা বেলার সময় আমি উহাকে বাসায় যাইয়া জল টল খাইয়া আসিবার জন্য অনুমতি দিয়াছি। অদ্য বিপিন বাসায় গিয়া মায়ের নিকট, কৈলাসের অত্যাচারের কথা বলে। স্ত্রীর অনুরোধে ডেপুটী বাবু কিয়ৎক্ষণের জন্য বাসায় আসেন। বাসায় আসিয়া তিনি পুত্রের কথায় আমাকে এই পত্র লিখিয়াছেন ;—

প্রিয়তম বীরেশ্বর,

অতি অল্প দিন মধ্যেই পরব্রহ্মের কৃপায়, আপনার সহিত আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিয়াছে। আপনার কর্তৃত্বাধীনে যে, বালকবৃন্দ সন্নীতি-পরায়ণ এবং সচ্চরিত্র হইবে, ইহাও আমার দৃঢ় ধারণা। বিপিন আপনার কাছে সুরুচিপূর্ণ শিক্ষা পাইবে বলিয়াই উহাকে ব্রাঞ্চস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছি। কিন্তু বড়ই ক্ষোভের বিষয়, অদ্য তাহার বিপরীত ভাব দেখিতেছি। কৈলাসচন্দ্র নামক কোন প্রথম শ্রেণীর বালক, স্কুল মধ্যে অতি অকথ্য ভাষায় বিপিনকে গালি দিয়াছে, হাততালি দিয়াছে। সকলেই বোধ হয় অবগত আছেন, আমার বালিকা কন্যা কমলিনী নিতান্ত সরলহৃদয়া, সুরুচি-স্বভাবা এবং পাশ্চাত্য-শিক্ষা-আরব্ধা। কিন্তু কালের কি কুটিল গতি! সেই কমলিনীর নামেই দুর্ব্বৃত্ত কৈলাস, কলঙ্ককালিমা আরোপ করিতে সাহসী হইয়াছে! কমলিনী এখন দ্বিপ্রহরিক নিদ্রিতা। তিনি যদি এ কথা শুনেন, তাহা হইলে বোধ হয়, অভিমানভরে, বিষপানে, প্রাণত্যাগ করিতে পারেন।

আর এক কথা বলিয়া রাখি। ঘনশ্যাম বাবু সাধুপুরুষ, সুরুচিসম্পন্ন এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ। কমলিনী এবং নবঘনশ্যামকে আমি যদি এক শয্যায় সুখশায়িত দেখি, তাহা হইলেও আমি বিশ্বাস করিতে পারি না যে, উভয়ের অভিসন্ধি মন্দ। কারণ, ঘনশ্যাম শিক্ষিত, কমলিনী শিক্ষিতা।

কুরুচিময় কৈলাস স্কুলের কলঙ্ক। সুরুচিভাব সুরক্ষার জন্য, কৈলাসের দণ্ড একান্ত প্রার্থনীয়। তোমারই রামচন্দ্র।

রামচন্দ্র বাবুর পত্রপাঠ শেষ হইলে, বীরেশ্বর বাবু কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিলেন। দর্শকমণ্ডলীও নীরব। কৈলাসও নীরব, নড়ন-চড়ন-বিহীন।

বীরেশ্বর, কৈলাসের দিকে তীব্রভাবে চাহিয়া গভীর-স্বরে আবার বলিতে লাগিলেন,—"কৈলাস! তুমি ভদ্রলোকের ছেলে। তোমার পিতা বুনিয়াদি, সম্ভ্রান্ত এবং তিনি সৎলোক বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই ভদ্রকুলে তুমি এরূপ কুলাঙ্গার হইলে কিরূপে? তুমি ত আর ছেলে-মানুষ নাই! তেইশ চব্বিশ বৎসর বয়স হইল, এখনও এন্‌ট্রেন্স পাস করিতে পারিলে না; পাস করা দূরে যাউক, তুমি অত্যন্ত দুরাচার হইয়া উঠিয়াছ। বিপিন অতি শিশু,—তাহার গায়ে ছড়া লিখে চিঠি ছুড়ে মার কেন? তুমি ভারি বদ্‌মাইস্, অসভ্য এবং অসচ্চরিত্র হইয়া উঠিয়াছ। এমনি কথাই কি চিঠিতে লিখিতে হয়?—ছি;—এই বয়সে এত ছড়া শিখলে কোথা?"

বীরেশ্বর বাবুর সেই ছড়া পাঠ,—

"কমলবনে কমলিনী করে কমল-খেলা।
নবঘনশ্যাম তথায় মুচকি হেসে গেলা॥
হেসে হেসে কচ্ছে ঘেঁসে বসে শ্যামরায়।
কমলিনী কমল মারে শ্যামরায়ের গায়॥
কমলমালা লয়ে ধনী বাঁধে শ্যামের হাত।
শ্যাম বলে মরি মরি বিষম আঘাত॥
হেনকালে ধেয়ে এলো ডাকাত দুজন।
শ্যামের মাথা ভেঙ্গে তারা হলো অদর্শন॥
কমলিনী কমলবনে লুকায়ে আবার।
হেলে দুলে হেসে ভেসে খেলে চমৎকার॥"

এই ছড়া শুনিয়া, কোন কোন শিক্ষক একটু আধটু মুচ্‌কে হাসিলেন। বৃদ্ধ পণ্ডিতটী একটু অধিক মাত্রায় সে হাসিতে যোগ দিলেন। ক্রমশ সে হাসি, সংক্রামক হইয়া, বালকমণ্ডলীতে প্রবেশ করিল। তখন আর রক্ষা রহিল না। বিতিকিচ্ছি হাসির রবে সভামণ্ডল পূর্ণ হইল। কোথাও হো হো ধ্বনি, কোথাও হা হা ধ্বনি, কোথাও হি হি ধ্বনি, অন্তিমে সর্ব্বত্র হাততালি ধ্বনি—এই ধ্বনিচতুষ্টয়ে বিচারভূমি গরম হইয়া

উঠিল! তখন প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় জলন্ত ক্রোধে উদ্দীপিত হইয়া, বিশঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, হাতা-হস্তে বীরেশ্বর, দাঁড়াইয়া উঠিয়া বজ্রবৎ বিভীষণ রবে বালকগণকে সম্বোধন করিলেন, "চুপ রও,—ফের্ যে গোল করিবে, তার হাতে দশ দশ হাতা হইবে।"

এক চীৎকারে বালকদল নীরব হইল,—পৃথিবী শীতল হইল,—যেন কেহই তথায় নাই বলিয়া বোধ হইল।

আবার বিচার আরম্ভ হইল। এইবার সাক্ষ্য গ্রহণ। প্রথম সাক্ষী মালী। সে বলিল, "হাঁ, আমি কৈলাস বাবুর কথায় বিপিনকে কাঁদিতে দেখিয়াছি এবং ডেপুটী বাবুর দরোয়ানের সঙ্গে কাঁদিতে কাঁদিতে বিপিন ১ টার সময় ঘরে গিয়াছিল।" দ্বিতীয় সাক্ষী রতিকান্ত বাবু। তিনি বলিলেন, "আমি অন্য কিছুই জানি না, মালীর মুখে সব কথা শুনিয়াছি।" তৃতীয় সাক্ষী, দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র হরেকৃষ্ণ সমাদ্দার। সে বলিল, "বিপিনের সঙ্গে কৈলাসের মারামারি হয়। শেষে কৈলাস ঐ ছড়ার চিঠি ছুড়িয়া বিপিনকে মারে।"

সাক্ষীর জোবানবন্দী গৃহীত হইলে, বীরেশ্বর বাবু বলিলেন, "দেখ কৈলাস, তোমার অপরাধ সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ হইয়াছে। তোমার প্রতি গুরুতর দণ্ডাজ্ঞার সময় উপস্থিত। এ সময় তোমার যদি কিছু বক্তব্য থাকে, তবে তাহা বল।—শীঘ্র বল, আর বৃথা কালবিলম্ব করিও না।"

কৈলাসচন্দ্র কোন কথাই কহিলেন না। পূর্ব্ববৎ নীরব, নিঃস্তব্ধ, অসাড়ভাবেই রহিলেন।

বীরেশ্বর। দেখ কৈলাস, এখনও সময় আছে; কোন কথা বলিবার থাকিলে এ সময় তোমার প্রকাশ করিয়া বলা উচিত।

কৈলাস তথাচ নীরব।

বীরেশ্বর। আর আমি অপেক্ষা করিতে পারি না। এখনি দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইবে—সাবধান!

কৈলাস এবারও একটী বাঙ্নিষ্পত্তি, করিলেন না—কেবল বীরেশ্বর বাবুর দিকে ম্লানভাবে তাকাইয়া, আপন অধরোষ্ঠে এবং কপালে হাত দিলেন। তৎপরে আবার সেইরূপ নীরবে অবনত-বদন হইলেন।

বীরেশ্বর। (ক্রোধে) কৈলাস! এ বুজুরুগীর স্থান নয়! তোমার পক্ষে কোনরূপ

সাফাই থাকে, স্পষ্ট কথায় বল। কিন্তু যখন তুমি কোনও উত্তর দিতে পারিতেছ না, তখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে, তুমি নিশ্চয়ই অপরাধী। আর আমি অপেক্ষা করিব না,—এই শুন,—তোমার দণ্ডাজ্ঞা—

কৈলাস পাহাড়ীতে সকরুণ সুর ধরিলেন ;—"সকলে বিচার করিয়া দেখুন,—আমি কথা কহিব কেমন করিয়া ? আমার কথা কহিবার অধিকার কৈ ? এই একটু পূর্ব্বেই হেডমাষ্টার মহাশয় হুকুম দিলেন যে, আমি কথা কহিলেই তিনি আমার জিহ্বা টানিয়া বাহির করিবেন। আবার তিনিই এখনিই সেই মুখেই বলিতেছেন, 'কৈলাস, তুমি কথা কও।' তাই আমি কপালে হাত দিয়া দেখাইয়াছিলাম, "হা অদৃষ্ট !" আর, যুক্ত-অধরপল্লবে হাত দিয়া বুঝাইয়াছিলাম, "আমার অধরৌষ্ঠ বিযুক্ত করিবার শক্তি কৈ ?" কিন্তু এ কার্য্যে, হেডমাষ্টার মহাশয় আমাকে বুজরুক্ বলিলেন। হা ভগবান্ ! তুমি কোথায় ? আর, আমার নামে যে সকল বৃথা অভিযোগ আসিয়াছে, তাহার বিলক্ষণ সদুত্তর আছে। কিন্তু তাহা বলিয়া কোন লাভ নাই, অতএব বলিব না। এক্ষণে নিবেদন, আমি গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে চাহি না;—আমি কথা কহিয়াছি, গুরু আমার জিহ্বা উপাড়িয়া বাহির করুন, এ কাজে আমি রাজি আছি।"

কৈলাসের কথায় কতকগুলি বালকের মুখমণ্ডলে হাসি দেখা দিল। কোন কোন শিক্ষকও, মুখে চাদর দিয়া অতিকষ্টে হাসির বেগ সংবরণ করিলেন। কিন্তু বিরাট সভার বিক্রমে, ফুটিয়া হাসিতে কাহারও সাহস হইল না।

বীরেশ্বর বাবু চারি দিকে হাসি-রাশির সমাবেশ দেখিয়া বড়ই লজ্জিত হইলেন। তাঁহার মনে হইল যেন ভয়ঙ্করী হাসি-রাক্ষসী, করাল দংষ্ট্রা বাহির করিয়া, লহলহ রসনায় তাঁহাকে গিলিতে আসিতেছে। তিনি আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না,—বীর-মূর্ত্তিতে বীরেশ্বর বজ্রহস্তে দাঁড়াইয়া উঠিলেন,—বলিলেন, "তবেরে নচ্ছার, কৈলেসা !—এক হাতায় তোর মাথা গুঁড়ো ক'রে ফেল্‌বো জানিস্"—এই কথা উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি তদভিমুখে ধাবিত হইবার উপক্রম করিলেন।

বড় বিষম ব্যাপার ! ত্রাহি মধুসূদন ! ত্রাহি মধুসূদন ! স্তব্ধ বালকদল ভয়-বিস্ময়ে অর্দ্ধস্তিমিতনেত্রে এ অপূর্ব্ব কাণ্ড অবলোকন করিতে লাগিল। বীরদাপে দুর্জ্জয় বীরেশ্বর বীরভদ্রবৎ যেন দক্ষযজ্ঞ-বিনাশার্থ বালক প্রতি ধাবিত হইলেন।

তখন বৃদ্ধ পণ্ডিত, "ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও" রবে গিয়া বীরেশ্বরের হাত ধরিলেন। পণ্ডিতটীর বয়ঃক্রম ৭৫ বৎসরের কম নহে। দেখিতে ঠিক পাকা আমটীর মত। বীরেশ্বর বাবুর পিতা, স্বয়ং বীরেশ্বর বাবু এবং বীরেশ্বর বাবুর পুত্র—এই তিন পুরুষই ঐ পণ্ডিতের ছাত্র। বিশেষত বীরেশ্বর বাবু স্বভাবতই বৃদ্ধকে বড়ই ভক্তি, শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন এবং তাঁহার যত্নেই পণ্ডিতের ব্রাহ্মস্কুলে এ বৃদ্ধবয়সের চাকরী আজও বজায় আছে। পণ্ডিত ব্রাহ্মণ, বীরেশ্বর কায়স্থ। ব্রাহ্মণ তাঁহার হাত ধরিলেন, গুরু তাঁহাকে নিষেধ করিলেন,—কাজেই বীরেশ্বর অনন্যোপায় হইয়া, ক্ষান্ত হইয়া চেয়ারে বসিলেন।

কিন্তু কৈলাস ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি সদম্ভে বলিতে লাগিলেন, "প্রহারে আমি ভয় করি না। আমি এই বক্ষ পাতিয়া দিলাম, আপনার যত ইচ্ছা হয়, কীল, ঘুষি, লাথী মারুন। বিশেষত আপনি এখন রাজা—স্কুলের অদ্বিতীয় অধিপতি। এখানে আপনার অতুল সহায়-সম্পত্তি;" দপ্তরী, দ্বারবান্, মালী, শিক্ষক, ছাত্র—সকলেই আপনার অধীনস্থ এবং আজ্ঞাবাহী। আর আমি এখানে একাকী, নিঃসহায়। সুতরাং এস্থলে আমাকে মারিতে আপনার অধিক আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। দরোয়ানকে হুকুম দিন—সে আমাকে বাঁধিয়া ফেলুক; আর আপনি আথালি-পাথালি হাতাপেটা করুন।"

বৃদ্ধ পণ্ডিত গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "কৈলাস! তুমি বুঝে-সুঝে কথা কও; পাগলের মত বকিও না। বেশ ধীরস্বভাব হও। হঠাৎ রাগিয়া উঠিও না। তোমার যদি কোন বক্তব্য থাকে, তবে তাহা আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা মেজাজে বল।"

কৈলাস। পণ্ডিত মহাশয়! আপনি যদি আমার সমস্ত কথা শুনেন এবং সুবিচার করেন,—তাহা হইলে আমি বলিতে রাজী আছি। পণ্ডিত মহাশয়! আপনার পায়ে ধ'রে বল্‌ছি, আপনি আমার সব কথাগুলি আগে শুনুন!

পণ্ডিত। দূর পাগল! তোর কথা শুন্‌বো ব'লেইত, তোকে নিয়ে এত হাঙ্গাম কচ্চি। তুই বল,—তোর কিছু ভয় নাই।

কৈলাস। আমি সমস্তই বলিব,—আধখানা কথা বলা হতে না হতে কেহ যেন বাধা না দেন,—এইটী আপনি দেখ্‌বেন।

পণ্ডিত। আঃ—তুই বল্‌না বাপু,—তোর কি বল্‌বার আছে! আমি বল্‌ছি—তোকে কেউ বাধা দিবে না।

কৈলাস। সকলে শুনুন,—আমি যাহা বলিব, তাহাতে এক বর্ণও মিথ্যা নাই। বিপিন অদ্য আমার উপর যে অভিযোগ আনিয়াছে, তাহা সত্য। তামাসার ছলে, হাসিতে হাসিতে আমি বিপিনের গায়ে ছড়ার কাগজ ছুঁড়িয়া মারিয়াছি—ইহাও সত্য। কিন্তু ইহাতে আমার দোষ কি? ইহাতে আমার গুরুতর অপরাধই বা কি হইল? চুরী, ডাকাতি, জাল, ফ্রেব—এ সব ধরাইয়া দিতে তারিলে, পুলিশের কাছে পুরস্কার আছে এবং সমাজেরও মঙ্গল আছে। প্রকৃত সাহসী ব্যক্তি, সংসারের অমঙ্গলকর গুপ্ত মন্দ কাজ প্রকাশ করেন। ডেপুটী বাবুর কন্যা সতী সাবিত্রী হউন, তাহাতে আপত্তি করি না; ঘনশ্যাম বাবু পরমহংস হউন, তাহাতেও আমার কোন কষ্ট নাই। কিন্তু এই যে, স্কুলের আট দশ জন বালক প্রত্যহ ডেপুটী বাবুর বাসায় গিয়া বৈকাল হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত কমলিনীর সহিত হাসি তামাসা, গান বাজনা করে—এটা কি বলুন দেখি? হেড-মাষ্টার মহাশয়কেও বলি, প্রত্যহ দুই তিন জন বালক যে,' বেলা ১ টার সময় পলাইয়া ডেপুটী বাবুর বাসায় যায়, তাহার কি কোন খবর তিনি রাখেন? ডেপুটী বাবুর বাড়ীটা কি পীঠস্থান?—যে, সেখানে একবার না গেলে চারি-পোয়া পুণ্যের সঞ্চয় হয় না? অধিক আর কি বলিব, এই স্কুলের একজন শিক্ষকও আজ এক মাস হইল, তথায় ঘুণ-ঘুণ ক'রে যেতে আরম্ভ করেছেন। আমিই না হয় ডেপুটী বাবু ও তাঁহার কন্যার এখন বিষ-নজরে পড়িয়াছি—সুতরাং আমার গুরুতর দণ্ড একান্ত প্রার্থনীয়। কিন্তু ঐ যে আট দশটা ছেলে, প্রত্যহ কমলিনীর সঙ্গে ইয়ার্কি দেয়, হার্ম্মোনিয়মের সুরে এক সঙ্গে গান করে—উহাদের কি গুরুতর দণ্ড প্রার্থনীয় নহে? আর ঐ শিক্ষকটীর কি মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া দেওয়া উচিত নহে?—বিপিনকে আজ একটা কথা ব'লে আমিই কি কেবল চোরের দায়ে ধরা পড়েছি? পাপ কথা প্রকাশ করিলে সমাজের মঙ্গল আছে, তাই আমি ও কথা ব্যক্ত করিয়াছি। ইহাতে আমার দোষ কি? স্কুলটা যে উৎসন্ন যেতে বসেছে, তার দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই,—আর, এই যত রোখ, এই গরীব-আমার উপর!—আমি না জানি কি?—আমি কাল রাত্রে ডেপুটী বাবুর বাড়ী ডাকাতিও দেখেছি, ডাকাতও দেখেছি, ঘনশ্যামকেও দেখেছি,—তবে খুলে বল্লেই দোষ, চুপই আচ্ছা! মরেছি, কথা কহিতে নাই!"

কৈলাসের এই তেজস্বরা বক্তৃতার বৈদ্যুতিক শক্তিতে, সভাস্থ সমগ্র প্রাণীকে যেন

মোহাভিভূত করিল। কৈলাসকে প্রতিনিবৃত্ত করে, এমন ক্ষমতা কাহারও রহিল না, যেন যাদু-মন্ত্রবলে নত-শির সর্পের ন্যায় সকলে অবনত-বদনে রহিলেন। দেখিতে দেখিতে চতুর্থ শিক্ষকটী সরিয়া পড়িলেন। সর্ব্বতোচক্ষু কৈলাস অমনি বলিয়া উঠিলেন, "দেখুন, পণ্ডিত মহাশয়। চতুর্থ শিক্ষক পলাইয়া গেলেন! বলুন দেখি, হঠাৎ কিসের ভয়ে উনি অন্তর্দ্ধান হইলেন?—আর, ঐ দেখুন, ঐ দেখুন,—চারিজন ধেড়ে ছাত্র ঐ পলায়, ঐ পলায়! কেন উহারা লুকাইয়া পলায়, কিছু বুঝিলেন কি?"

প্রকাণ্ড-দেহ বীরেশ্বর দাঁড়াইয়া উঠিলেন। আবার সেইরূপ ভৈরবরবে বলিলেন,— "কৈলাস! তোমার আর কিছু কি বলিবার আছে? যাহা থাকে শীঘ্র বল—সময় নাই।"

কৈলাস। আমি যাহা বলিলাম, তাহাতে বোধ হয় বুঝিতে পারিলেন যে, আমি নির্দ্দোষ!

বীরেশ্বর। আমার নিকট অন্য কোন বিষয়ের বিচার হইবে না। তুমি অদ্য বিপিনকে কুকথা বলিয়াছ কি না, ইহাই আমার বিচার্য্য। তুমি নিজে স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছ যে, "হাঁ আমি ঐ কুকথা বলিয়াছি।"

কৈলাস। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা ত কুকথা নহে। বিপিনের মঙ্গলের জন্য, ডেপুটী বাবুর মঙ্গলের জন্য, কমলিনীর মঙ্গলের জন্য এবং স্কুল-বালকগণের মঙ্গলের জন্য আমি ঐ কথা বলিয়াছি। আপনি বিজ্ঞ, সুবিবেচক,—বুঝিয়া দেখুন, যে কথা সর্ব্বলোকে মঙ্গলপ্রদা, তাহা কখনও কুকথা হয় না। আমি সদুদ্দেশ্যে ভাল কথাই বলিয়াছি। সুতরাং আমি নিরপরাধী! আমাকে দণ্ড দিউন, আপত্তি নাই; কিন্তু নির্দ্দোষীকে দোষী সাব্যস্ত করিবেন না। আপনার গায়ে জোর আছে, আমাকে মারিতে পারেন; আমি দুর্ব্বল, সহিয়া যাইব।

বীরেশ্বর। আর, বৃথা সময় নষ্ট করিতে পারি না! কৈলাস আপন মুখে নিজ দোষ স্বীকার করিয়াছে। অতএব উহার ২৫ হাত্তা দণ্ড হইল।—দরোয়ান, কৈলাসকো জলদি পাকড় ল্যাও—

দ্বারবান্ কৈলাসের নিকট অনেক বক্‌সীস খাইয়াছে। বিশেষ, প্রতিবৎসর পূজার সময়, কৈলাস, ঐ দ্বারবান্‌কে ধূতি চাদর দিয়া থাকেন। ৺পূজা ত নিকট-প্রায়।

দ্বারবান্ আরও জানে, কৈলাসচন্দ্র বড়ই তেজী লোক ; পাছে গায়ে হাত দিলে কৈলাস তাহাকে কামড়াইয়া দেয়, ইহাই তাহার ভয় হইল। কিন্তু দ্বারবান্ কি করে!—ওদিকে অন্নদাতা বীরেশ্বর, এদিকে বক্‌শীসদাতা কৈলাস। তাই সে, ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে, পেছু পানে চাহিতে চাহিতে, ম্লানমুখে কৈলাসের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। যাইতে যাইতে তাহার পায়ে পায়ে বাধিতে লাগিল! দেহ কম্পিত হইল!

কৈলাসও সবেগে দ্বারবান্-অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বোধ হইল যেন কৈলাস স্বয়ং স্ব-ইচ্ছায় বীরেশ্বর বাবুর সমীপস্থ হইবার জন্য চলিয়াছেন। কিন্তু দ্বারবানের কাছে আসিয়াই তিনি তাহার গালে একটী পাকা ৮২ সিক্কা ওজনের চড় মারিলেন। "কোন্ শ্যালা আমাকে বিনা অপরাধে গ্রেফ্‌তার করে?"—এই বলিয়া এক মহাহুঙ্কার রব ছাড়িয়া তিনি দৌড়িলেন। বীরেশ্বর বাবু ধর্ ধর্ করিয়া দু-চারি পা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। কিন্তু কৈলাসকে আর পায় কে? কৈলাসচন্দ্র চারি লাফে স্কুলের সম্মুখস্থ ময়দান পার হইয়া, নিমেষ মধ্যে কম্পাউণ্ডের প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া নক্ষত্রবেগে চম্পট দিলেন। বালকমণ্ডলী হো হো রবে চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। শৃঙ্খলা, নিয়ম, সমস্তই ভঙ্গ হইল। কেহ হাসিতে লাগিল, কেহ নাচিতে লাগিল, কেহ বা হাততালি দিতে লাগিল। কোন বালক থামের আড়ালে গিয়া গান ধরিল,—

কেন আজ কেঁদে গেল বংশীধারী?
বুঝি অভিপ্রায়,
বঁধু ফিরে যায়,
সাধের কালাচাঁদকে কি বলেছে ব্রজকিশোরী!

বীরেশ্বর বাবু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া এক দৃষ্টে ফ্যাল ফ্যাল চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার যেন বুদ্ধি লোপ পাইল। তিনি যে জীবন্তে মৃতবৎ হইলেন। বৃদ্ধ পণ্ডিত বীরেশ্বরকে বলিলেন, "আর এখানে কেন?—সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এলো; চলুন আমরা বাসায় যাই। কৈলাস বড়ই দুর্ব্বৃত্ত হয়ে উঠেছে; উহার পিতাকে বলে, শাসন করিতে হইবে।"

বীরেশ্বর বাবু এ কথায় কোন উত্তর দিলেন না। পণ্ডিতের কথামত, কেবল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। আর, চপেটাঘাত-জ্বালায় জর্জ্জরিত,—প্রফুল্লিত-গণ্ডস্থল

শ্রীল শ্রীযুক্ত সেই দ্বারবান্, বীরেশ্বর বাবুর বাক্স কাধে করিয়া, তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল।

এদিকে কিন্তু হুগলীর প্রায় সমস্তই সাবালক ছাত্র উত্তম-মধ্যম তৈয়ারি হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা একে একে, দুয়ে দুয়ে, দলে দলে সান্ধ্য-সমীরণ সেবনার্থ রাজপথে বহির্গত হইয়াছে। বীরেশ্বর বাবু পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, ত্রিশ হাত দূরস্থিত এক দল বালক মিহিস্বরে গান ধরিয়াছে,—

সুখের লাগিয়া, পিরীতি করিনু,
শ্যাম বঁধুয়ার সনে।
পরিণামে এত, দুখ হবে বলে,
কোন্ অভাগিনী জানে॥
সই! পিরীতি বিষম মানি।
এত সুখে এত, দুখ হবে বলে,
স্বপনে নাহিক জানি॥

আর কিয়দ্দূর গিয়া, বীরেশ্বর বাবু, দ্বিতলের বারান্দায় তাকাইয়া দেখিলেন, বালকগণ গাহিতেছে,—

বিবিধ কুসুম, যতনে আনিয়া,
গাঁথিনু পিরীতি-মালা।
শীতল নহিল, পরিমল গেল,
জ্বালাতে জ্বলিল গলা॥
সেই মালা কেন হেন হৈল।
মালায় করিয়া, বিষ মিশাইয়া,
হিয়ার মাঝারে দিল॥
জ্বালায় জ্বলিয়া, উঠিল যে গিয়া,
আপাদ-মস্তক চুল॥
না শুনি, না দেখি, কি করিব সখি,
আগুন হইল ফুল॥

ফুলের উপর চন্দন লাগল,
সংযোগ হইল ভাল।
দুই এক হৈয়া, পোঁড়াইল হিয়া,
পাঁজর ধসিয়া গেল॥

গঙ্গার ধার দিয়া যাইতে যাইতে, বীরেশ্বর বাবু শুনিলেন, বজ্‌রার ছাদে বসিয়া একটী বালক তানপূরা-সংযোগে গাহিতেছে,—

ভাল বাসিবে বলে ভাল বাসিনে।
আমার স্বভাব এই, তোমা বই আর জানিনে।
বিধুমুখে মধুর হাসি, দেখতে বড় ভালবাসি,
তাই তোমায় দেখিতে আসি, দেখা দিতে আসিনে॥

বীরেশ্বর বাবু ভাবিতে লাগিলেন, হঠাৎ হুগলী শ্মশান হইল কেন? বালকমণ্ডলী হঠাৎ এইরূপ আদিরসে উন্মত্ত হইল কেন? ঐ শুন, কচি কচি ছেলে, যারা নেহাত সুবোধ ছিল, তারা পর্য্যন্ত গান ধরিয়াছে,—"শ্যাম, তোমার ভাঙ্গা বাঁশী—"। কেন এমন হইল? এ সোণার সংসারে কেমন করিয়া কৃমিকীট প্রবেশ করিল?

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি স্বগৃহে পৌঁছিলেন। বলিলেন, আমার শরীর অসুস্থ, আজ আর আহারাদি করিব না। নির্জ্জনে নিজ কক্ষে শয়ন করিয়া, ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন, যেন বালকমণ্ডলী তাঁহার চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া, পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া, কোমর দুলাইয়া, নাচিয়া নাচিয়া, গান করিতেছে,—

আয় রে!
তোরা কে কে যাবি
জল আনিবারে;
সেই,—কমলমণির বাঁধা-ঘাটে
প্রেম-সরোবরে।

বীরেশ্বর বাবু শিহরিয়া উঠিয়া বিকট ধ্বনি করিলেন। তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল বীভৎস রসে তাঁহার হৃদয় শুষ্ক হইল। তিনি স্ত্রীকে বলিলেন, জল দাও। জল পান করিতে করিতে, আবার যেন তিনি শুনিলেন, কোন বালক গাহিতেছে,—

ভাসিয়ে প্রেমতরী হরি যাচ্ছে যমুনায়।
গোপীর কুলে থাকা হলো দায়!

তখন বীরেশ্বর বাবু যেন সম্মুখে দেখিতে পাইলেন, কমলমালা গলায় দিয়া, এক একটী ফুটন্ত কমল হাতে করিয়া, এক দল বালক উলঙ্গ হইয়া, তালে তালে নাচিতে নাচিতে, গাহিতে গাহিতে, তাঁহার দিকে তীব্রবেগে আসিতেছে,—

পিরীতি বলিয়া, একটী কমল,
রসের সাগর মাঝে।
প্রেম পরিমল- লুবধ ভ্রমর,
ধাওল আপন কাজে॥

বীরেশ্বর বাবু জাগ্রত অবস্থায় সেই স্বপ্ন দেখিয়া, প্রলাপ বকিতে বকিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

স্কুলে এই হুলস্থুল কাণ্ড ঘটিবার পর দিন হইতেই, পুলিস সাহেবের এজলাসে একটু পরিবর্ত্তন ঘটিল। সাহেব, হঠাৎ ডাকাতির তদারক বন্ধ করিতে বলিলেন। সেই দিন প্রাতে ডেপুটী বাবুর সহিত সাহেবের কি একটা গোপন-পরামর্শ হয়। সেই পরামর্শ-অন্তে, ডাকাতির তদারক একবারে বন্ধ হইল। ইনেস্পেক্টর, সবইনেস্পেক্টর এবং কনষ্টেবলগণ চমকিল। তাহারা ভাবিল, যে ডাকাতির প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান জন্য আজ দুই দিন কাল,—দিন নাই, রাত নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই—আমরা অষ্ট-প্রহর পরিশ্রম করিতেছি, হঠাৎ বিনা-কারণে বড়-সাহেব সে তদারক বন্ধ করিতে বলেন কেন? অধস্তন কর্ম্মচারিগণ বড়ই গোলক-ধাঁধায় পড়িল।

প্রহারের পরদিন হইতে শ্রীযুক্ত নবঘনশ্যাম নন্দী মহাশয়, রাত্রি-ভ্রমণরূপ শিরঃপীড়ার ঔষধ-সেবন বন্ধ করিলেন। তবে, রাত্রির পরিবর্ত্তে দিবসেই ঔষধ-সেবনের বন্দোবস্ত করিলেন।

ঘনশ্যাম বাবু একজন গুণী ব্যক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পাস করিতে পারিলেই একটা মহাসম্মান পাওয়া যাইত। বোধ হয়, সে সময় কুড়ি পাঁচশ জনের অধিক বি, এ, উপাধিধারী জন্মগ্রহণ করেন নাই। এখন যেমন হাটে মাঠে গৃহে গোঠে—অলিতে গলিতে, ঘোঁজে ঘাঁজে—আটচালায়, পরচালায়, দরমার বেড়ায়—বি, এ, পাস দেখিতে পাওয়া যায়, তখন সেরূপ ছিল না;—তখন ছিল, সুরম্য উদ্যানে একমাত্র মল্লিকার ফুল। পল্লীগ্রামে কোন বি, এ, পাস পৌঁছিলে, পাঁচ ক্রোশ দূর হইতে লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিত। পাঁচ বাড়ার মেয়ে একত্র হইয়া, কপাটের অন্তরাল দিয়া, উঁকিঝুঁকি মারিয়া তাঁহাকে দেখিয়া যাইত। ফলকথা, তিনি, সেকালে, সর্ব্বচক্ষুর লক্ষ্যস্থল ছিলেন। ঘনশ্যাম প্রথমত অর্থবান্, দ্বিতীয়ত ডেপুটী বাবুর অনুগৃহীত, তৃতীয়ত বি, এ, পাস—এই ত্র্যহস্পর্শ নিবন্ধন, অল্পদিন মধ্যে, হুগলীতে তাঁহার যে সমধিক পসার বৃদ্ধি হইবে, তৎপক্ষে আর সন্দেহ কি?

এই গুণত্রয়ের উপর তাঁহাতে আর একটা দৈববিদ্যা জন্মিয়াছিল। তিনি বি, এ, পাসের এক সপ্তাহ পরে হঠাৎ আপনা-আপনি মহাকবি হইয়া উঠিলেন। ফুটন্ত গোলাপ দেখিলেই তিনি এইরূপ কবিতা রচনা করিতেন,—

"রে গোলাপ! ছিলি যবে কুঁড়ি-আধফুটন্ত!
নর-মনে কত আশা উদেছিল হায়!
প্রভাত হইলে এবে, শুকাইবে পাতা!
ঝরিয়া পড়িবে তলে—হবে শেষে মাটী!"

একবার একটী ছাগল দেখিয়া তিনি এইরূপ কবিতা রচনা করেন,—

"ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব ছাগল ধরায়।
দুটা কাণ, দুটা চোক্, লেজ আছে তায়॥
মুখটী ছুঁচাল তার, কুর্ কুর্ করে।
ক্রোধ হলে শিং নেড়ে ধায় ক্রোধভরে॥
গায়ে লোম মখমল—কোমল কুসুম।
কবির কল্পনা কাব্য—উপমার ধূম॥

হেলে দুলে দুলে দুলে চলেরে ছাগল।
দেখে শুনে কত কোটী লেখক পাগল॥"

এডুকেশন গেজেটে এই কয়েক ছত্র কবিতা প্রকাশিত হইবার পরই, ঘনশ্যামের নাম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত হয়। অনেক বন্ধু, তাঁহাকে আরও ঐরূপ স্বভাবোক্তি-অলঙ্কার-পূর্ণ কতকগুলি কবিতা লিখিতে অনুরোধ করেন। বন্ধুগণের মতে ঐরূপ দ্বাদশটী কবিতা সংগৃহীত হইলে, পঞ্চম ভাগ পদ্যপাঠ তৈয়ারি হইবে,—এবং বাঙ্গালী-বালকের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে। বিশেষতঃ, স্কুল-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ, ঘনশ্যাম বাবুর কবিতা পাঠে বিমোহিত হইয়া বলেন, "এরূপ কবিতা ক্ষণজন্মা। উক্তরূপ কয়েকটী কবিতা, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলেই আমরা এই গ্রন্থ বঙ্গের প্রত্যেক স্কুলে ধরাইয়া দিব।"

ঘনশ্যাম বাবুর নিকট, বন্ধুগণ ঐরূপ প্রস্তাব করিলে, তিনি হাসিয়া বলিলেন, "যাঁহারা স্বভাব-কবি, তাঁহারা পয়সার জন্য কখন কবিতা লেখেন না। বিশেষতঃ, আসল খাঁটি কবিতা কখনও অনুরোধে উপরোধে বাহির হয় না। কবিতার ফোয়ারা আপনা আপনি ফুটিয়া উঠে। এই মনে করুন, আমি হয় ত এক বৎসর কবিতা লিখিলাম না—নিশ্চিন্ত আছি,—কমল-বাসিনী কবিতা-দেবীর কোমল কৃপাকটাক্ষ কোন মতেই আমার উপর পতিত হইল না! কিন্তু হঠাৎ একদিন দিবা দ্বিপ্রহরে কবিতার উৎস উথলিয়া উঠিল—আর বিরাম নাই—বেলা তিনটা না বাজিতে বাজিতেই, এক প্রকাণ্ড মহাকাব্য রচিত হইয়া গেল! কবিতার ঐশী শক্তি বড়ই চমৎকার।"

বন্ধুগণ, বি-এ-পাস ঘনশ্যামের এই অভাবনীয় কথা শুনিয়া বড়ই আশ্চর্য্য-অভিভূত হইলেন। তাঁহারা মনে মনে বলিলেন, "আমরাত বি-এ পাস নই, কবিতা-মাহাত্ম্য কি বুঝিব?"

এই কবিতামর-জীবন নবঘনশ্যামই ডেপুটী বাবুর অনুমতিক্রমে কমলিনীকে প্রথমে কবিতালিখন-প্রণালী শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু রাত্রে, ডেপুটীগৃহে, ডাকাত-হস্তে প্রহার এবং তৎপরে একদিন দিবাভাগে কতিপয় বালককর্ত্তৃক অঙ্গে ধূলা-বর্ষণ—এই উভয় কারণে তিনি সে যাত্রা হুগলী হইতে ত্বরায় স্বদেশ-প্রস্থান করিলেন।

ঘনশ্যামের বাটীতে পৈতৃক দুর্গোৎসব হয়। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি বাটীতে পিতাকে পত্র লেখেন, "এবার পূজার সময় আমি বাটী যাইব না। ওকালতী পরীক্ষা দিতে হইবে। হুগলীতে না থাকিলে পড়াশুনার সুবিধা হইবে না।" কিন্তু সহসা, সাত দিন পরে বাটী গিয়া পিতাকে বলিলেন, "শরৎকালে সহর অপেক্ষা পল্লীগ্রাম অধিক স্বাস্থ্যকর—ইহা বিজ্ঞানসম্মত। কাজেই শরীর-ধারণের জন্য, বাটীতে আসিতে বাধ্য হইলাম।"

এদিকে, পিতার জবানী রাধাশ্যামের পত্র, রামচন্দ্রের নিকট আসিয়া পৌঁছিল। সে পত্রে রাধাশ্যামের পিতা লিখিয়াছেন, "আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। আর অধিক দিন বাঁচিব না। বৌমাকে দেখিতে আমার বড় সাধ হয়েছে। আপনি এসময় ত্বরায় বধূমাতাকে পাঠাইয়া দিবেন।"

এই পত্রের কথা গৃহমধ্যে প্রকাশ হইবার এক ঘণ্টা পরে, কমলিনী বলিলেন, "আমি আজ আর, আহার করিব না। আমার চক্ষু জ্বালা করিতেছে, জ্বর বোধ হইয়াছে।" এই কথা বলিয়া ডেপুটী-কুল-উজ্জ্বলকারিণী কমলিনী, মাথায় একটা রুমাল বাঁধিয়া, চারু অঙ্গে লংক্লথের চাদর জড়াইয়া, খাটে গিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন।

কন্যাকে শ্বশুর-গৃহে পাঠাইবার, ডেপুটী বাবুর বিশেষ কিছুই অনিচ্ছা ছিল না। তবে এ সম্বন্ধে তখন কয়েকটী বাধাজনক-আপত্তি তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল। ১ম কন্যা অতি বালিকা; এত অল্পবয়সে স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পাশ্চাত্য-নীতি-বিরুদ্ধ! ২য় কমলিনীর এখনও শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই। সাহিত্য, সঙ্গীত এবং স্ত্রী-স্বত্ব বুঝিতে তিনি এখনও তাদৃশ পারদর্শিনী হন নাই। সুতরাং এমন অবস্থায় কন্যাকে সহসা শ্বশুরালয়ে পাঠান যুক্তিযুক্ত নহে।

সে যাহা হউক, কমলিনী ত জ্বররোগ-গ্রস্তা হইলেন। রামচন্দ্র, বেহাইকে এই ভাবে সেই পত্রের উত্তর লিখিলেন;—"আমার মেয়েটী এখনও অতি শিশু। সে সংসারের ভাল মন্দ এখনও কিছুই বুঝে না। তার অন্তঃকরণটী বড়ই সরল। আপনার ব্যারামের সময় কমলিনী-মাতাকে তথায় পাঠাইবার কিছুই আপত্তি ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত কন্যার জ্বর হইয়াছে। একটু আরোগ্য হইলেই পাঠাইবার চেষ্টা করিব। শ্রীমান্ রাধাশ্যামকে আমার ভালবাসা দিবেন।"

এই সময় ডেপুটী বাবু বড় বিব্রত হইয়া পড়িলেন। রাত্রে তাঁহার বাড়ীতে প্রত্যহই ঢিল পড়িতে লাগিল। তিনি ফটকে দুইজন দ্বারবান্ রাখিলেন, তথাচ ঢিল-পড়া বাড়িল বৈ কমিল না। শেষে শান্তিরক্ষার জন্য দুইজন পুলিস কনষ্টেবল মোতাইন করিলেন; তথাচ ঢিল যথানিয়মে পড়িতে লাগিল। কিরূপে কোন্ দিক্ দিয়া, ঢিল পতিত হয়, তাহা কেহই ঠিক করিতে পারিল না।

শুধু কি ঢিল? ঢিলের সঙ্গে কোন কোন দিন ফুলের তোড়াও পড়িতে লাগিল। একদিন সন্ধ্যার পর দ্বিতলের ছাদে ডেপুটী বাবু এবং কমলিনী উভয়ে একই সোফায় উপবেশন করিয়া রহসি ঈশ্বর-প্রেমালাপ করিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ একটী ফুটন্ত গোলাপ কমলিনীর কোলে আসিয়া পড়িল; আর একগাছি বেলফুলের গ'ড়ে মালা, কে যেন তাঁহার গলায় পরাইয়া দিল। এই ব্যাপার সংঘটন হইবামাত্র, কমলিনী একটী মৃদুমধুর মিঠেকড়া-গোছ ধ্বনি করিয়া সোফায় ঢলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

কেহ বলিল, ভূতের উপদ্রব। কেহ বলিল, বাগানের বেলগাছে একটা শাঁকচিন্নি থাকে—এসব তাহারই কাজ। কিন্তু রামচন্দ্র বাবু ব্রাহ্ম; সুতরাং তিনি চক্ষুর অগোচরী-ভূত অন্য ভূত এবং শাঁকচিন্নি প্রভৃতি মানেন না। তিনি বলিলেন, "নিরাকার-ভূত আবার কি?"

ডেপুটী বাবু অন্য ভূত মানুন, আর নাই মানুন, উপদ্রব সমভাবেই চলিতে লাগিল। একদিন বৈকালে দেখা গেল, কমলিনীর পালঙ্কোপরি দুগ্ধফেননিভ সুখ-শয্যায়, কে মল-মূত্র পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। তাহা দেখিয়া, কমলিনী আবার মূর্চ্ছিত হইলেন। কমলিনীর মূর্চ্ছারোগের এখন হইতে সূত্রপাত হইল।

অনেকে তখন ডেপুটী বাবুকে পরামর্শ দিলেন, গঙ্গার ধারের এ বাসা পরিত্যাগ করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কিন্তু পাছে তাঁহাকে কেহ ভূতভয়প্রাপ্ত কুসংস্কারাপন্ন বলে, এই ভয়ে তিনি সহসা সেই বাসা ছাড়িতে পারিলেন না। বিশেষ, কলিকাতার গুরুজী যদি এ কথা শুনেন যে, ভূতের ভয়ে রামচন্দ্র পলাইয়াছে, তাহা হইলে, তিনিও তৎক্ষণাৎ দল হইতে রামচন্দ্রের নাম কাটিয়া দিবেন।

প্রকৃতই রামচন্দ্র বড়ই বিপদে পড়িলেন। বাসায়ও তিষ্ঠিতে পারেন না—এবং বাসা ছাড়িতেও পারেন না,—

না খাইলে রাজা বধে, খাইলে ভুজঙ্গ।
রাবণের হাতে যথা মারীচ কুরঙ্গ!

কেবল বাসায় নহে; স্বয়ং রামচন্দ্র একদিন রাজপথে বিভীষিকা দেখিলেন। সে সময় হুগলীতে ঘোড়গাড়ীর তত প্রাদুর্ভাব ছিল না। ডেপুটী বাবু প্রত্যহ পাল্কী করিয়া কাছারি যাতায়াত করিতেন। একদিন বৈকালে পাল্কী করিয়া রামচন্দ্র বাসায় আসিতেছেন, কে যেন, কোথা হইতে আসিয়া একছড়া কমল-মালা তাঁহার বক্ষে ধীরে ধীরে বসাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। রামচন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন।

তখন তিনি ঠিক করিলেন, হুগলী ত্যাগ করাই মঙ্গলকর। আপাতত সুবিধাও হইল। পূজার ছুটী নিকট। রামচন্দ্র পূজাবকাশে, সপরিবারে স্বগৃহে যাত্রা করিলেন। কমলিনীর মূর্চ্ছাব্যাধি ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায়, সঙ্গে একজন মেডিকেল-কলেজ-উত্তীর্ণ নবীন চিকিৎসকও চলিলেন।

ওদিকে, অতি অল্পদিন মধ্যেই রাধাশ্যামের পিতার মৃত্যু হইল। বিজয়াদশমীর দিন এ ঘটনা ঘটে। ডেপুটী বাবু তখন স্বগৃহে ছুটী ভোগ করিতেছেন এবং মনে মনে কল্পনা আঁটিতেছেন, ত্বরায় কলিকাতা গিয়া সেই মুরুব্বি-সাহেবকে ধরিয়া কৃষ্ণনগরে বদলীর প্রার্থনা করিবেন। এমন সময় রাধাশ্যামের পিতৃবিয়োগ-জনিত শোকপত্র আসিয়া পৌঁছিল। এ দুঃসংবাদ পাইয়া অন্নপূর্ণা কাঁদিলেন; কমলিনীও নয়নজলে বুক ভাসাইলেন। অন্নপূর্ণা বলিলেন, "মা কমল! ঘাটে উঠার দুই দিন থাকিতে তোমাকে শ্বশুরবাড়ী যাইতে হইবে। না গেলে এ পাড়াগাঁয়ে লোকনিন্দা আছে।"

কমলিনী। মা, তোমার আজ্ঞা আমি কখন লঙ্ঘন করি না; আমাকে যা করিতে বলিবেন, তাহাই আমি করিব। আমার শরীরে যাহা সহিবে, তৎক্ষণাৎ আমি তাহা করিব। ডাক্তার বাবু যদি আমার দেহ পরীক্ষা করিয়া মত দেন যে, আমি শ্বশুরগৃহে গেলে শারীরিক কোন ক্ষতি নাই, তাহা হইলে আমি তখনই যাইব। মা, আমার শরীর বড় কাহিল না হলে কি আর এ কথা বলি?—আমি দাঁড়াইলে কেমন ধোঁয়া দেখি, মাথা যেন ঘুরিয়া পড়ে!

অন্নপূর্ণা। মা, তোমার শ্বশুর গঙ্গালাভ করেছেন। দু ঘাট করিতে নাই। আর

তুমি এ সময় না গেলে জামাই বড়ই রাগ করিবেন। যেমন করিয়াই হউক, তোমার এ সময় যাওয়া উচিত। সহরে যা কর, তাই চলে। পাড়া-গাঁয়ে হিন্দুর আচরণ না দেখ্‌লে, লোকে বড়ই নিন্দা কর্‌বে। পাঁচ বাড়ীর মেয়ে পাঁচ কথা কবে—সে সব আমি সহ্য করিতে পারিব না।

কমলিনী। আচ্ছা, মা! আমি লোকের মনে কষ্ট দিতে চাই না। পরমব্রহ্ম যা করিবেন, তাহাই হইবে। মা, তোমার কথা আমি কবে না শুনিয়াছি?

জননীর আদেশমত, প্রথম দিন হবিষ্যান্ন খাইয়া, কমলিনী যেমন দাঁড়াইয়া উঠিবেন, অমনি তিনি পিতা, মাতা এবং ডাক্তার বাবুর সমক্ষে দড়াম্ করিয়া ঘুরিয়া পড়িয়া গেলেন। সকলে আ-হা-হা করিয়া তুলিয়া কমলিনীর মুখে জল দিলেন। ডাক্তার বাবু বলিলেন, "আতপ তণ্ডুলের তীব্রবিষে কমলিনীর দেহ জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিয়াছে। একজন জর্ম্মাণ পণ্ডিত বলিয়াছেন, হিন্দুদের আতপ চাল রমণীকুলের মস্তকীয় ধমনীতে সঞ্চপ্রবেশ হইয়া মাথাকে জলন্ত অঙ্গারবৎ করিয়া ফেলে। মাথা ঘুরিয়া রোগী পড়িয়া যায়। আতপ-তণ্ডুলে পক্ষাঘাত রোগের বিশেষ সম্ভাবনা। আমার বোধ হইতেছে, কমলিনী বুঝি বা এই সূত্রে দারুণ পক্ষাঘাত-রোগবিশিষ্টা হইয়া পড়েন। আমি চিকিৎসক; তাই এত কথা বলিলাম। আপনাদের এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় করিবেন। এক্ষণে আর একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। ধর্ম্ম আগে, না শরীর আগে? শরীর টিকিয়া থাকিলে ত, ধর্ম্মকর্ম্ম হইবে?"

বলা বাহুল্য, ডাক্তার বাবুর এই বক্তৃতার পর, কমলিনীর হবিষ্যান্ন-ভোজন নিষেধ হইল। ডেপুটী বাবু একদিন গোপনে বলিলেন, "দেখুন ডাক্তার বাবু, কমলিনীর হবিষ্যান্নের কথা কোনরূপে গুরুজীর কাছে যেন প্রকাশ না পায়। আপনি কথাটা খুব গোপনে রাখিবেন।"

সে যাহা হউক, পতনের পরদিন হইতে কমলিনীর ব্যাধি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমশ তিনি শয্যাগত হইলেন। ডাক্তার বাবু এক মনে, এক ধ্যানে, কমলিনীর চিকিৎসা-কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন। তিনি বলিলেন, "রোগ কঠিন হইবার লক্ষণ দেখিতেছি। কমলিনীকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া অন্যান্য ডাক্তারদের সহিত এ বিষয়ের পরামর্শ আবশ্যক।"

রাধাশ্যামের কাছে পত্র গেল—"আমার কন্যা শয্যাগতা। কঠিন পীড়ায় অভিভূতা। উত্থানশক্তি-রহিতা। তাঁহাকে পাঠাইবার কিছুই অন্যমত ছিল না; কিন্তু কি করি, উপায় নাই। সকলি আমার মন্দ ভাগ্য বলিতে হইবে।"

রাধাশ্যাম যে লোক পাঠাইয়াছিলেন, সে ব্যক্তিও তাঁহাকে গিয়া বলিল, "আপনার স্ত্রীর ব্যারাম বড় সঙ্কট। ডেপুটী বাবু কলিকাতা হইতে সাহেব-ডাক্তার আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছেন।"

রাধাশ্যাম বোধ হয় বড়ই কাতর হইলেন! একদিকে পিতৃবিয়োগ, অন্যদিকে স্ত্রীর জীবন সঙ্কটাপন্ন। কিন্তু তিনি অক্ষুব্ধচিত্তে, যথানিয়মে যথাসাধ্য আপন কর্ত্তব্য-কর্ম্ম পালন করিলেন। শুনা যায়, এ শ্রাদ্ধ-ব্যাপারে, রামচন্দ্র রাধাশ্যামকে প্রায় দুই শত টাকার সামগ্রী পাঠাইয়াছিলেন। অন্নপূর্ণার অনুরোধে এই দান-কার্য্য সম্পন্ন হয়। বোধ হয়, জামাতাকে কোন মত সান্ত্বনা করাই অন্নপূর্ণার উদ্দেশ্য ছিল।

শ্রাদ্ধ-অন্তে কমলিনীকে চিকিৎসার্থ কলিকাতা আনা হইল। তথায় এক মাস কাল চিকিৎসিত হইলে, ডাক্তার বাবু বলিলেন, "উত্তর-পশ্চিমের বিশুদ্ধ-বায়ু দুই মাস কাল সেবন না করিলে কমলিনীর এ রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে না।"

অগ্রহায়ণ মাসে হাওয়া খাইতে কমলিনী বাহির হইলেন। সঙ্গে বিপিন, ডাক্তার বাবু এবং কপিল খানসামা চলিল। রামচন্দ্রের বৃদ্ধা পিসীমাও গৃহিণীরূপে তাহাদের অনুসরণ করিলেন। শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যন্ত যাইবার কথা স্থির হইল।

ডাক্তার বাবুর নাম মহেন্দ্রনাথ। সেই প্রথমভাগের পূর্ব্বপরিচিত মহেন্দ্রনাথ। কপিল খানসামাটী গুরুজীর খাসতৈয়ারি খানসামা। কপিলের মাতা বিগতপ্রাণা হইলে, পঞ্চম বৎসর বয়সে কপিল, গুরুজীর হাতে পড়ে। সেই সময় হইতে কপিল গুরুজীর নিকট শিক্ষা দীক্ষা পাইতেছিল; সর্ব্বদা তাঁহার কাছে বাসায় থাকিত—কপিল কলিকাতা ছাড়িয়া এ পর্য্যন্ত আর কোথাও যায় নাই। রামচন্দ্র অতীব স্নেহের পাত্র বলিয়া, অবশেষে গুরুজী তাঁহাকে এই খানসামা-রত্ন প্রদান করেন। সহবৎগুণে কপিল এখন সর্ব্বকর্ম্মে সমান পারদর্শী। ঝোলে, ঝালে, অম্বলে, পোড়ায়, ভাতে, বেগুনবৎ কপিল-চন্দ্র সর্ব্বত্রই সমভাবেই অবস্থিত।

বাজে কথা ফুরাইল। এইবার প্রকৃত-প্রস্তাবে গ্রন্থারম্ভ। পাঠক! কে কেমন ব্যক্তি চিনিলেন ত! এখন আর কোন ভাবনা নাই, পরমানন্দে তৃতীয় ভাগ পড়িতে আরম্ভ করুন।

দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত।

তৃতীয় ভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

মাঘ মাসের কন্‌কনে শীত। সমস্ত দিন বৃষ্টি হইতেছে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে মেঘও নাই, জলও নাই,—কেবল সতেজ, সুতীক্ষ্ণ, সু-রস-ভরা বায়ু বহিতেছে। বৃদ্ধ বালাপোষ গায়ে দিয়াও শীতে হিহি করিতেছেন ; বালকের বালাই নাই—দিগম্বর-দেহে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে ; যুবক, ফ্লানেল-কাশ্মিয়ারে, রেশমে-পশমে, ষ্টকিনে-গার্টারে, টুপিতে-কম্ফর্‌টারে, অঙ্গ-যষ্টিখানিকে বিলাতীভাবে বাহার দিবার সুবিধা পাইয়াছে।

সন্ধ্যা হয় হয়। গৃহস্থ, গৃহে সন্ধ্যা দিবার উদ্যোগে আছে। কিন্তু হাবড়ার ষ্টেসনে ইতিপূর্ব্বেই আলো জ্বালা হইয়াছে। ষ্টেসনটী যেন প্রফুল্ল মল্লিকার ন্যায় হাসিতেছে। লোকপাল কলকল শব্দ করিতেছে। চারিদিকে যেন ধন্য ধন্য ধ্বনি উঠিতেছে। আকাশ হইতে যেন দৈববাণী হইতেছে,—"বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস।" মহাভারতে বকরূপী ধর্ম্ম প্রশ্ন করেন, "কিমাশ্চর্য্যং ?" যুধিষ্ঠির উত্তর দেন,—

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্॥

কিন্তু কলিকালে বণিক্‌রাজ-ইংরেজ-রাজত্বে ইহা অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্য আছে। আমি হাতে পয়সা লইয়া কাতরভাবে বলিতেছি, "মহাশয়! এই লউন;—এই আমার টাকা লউন—লউন!"—তথাচ দোকানদার লয় না; অধিকন্তু লোকের ভিড়ে, ঠেশাঠেশি,—পেষাপেষিতে, কনষ্টেবলের রুলের গুড়ায় হাড় গুঁড়া হইয়া গেল; অথচ আমার ফিরিবার নামটী নাই,—মুখে তখনও "টাকা লউন, টাকা লউন" শব্দ। তাই বলি, ইহা অপেক্ষা আর অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? তৃতীয়-শ্রেণীর টিকিট-ঘর পানে চাহিয়া দেখুন—ঠিক্ এই ব্যাপার দেখিতে পাইবেন। ভুক্ত-ভোগীই ইহার মর্ম্মকথা বুঝিবে; অন্য কেহ বুঝাইলেও বুঝিবেন না।

টিকিট খরিদের পর গাড়ীতে উঠা। প্রকাণ্ড প্লাটফরমের সম্মুখে, পার্ব্বতীয় সুবৃহৎ অজগর সর্পাপেক্ষাও সুবৃহত্তর—সেই সুলম্বা রেলগাড়ী দণ্ডায়মান। এধার ওধার সহজে নজর হয় না। লোকরাশিও তদুপযুক্ত,—অথবা যেন কিছু অধিক উপযুক্ত। এই যাত্রীগাড়ী দিল্লী পর্য্যন্ত যাইবে

গাড়ী ছাড়িতে আর দশ মিনিট বাকি। প্রবেশদ্বার—ফটক দিয়া লোক সকল নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। কাহারও ডান হাতে এবং বাম হাতে প্রকাণ্ড পুঁটুলিদ্বয় ঝুলিতেছে; কাহারও বগলে মাজুরি, মাথায় ধামা; কাহারও কাঁধে পোর্টমেণ্ট, হাতে ব্যাগ। কিন্তু সকলেরই চলন চঞ্চল, মুখ হাঁ-করা, কাণ খাড়, চক্ষু ফ্যাল্ ফ্যাল্;—তাহারা কি একটা যেন বিভীষিকা দেখিয়াছে। এই-কে ধরিল, এই-কে মারিল, এই-কে আটক করিল—ইহাই যেন তাহাদের একটা প্রাণের ভয়; ওদিকে একটা কনষ্টেবল, দুই জন গোলমালকারী কুলিকে "হোট্" করিয়া উঠিল, এদিকে সেই লোক সকল, অমনি থমকিয়া দাঁড়াইল;—তাহাদের মনে হইল, বুঝি এইবার "ধল্লেরে, ধল্লেরে!" ফটক পার হইয়া, তাহারা প্রথমত প্লাটফরমের পশ্চিম পানে ছুটিল—সেদিকে গাড়ীতে স্থান নাই, আবার পূর্ব্বপানে দৌড়িল। পূর্ব্বে হউক, পশ্চিমে হউক, আর মধ্যভাগেই হউক, এই শেষযাত্রীগণ শেষে গাড়ীতে মোটেই স্থান পাইল কিনা, তাহা দেখে কে?

ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাস বা মধ্যশ্রেণী, ভারতে ইংরেজ-বণিকের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স বা জর্ম্মাণির রেলওয়ে-কবিগণ এরূপ সুমহতী কল্পনা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। বোধ হয় ভারতীয় রেলপথ-শাস্ত্রকারগণ, ভারতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিবর্ণের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া রেলগাড়ীকেও প্রথম, দ্বিতীয়, মধ্য, তৃতীয়—এইরূপ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকিবেন। কিন্তু বিধির লিখনে, এ কলিকালে, এ হিন্দুর দেশে, ইংরেজই ব্রাহ্মণ, ইংরেজই ক্ষত্রিয়, ইংরেজই বৈশ্য,—আর শূদ্র, অথবা শূদ্রাদপি অধম, এই পতিত হিন্দুজাতি। হিন্দু প্রথম শ্রেণীতেও দাস, দ্বিতীয় শ্রেণীতেও দাস, মধ্যশ্রেণীতেও দাস,—তৃতীয়ে ত দাসত্বের অবধি-পর্য্যন্ত নাই। সর্ব্বত্রই দাসভাব, আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই,—স্বর্গ নাই, নরক নাই,—ঘর নাই, জঙ্গল নাই,—বসুন্ধরা নাই, বৈকুণ্ঠ নাই,—সর্ব্বত্রই সমভাব!

দেড়া-ভাড়া ব্যতীত মধ্যশ্রেণীর আর কিছু গুণ আছে কি না, তাহা আমি জানি না; গুণের ভাগ ঐ পর্য্যন্ত,—কিন্তু দোষের ভাগ কথঞ্চিৎ অবগত আছি। বিধির বিচিত্র লীলা বুঝি না,—কিন্তু যে কারণেই হউক, মধ্যশ্রেণীর বেঞ্চে বসিলে ছারপোকার কামড়ে অস্থির হইতে হয়। তৎপরে প্রত্যেক ষ্টেসনে যতক্ষণ না গাড়ী ছাড়ে, মুখ বাড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে আরোহীকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে, "বাপু! এ গাড়ী তোমাদের নয়; ইহা দেড়া ভাড়ার গাড়ী; ইহা ইন্টারমিডিয়েট ক্লাস।" আরোহী যদি সুবুদ্ধি হন, তিনি তৎক্ষণাৎ অন্য স্থানে চলিয়া যান। নির্ব্বুদ্ধি আরোহী তৃতীয় শ্রেণীর একখানি টিকিট সম্মুখে ধরিয়া উত্তর দেয়,—"কেন, মোশাই,—আমরা ত অমনি গাড়ীতে উঠ্‌তে চাই নাই; এই দেখুন "টিকিষ" কিনেছি, তবে এসেছি—আপনিও পয়সা দিয়েছেন, আমিও পয়সা দিয়েছি;—তা, আপনার জোর বেশী, এ গাড়ীতে উঠ্‌তে না দেন, আরও ত ঢের গাড়ী রয়েছে।" এই কথা বলিয়া নির্ব্বুদ্ধি লোক অন্য স্থানে প্রস্থান করে। কিন্তু আরোহী দুর্ব্বুদ্ধি হইলেই বিপদ। দুর্ব্বুদ্ধির উত্তর এইরূপ,—"কেন, তুমি কি মেজেষ্টর নাকি? তুমি কেহে বাপু?—উঠ্‌তে দেওয়া, না দেওয়া তোমার এক্তার কি?"

প্রশ্ন। কৈ, তোমার টিকিট দেখি?—কোন্ ক্লাসের টিকিট?

উত্তর। তোমাকে টিকিট দেখাতে গেলাম কেন? ওঃ, গেঁটের পয়সা খরচ করে এইমাত্র টিকিট কিন্‌লাম, উনি উড়ে এসে জুড়ে বসে বলচেন, আমি টিকিট কিনি নাই?—হাঃ হাঃ হাঃ—

প্রশ্ন। নাহে বাপু, সে কথা বলি নাই!—দেড়া ভাড়া দিয়ে তুমি টিকিট কিনেছ কি?

উত্তর। যা ভাড়া তাই দিয়ে টিকিট কিনেছি—তার আবার দেড়া দুনো কি?—খোল, ঠাকুর! দোয়ার খোল—আমরা পাড়াগেঁয়ে বটি, কিন্তু সহুরে লোক আমাদিগকে ঠকাইতে পারে না।

এইরূপ কথাবার্ত্তা-অন্তে দোয়ারে ধাক্কাধাক্কি আরম্ভ হইল। এমন সময় একজন পেণ্টুলান-চাপকান-পরা হিন্দুস্থানী আসিয়া, তাহার টিকিট দেখিয়া তাহাকে তৃতীয় শ্রেণীতে চাপাইয়া দিয়া গেল।

বক্তা এবং আরোহী উভয় পক্ষই দুর্ব্বুদ্ধি হইলে, সময়ে সময়ে কুরুক্ষেত্র ব্যাপার ঘটিয়া থাকে; গালাগালি, ঠেলাঠেলি, চুলোচুলি পর্য্যন্ত ঘটে।

এ ছাড়া, কোনও ষ্টেসনে তৃতীয় শ্রেণীতে অতিরিক্ত লোক হইলে, ষ্টেসন-মাষ্টার সেই অতিরিক্ত যাত্রীগণকে মধ্যশ্রেণীতে উঠাইয়া দিয়া থাকেন। কোন মধ্যশ্রেণীর আরোহী যদি ইহাতে ঈষৎ আপত্তি উত্থাপন করিয়া, ষ্টেসন-মাষ্টারকে বলেন, "মহাশয়! আমাকে তবে দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাইতে অনুমতি দিন না কেন? এত লোকের ভিড়ে টিকিব কেমন করিয়া?" ষ্টেসন-মাষ্টার অমনি গম্ভীর স্বরে বলেন, "আপনি কি জানেন না, প্রত্যেক বেঞ্চে পাঁচ জনের বসিবার নিয়ম? এ গাড়ীতে ত দশ জনের অধিক লোক নাই। যাঁহার একা যাইবার ইচ্ছা, তাঁহার উচিত, গাড়ী রিজার্ব করা।" বলা বাহুল্য, এইরূপ কথাবার্ত্তা শেষ না হইতে হইতেই ঘণ্টা বাজিল, নিশান উড়িল, গাড়ী ছাড়িল।—সব বিবাদ মিটিল।

মধ্যশ্রেণীর এই অপূর্ব্ব মধুময় ভাব অদ্য যথাশক্তি কথঞ্চিৎ, সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম—অবশিষ্ট প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণীর কথা গ্রন্থ-কলেবর-বৃদ্ধি-ভয়ে এখন আর উত্থাপন করিলাম না। কিন্তু এই অল্প আভাসে যাহা বুঝিলাম, তাহাতেই মজিলাম। হৃদয়ে অনবরত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল,—

কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্!

ঘরের পয়সা খরচ করিয়া, এমন লাঞ্ছনাভোগ কোথাও আছে কি না, জানি না!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

উটী কি সাহেব, বাঙ্গালী, না ফিরিঙ্গী?—কি জাত? ঐ যে টুক্‌টুকে কোমল মুখখানি মধ্যশ্রেণীর গবাক্ষ দিয়া ঝুলিয়াছে, ঐ যে তাহার মাথায় হ্যাট, নাকে চস্‌মা, মুখে চুরুট, গলায় কলার দেখা যাইতেছে,—আর মধ্যে মধ্যে সেই মুখ-নিঃসৃত অব্যক্ত, মধুর, বঙ্কিম কণ্ঠধ্বনি শুনা যাইতেছে, "ইডার নেই, এ গাড়ি নেই—এ সাহেব লোক্‌কা গাড়ী আছে,"—উটী কে? দেখুন, দেখুন,—আবার দেখুন,—ওঃ, ঐটুকু মুখের তেজই বা কি?—নাকে, মুখে, চোখে, কাণে কথা—যেন তপ্ত খোলা, চড়্‌বড়্‌ চড়্‌বড়্‌ খৈ ফুটিছে, অথবা যেন ফর্‌ফর্‌ তুব্‌ড়ী ফুটিছে! উহা আর কিছুই নয়—গার্ড-সাহেবের সঙ্গে উহাঁর ইংরেজীতে কর্ত্তাবার্ত্তা! উভয়েই সাহেব কিনা, তাই সঙ্গে সঙ্গে স্বজাতিপ্রেম—কাজেই রঙ্গভঙ্গময়ী কথার বিদ্যুল্লতাবৎ ছটা! সে মহাকথার গূঢ়ভাব এইরূপ;—"আমার গাড়ীতে 'For Europeans only' অর্থাৎ ইউরোপীয়দের জন্য এই গাড়ী—এইরূপ একটা লেবেল আঁটিয়া দেওয়া হউক।" গার্ড-সাহেব অনেকক্ষণ স্বজাতি আপ্যায়িতের পর, সে কথার এই ভাবে উত্তর দিলেন,—"আচ্ছা, তবে আপনি এ কথা একবার ষ্টেসন-মাষ্টারকে জানান,—আমি এখনি লেবেল আঁটিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া গার্ড-সাহেব চলিয়া গেলেন। তখন ভিতরকার সাহেব দ্বার খুলিয়া, স-সাজে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। বাঃ—বাঃ—কি বাহার! কিবা গিরিমাটীর গড়ন, তার উপর পাউডার লেপন,—তস্য উপর আবার তালে তালে হেলন দোলন,—মরি মরি!—যেন মূর্ত্তিমান্‌ অঙ্গনা-আনন্দ-বর্দ্ধন! দেহখানির ভাব নবীন নবীন, চঞ্চল চাহনি—খঞ্জন-গঞ্জন; বয়স বাইশ বৎসরের অধিক হইবে কি? শস্য-শ্যামল, ঈষৎ-রেখাযুক্ত, সতেজ, বর্দ্ধন-উন্মুখ গোঁফ-যুগল ভ্রমর-পংক্তির অনুকরণ করিতেছে। মনে হয় যেন উর্ব্বর-ভূমে কচি-ঘাস সদম্ভে গা-ঝাড়া দিয়া উঠিতেছে—দুই দিন পরেই আধ হাত হইবে। সেই হ্যাট-কোট-ধারী, আজানুসন্ধি-বুট-বিহারী, মুখ-বিবর হইতে মুহুর্ম্মুহু চুরুট-ধূমনির্গমনকারী, নবীন-সাহেব-পুঙ্গব,—ষ্টেসন-মাষ্টারের অনুসন্ধিৎসু হইয়া, একবার প্লাটফরমের এদিক ওদিক পাদচারণ করিলেন। হঠাৎ তাঁহার যেন কি মনে হইল। অমনি নিজকক্ষাভিমুখে

দ্রুতপদে ফিরিলেন। প্রত্যাগমন কালে দেখিলেন, সম্মুখেই স্বয়ং ষ্টেসনমাষ্টার উপস্থিত। আবার তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু সেই মনের কথাটা ষ্টেসন-মাষ্টারকে—

বলি বলি আর বলা হলো না।

(বুঝি) শরমে মরমের কথা কওয়া গেল না॥

তখন সেই নবীন-সাহেব ষ্টেসন-মাষ্টারকে ছাড়িয়া, সভয়ে ম্লানমুখে, নিঃশব্দ-দ্রুত-পাদসঞ্চারে আপন গাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। কিন্তু সেখানে তাঁহার জাঁক জারি, লম্ফ ঝম্ফ, দম্ভ কম্প দেখে কে? সিংহের ন্যায় গভীর গর্জ্জন আরম্ভ করিলেন। কখন হিন্দী, কখন বাঁকা বাঙ্গালা, কখন ইংরেজী, কখন বা এই ভাষাত্রয়-মিশ্রিত এক অপূর্ব্ব খিচুড়ী —এই ভাষাচতুষ্টয়ে; এবং ঘন ঘন দোদুল্যমান হস্ত, অবিরল ঘূর্ণায়মান চক্ষু, নিয়ত ঘড়-ঘড়ায়মান নাসিকা, আর মুহুর্ম্মুহু শব্দায়মান স-বুট-পদযুগল—এই বিভীষিকা-চতুষ্টয়ে বিভূষিত, সেই নবীন-নধর-সাহেবপুঙ্গব সেই গাড়ীদ্বারে দাঁড়াইয়া এক মহাকুরুক্ষেত্র-ব্যাপার করিয়া তুলিলেন। দৈত্যকুল ধ্বংসের নিমিত্ত ধরাধামে যেন নরসিংহ অবতার অবতীর্ণ হইলেন। পৃথিবী যেন প্রলয়োন্মুখিনী হইয়া উঠিলেন। হরি, হরি! মধুসূদন!!

গাড়ী ছাড়িতে আর ছয় মিনিট বিলম্ব। তৃতীয়-শ্রেণীর টিকিট লইয়া যাত্রীগণ দলে দলে, প্লাটফারমের দিকে ছুটিয়াছে। গাড়ী ছাড়িলরে—গেলরে, গেলরে—নবীনার নবযৌবন ভেসে গেলরে—যেন একটা শব্দ উঠিয়াছে! ফটক পার হইয়াই, যাত্রীগণের ঠিক সম্মুখেই "একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি" গোছ, মধ্যশ্রেণীর গাড়ীখানি অবস্থিত। যত লোক, সবাই সেই দিকেই ঝুঁকিতেছে। সেখানিতে অপেক্ষাকৃত লোক কিছু কম। বিশেষ, যে কামরাটীতে আমাদের সাহেব-পুঙ্গব আছেন, সেটীতে অন্য কেহই নাই। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী অধিকাংশ নিরক্ষর;—অক্ষর-যুক্ত হইলেও ইংরেজীজ্ঞানশূন্য; ঈষৎ ইংরেজীজ্ঞানসম্পন্ন হইলেও, তাড়াতাড়িতে বিচলহৃদয়; সুতরাং অভেদশরীর যমজ-ভ্রাতাবৎ মধ্য এবং তৃতীয়শ্রেণীর ভেদজ্ঞান বুঝিতে না পারিয়া, যাত্রীগণ স্বভাবতই সেই সম্মুখস্থিত মধ্যশ্রেণীতে উঠিবার প্রয়াস পাইতেছে। সাহেব-পুঙ্গবের সেই খালি গাড়ীতে উঠিতে অনেকেরই লালসা বলবতী।—প্রথম উদ্যমে সেইদিকেই প্রায় সকলে ধাবিত।

সাহেব নিজ কেল্লা অখণ্ডভাবে রক্ষার জন্য বীরদর্পে দ্বারমুখে দণ্ডায়মান। প্লেভ না-ব্যাস-মুখে যেন বীরভদ্র ওসমানপাশা সঙ্গীনহাতে সদম্ভে অবস্থিত। যিনি গাড়ীর

নিকটবর্ত্তী হইতেছেন, সাহেব অমনি তাঁহাকে সাহেবী-চীৎকাররূপ অমোঘ-অস্ত্রে তাড়াইতেছেন। চীৎকারে যে ব্যক্তি না সরিতেছে, তাহাকে যুগল-দন্তপঙ্ক্তি বাহির করিয়া খ্যাঁক্ করিয়া খিচাইয়া উঠিতেছেন,—অমনি সে ভয়ে জড়সড়। "খ্যাঁক্" ব্যর্থ হইলে, ঘুষি প্রদর্শন। ঘুষি দেখানর পর, অবশেষ ব্রহ্মাস্ত্র গলাধাক্কা। এই চারি রকম অস্ত্র লইয়া সাহেব দ্বার রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার সেই বিভীষণ রঙ্গ দেখিয়া লোক সব চমকিল। ধাক্কাধুক্কি, চড়চাপড়, চীৎকারে প্রকৃতই মহাপ্রলয় ঘটিবার যোগাড় হইল। তাই দুর্ব্বল বাঙ্গালী, সাহেবের বিক্রম দেখিয়া, ঘোর বিপদে 'হরি, হরি, মধুসূদন, মধুসূদন' করিয়া উঠিল।

আর পাঁচ মিনিট বাকি! প্রথম ঘণ্টা বাজিল। এমন সময় একজন বাঙ্গালী বাবু, মস্ মস্ শব্দে সেই দিকে আসিলেন। মাথায় মখমলের টুপি, হাতে পিচের ছড়ি, পরিধান কালো বনাতের পেনটুলান, চাপকান, চোগা। ভাব গম্ভীর। তিনি মধ্যশ্রেণীর নিকটে গিয়া, ঈষৎ এদিক ওদিক চাহিয়া, সাহেবের সেই লোকশূন্য কামরায় সৎসাহসের সহিত উঠিবার উপক্রম করিলেন। সাহেব, তাঁহার মুখের দিকে একবার তাকাইলেন, দেখিলেন, তাঁহার চক্ষু তীক্ষ্ণ।—কিছুতেই তাঁহার দৃক্‌পাত নাই, ভ্রূক্ষেপ নাই,—বেশ সহজে, অথচ সতেজে গাড়ীর দ্বার খুলিয়া উঠিতেছেন। সাহেব তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহার চোখের দিকে চোখ রাখিয়া, বাঁ হাতে করিয়া মুখের চুরুট লইয়া, ঘাড়টা ঈষৎ বাঁকাইয়া, ইংরেজীতে বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এ কামরা কেবল ইউরোপীয়দের জন্য।"

বাবু এক পা রেকাবে, এক পা গাড়ীর ভিতর দিয়া উঠিতে উঠিতে যেন অন্যমনস্ক হইয়াই ইংরেজীতে উত্তর দিলেন, "তবে তার লেবেল আঁটা কৈ?"

সাহেব। গার্ড এখনি আসিয়া লেবেল আঁটিয়া দিবেন।

বাবু। ভাল, যখন দিবেন, তখন আমি নামিব।

সাহেব। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাজ করা উচিত নহে কি?

বাবু। আমার ভবিষ্যৎ আমি ভাবিব,—সেজন্য আপনি চিন্তিত হইবেন না।

ইত্যবসরে বাবু বেঞ্চের উপর দিব্য এক বিছানা পাতিয়া শুইয়া পড়িলেন।

একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, সঙ্গে একটী নয় বছরের বালক,—কোথাও স্থান পায় নাই;

ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই মধ্যশ্রেণীর সাহেবের কাছে গিয়া বুড়ী বড় কাতরভাবে বলিল, "বাছা! এ গাড়ীতে এই ছেলেটীকে একটু জায়গা দেবে কি? আমরা বাছা, ছিরামপুরে নাব্‌বো।"

বুড়ী চোখে ঝাপসা দেখে। বিশেষ ষ্টেসনের ঘোরঘটা দেখিয়া কেমন সে দিশাহারা হইয়াছে। বুড়ী, আরোহীকে সাহেব বলিয়া চিনিতে পারে নাই।

বৃদ্ধার বাক্য শ্রবণানন্তর সাহেব হুমকী দেখাইয়া গোক্ষুরা-সর্পবৎ গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "হিঁয়াসে, আবি ভাগো বুড্‌ঢী—চলা যাও, চলা যাও—"

বৃদ্ধা, সাহেব দেখিয়া, গর্জ্জন শুনিয়া, থতমত খাইয়া ভূমিতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল।

এমন সময় আর এক ঘটনা ঘটিল।

আর এক ব্যক্তি আসিয়া সাহেবের গাড়ীর হাতল ধরিল। তাহার পরিধান আধ-ময়লা মোটা থানধূতি; গায়ে একটা পুরাতন জীর্ণ লাল বনাত,—অদ্যকার দারুণ শীতে তাহাই তাহার একমাত্র সম্বল; অঙ্গে পিরাণ, কি আঙরাখা, কি কোট—কিছুই ত দেখিতেছি না। কি আশ্চর্য্য! পায়ে যে জুতাও নাই! পায়ের গোড়ালি যেন একটু একটু ফাটা ফাটা বোধ হইতেছে; বাম হাতে একটা মৈনাক-পর্ব্বতবৎ মহাভারী পুঁটুলী—পাকি আধমণের কম নহে। মোটের ভারে তাহার বামাঙ্গ ঈষৎ হেলিয়াছে; দেহ খুব কঠিন না হইলে বোধ হয়, এতক্ষণ সে, বামে হেলিয়া পড়িয়া যাইত।

হাতল ধরিবামাত্র সাহেব, রুক্ষস্বরে তাহাকে বলিলেন, "এ গাড়ী, তোমারা নেহি—দোস্‌রা কামরামে যাও—আবি চলা যাও—"

এই কথা বলিতে বলিতে সেই হাতলে-সন্নিবিষ্ট হস্তে সাহেব অল্প ধাক্কা দিলেন।

সে ব্যক্তি তখন সাহেবের মুখ পানে স্থিরদৃষ্টিতে এক মুহূর্ত্তের জন্য একবার চাহিল। চাহিয়া বলিল, "কেন, এই গাড়ীইত আমাদের; ইহাতে চাপিতে দোষ কি?"

এই কথা বলিয়া সে, হাতল ঘুরাইয়া দ্বার খুলিতে গেল।

সাহেব তালপত্রের অগ্নির মত ধূ ধূ জ্বলিয়া উঠিলেন। মহাক্রোধে কম্পিত-কলেবরে বলিলেন, "শূয়র্‌কা বাচ্ছা—হারামজাদ্—আবি ভাগো হিঁয়াসে।"—এই কথা শেষ হইতে না হইতেই, তাহার গলদেশে সাহেব এক সজোর ধাক্কা দিলেন।

সেই প্রহারিত ব্যক্তি আবার ধীরস্থিরদৃষ্টিতে সাহেবের পানে চাহিল। সে,

আত্ম-প্রসন্নতা দেখাইয়া অথচ নির্ভয়ে,—প্রফুল্লিত-গণ্ডস্থলে, হাসি-হাসিমুখে মধুর কথায় সাহেবকে সম্বোধন করিল, "মহাশয়, রাগ করেন কেন? রাগ বড় বিষম শত্রু।"

সাহেব অবাক্!—স্তম্ভিত! গালি দিলাম, মারিলাম,—তবু লোকটা রাগও করিল না,—কিছুমাত্র ভীতও হইল না;—নির্ভয়ে আনন্দে কেবল হাসিল, উপদেশ দিল। সম্মুখে হঠাৎ শতবজ্রপাত হইলেও বোধ হয় তিনি এত চমকিতেন না। সাহেব-জীবনে তিনি কখন এরূপ অপূর্ব্ব অলৌকিক ঘটনার সম্মিলন দেখেন নাই। বাস্তবিকই তখন সাহেব যেন অবসন্ন, মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন। সাহেব তখন নিঃশব্দ, নীরব, কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান।

গাড়ী-দ্বারে আর কোন বাধা-বিপত্তি রহিল না; সে ব্যক্তি মোট লইয়া সহজে উঠিল। বলা বাহুল্য, এই ঘটনা ঘটিতে এক মিনিটের অধিক সময় লাগে নাই।

ইত্যবসরে সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটী একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যোড়-হাতে—সুম্মুখে যাহাকে পায়,—তাহাকেই বলিতে লাগিল—"বাবা, আমরা কি গাড়ীতে একটু যায়গা পাবো না? বাবা, রাত হয়েছে; কল্‌কাতার রাস্তা যে চিনি না, বাবা, ফিরেই বা যাবো কেমন করে?—ছোট ছেলেটীকে নিয়ে রেতে কোথা থাক্‌বো? পায়ে পড়ি, আমাদিগে উঠিয়ে দাওনা বাবা!"

বৃদ্ধার সেই মৃদু করুণ আর্ত্তনাদ কেহ শুনিল না, সে চোখো জল কেহ দেখিল না! সকলেই আপনাপন কর্ম্মে ব্যস্ত।

কিন্তু সেই গলাধাক্কা খাওয়া, রাঙ্গাবনাত-গায়ে-দেওয়া লোকটার কাণ সেই দিকে গেল। সে, গাড়ী হইতে উঁকি মারিয়া বুড়ীকে মধুরস্বরে জিজ্ঞাসিল, "কেন মা, কাঁদ্‌চো?"

বৃদ্ধা। বাবা, আমাকে কেউ যায়গা দিচ্চে না।

লোকটা। মা, তবে তুমি শীঘ্র এই গাড়ীতে এস। গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে হইয়াছে।—এতে লোক কম আছে। তোমার কি মা—তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট?—আচ্ছা, হোক!—তুমি কোথা নাবে, মা?

বুড়ী। বাবা, আমি ছিরামপুরে যাবো।

লোকটা। মা, তবে শীঘ্র এই গাড়ীতেই এসো।

বুড়ী। ও-গাড়ীতে যে, সাহেব আছে বাবা,—আমি মেয়ে মানুষ, সাহেবের সঙ্গে কেমন করে যাবো বাবা ?

ইত্যবসরে তথায় খোদ ষ্টেসনমাষ্টার আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি দূর হইতে কোন লোকের গদাদণে, কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক ধাক্কা-প্রদান দেখিতে পাইয়াছিলেন। শান্তিভঙ্গ-ভয়ে তিনি দ্রুতপদে আসিয়াই সেই কামরাস্থ আরোহিগণের উদ্দেশে, ইংরেজীতে জিজ্ঞাসিলেন,—"ব্যাপার কি ? কে কাহাকে প্রহার করিল ?"

যে ব্যক্তি মার খাইয়াছে, সে ইংরেজী-অনভিজ্ঞ। ষ্টেসন-মাষ্টারের ইংরেজী কথা, সে বুঝিল না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একজন পেন্‌টুলান-চাপকান-চোগা-পরা বাবু সেই মধ্যশ্রেণীতে উঠিয়া, শুইয়াছিলেন। তিনি ষ্টেসন-মাষ্টারের কথা শুনিয়া শয্যা হইতে বেগে উঠিয়া সেই সাহেবটার দিকে অঙ্গুলি হেলাইয়া, ইংরেজীতে ষ্টেসন-মাষ্টারকে উত্তর করিলেন,—"ঐ ভদ্রলোকটী, এই ভালমানুষ লোকটীর গলায় বিনাকারণে ধাক্কা মারিয়াছেন,—অনর্থক গালি দিয়াছেন—"

ষ্টেসনমাষ্টার। বড় অন্যায় কথা! ঐ প্রহারিত ব্যক্তির এ সম্বন্ধে কোন বক্তব্য আছে কি ?

তখন সেই বাবু, প্রহারিত ব্যক্তিকে বলিলেন, "অ, ঠাকুর! শোন।—তোমাকে যে, সাহেব মেরেচে, সে সম্বন্ধে ষ্টেসন-মাষ্টারকে তোমার কিছু বলিবার আছে কি ?—বলে দাও এখনি—মেরেছে। যেমন কর্ম্ম তেমনিই ফল হোক।"

সেই সদানন্দ লোকটী ঈষৎ হাসিয়া, বাবুকে বলিলেন, "সে কথা যেতে দিন,—সেজন্য আমার কিছু ক্ষতি নাই। ষ্টেসন-মাষ্টারকে আমার বক্তব্য,—ঐ বৃদ্ধাকে এবং ছেলেটীকে যেন তিনি গাড়ীতে উঠিয়ে দেন।"

সাধু উদ্দেশ্য সফল হইল না দেখিয়া বাবু একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন ; একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

ষ্টেসন-মাষ্টার খাঁটি ইংরেজ হইলেও, বহুকাল বঙ্গদেশে বাসহেতু, বেশ বাঙ্গালা বুঝিতেন। সেই প্রহারিত লোকের অমায়িক ভাবের কথা শুনিয়া তিনিও একটু আশ্চর্য্য হইলেন। সম্মুখে সেই বৃদ্ধা এবং বালকটীকে দেখিয়া, তাহাদের তৃতীয়

শ্রেণীর টিকিট সত্ত্বেও, ষ্টেসন-মাষ্টার তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ সেই মধ্যশ্রেণীতে উঠাইয়া দিলেন। তৃতীয় শ্রেণীতে আর স্থান নাই। তখন তিনি অন্যান্য মধ্যশ্রেণীর আরোহীর টিকিট পরীক্ষা করিয়া সে, গাড়ীদ্বারে চাবি আঁটিয়া দিলেন।

মুহূর্তমধ্যে ষ্টেসন-মাষ্টারের নিশান উড়িল, গাড়ী ছাড়িল।

সেই আরোহী সাহেব মুগ্ধ। নড়ন-চড়ন-বিহীন হইয়া সেইরূপই নিঃশব্দে দণ্ডায়মান।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিষম ধাঁধা। উদ্ভট সমস্যা। হৃদয়ে ঘোরতর অন্ধকার,—দিক্‌শূন্য, পথশূন্য, সীমাশূন্য; তাই সাহেব কিছুরই কূল-কিনারা না পাইয়া, একেবারে যেন দমিয়া পড়িলেন। তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। ঘাড় হেঁট হইয়া রহিল। মাঝে মাঝে তিনি এক একবার ঈষৎ ঘাড় তুলিয়া চক্ষু অল্প চাহিয়া চকিতের ন্যায় সেই লোকটার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন,—আর তৎক্ষণাৎ সেই মুহূর্ত্তেই, যেন ভয়ে জড়সড় হইয়া, যেন নিদারুণ লজ্জায় অভিভূত হইয়া, তিনি চক্ষু ফিরাইয়া লয়েন, আবার ঘাড় অবনত করেন।

সাহেবের মনে কি এই ভাবের উদয় হইল?—আমি কি দুষ্ট-স্বভাব, দুরন্ত!—আর, ঐ লোকটাই বা কি শিষ্ট-স্বভাব, শান্ত!!—আমি কতই পামর, পাষণ্ড, ভণ্ড!—আর ঐ লোকটা কতই সরল, সাধু, অমায়িক!! আমি উহাকে কটূবাক্যে যাচ্ছেতাই গালি দিলাম, গলাধাক্কা দিয়া প্রহার করিলাম,—তবু লোকটা রাগ করিল না; কিঞ্চিৎমাত্র ভীতও হইল না। রাগ ভয় দূরে যাউক, একটুও দুঃখিত হইল না, একটু কষ্টও অনুভব করিল না। বরং যেন সে আনন্দিত হইল—হাসিল!! আমাকে কি ও-লোকটা তবে পশু বা বাঁদর মনে করে? এরূপ প্রহার-কাণ্ডে লোকটা কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করিল না, বিচলিতও হইল না;—এমন লোকও ত আমি কখন দেখি নাই!!

বোধ হয় সাহেব এই বিষম ধাঁধায়, ঘোর অন্ধকারে, অগাধ সলিলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন। তাই বুঝি তিনি মন্ত্রৌষধ-মুগ্ধ সর্পের ন্যায় নতশির, অবশ, ম্রিয়মাণ!

এদিকে বাবুরও কতকটা লক্ষ্য সেঁই লোকটার দিকে হইল। বাবু কয়েকবার তাহার পানে চাহিলেন। শেষে জিজ্ঞাসিলেন,—"ঠাকুর, তুমি নাম্‌বে কোথায়?"

সেই লোকটা যখন গাড়ীতে উঠিয়া, মোট রাখিয়া—প্রথমত সেই জীর্ণ বনাতখানি একটু গুছাইয়া গায়ে দেয়, তখন সেই অবসরে বাবু তাহার পৈতা দেখিয়া, তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া চিনিয়াছিলেন। তাই তিনি তাহাকে ঠাকুর বলিয়া সম্বোধন করেন।

ঠাকুর অতি বিনীতভাবে, যেন ভৃত্যবৎ, অথচ খুব সহজে বাবুর কথায় উত্তর দিল,—"মহাশয়, আমি ৺ কাশীধাম যাবো—"

বাবু। বেশ বেশ!—তবে রাত্রের একজন সঙ্গী পাওয়া গেল। রাত্রে'ত—আর ঘুম হবে না; দুজনে তামাক খাবো, গল্পসল্প কর্‌বো—

ঠাকুর নীরব,—পূর্ব্ববৎ হাসি-হাসি-মুখ।

বাবু। টিকে, তামাক, দেশেলাই সবই মজুদ—

ঠাকুর তথাচ নীরব।

বাবু। ঠাকুরের তামাক খাওয়া আছে ত?

ঠাকুর। (হাসি-হাসি-মুখে) তামাক খাই বৈকি?—

বাবু। বেশ, বেশ! অতি উত্তম! দুজনে ঢাল্‌বো আর সাজ্‌বো;—আর এ অম্বুরী তামাক,—আজকার শীতে বড়ই মজাদার লাগ্‌বে!—তামাকে না কুলায়, শেষে, বর্ম্মা চুরুট তোমাকে দিব। আমার ব্যাগে সব আছে। কি বলো ঠাকুর, আজকের যেরূপ কন্‌কনে শীত,—এরকম দুই একটা জিনিষ না থাক্‌লে কি পথ চলা যায়?

সদানন্দ ঠাকুর ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিল,—"মহাশয়, আমি তামাক খাই বটে, কিন্তু রেলগাড়ীতে কখন খাই না; চুরুট ত কস্মিন্‌কালে খাই নাই—"

এই কথা শুনিয়া বাবু বড়ই বিমর্ষ হইলেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন, এই বামুনটাকে দিয়ে সমস্ত রাত তামাক সাজাবো আর খাবো। কিন্তু বামুনত তামাক খাইবে না,—উহাকে সাজিতে বলিব কেমন করিয়া?

বাবুর একটু রাগও হইল। মনে মনে বলিলেন, "ঘণ্টানাড়া, টীকিওয়ালা বামুনটাত

কম পাত্র নয়?" তাঁহার হৃদয়ে এরূপও বাঁধা ঠেকিল, "বামুনটা বুঝি শীতে হাত বা'র করে তামাক সাজিবার ভয়ে মিথ্যা করিয়া বলিল,—'গাড়ীতে আমি তামাক খাই না।' বামুনের বিট্‌লিমি দেখেচো;—হুঁ! ভণ্ড! তুমি ঘরে তামাক খাও,—আর বাইরে তামাক খেতে হলে তোমার মাথায় বজ্রাঘাত হয় নাকি? এই বেল্লিক বামুন-গুলোই ত দেশ মজালে।"

যাহা হউক, দুঃখ এবং ক্রোধ সংযত করিয়া বাবু উত্তর করিলেন, "সে কি ঠাকুর? —এ শীতে তামাক খাবে না, চুরুট খাবে না, এঁ-এঁ-এঁ! দারুণ শীত কাটাবে কি করে?—জমে বরফ হয়ে যাবে যে!—ঠাণ্ডা বাতাসের তেজই বা কি? (গলার সুর নরম করিয়া) কালী মায়ের পেসাদ টেসাদ কখন খাওয়া আছে কি?

ব্রাহ্মণ উচ্চকণ্ঠে হো-হো হাসিয়া উঠিল। বাবু যেন একটু অপ্রস্তুত হইলেন। বলিলেন, "না— আমি তা বলি নাই,—তবে শাস্ত্রানুযায়ী তন্ত্র-মতে সে কাজে কোন দোষ নাই, তাহাই বলিতেছিলাম।"

বাবু তখন সর্ব্বদিকে বিফল-মনোরথ হইয়া,—সে রাত্রে শীতে স্বয়ং তামাক-সাজা-কার্য্য ঝকমারি বিবেচনা করিয়া, ব্যাগ হইতে চুরুট দিয়াশেলাই বাহির করিলেন। বলা উচিত, বাবু চুরুট-খোর নহেন। কালে-ভদ্রে, মজলিসে-মহোৎসবে, বিশেষ আবশ্যকে, তিনি চুরুট ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু এইরূপ রেলগাড়ীতে যাতায়াতে, তিনি প্রায় সব কয়টা নেশা-দ্রব্যই একত্রিত করেন। এ সব কথা, একটা সংসার-রসানভিজ্ঞ লোক শুনিলে হয়ত অবাক্ হইয়া যায়। (১) তামাক, (২) চুরুট, (৩) সিগারেটের জন্য বিলাতী গুঁড়া তামাক এবং তাহার কল, (৪) সিদ্ধি, (৫) গাঁজা যৎসামান্য—এক ছিলেমের অধিক হইবে না, (৬) এক বোতল ব্রাণ্ডী।

বাবুর সাফায়ে একটা কথা বলিয়া রাখি; বাবু মদখোর—মাতালও নহেন, বা গাঁজাখোর—গেঁজেলও নহেন। খুব পরিমিতব্যয়ী। যদি বড়ই সখ হইল, তবে এক-ছিলিম গাঁজা চারি ছিলিম তামাকে মিশাইয়া, তাহারই এক এক ছিলিম এক-একবার খান। ভাবো, দারুণ শীত, অন্তর গুর্‌গুর্ করিতেছে, সর্দ্দিও একটু বেশ হইয়াছে—তখন বাবু হয়ত তিন আউন্স ব্রাণ্ডি খাইয়া, মুখ পুঁছিয়া, গোটাদুই ছোট এলাচ মুখে দিলেন। একাকী রেল-পথে ভ্রমণে তাঁহার এসব সখ অপেক্ষাকৃত একটু অধিকমাত্রায়

বৃদ্ধি পায়। নচেৎ আর কোন দোষ বা উপদ্রব নাই। এ ছাড়া তিনি তেইশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মাদক-নিবারণী সভার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তার পর, তিনি রাষ্ট্র করিলেন, রাজকার্য্যের পরিশ্রমাধিক্য হেতু তামাকটা না খাইলে শরীরের স্ফূর্ত্তি হয় না। তামাকের পর চুরুট; অবশেষে ক্রমান্বয়ে মদ এবং গাঁজা ধরিলেন। এত মাদক দ্রব্য সত্ত্বেও তিনি কখন নিজ পয়সায় সভার নিয়ম ভঙ্গ করেন নাই,—কেবল শরীরধারণার্থ স্বাস্থ্য-অভঙ্গের ভয়ে, ঔষধের হিসাবে, যতটুকু দরকার, ততটুকুই গ্রহণ করিতেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার মদ এবং গাঁজা সেবনের কথা, দুই চারিজন "বিশেষ-বন্ধু" ব্যতীত ইহলোকে আর কেহই জানিত না।

বাবু, মুখে চুরুট ধরিয়া দিয়াশেলাই জ্বালিতে আরম্ভ করিলেন। এক, দুই, তিন—ক্রমান্বয়ে চারিটী দিয়াশেলাই জ্বালিলেন। কিন্তু বায়ুর তেজে চারি বারই নিবিয়া গেল; চুরুট ধরিল না। তখন বাবু এক কোণে গিয়া যোড়া যোড়া দিয়াশেলাই বাহির করিয়া এক কালে বাক্সের গায়ে ঘষিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বয়ং আনাড়ী হইলে, কোন কাজেই সুখ হয় না। হাত দিয়া বায়ুকে ফিরাইতে তিনি কত বার চেষ্টা করিলেন—কিন্তু সবই বিফল হইল। বাবুর মুখের চুরুট মুখে রহিল, কেবল নয়ন-জলে বুক ভাসিল।

বাবুর সে সময়ের লাঞ্ছনা ও কষ্ট দেখিয়া কাহার না দুঃখ হয়? সেই বামুন ঠাকুরটা বাবুকে বলিল, "মহাশয়! আমাকে একবার দিয়াশেলাইটে দিন দেখি?—পারি কি না, আমি একবার চেষ্টা করে দেখি,—"

বাবু কৃতার্থ হইলেন; দিয়েশেলাই দিলেন।

বামুনটা হাতের এমন কৌশল করিল,—উভয় করতল সম্মিলিত হইয়া এমন এক গুপ্ত-গৃহ নির্ম্মিত হইল যে, তাহার ভিতর আগুন আর নিবিল না। বামুন বলিল, "এইবার শীঘ্র চুরুট ধরাইয়া লউন। (হাসিয়া) দেখ্‌বেন, আমার মুখের দিকে যেন ধূঁয়া দিবেন না।"

বাবু তাহাই করিলেন। চুরুট ধরিল; আনন্দ হইল। গড়্ গড়্ শব্দে গাড়ী বালী আসিয়া পৌঁছিল।

বাবুর প্রথমে আনন্দ হইল বটে, কিন্তু বামুন যে, "আমা অপেক্ষা বাহাদুর"—এই ধারণায় বাবুর একটু কষ্টও হইল। একটু হিংসাও হইল। ক্রমশ এই ভাবগুলি বাবুর

মনে উদয় হইল ;—“বামুনটা পুজারি না রঁধুয়ে বামুন ? বোধ হয়, কলিকাতায় কোন বড়লোকের বাড়ীর পাকা-রঁধুয়ে হবে ! বড়মানুষের কাছে থেকে থেকে সব কাজকর্ম্মই শিখেছে,—রাস্তাঘাটে সাহসও বেড়েছে,—লোকটা কাজের লোক বটে। কিন্তু একটা দোষ আছে, লোকটা বড় মিছে কথা কয় ? বামুন নিশ্চয়ই চুরুট খায় ! তা না হলে, চুরুট ধরাবার এমন কৌশল শিখ্‌-লে কি ক'রে ? ভণ্ড-বেটা নিশ্চয়ই ওস্তাদ চুরুটখোর।”

এদিকে সেই সাহেব এখনও সেই ভাবেই দণ্ডায়মান। যেন বসিতে ভুলিয়া গিয়াছেন, অথবা যেন তিনি এ সংসারে আর নাই ! ভগবান্ জানেন, তিনি আজ কি ভাবে ভোর !

বালীতে গাড়ী থামিলে, বামুন তীব্র-দৃষ্টি দিয়া সাহেবের চোখ, মুখ, কপাল, গাল, হাত, পা পরীক্ষা করিতে লাগিল। সাহেবের চেহারা দেখিয়া বামুনের সন্দেহ জন্মিল,—বুঝি উঁহার কোন রোগ জন্মিয়াছে। নচেৎ অমন নিশ্চলদেহ, থেকে থেকে' থর থর কাঁপিয়া উঠিবে কেন ?

বামুন তখন আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া, দৌড়িয়া গিয়া, সাহেবের গায়ে হাত দিয়া বলিল, “মহাশয়, আপনার কি হয়েছে ?”

এ কি-এ ? সাহেবের সঙ্গে বাঙ্গালা কথা ? সাহেব কোন কথার উত্তর দিতে না দিতেই, বামুন আবার সাহেবকে বলিল,—' আপনি অমন করিতেছেন কেন ?—কি হয়েছে ?—”

আবার এ কি বেয়াদবী ?—এ কি গোস্তাকী সাহেবকে “বাবু” সম্বোধন !! এ আপমানের কি কোন প্রতিশোধ নাই ?—প্রতিশোধ ঘুষি ; অথবা স-বুট পদচালন।

কিন্তু সাহেব এ দুয়ের কোন কাজই করিলেন না। তিনি বামুনের মুখপানে ফ্যাল ফ্যাল চাহিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া হঠাৎ বসিয়া পড়িলেন। বামুন তাঁহাকে তখনও ধরিয়া রহিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দুরন্ত বাঘ ভেড়া হইল। রাক্ষস মানুষ হইল। পাপী বুঝি সাধু হইল।

সৎসঙ্গই স্বর্গ। বলিরাজ পাষণ্ড লইয়া স্বর্গে যাইতে স্বীকৃত হন নাই। গুহক চণ্ডাল, রামচন্দ্রের সখ্যতা লাভ করিয়া মোক্ষধামে গমন করেন। দুর্ব্বৃত্ত জগাই মাধাই, শ্রীচৈতন্যের চরিত্র-বলে চৈতন্য প্রাপ্ত হয়।

তৃণহীন, বিশুষ্ক, উত্তপ্ত মরুভূমে হঠাৎ শীতল স্বচ্ছ জলের ফোয়ারা উঠিল! পাষাণে পদ্মফুল ফুটিল! অমাবস্যায় চাঁদ উদিল! মৃতদেহে প্রাণ আসিল! নরক হাসিল!

বামুন, সাহেব-বাহাদুরের দেহখানিকে বাহুদ্বয় দ্বারা ধরিয়া থাকিয়া, আবার জিজ্ঞাসিল,—"অমন্ ক'র্‌ছেন কেন বলুন দেখি?"

সাহেব নিরুত্তর। কেবল ইঙ্গিতে, ভাবে, তিনি শয়নের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বামুন, খাট সরাইয়া সাহেবকে শোয়াইল; নিজের উরুতে সাহেবের মাথা রাখিল। দেখিল, এত শীতেও সাহেবের কপাল যেন ঈষৎ ঘামিতেছে। বামুন তখন তাঁহার সেই বিলাতী-জামার বোতাম খুলিতে লাগিল।

বাবু স্বচ্ছন্দে, পরমানন্দে চুরুট খাইতে খাইতে সেই ব্যাপার অবলোকন করিলেন,—উদ্বেগ নাই, চিন্তা নাই, যেন তিনি মজা দেখিতে লাগিলেন; আর বোধ হয়, মনে মনে তিনি এই চিন্তা করিতেছিলেন, "বামুনটা যেরূপে, সাবধানে, সুকৌশলে সাহেবের সেবা আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে সে নিশ্চয়ই কোন আমীর লোকের পিয়ারের খানসামা হবে।"

বামুন, সাহেবকে ধীরে-ধীরে বলিল, "আপনি একটু জল খাবেন কি?"

সাহেব তখন দুই হাতে, বামুনের দক্ষিণ কর-কমল ধরিয়া, বুকের উপর রাখিয়া, ক্ষীণকণ্ঠে, ভাঙা-ভাঙা স্বরে, অতি কাতরভাবে বলিলেন, "আমি মহাপাপী,—আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন কি?"

সাহেবের কথা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাঙ্গালা—ঠিক যেন খাঁটী বাঙ্গালীর কথা। বাবু, সাহেবের মুখে এরূপ চাঁচাছোলা বাঙ্গালা শুনিয়া একটু চমকিলেন। বাবুর ধারণা

ছিল,—সাহেব প্রকৃত ইংরেজ না হইলেও ভাল মেটে-ফিরিঙ্গী বটে; কিন্তু ফিরিঙ্গীতে এমন চমৎকার, এমন উচ্চারণশুদ্ধ, বাঙ্গালা বলিতে পারে কি? বাবুর বড়ই কৌতূহল জন্মিল। ব্যস্তবাগীশ বাবু আর থাকিতে না পারিয়া, সাহেবকে জিজ্ঞাসিলেন; "মহাশয়ের নাম কি?—আপনি কি বাঙ্গালী?"

বামুন-ঠাকুর হাসিয়া বাবুকে উত্তর দিল, "আপনি কি মুখের চেহারা দেখিয়া লোক চিনিতে পারেন না? ইনি বাঙ্গালীত বটেনই—"

সাহেব আবার বামুনকে বলিলেন, "আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই?—আপনার উরুতে মাথা দিবার আমি অযোগ্য।"

ঠাকুর। (সহাস্যে) আপনি অমন কথা বলেন কেন? আমার ত আপনি কিছুই করেন নাই? আপনার দোষ কি?

বাবু এখন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। ছেঁড়া-চটি-পায়ে, ময়লা-টেনা-পরা বামুনটা কি না আমার সঙ্গে সমান উত্তর করে, "আপনি কি মুখের চেহারা দেখিয়া লোক চিনিতে পারেন না?"—ওর ত বড়ই স্পর্দ্ধা দেখিতেছি! ঐ টাকিওয়ালা বামুনটা কি আমার চেয়ে বুদ্ধিমান্? তা'ত কখনই নহে। তবে লোকটা বোধ হয় খুব সাহেব-ঘেঁসা হবে!—এঁ—কলিকাতায় গোরার দালাল নয়ত? নিশ্চয়ই তাই বটে! হামেসা সাহেবের কাছে ধাক্কাধুক্কি খাওয়া অভ্যাস আছে; তা না হলে, এখন এমন গলাধাক্কা খেয়ে, সাহেবকে কিছু সে বলিল না কেন? হাসিয়া উড়াইয়া দিল কেন? আবার সে এখনি যেয়ে, সাহেবটার মাথা উরুতে রেখে, সাহেবের খোষামোদ করিতেছে!—ছি! ছি! ছি! লোকটা কি কাপুরুষ, নরাধম দেখেচো!—এই দোষেই ত বাঙ্গালী-জাতি অধঃপাতে গেল!

সাহেব আর শুইয়া থাকিতে পারিলেন না। বেগে লাফাইয়া উঠিয়া, একেবারে ব্রাহ্মণের চরণতলে পড়িয়া, তাহার দুইটা পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "আপনি [illegible]বে হউন,—আপনি আমাকে আজ ক্ষমা করুন। আমি পাষণ্ড; আমাকর্ত্তৃক পাদস্পর্শে আপনার পায়ের লাঘব আছে বটে, কিন্তু আমি আপনার পা ছাড়িব না; আপনি আমায় ক্ষমা করুন।"

বামুন, অতি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিল, "আপনি করেন কি?—করেন কি?—"

সাহেব কাতরকণ্ঠে, নয়ন-জলে গণ্ডস্থল ভাসাইয়া বলিলেন, "আপনি বলুন,—একবার বলুন,—ক্ষমা করিলাম।"

সেই আনন্দময় ব্রাহ্মণ হাসি-হাসি মুখে উত্তর দিল, "পাগল! পাগল!—আচ্ছা—আমি ক্ষমা করিলাম; আপনি উঠুন। হরি রক্ষা কর।"

সাহেব উঠিয়া স-সম্মানে ব্রাহ্মণের অদূরে বসিলেন। তাঁহার শরীর যেন কতকটা নীরোগ, সুস্থ হইল।

দেখিয়া শুনিয়া বাবু ঠাওরাইলেন, সাহেবটার নিশ্চয়ই মৃগী রোগ আছে। নচেৎ তিনি এমন লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া উঠিবেন কেন?—অমন কাঁপিবেনই বা কেন?—সাহেবটা কি জাত—চুণোগলির ট্যাস?—না, চৌরঙ্গীর ফ্যোস? উঁ—বাঙ্গালী কি? নবজাত নবনীবৎ বাবুর তরলচিত্ত ঐ ভাবেই আন্দোলিত হইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে গাড়ী শ্রীরামপুরে থামিল। বামুন বৃদ্ধাকে বলিল, "মা, এইবার তোমায় নামিতে হবে।"

বুড়ী ছেলেটীর হাত ধরিয়া উঠিল। বামুন বৃদ্ধার ছোট একটী পুঁটুলি, নীচে প্লাট্‌ফরমে নামাইয়া দিতে গেল। সাহেব বেগে উঠিয়া, তাড়াতাড়ি পুঁটুলি ধরিয়া, বামুনকে বলিলেন, "আমি পুঁটলিটী নাবিয়ে দিচ্চি,—আপনার আর কষ্ট করে নাবাতে হবে না।"

এই ব্যাপার দেখিয়া বৃদ্ধা গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "বাবা, সর্ব্বনাশ হ'লো, বাবা, সর্ব্বনাশ হ'লো!—পুঁটলীতে যে কালীর চরণামৃত আছে,—মায়ের ভোগের সন্দেশ আছে, আমার হরিনামের ঝুলি আছে!—সায়েবে ছুঁয়ে বাবা আমার আজ সর্ব্বনাশ করিল—"

বৃদ্ধার চোখে জল আসিল, ক্রমে সে ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সাহেব অপ্রতিভ, লজ্জায় অধোবদন। "মাতঃ বসুন্ধরে! দ্বিধা বিভক্ত হও, আমি তাহাতে প্রবেশ করিব"—বোধ হয় সাহেব মনে মনে ঐ কথাই বলিলেন।

প্রাণ খুলিয়া হাসিবার সময় ব্রাহ্মণের কণ্ঠের আওয়াজ বৃদ্ধি পাইত। সদানন্দ ব্রাহ্মণ এবার উচ্চগলায় হো হো হাসিয়া উঠিল।

সাহেব আরও দ্বিগুণ শরমে যেন মরমে মরিলেন। এক ঘণ্টা পূর্ব্বের সেই লম্ফঝম্প-কারী তেজীয়ান্ সাহেব-পুঙ্গব, এখন একটা সামান্য, সোজা কথায় ভীত, ত্রস্ত, কম্পিত, থতমত,—ন যযৌ ন তস্থৌ। পরোপকারে যে এত বিভ্রাট ঘটে, সাহেবের সে ধারণা ছিল না। বুড়ীর সুবিধার জন্য, সাহায্যের জন্য, উপকারের জন্য, আমি অগ্রসর হইলাম,—বুড়ী কিন্তু তাহা মানিল না; কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে যাউক, বুড়ী ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করিল,—কাঁদিল!! আর ঐ সুব্রাহ্মণ হো হো হাসিয়া উঠিল! কি বিপদ্!! গতিক কি?

বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে গাড়ী হইতে অবতরণ করিল। বামুন হাসিতে হাসিতে, পুঁটুলী লইয়া, বৃদ্ধার সঙ্গে নামিয়া বলিল, মা, "কেঁদো না;—উনি সাহেব নহেন, উনি বাঙ্গালী।"

বৃদ্ধা ম্লানমুখে, সাহেবের পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসিল,—"বাছা, তোমার নামটী কি?—তোমার বাড়ী কোথা বাছা?"

বৃদ্ধার প্রশ্ন শুনিয়া, সাহেব সেই নিদারুণ শীতে, ঝটিতি সতেজে আপন গাত্রবস্ত্র খুলিয়া ফেলিলেন,—উলঙ্গ গাত্র হইতে, দক্ষিণ হস্তে পৈতা ধরিয়া, বৃদ্ধাকে দেখাইয়া বলিলেন, "মা, আমি ম্লেচ্ছ নহি, আমি ব্রাহ্মণ! মা, আমি মহাপাপী। পাষণ্ডের নাম—কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—নিবাস হুগলী।"

সেই গাড়ীমধ্যস্থ বাবু ব্যাপার দেখিয়া, চমকিয়া উঠিলেন!—"ঐ লোকটা তবে সাহেব নয়—বামুন!!—আমার চোখে আচ্ছা ধূলা দিয়েছিল ত!—সাহেবী সাজের ওস্তাদী আছে,—বিষম কারিকুরি আছে!!

বৃদ্ধা, সাহেবকে পৈতাধারী ব্রাহ্মণ দেখিয়া, আনন্দ-অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে, পুঁটুলি লইয়া, ছেলেটির হাত ধরিয়া চলিয়া গেল।

ব্রাহ্মণ উঠিল। গাড়ী ছাড়িল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পাঠক! বুঝিলেন কি? হুগলী ব্রাঞ্চস্কুলের সেই এনট্রেন্স ক্লাসের ছাত্র শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্রই আমাদের সাহেব। বিভীষণ-মূর্ত্তি বীরেশ্বর বাবুর সুদর্শন-চক্র হাতা-অস্ত্রকে উপেক্ষা করিয়া, কৈলাস প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া, পলাইয়া যান। অচিরে চারিদিকে নানা কথা রাষ্ট হইল। প্রকাশ পাইল, কৈলাসই সেই 'ডাকাৎদলের' নেতা—কৈলাসের লাঠিতেই ঘনশ্যাম বাবু ভূপতিত হন। এমন কথাও কাণাকাণি হইল, কমলিনীর সহিত কৈলাসের পূর্ব্বে যে সম্বন্ধটুকু ছিল, ঘনশ্যাম বাবু আসা অবধি যে সম্বন্ধটুকু ঘুচিয়াছে। পুরুষগণের সহিত কমলিনী যখন বৈকালিক সাহিত্য-চর্চ্চা এবং সঙ্গীত আলাপ করেন, তখন সে আসরে কৈলাস আর স্থান পান না। এমন কি, কৈলাসের সঙ্গে কমলিনী দিনান্তে একবার একটীও কথা পর্য্যন্ত কহেন না। কৈলাস প্রত্যহ চারি পাঁচবার ডেপুটী বাবুর বাসায় যান,—আর, শুষ্কমুখে ফিরিয়া আসেন। ক্রমে কৈলাসের বিষম জাতক্রোধ বাড়িল! কৈলাস দল বাঁধিলেন। সেই দলবাঁধার ফল—ডাকাতি,—ঘনশ্যামকে প্রহার। তারপর ব্রাঞ্চস্কুলের বিচার আরম্ভ—কৈলাসের পলায়ন।

ক্রমশ কৈলাসের দুর্ব্বৃত্ততার পরিচয়—কৈলাসের পিতার কাণে উঠিল। বাপ, ছেলেকে বহু ভর্ৎসনা করিলেন। শেষে ক্রোধোন্মত্ত হইয়া বলিলেন, "অমন ছেলের মুখ দেখ্‌তে নাই।"

কৈলাস একগুঁয়ে তেজী পুরুষ। পিতার বাক্যবাণ তাঁহার মরমে বিঁধিল। তিনি গৃহত্যাগের উপায় স্থির করিতে কলিকাতায় আসিলেন। পিতার নিকট একটী পয়সাও চাহিলেন না। নানা উপায়ে পঞ্চাশটী টাকা সংগ্রহ করিলেন। কৈলাসের বড়-দাদা পাটনায় চাকুরী করেন,—কৈলাস আপাতত তথায় যাইবেন। সেখানে গিয়া কিছু অধিক টাকা সংগ্রহ করিয়া তিনি বারিষ্টার হইতে বিলাত গমন করিবেন—ইহাই স্থির হইল।

কিন্তু দাদার হাতে টাকা থাকিলেও তিনি যে ভ্রাতার বিলাত-গমনে অনুমোদন করিবেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। ব্যবসা করিব বলিয়া, টাকা লওয়াই, কৈলাস ঠিক করিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া কৈলাসচন্দ্র বিলাত যাইবার অন্ধি সন্ধি সমস্তই শিক্ষা করিতে লাগিলেন। অনেক বিলাত-প্রত্যাগতের কাছে গোপনে উপদেশ গ্রহণ করিলেন। সাজসজ্জায় পোষাকে খাঁটি সাহেব হইলেন। হাবভাবে, আচারে বিচারে, আহারে বিহারে, চলনে দোলনে, কথায় বার্ত্তায় সাহেবীপ্রথার আখড়াই দিতে লাগিলেন। তবে দাদার কাছে যাইতে হইবে বলিয়া আপাততঃ ছাড়িলেন না,—কেবল পৈতাগাছটা।

যখন সব ঠিক হইল, তখন তিনি রেলগাড়ী চাপিয়া বাঁকিপুর যাত্রা করিলেন। রেল-গাড়ীতে অধিক সম্মান পাইবেন বলিয়া, তাঁহার সেই নবনির্ম্মিত সাহেবী-পোষাক পরিলেন। পুরা সাহেবী-পোষাকে, পুরা সাহেবীমেজাজে, পুরা সাহেবী-ঢঙে তিনি তথায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। তবে হাতে পয়সা কম, তাই মধ্যমশ্রেণীতে উঠিতে বাধ্য হইলেন।

কৈলাস বাবু সাহেব,—সাহেবের গাড়ীতে কেহ না উঠে, প্রথমেই তাহার তিনি সুবন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। গার্ডের উপদেশানুসারে "কেবল ইউরোপীয়দের জন্য" তাঁহার কামরায় এইরূপ একটা লেবেল আঁটাইবার অভিলাষে তিনি একবার ষ্টেসন-মাষ্টারের সম্মুখে কতকটা অগ্রসর হন। পাঠকের এসব কথা স্মরণ আছে কি? কিন্তু শেষে, কৈলাস কোন কথাই না বলিয়া, দ্রুতপদে ষ্টেসন-মাষ্টারের নিকট হইতে ফিরিয়া আইসেন।

কেন ফিরিলেন? কেন দমিলেন? এত সাধের কথা কেন বলা হইল না? বালবৈধব্যদগ্ধ কুল-স্ত্রীর পয়োধর-যুগলের মত এবং দরিদ্র ব্যক্তির মনোরথের মত—তাঁহার সেই মনোভাব হৃদয়ে উঠিয়া হৃদয়েই লীন হইল কেন?

চোরের সদাই ভয়। কাঁচা-চোর বা জালকরের আরও ভয়। সিঁধ কাটিতে হাত কাঁপে, অন্তর গুর্‌গুর্ করে। ঐ ধরিল, ঐ বাঁধিল, এই ধরা পড়িলাম, এই মজিলাম,—এই ত্রাসে অহরহ সে কম্পিত হয়।

গাধা, সিংহের মুখস্ পরিয়া অন্য গাধাকে হয় ত হুমকি দেখাইয়া তাড়াইতে পারে, কিন্তু সম্মুখে প্রকৃত সিংহ দেখিলে, সে আপনিই আতঙ্কে অস্থির হয়।

ব্রাহ্মণ-সন্তান কৈলাসচন্দ্র সাহেব সাজিয়া, ম্লেচ্ছভাবে অভিভূত হইয়া, আজ চোর বা জালকরেরও অধম। কৈলাস সাহসী, তেজস্বী পুরুষ হইলেও, চোর ত বটে! চোরের মন সদাই ধুকুধুকু করে! গাডটা ফিরিঙ্গী;—বোধ হয়, কৈলাস তাহাকে সমশ্রেণীস্থ বিবেচনা করিয়া তাহার সঙ্গে তত মধুরালাপ করিয়াছিলেন,—গার্ডের কাছে আপনাকে ইউরোপীয় বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু ষ্টেসন-মাষ্টার ত খাঁটি সাহেব—সিংহজাতীয়। যদি ধরা পড়েন, যদি পোষাক ভেদ করিয়া পৈতাগাছটা বাহির হইয়া পড়ে, যদি কথার সুর বাঙ্গালীর মত হয়, যদি তাঁহার গায়ে বাঙ্গালী-বাঙ্গালী গন্ধ ছাড়ে, অথবা যদি ষ্টেসন-মাষ্টার তাঁহার নাম, ধাম, পিতার নাম, বাসস্থান জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলেন,—তবেই ত মুস্কিল!!—বাস্তবিক কৈলাসচন্দ্র এই ভয়েই ষ্টেসন-মাষ্টারের সম্মুখবর্ত্তী হইয়াও, কথা "কহি-কহি" আর কহিতে পারিলেন না!—হঠাৎ দ্রুতপদে পলাইয়া আসিলেন।

তেজীয়ান কৈলাসের হৃদয়ে এই প্রথম ধাক্কা লাগিল। দ্বিতীয় ধাক্কা,—সেই গলা-ধাক্কা-খাওয়া বামুনটার হাসি। এ আঘাত বড়ই নিদারুণ। গর্ব্ব, দর্প, তেজ, দম্ভ,—এই একাঘাতে সমস্তই চূর্ণ হইয়া গেল। রস শুকাইল। শরীর অবসন্ন হইল। আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা—সেই বৃদ্ধার ক্রন্দন!—সেই উপকৃতার অশ্রুবিসর্জ্জন।

শ্রীরামপুর হইতে গাড়ী ছাড়িল। বৃদ্ধা পুঁটলি লইয়া চলিয়া গেল। কৈলাসচন্দ্র কিন্তু গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া এক দৃষ্টে বৃদ্ধার পানে চাহিয়া রহিলেন;—ষ্টেসনের ক্ষীণালোকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধার ছায়ার ঈষৎ অগ্রভাব দেখা গেল, ততক্ষণ কৈলাসের চক্ষু সেইদিকে রহিল। সব অদৃশ্য হইলে, কৈলাস ধীরভাবে ফিরিয়া বসিলেন।

কোট্ খুলিয়া, কামিজ খুলিয়া, কৈলাস, বৃদ্ধাকে-পৈতা দেখাইয়াছিলেন। তিনি সে কোট-কামিজ আর অঙ্গে পরিলেন না। ক্রমে পেণ্টালুন্ খুলিলেন, ট্রাউসার খুলিলেন;—পোর্টম্যাণ্ট হইতে ধুতি বাহির করিয়া পরিধান করিলেন। কাপড় পরিয়া র‍্যাপার গায়ে দিয়া বেঞ্চের একপার্শ্বে শান্তভাবে বসিলেন—কিন্তু বাঁকা টেড়িটী তখনও ভাঙ্গিতে পারিলেন না। কমলিনী যদি আবার কথা কয়—তাই বুঝি টেড়িটী রাখিলেন।

কৈলাসচন্দ্র দেখিলেন, সেই পাতুকাবিহীন, ষ্টাকিন-বিহীন জামা-বিহীন, রুক্ষকেশ ব্রাহ্মণ বেঞ্চের উপর দিব্য এক কম্বলাসন বিছাইয়া ধ্যানমগ্ন যোগীর ন্যায় উপবিষ্ট। নয়নযুগল মুদ্রিত। ললাট বিস্তৃত, উচ্চ। নাসিকা দীর্ঘ, দেহ স্থির, ধীর। দক্ষিণ হস্তে এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ।

কৈলাসচন্দ্র অনিমিষ-লোচনে সে মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যতই দেখিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার ভক্তি বাড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাঁহার মনে হইল, বুঝি ধরাধামে স্বয়ং শুকদেব অবতীর্ণ হইয়াছেন। বুঝি এমন সুন্দর অপরূপ রূপ তিনি আর কখন দেখেন নাই। বুঝি এমনটী আর এ সংসারে নাই। বুঝি ইনিই স্বয়ং ঈশ্বর।

কৈলাসের সেই প্রসারিত, সুতীক্ষ্ণ নয়নদ্বয় ব্রাহ্মণের মুখমণ্ডলকে যেন গ্রাস করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ব্রাহ্মণের হস্তস্থিত পুস্তক দেবনাগর অক্ষরে লেখা। ব্রাহ্মণ একবার পাতা খুলিয়া সে গ্রন্থ পড়িবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু অল্পালোকে, গাড়ীর দোলনে, পাঠের সুবিধা হইল না। তিনি কেতাব রাখিয়া দিলেন।

তখন ব্রাহ্মণ বীণা-বিনিন্দিত মধুর স্বরে, ধীরে ধীরে সংস্কৃত ভাষায় গাহিতে লাগিলেন :—

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতানি চ॥
পশ্যাদিত্যান বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত॥
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসি॥

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥
এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥
অনেকবক্ত্রনয়ন-মনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥
দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥

গাড়ী বৈদ্যবাটী আসিয়া থামিল। ব্রাহ্মণের বিরাম নাই, ভাবে ভোর হইয়া আপন মনে সেই সংস্কৃত গান গাহিতে গাহিতে চারিদিক্ যেন মাতাইয়া তুলিলেন;—

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্ব্বতোদীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে।
অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্যমনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমিদং তবোগ্রং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥
অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসংঘাঃ স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ॥
রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসংঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে॥
রূপং মহৎ তে বহুবক্ত্রনেত্রং মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্॥
নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো॥
দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥
অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসংঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ॥
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ॥
যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতো জ্বলন্তি॥
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ॥
লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো॥
আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্॥

অন্য কাম্‌রা হইতে দু চারি জন লোক উঁকিঝুঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল। কিন্তু রাত্রে তাহারা বড় কিছু ঠিক করিতে পারিল না

গাড়ী ছাড়িল। ব্রাহ্মণ কিন্তু গান ছাড়িলেন না। ব্রাহ্মণ বাহ্যজ্ঞানহীন, সংজ্ঞাহীন, মুগ্ধ, অভিভূত। তাঁহার সেই কোমল কণ্ঠরব ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।—

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥
তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্॥
দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্॥
এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্য ভূয় এবাহ কৃষ্ণং সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য॥
স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ॥
কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎপরং যৎ॥
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্ব॥
সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব॥

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্॥
অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোহস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে॥
ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্॥
ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর॥
মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য॥
ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা॥

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥
সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি যন্মম॥
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যো অহমেবংবিধোহর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥
মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥

গাড়ীস্থিত সেই চোগা-চাপকানধারী বাবুটী মাঝে মাঝে মিটি মিটি চাহিয়া, ব্রাহ্মণের কার্য্যকলাপ সমস্তই পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণের মুখ হইতে সুরসংযুক্ত সংস্কৃত

শ্লোক উচ্চারিত হইতেছে দেখিয়া, বাবু অন্তরে হাসিয়া, ভ্রূকুটী করিয়া মনে মনে বলিলেন,—"বামুনটো সাফ বুজ্‌রুকী আরম্ভ করুচে; ঠিক্ যেন সাপের মন্তর আওড়াচ্চে! এখনি ব্যাটা বলে এই দেখ না,—আমি ছেলে হবার অষুদ জানি।"

কৈলাসের কিন্তু ভাবনা অন্যরূপ। ব্রাহ্মণ কে, নিবাস কোথায়, নাম কি?—ইহা জানিবার তাঁহার বড়ই কৌতূহল জন্মিল। এত কৌতূহল যে, তিনি যেন মুখ আর চাপিয়া রাখিতে পারেন না, বুক্ ধড়াস্-ধড়াস্ করিতে লাগিল।

কিন্তু আশ্চর্য্য এমনি যে, কৈলাস মুখ ফুটিয়া ব্রাহ্মণকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইলেন না। ভয় বল, ভক্তি বল, অথবা কৈলাসের স্নায়বীয় দুর্ব্বলতাই বল,—কিছুতেই তাঁহার বাক্যোচ্চারণ হইল না। সেই দেবপ্রতিম ব্রাহ্মণকে "তোমার বাড়ী কোথায়"—কেমন করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসিবেন—ইহাই তাঁহার বিষম ভাবনা হইল। কৈলাসের চক্ষে ব্রাহ্মণ দ্বাদশ সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান তেজীয়ান প্রতীয়মান হইলেন। কৈলাসের রসনা নড়িল না।

বুক ফাটিল, কিন্তু মুখ ফুটিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

উলটী পালটী বহুবার সেই স্তোত্র গাহিয়া ব্রাহ্মণ নীরব হইলেন।

কিছুক্ষণ সকলেই নীরব। বাবু একবার ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন। ঘুম হইল না। উস্ খুস্—আইঢাই করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণকণ্ঠের সেই মধুর আওয়াজ তাঁহার কাণে লাগিয়া রহিল।

নিদ্রা নাই; বাবুর মনে নানারূপ চিন্তার উদয় হইল।—"ব্রাহ্মণের গলাটী ত বেশ! বামুন যদি যাত্রার দলে থাকে, তা'হলে উহার অন্তত ১৮ টাকা মাহিনা হ'তে পারে। তাল-বোধ আছে কি?—তা' নেই! বোধ-শোধ থাকলে, রাগরাগিনী জ্ঞান থাকলে বামুনটা কি আর অমন করে বেড়ায়?—তা'হলে বামুন এতদিন থিয়েটারের দলে ঘুটতো!—উঁহু—বোধ হয় একটু আধটু জানা শুনা আছে। অমন মিষ্টি সুর!—বামুনটা

কি কিছুই জানে না ?—কিছু কিছু জানে বৈকি।"—এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া, বালাই-হীন বাবু ব্রাহ্মণকে প্রকাশ্যে বলিলেন, "অ ঠাকুর ! তোমার মিষ্টি সুর শুনে বড় খুসী হয়েচি। টপ্পাগান তোমার জানা আছে কি ?"

ব্রাহ্মণ বাবুর মুখপানে চাহিয়া একটু হাসিলেন। বাবু ভাবিলেন, টপ্পার নাম শুনিয়া, বামুনটার খুব আহ্লাদ হইয়াছে। বাবু এবার একটু রঙ চড়াইয়া, সঙের মত হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ঠাকুর, তুমি তামাক খাবে না, চুরুটও খাবে না,—দুটা টপ্পা-টপ্পি না হলে, এ শীতে বাঁচ্‌বে কি ক'রে ? এক আধটা মেয়েমানুষের গান গাও, তবু একটু গা গরম হবে।"

সদানন্দ ব্রাহ্মণ আবার হাসি-হাসি মুখে, ঈষৎ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাবুর চক্ষের উপর চক্ষু রাখিয়া, যেন একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

কিমত্র হেয়ং ?—কনকঞ্চ কান্তা
কা শৃঙ্খলা প্রাণভৃতাং হি ?—নারী।
ত্যাজ্যং সুখং কিং ?—রমণীপ্রসঙ্গঃ
সম্মোহয়ত্যেব সুরেব কা ?—স্ত্রী ॥
বিজ্ঞান্মহাবিজ্ঞতমোহস্তি কো বা ?—
নার্য্যা পিশাচ্যা ন চ বঞ্চিতো যঃ ॥

কিছু বুঝিলেন কি ? ধন এবং স্ত্রী, মুক্তিপ্রার্থী ব্যক্তির পক্ষে ত্যাগের যোগ্য। রমণীই জীবের দুশ্ছেদ্য বন্ধন। রমণীপ্রসঙ্গে যে সুখ, তাহা পরিত্যাগের যোগ্য। স্ত্রীই সুরার ন্যায় মনুষ্যকে উন্মত্ত করে। যাঁহাকে পিশাচরূপিণী রমণী বঞ্চনা করিতে পারে নাই, তিনিই বিজ্ঞ হইতে বিজ্ঞতম।"

বাবু। (স্বগত) ঐ গো,—আবার সাপের মন্তর আরম্ভ করেচে! বামুনটা নিশ্চয়ই বাইস-বিটল! কথায় কথায় বুজরুকী। আবার শাস্ত্রের দোহাই! আচ্ছা, বামুনটাকে একবার নাকাল ক'রে ছাড়্‌বো।

পূর্ব্বোক্তরূপ, মুখে মুখে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করিয়া ব্রাহ্মণ মধুর বচনে জিজ্ঞাসিলেন, "মহাশয় ! ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের কথা শুনিলেন কি ?"

বাবু যেন ঈষৎ কোপ প্রকাশ করিয়া উত্তর দিলেন, "ঠাকুর, তোমার কোথাকার

টোলে লেখাপড়া শেখা? ধন এবং স্ত্রী—এ দুটীকেই কি ত্যাগ করিতে হইবে? বেশ! বেশ!—অতি উত্তম কথা!!—এ কথা তোমাকে শেখালে কে?"

ব্রাহ্মণ উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আপনাকে আমি ধন ও স্ত্রী ত্যাগ করিতে বলি নাই,—রাগ করিবেন না।"

বাবু। আচ্ছা, রমণী-প্রসঙ্গে দোষ কি! কুমারী নাইটীঙ্গেল, কুমারী কারপেণ্টার, অথবা শ্রীমতী রোলান্দ—ইহাঁদের কি সৎপ্রসঙ্গের কথা আমি কহিতে পাইব না?

ব্রাহ্মণ এইবার প্রাণ খুলিয়া উচ্চরবে হো হো হাসিতে লাগিলেন। শেষে যোড়-হাতে বলিলেন, "আমাকে ক্ষমা করুন,—আর না!—"

বাবু মনে মনে ঠিক্ করিলেন, "বিটল বামুনটা জব্দ হইয়াছে। সাপের মন্তর শাস্ত্র আউড়ে ন্যাকুরা যুড়ে দিয়েছিলো—উপযুক্ত উত্তর পেয়ে ঠিক্ যেন জোঁকের মুখে চূণ পড়েছে।"

ব্রাহ্মণ এবং বাবু উভয়েই নীরব হইলেন। ক্রমে রাত্রি বাড়িতে লাগিল; শীতও বাড়িতে লাগিল। নানা চিন্তায় বাবুর ঘুম আসিল না। তখন বাবুর একটু মদ খাইতে ইচ্ছা জন্মিল! ব্রাহ্মণকে ঘৃণার চক্ষে দেখিলেও, ব্রাহ্মণের সাক্ষাতে ব্যাগ হইতে বোতল বাহির করিয়া মদ ঢালিয়া খাইতে বাবুর সাহস হইল না,—প্রবৃত্তিও জন্মিল না। বাবু স্থির করিলেন, বামুনটা ঘুমাইলে তিনি স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সুরাপান করিয়া নিদ্রা যাইবেন।

ব্রাহ্মণ স্থির হইয়া বসিয়া একাগ্রমনে কত কি ভাবিতে লাগিলেন,—"লোকের মতিগতি কেন এমন হয়? স্রোত এমন উল্টা দিকে বয় কেন? এমন সুন্দর সুগঠিত সুপুরুষ-মূর্ত্তিতে বিষয়-বিষের কেন এমন কাল-কূট ভরা? এমন সচেতন জীব এরূপ অচৈতন্য কেন? মানুষ এমন পশু হইল কেন? কাম-প্রবৃত্তি এত প্রবলা কেন? আসঙ্গলিপ্সা এত বলবতী কেন? বৃথা আসুরিক মদে এত উন্মত্ত কেন? লাভ কি? বালক প্রহ্লাদ বলিয়াছেন,—

"যন্মৈথুনাদি গৃহমেধি সুখং হি তুচ্ছং কণ্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখদুঃখম্।
তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহুদুঃখভাজঃ কণ্ডূতিবন্মনসিজং বিষহেত ধীরঃ॥"

"সমস্তই ক্ষণভঙ্গুর! সমস্ত ভুয়াবাজী! যাদুকরের মায়া! চর্ম্মরোগ চুলকাইলে

প্রথমে যেন ঈষৎ সুখ হয় বটে, কিন্তু পরিণামে জ্বালা করে—অবসান দুঃখময়! স্ত্রী-সম্ভোগাদি তুচ্ছ সুখেরও অবসান বহুদুঃখময়!! লোকের বিষয়ে বুদ্ধি নাই,—লোক অবিষয়কেই বিষয় বলিয়াই বুঝিতেছে। অহো! কি বিড়ম্বনা!"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বাবু, ব্রাহ্মণের সহিত এত কথা কহিলেন, কৈলাসচন্দ্র কিন্তু একটীও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। কৈলাস নীরব, নিশ্চল, নিথর। তিনি কেবল একমনে ভাবিতেছেন, "বামুনকে মারিলাম, তবু সে রাগ করিল না কেন? ব্রাহ্মণ কি মানুষ নয়,—দেবতা?" কৈলাসের মুখ শুকাইয়াছে, চোখ বসিয়াছে, নাকটী যেন দীর্ঘ দেখাইতেছে। তাঁহাকে বিশিষ্টরূপ নিরীক্ষণ করিলে মনে হয়, তিনি যেন কোন নিদারুণ আভ্যন্তরিক যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছেন।

বাবু নিস্তব্ধ হইলে, ব্রাহ্মণ বহুক্ষণ নানাবিষয় চিন্তা করিলেন। শেষে কৈলাসের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "দেখিতেছি, আপনার শরীর অসুস্থ,—একবার ঘুমাইবার চেষ্টা করিলে ভাল হয়।"

কৈলাস দাঁড়াইয়া উঠিলেন। যোড়হাতে বলিলেন, "চিন্তানলে আমার মন পড়িতেছে, আমি ঘুমাইব কেমন করিয়া? গৃহের চারিধারে আগুন ধরিয়াছে, আমি পালঙ্কে শুইয়া চক্ষু বুজিব কেমন করিয়া? আপনার পায়ে ধরিয়া বলিতেছি, এ অধম পাপিষ্ঠের যদি একটী কথার উত্তর দেন, তাহা হইলেও কতক শান্তিলাভ করিতে পারি—"

এই বলিয়া কৈলাসচন্দ্র ব্রাহ্মণের আবার পায়ে ধরিতে উদ্যত হইলেন।

ব্রাহ্মণ বিব্রত হইয়া, দাঁড়াইয়া উঠিয়া, বলিলেন, "করেন কি?—করেন কি?—আমার মত তুচ্ছ লোকের পায়ে ধরে লাভ কি?"

কৈলাস। আপনি আমার গুরু, শিক্ষক, পথপ্রদর্শক, চক্ষুদানকর্ত্তা! আমি আপনার পদতলে লুটাইয়া পড়িবার একান্ত অধিকারী,—

ব্রাহ্মণ হাসিয়া উঠিয়া, হাতে ধরিয়া কৈলাসকে বসাইয়া, বলিলেন, "আপনি এত কাতর হইলেন কেন? আপনার হইয়াছে কি?—আপনার প্রশ্নই বা কি?"

কৈলাস। আমার প্রশ্ন অনন্ত!—আজ আমাকে কেবল একটী মাত্র কথা বুঝাইয়া দিন;—আপনাকে আমি যথোচিত অপমান করিলাম, গায়ে থুঁতু দিলাম, গালি দিলাম, মারিলাম,—তথাচ আপনি রাগ করিলেন না কেন?

ব্রাহ্মণ আবার হো হো হাসিলেন। কেহ বিরক্ত হইবে না—উচ্চকণ্ঠে হাসিটা ব্রাহ্মণের রোগ। উপায় নাই। খুব একদম হাসিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, "এই কথা!!—এ সামান্য কথার জন্য আপনার এত ভাবনা কেন?—আর, এ সোজা কথাটা আমাকে এতক্ষণ বলিলেই ত হইত!—সব গোল মিটিত!!—"

ব্রাহ্মণের আবার হাসি। ব্রাহ্মণ যত হাসেন, কৈলাসের অঙ্গ ততই দগ্ধ হইতে থাকে।

কৈলাস। শীঘ্র বলুন,—আমায় রক্ষা করুন!

ব্রাহ্মণ। বুঝিলে, কথা নিতান্ত সোজা। মারিলেই কি লাগে? শিশু সন্তানের দুই একটী দাঁত উঠিতেছে,—শিশু মায়ের আঙ্গুল কামড়াইয়া ধরিল। মা হয় ত যাতনায় উহু উহু করিতেছেন,—তথাচ মায়ের ইচ্ছা, ছেলে যেন আর একবার তাঁহাকে কামড়াইয়া দেয়! তাই বলি, মারিলেই কি লাগে? আর, লাগিলেই কি রাগ করিতে হয়? আপনার আঙ্গুল সরু, হাতের বলও কম,—আপনি আজ যে ধাক্কা আমায় দিয়াছিলেন, তাহা ত যৎসামান্য;—বিশেষ, আপনার মূর্ত্তি দেখিয়া, প্রথমেই ঐরূপ কোন না কোন রকম প্রহার, আমি আশাও করিয়াছিলাম। সুতরাং আপনার প্রহারে কিছুমাত্র বিচলিত হই নাই,—ভ্রূক্ষেপও করি নাই—বরং আমোদ হইল। আমি যখন টোলে পড়িতাম, তখন আমার স্বর্গীয় গুরুদেব আদর করিয়া আমার পিঠে এক এক দিন চাপড় মারিতেন; সে চাপড়ে বোধ হয় আপনি মূর্চ্ছা যান। সে চাপড়ে আমারও শরীর এক আধ দিন টলিত! কিন্তু তাহাতে যে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ হইত, তাহা আমি একমুখে বর্ণন করিতে পারি না। ইচ্ছা হইত, প্রতিদিনই তাঁহার নিকট গিয়া সেইরূপ চাপড় খাই!—কৈ তখন রাগ ত হইত না! উপরন্তু সে প্রহারে আনন্দই হইত!—

কৈলাস নীরবে ব্রাহ্মণের বাক্যসুধা পান করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, বলিলেন, "গুরুদেব! আপনার উপদেশ শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। গুরুদেব! আমার—"

ব্রাহ্মণ। (হাসিয়া) আমাকে সদাই গুরুদেব বলেন কেন?—গুরু শিষ্য বড় কঠিন সম্বন্ধ। কথার বৃথা অপব্যবহারে ফল কি?

কৈলাস। কেন?—আপনিই ত আমার শিক্ষক—আপনিই ত আমার গুরু।

ব্রাহ্মণ হাসিয়া বলিলেন, "আমি কেহই নহি,—উপলক্ষ মাত্র,—সেই সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরই সর্ব্বস্ব। সে যাহা হউক, রেলগাড়ীতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সংক্ষেপে গুরু হওয়া হয় না, তাহার অনুষ্ঠান অন্যরূপ—(উচ্চ হাসিয়া) 'গুরুগিরি' সোজা কাজ নহে, বড়ই কঠোর দায়িত্ব।"

কৈলাস অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "তবে আজ এখন আর আমি আপনাকে গুরুদেব বলিব না। কিন্তু এক অনুরোধ, আপনি আমাকে 'আপনি, মহাশয়' ইত্যাদিরূপ সম্মানসূচক সম্ভাষণ করিবেন না। ওরূপ কথায় আমি বড়ই লজ্জিত হই, আমার বড়ই কষ্ট হয়। আমি নিতান্ত নরাধম! নরাধম পিশাচের আবার সম্মান গৌরব কি—"

বলিতে বলিতে কৈলাসের কণ্ঠরোধ হইল।

ব্রাহ্মণ হাসিয়া, আনন্দে বা আদরে কৈলাসের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "আম গাছে টক আম ধরিলে, অথবা একেবারে আম না ধরিলেও, তাহাকে আম-গাছই বলে; কাঁটা-গাছ ত কেহ বলে না। আপনি ব্রাহ্মণ, আমিও ব্রাহ্মণ—উভয়ে উভয়েরই কুল-শীল-অজ্ঞাত—আমি আপনাকে অগৌরব বা অসম্মানের কথা কহিব কেন? যেই হউক, কাহারও মর্য্যাদা ভঙ্গ করিতে নাই।"

কৈলাস। (যোড়হাতে) আপনি যাহা উপদেশ দিবেন, তাহাই করিব, আপনি যাহা ভাল বুঝিবেন, তাহাই করিবেন। আমার এখন বক্তব্য এই, প্রশ্ন এই,—সন্তানের দংশনে মায়ের সুখ হইতে পারে সত্য, গুরুর প্রহারে শিষ্যের আনন্দ হইতে পারে সত্য,—কিন্তু যার তার প্রহারে বা দংশনে যার তার সুখ বা আনন্দ সম্ভবে কিরূপে? মনে করুন, আমাকে একজন উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি আসিয়া অকারণে মারিল,—আমি কি তাহাতে রাগ করিব না?

ব্রাহ্মণ। সমগ্র সংসার যাঁর আত্মীয়—সমগ্র সংসারকে যিনি ঈশ্বরময় দেখেন,

তাঁর ত রাগ হইবে না। ক্রোধ ত প্রহারের উপর কিছুতেই নির্ভর করে না। প্রহারিত ব্যক্তির উপর যতটা রজোগুণ এবং তমোগুণের প্রভুত্ব, ক্রোধও সেই পরিমাণে পরিমিত হইবে। যার যেমন অহঙ্কার, দর্প, মত্ততা,—আঘাতে তার তেমনি কষ্ট হইবে, ক্রোধ হইবে। আঘাত বা প্রহার ক্রোধের অনুগমন করে না,—ক্রোধই আঘাতের অনুগমন করে।

কৈলাস। নিদারুণ প্রহারিত হইলে, অথবা বিষম আঘাত পাইলেও কি কষ্ট হইবে না?

ব্রাহ্মণ। (হাসিয়া) কাদায় হঠাৎ পা পিছলিয়া পড়িয়া গিয়া যদি আমার হাত ভাঙ্গে, তবে আমার ক্রোধ কিসের?

কৈলাস। উহা'ত পড়িয়া যাওয়ার কথা হইল; কিন্তু কোন লোক যদি লাঠি মারিয়া সেইরূপ হাত ভাঙ্গিয়া দেয়—তা হ'লেও কি রাগ হয় না?

ব্রাহ্মণ। না। সাধু ব্যক্তির তাহাতে রাগ কেন হইবে? স্বয়ং পড়িয়াই হাত ভাঙ্গুক, অথবা অপরের লাঠিতেই হাত ভাঙ্গুক—সাধুর পক্ষে উভয়ই এক কথা। সাধুর চক্ষে ত সংসারে কোন ভেদজ্ঞান নাই।

কৈলাস। ইহাতে সাধুর কি কোন কষ্টও হইবে না?

ব্রাহ্মণ। না। এ বড় কঠিন দার্শনিক কথা। আপনি ইহা সহজে বুঝিতে পারিবেন কি?

কৈলাস। (যোড়হাতে) আমি অধম। অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বুঝাইয়া বলুন। আপনার সকল কথা বুঝিবার আমার শক্তি নাই; কিন্তু বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছে। আপনি পূর্ব্বে যাহা উপদেশ দিলেন, তাহার কতক কতক যেন বুঝিয়াছি বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বিশিষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। আপনার পায়ে ধরিয়া বলিতেছি,—বুঝি, আর না বুঝি—তবু আপনি আমাকে এ সব কথা, বুঝাইয়া বলুন। আপনার কথামৃতে আমার কর্ণকুহর পবিত্র হউক।

নবম পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে রেল-গাড়ী হুগলী ছাড়াইল। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসিলেন, "এই হুগলীতেই আপনার নিবাস? পড়াশুনা কি হুগলীতেই হইতেছে?"

কৈলাস। হাঁ।

ব্রাহ্মণ। আজকাল ইংরেজী পড়ার সঙ্গে এক আধটু সংস্কৃত-পাঠ হয়, নয়?—আপনি কি কোন সংস্কৃত গ্রন্থ পড়িয়াছেন?

কৈলাস। হাঁ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঋজুপাঠ প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ এবং তৃতীয় ভাগ পড়িয়াছি।

ব্রাহ্মণ। আর কোন সংস্কৃত গ্রন্থ পড়েন নাই কি?

কৈলাস। না।

ব্রাহ্মণ। আপনি ধর্ম্মশাস্ত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব জানিতে চাহেন, অথচ শাস্ত্র-কথা সম্বন্ধে আপনার আজ হাতে-খড়িও হয় নাই। আপনি সেই গুরুতর মীমাংসা কেমন করিয়া বুঝিবেন বলুন দেখি? সে গভীর উপদেশ আপনার হৃদয়ে কেমন করিয়া অঙ্কিত হইবে বলুন দেখি? বিশুষ্ক মরুভূমে কখন কি বীজ অঙ্কুরিত হয়? কঠিন প্রস্তরে কখন কি পঙ্কজ প্রস্ফুটিত হয়?—আপনার হঠাৎ একটা উৎকণ্ঠা হইয়াছে, কৌতূহল জন্মিয়াছে,—তাই আপনি শাস্ত্রকথা শুনিতে ব্যগ্র হইয়াছেন!—কিন্তু ঐ ব্যগ্র-ভাব কতক্ষণ থাকিবে?—জলবুদ্বুদ মত এখনি মিলাইয়া যাইবে। বিশেষ, এমন উৎকট উৎকণ্ঠার অবস্থায় কোন বিষয়েরই উপদেশ দিতে নাই। ধর্ম্মকথা যেখানে সেখানে, যাকে তাকে, যখন তখন বলিতে নাই।

কৈলাস অধোমুখ, নীরব।

ব্রাহ্মণ কৈলাসের মনোভাব যেন বুঝিয়াই বলিলেন, "দেখুন, শাস্ত্রকথা বলিলেই যদি কোন ফল হইত, তাহা হইলে, আমি যাহা জানি, তাহা আপনাকে এখনি বলিতাম। তবে অন্যকে একটু আধটু যাহা কখন কখন বলি, তাহা অভ্যাস-দোষেই বলি,—তাহাও বলা উচিত নহে। ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ এই যে,—অনধিকারীকে ধর্ম্মকথা

কখন বলিবে না। আর, আমার মত ক্ষুদ্র লোকে শাস্ত্রতত্ত্ব জানিবেই বা কি,—বলিবেই বা কি?"

কৈলাস কোন কথা না কহিয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন। বারিধারা গণ্ডস্থল বহিয়া বক্ষে পতিত হইল।

সেই বাবু কখন চক্ষু বুজিয়া নিদ্রার ভাণ করিতেছিলেন, কখন বা মিটি মিটি চাহিয়া বামুনটার মজা দেখিতেছিলেন। শেষে কৈলাসের চক্ষে জল দেখিয়া ভাবিলেন, "বামুনটা নিশ্চয়ই ভেল্কী-বাজি জানে; নহিলে ভালমানুষের ছেলে হঠাৎ এমন কাঁদিয়া উঠিবে কেন?—বামুন-বেটা কৈলাসের গায়ে সর্‌ষে-পড়া দিলে নাকি?"

ব্রাহ্মণ ধীরভাবে কৈলাসকে বলিলেন, "আপনি শাস্ত্রকথার বিন্দুবিসর্গও অবগত নহেন,—আপনি হঠাৎ এই মুহূর্ত্তে বেদান্ত-দর্শনের কথা—মায়ার কথা কেমন করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবেন,—ইহা আপনিই ভাবিয়া দেখুন দেখি? একটা সহজ কথা বুঝুন, একজন অজমূর্খ চাষা আসিয়া যদি কোন বৈজ্ঞানিককে জিজ্ঞাসা করে,—'মহাশয়! আপনার পায়ে পড়ি,—তারের খবরটা কেমন করিয়া চলে, আমাকে শীঘ্র একবার শিখাইয়া দিন!'—তবে সেই বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত তখনই কি তাহাকে সে কথা বুঝাইতে সক্ষম হন?"

কৈলাস এবার ক্রন্দনের ভাঙ্গা ভাঙ্গা সুরে যোড়হাতে উত্তর করিলেন, "আমি বুঝি, আর না বুঝি, আপনি দয়া করিয়া আমাকে বলুন। আমি আপনার চরণতল কখনই ছাড়িব না। আপনাকে বলিতেই হইবে। আমাকে অজ্ঞান, অধম বোধে আপনি কখন ত্যাগ করিতে পাইবেন না।"

ব্রাহ্মণ হো হো হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, "পাগল! পাগল!—আমার কি অনিচ্ছা যে, আপনাকে আমি ধর্ম্মকথার উপদেশ না দি? প্রত্যুত আমার নিতান্তই সাধ যে, আপনার মত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বধর্ম্মপরায়ণ হন, ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যয়নে মনোযোগ দেন। নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই, আমি আপনাকে পূর্ব্বোক্তরূপ কথা বলিয়াছিলাম। শাস্ত্রকথা যিনি শুনিবেন এবং যিনি শুনাইবেন, তাঁহাদের উভয়েরই একাগ্র-মনে আসীন হওয়া উচিত। উভয়েই পবিত্রদেহ, পবিত্রচিত্ত হইবেন। উভয়কেই বাহ্য বিষয় হইতে মনকে গুটাইয়া লইতে হইবে। (হাসিয়া) এ রেল-গাড়ীর হটর হটর শব্দে বেদান্তদর্শনের কথা

আনুপূর্ব্বিক সুবিস্তৃতরূপে বুঝান কখন সম্ভবপর কি?—বিশেষ আপনাকে। এখনও আপনার ক, খ, পরিচয়ও হয় নাই। আর, ওদিকে ইংরেজী-শিক্ষার ঝোঁকে আপনার প্রবৃত্তি নিতান্ত বহির্ম্মুখী হইয়াছে;—স্রোত উল্টা দিকে বহিতেছে। এমন অবস্থায় আপনি দর্শনের কথা কেমন করিয়া বুঝিবেন? আমার বলাও বৃথা! আপনার শোনাও বৃথা।"

কৈলাস। আপনি একটু আধটু কথা সংক্ষেপে বুঝাইয়া বলুন,—নহিলে আমার মৃত্যু—শয্যাকণ্টক উপস্থিত। পাষণ্ডকর্তৃক অন্যায়পূর্ব্বক নিদারুণ আঘাতিত হইলে, রাগ, অভিমান দূরে যাউক, মনোমধ্যে একটুও কষ্ট বা যন্ত্রণা অনুভূত হইবে না—এ কেমন কথা,—অপূর্ব্ব রহস্য অন্তত সংক্ষেপে বুঝাইয়া বলুন,—

বাবু এবার মনের হাসি আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। বিলাতী কম্বল মুখে চাপা দিয়া হি হি হি হাসিয়া উঠিলেন। মনে মনে বলিলেন, "কৈলাসটাকে যা'হোক বামুনটা আচ্ছা যাদু করেছে। তলোয়ারের চোট মারিলে রাগ হবে না, যাতনা হবে না, কষ্টও হবে না;—হি হি হি!!—বামুনটার ভয়ঙ্কর বুজরুগি বটে। আমি অ্যানেকের বাজী দেখেছি, কিন্তু এমন আশ্চর্য্য তামাসা কখন দেখি নাই। আর, কৈলাসও কি পাগল হলো নাকি? ও আবার ঐ কথার ব্যাখ্যা শুনতে চায়! ব্যাখ্যা থাকলে কি আর বামুনটা এত ভাঁড়ভোঁড়ি করে?—হি হি হি!!"

এইবার বড় বিষম সমস্যা আসিল। ব্রাহ্মণ বিপদে পড়িলেন। কি করি, কর্ত্তব্য কি—উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে সেই সদানন্দ পুরুষের হৃদয়ে হাসির বেগ উথলিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণের মুখ-বাঁধ ভাঙ্গিয়া অট্টাশব্দে হাসির তরঙ্গরাশি দিগ্‌দিগন্তে ছুটিল। ধরাধাম প্লাবিত হইল। বাবু চমকিয়া উঠিলেন;—ভাবিতে লাগিলেন, "ব্যাপার কি? কোথাও কিছুই নাই, বামুনটা শুধু শুধু এত ভয়ঙ্কর হাসি হাসে কেন? হলো কি?—কাণে যে ঝালাপালা ধরিল!—এমন হাসির রব ত আমি কোথাও শুনি নাই। থামে না যে!—বামুনটার ছিট আছে নাকি? না, বিটলিমি করচে?—তাই বটে!—বেটা ভয়ানক ভণ্ড!—আবার একটা বুঝি নূতন ভেল্কী দেখাবে, তাই একটা বিতিকিচ্ছি হাসিয়া আসর সরগরম করিয়া লইতেছে। তাই ঠিক!"

ভগবান্ জানেন, ব্রাহ্মণ হঠাৎ এমন হাসি হাসিলেন কেন? সর্ব্ব বিষয়ে সদাই হাসি—ব্রাহ্মণের ত স্বভাব। তা'ত বটেই, তবে এবার হাসির মাত্রা হঠাৎ এত অধিক হইল কেন? সদ্যোজাত শিশু চাঁদ ধরিতে যায় দেখিয়া কি তাঁহার এই হাসি উপজিল?—কে জানে, কি?

সে যাহা হউক, ব্রাহ্মণ প্রাণ খুলিয়া খুব একদম হাসিয়া, কৈলাসের হাত ধরিয়া নিকটে বসাইয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, কৈলাস! আমি যা কিছু অল্পস্বল্প জানি, তোমাকে সংক্ষেপে বলিব; তুমি ক্ষান্ত হও। মনকে স্থির কর। ধৈর্য্য ধর।"

কৈলাস কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রাহ্মণ-সমীপে উপবেশন করিয়া ব্রাহ্মণের মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণ মুদ্রিত নয়নে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা, এই সোজা কথা,—স্থূল বিষয় হৃদয়ঙ্গম করুন দেখি? সুখ জিনিসটা কি? সুখ কি কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তুগত?—না। সুখ বাহিরে নাই, সুখ অন্তরে। একটু ভাবিয়া দেখুন,—মেথর মলমূত্র বিষ্ঠা ঘাঁটে, ইহাতে তার কোন কষ্ট আছে কি? বরং এ কাজ অভাবেই তার কষ্ট হয়। কিন্তু একজন বাবুকে এ কর্ম্ম করিতে বল, তাঁর মৃত্যুযন্ত্রণা উপস্থিত হইবে। প্রকৃত ডাক্তারেরও পুঁজ, রক্ত, বিষ্ঠা মাখিতে ভ্রূক্ষেপ নাই; কিন্তু অন্য লোকের পক্ষে সে কাজ বড়ই বিষম। আরও দেখুন, ভারবাহী মুটে বা বেহারার ভার বহিতে পাইলেই সুখ। বৈশাখের দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে গলদ্‌ঘর্ম্ম,—লোকের শুধু চলিতেই কষ্ট হয়, তথাচ দেখ কেমন সহজে, কেমন স্ফূর্ত্তির সহিত বেহারারা দ্রুতপাদবিক্ষেপে পাল্কী কাঁধে করিয়া চলিয়াছে। আর যে বাবু—যে মাংসপিণ্ড, পাল্কীর ভিতরে আছেন, তাঁহার হয় ত কষ্ট হইতেছে—তিনি হয় ত আই চাই করিতেছেন! কিন্তু বাবুকে একবার পাল্কী কাঁধে করিতে বলুন,—তিনি ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়িবেন!—কাজ ত একই,—ইহাতে, এক জনের সুখ, অন্য জনের কষ্ট হয় কেন [illegible]

কৈলাস। তা'ত হবেই! যাঁর যাতে অভ্যাস নাই, তাঁর সে কাজ করিতে কষ্ট হবে বৈ কি?—

ব্রাহ্মণ। বেশ কথা!—আচ্ছা ধরিয়া লইলাম, অভ্যাসই সুখ দুঃখের মূল অভ্যাসের প্রকৃত অর্থ আপনি বুঝেন কিনা, তাহা আমি জানি না। সে যাহা হউক, মোটামুটি ধরিয়া লউন,—অভ্যাসেই সংসার চালিত হয়। এরূপ হইলে, বোধ হয় বুঝিতে পারিবেন,—সুখ-দুঃখ বস্তুগত, বিষয়গত বা কার্য্যগত নহে। মনে করুন, শ্রাবণের বারিধারা অবিরল নিপতিত; পথ ঘাট মাঠ কর্দ্দম-ক্লিন্ন বা জলময়। ঘরের বাহির হইতে বোধ হয় আপনার কষ্ট হইবে। কিন্তু কৃষকের আজ কতই আনন্দ। সে লাঙ্গল ঘাড়ে করিয়া, বৃষ লইয়া আহ্লাদে স্ফীতকলেবরে মাঠে চলিল। উপরে জল, নীচে জল,—সর্ব্বাঙ্গ তাহার জলে কাদায় ভূষিত হইল,—তথাচ সে, একহাঁটু কাদায় দাঁড়াইয়া, ভিজিতে ভিজিতে, স্বচ্ছন্দে হলচালনে মগ্ন,—যেন সংসারে কিছু ঘটে নাই, যেন জল নাই, মেঘ নাই, বজ্রাঘাত নাই! বাস্তবিকই কৃষক আজ সুখসাগরে সাঁতার দিতেছে; কেননা, আজ তাহার জমীতে ধান্যরোপণের সুবিধা হইয়াছে। আপনার যদি পল্লীগ্রামের কৃষকগণের অবস্থা জানা থাকে, তবে আমার কথার অর্থ অবশ্যই অনুধাবন করিতে পারিবেন।

কৈলাস। হাঁ,—আপনি যা বল্‌চেন, তা ঠিক বটে!

ব্রাহ্মণ। তাই যদি ঠিক হইল,—তবে নিশ্চয়ই আপনার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, সুখ বস্তুগত নহে। ধন ধান্য, সুরম্য হর্ম্ম্য, গজ বাজী রথ,—এ সব কিছুই সুখের অবশ্যম্ভাবী কারণ হইতে পারে না।

কৈলাস। কেন? কেন?

ব্রাহ্মণ। এমন লোক কি দেখেন নাই,—যিনি, ত্রিতল হর্ম্ম্যে সুবর্ণ-খাটে পুষ্প-শয্যায় শুইয়া, রূপবতী যুবতী পরিচারিকাগণকর্ত্তৃক চামরসেবিত হইয়াও, যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছেন? দুশ্চিন্তায় তাঁহার অন্তর পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইতেছে? অমন নীরোগ দেহ, তপ্ত তৈলে নিক্ষিপ্ত খলিসা-মাছবৎ ধড়ফড় করে কেন?—হয়ত শুনিবেন, তাঁহার জমীদারীতে খাজনা আদায় হয় নাই,—কাল অষ্টমে তাঁহার মহাল নীলাম হইবে,—হয়ত শুনিবেন, তাঁহার একদমে, কোন কৌশলে দশহাজার টাকা লাভের আশা ছিল,

কিন্তু একশত টাকা যে তাহাতে লাভ হয় নাই; হয়ত শুনিবেন, তাঁহার পুত্রটীর মৃত্যু হইয়াছে—ধন-জন-রত্নে তাঁহার পুত্রকে মৃত্যুমুখ হইতে ফিরাইতে পারে নাই। যে কারণেই হউক, দেখিবেন, ধনবান্ ব্যক্তিরও সুখ নাই। ধন ত সুখের কারণ হইতে পারে না।

কৈলাস। কেন?—দরিদ্র ব্যক্তি ধন পাইলে সুখী হয় না কি? আমি ১৫৲ টাকা মাহিনা পাই, কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয়; দেড় শত টাকা মাহিনায় বেশ সুখে সংসার চলে ত?

ব্রাহ্মণ। আপনি সুখের অন্যরূপ অর্থ আনিয়া ফেলিলেন। সে যাহা হউক, আপনাকে মোটামুটি বলি, ১৫৲ টাকাই হউক, দেড়শতই হউক, দেড়হাজারই হউক, দেড় লক্ষই হউক, আর দেড়কোটীই হউক—সুখে, নির্ভাবনায় সংসার কাহারই চলে না। যার পনের টাকা আয়, তারও যেমন অভাব-বোধ, কষ্ট; যার দেড়শত টাকা আয়, তারও সেইরূপ অভাববোধ, কষ্ট,—কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। অভাব কাহারও ঘুচে না! তবে যাহার পনের টাকা মাহিনা, সে মনে করিতে পারে বটে, দেড়শত টাকা মাহিনা হইলে তাহার সর্ব্বদুঃখ দূর হইবে। কিন্তু সেটা তাহার মহা ভ্রম। ১৫৲ টাকার সময়, সে একতলা ঘরে, একটাকা যোড়া ধুতি পরিত;—এখন দেড়শত টাকার সময়, সে থাকে দ্বিতলে, পরে ৪৲ টাকা মূল্যের কাপড়, খায় লুচি-সন্দেশ। তাহাতে অভাব দূর হইল কি? আগে সে চলিয়া আফিস যাইত, এখন গাড়ী ব্যতীত যাইতে অক্ষম। আগে স্ত্রীর সোণার গহনার দরকার ছিল না,—এখন মতির মালা না হইলে তাঁহার আশ মিটে না। বাবুর দেড়শত টাকাতে অভাব পূর্ণ হওয়া দূরে যাউক, টানাটানি বাড়িল, ধার হইল,—কষ্ট হইল! তখন হয়ত বাবু ভাবিল, আমার যদি আড়াইশত টাকা মাহিনা হয়, তাহা হইলে আর কোনও গোল নাই, বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে চলিবে,—কোনও অভাব হইবে না। কিন্তু যেই তিনি আড়াইশত টাকায় পৌঁছিলেন, তেমনি আবার নূতন অভাবের, নূতনকষ্টের সৃষ্টি হইল। এ সংসারে লক্ষপতিরও কষ্ট, কোটীপতিরও কষ্ট, কাহারও অভাব দূর হয় না। শুনিয়াছি, ভারতভূমে ইংরেজরাজের আয় ৭০ কোটী, ব্যয় কিন্তু ৭১ কোটী,—কিছুতেই কুলায় না।—বৎসর বৎসর ধার বাড়ে। আরও কিসে আয় বৃদ্ধি হয়, সাম্রাজ্য বৃদ্ধি হয়, ইহাই রাজার ইচ্ছা। সমস্তই মরুভূমে মরীচিকাবৎ—ঐ জলাশয়, ঐ জলাশয়,—

কিন্তু নিকটে গেলে কোথাও কিছু নাই!—মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে!! অহো কি বিড়ম্বনা,—

> নিঃস্বো বষ্টি শতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপঃ
> লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশ্বরত্বং পুনঃ।
> চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং সুরপতির্ব্রাহ্মাস্পদং বাঞ্ছতি
> ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং পুনঃপুনরহো আশাবধিং কো গতঃ॥

শিহ্লন বলিয়াছেন, নিঃস্ব ব্যক্তি একশত টাকা চায়। যে একশত টাকা পায়, তার কামনা হাজার টাকা। হাজার পাইলে, লক্ষ কামনা করে। যিনি লক্ষপতি, তিনি রাজা হইতে চাহেন; ক্ষিতিপতি হইলে, সম্রাট্ হইবার সাধ; সম্রাটের ইন্দ্রত্বলাভ ইচ্ছা হয়; ইন্দ্রত্ব পাইলে ব্রহ্মপদে সাধ; ব্রহ্মার বিষ্ণু হইবার বাসনা। এইরূপ পুনঃপুনঃ চলিতে থাকে। অহো! আশার অবধিতে কে গমন করিয়াছে?—যদি আপনার অল্প বহুদর্শিতাও থাকে, তাহা হইলে এ তত্ত্ব আপনি সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

কৈলাস নীরব, গদ্গদচিত্ত। ব্রাহ্মণ আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন; "তাই বলি, সুখ বাহিরে নয়,—অন্তরে। সুখ বস্তুগত নহে,—প্রবৃত্তিগত, অভ্যাসগত, মনের গঠনের ইতর বিশেষগত। আমার যাহাতে সুখ, অন্যের তাহাতে কষ্ট; অন্যের যাহাতে সুখ, হয়ত আমার তাহাতে কষ্ট। ভাবুন, আমি নিম্‌ঝোল বড় ভালবাসি;—কিন্তু একজন বালক বা অনভ্যস্ত ব্যক্তি তিক্তবোধে নিম্‌ঝোলকে থু থু করিয়া ফেলিয়া দিবে।"

কৈলাস। নিম্‌ঝোল তেঁত,—আপনার তেঁত খাওয়া অভ্যাস, তাই আপনাকে ভাল লাগে। অপরকে তাহা ভাল লাগিবে কেন? কিন্তু খুব উত্তম সন্দেস, সর্ব্বসাধারণের ত নিশ্চয় ভাল লাগিবে,—কেহই তাহাতে বিরক্ত হইবে না। তাহাতে ত সকলের সুখ আছে!

ব্রাহ্মণ। তা, ভাল লাগুক না কেন? তাহাতে ত আমার আপত্তি নাই। কিন্তু তাই কি কখন লাগে? ময়রার কি সন্দেশ ভাল লাগে? অবিরত সন্দেশ ভোজী ধনবান্ ব্যক্তির সন্দেসে সুখ কি? সন্দেশে তাঁর ত অরুচি। বরং ঘি মাখিয়া মুড়ি খাইবেন, তথাচ তিনি সন্দেশ স্পর্শ করিবেন না। আপনি কি জানেন না,

রাজার ছেলে সর্ব্বদাই গাড়ী-ঘোড়া চড়ে বলিয়া, চলিয়া যাইতে পাইলেই তাহার সুখ হয়? এই দেখুন না কেন, যাঁহারা জনাকীর্ণ কলিকাতায় থাকেন, তাঁহারা নির্জ্জন পল্লীগ্রাম ভাল বাসেন; আবার পাড়াগেঁয়ে লোক কলিকাতা ভালবাসে। সুখ কোথাও নির্দ্দিষ্ট বাঁধা নাই,—কেবল টানা-পড়েন চলিয়াছে। আর আপনিই ত স্বীকার করিয়াছেন,—'যার যে কাজ অভ্যাস নাই, তার সে কাজ করিতে কষ্ট হয়।' সন্দেশ খাওয়া যার অভ্যাস নাই, তাহাকে সন্দেস ভাল লাগিবে কেন? গ্রাম্য চাষার হাতে আধা-ছানার মণ্ডা দেও, সে খাইয়া বলিবে,—'এ জিনিস কি বেশী খাওয়া যায়,—এতে যে মিষ্টি কম?' গুড়ই তাহার পক্ষে অতি উপাদেয় সামগ্রী—অমৃততুল্য। একটা নগদা মুটেকে পাল্কী চাপাইয়া সহর পরিভ্রমণ করাইয়া আনুন, দেখিবেন, মুটে বড়ই বিব্রত হইয়াছে,—পাল্কী থেকে কখন নাবি, কখন নাবি,—এইজন্য সে কেবল উসুখুসু করিতেছে,—পাল্কীরূপ কারাগারে আবদ্ধ হইয়া মুটের প্রাণ কেবল ধড়ফড় করিতেছে,—হয়ত তাহার গা দিয়া ঘাম বাহির হইতেছে। একটা গল্প বলি, শুনুন। কয়েক জন জেলের মেয়ে তাহাদের গ্রাম হইতে চারিক্রোশ দূরে কোন প্রসিদ্ধ হাটে মাছ বেচিতে গিয়াছিল। অধিক মাছ পাইলে, এইরূপ তাহারা মাঝে মাঝে প্রায়ই যাইয়া থাকে। মাছ বেচিয়া ঘরে ফিরিতে কখন সন্ধ্যা হয়, কখন বা একটু রাতও হয়। অভ্যাস বশত ধীবরকন্যাদের সন্ধ্যাই হউক, রাত্রিই হউক, পথে কোন ভয় ছিল না। কিন্তু সেবার কার্য্যগতিকে, হাটে মাছ বেচিয়া গৃহাভিমুখে এক ক্রোশ পথ আসিতে না আসিতেই, প্রায় দুই দণ্ড রাত্রি হইল। এমন সময় ঝড় জল আসিল; ঘোর অন্ধকারে জেলের মেয়েরা দিশাহারা হইল; প্রকাণ্ড মাঠে পড়িয়া তাহারা পথের আর কূল-কিনারা পাইল না; ভয়ে তাহাদের প্রাণ চমকিল! অবশেষে বহু কষ্টে এক গ্রামের প্রান্ত-ভাগে পৌঁছিল; এক উদ্যান দেখিল,—তন্মধ্যে এক মনোহর অট্টালিকা নয়নগোচর হইল। সাহসে ভর করিয়া আশ্রয়-বিহীনা মেছুনীরা সেই উদ্যানে প্রবেশ করিল। সেই বাগানটী, কোন বাবুর এক প্রমোদ-কানন। ঝড় জল থামিল। আকাশে চন্দ্র উদিত হইল। মৃদুমন্দ সমীরণ বহিল। উদ্যানে নানাজাতীয় কুসুম প্রস্ফুটিত, গন্ধে দিক্ আমোদিত; জাতী, যুথী, তমাল, বেল, গোলাপ, রজনীগন্ধ বৃষ্টিজলে বিধৌত হইয়া, চন্দ্রালোকে হাসিতে লাগিল। সেই অট্টালিকাস্থ উদ্যানস্বামী সদাশয় ব্যক্তি।

তিনি ধীবররমণীদিগকে বিপন্না দেখিয়া, সাদরে তাহাদিগকে আশ্রয় দিলেন,—আহারের সুবন্দোবস্ত করিলেন। মর্ম্মর-প্রস্তর-গ্রথিত দ্বিতল হর্ম্ম্যের প্রশস্ত বারান্দায়, গদী-বালিশ-যুক্ত দুগ্ধফেননিভ শয্যায় তিনি তাহাদিগকে শুইতে বলিলেন। সেই শয়নগৃহের চারিদিকে ফুলের টব,—ফুলদলের সুগন্ধ, গন্ধবহ সহ মিলিয়া, ঘর মাতাইয়া তুলিয়াছে। অষ্টশাখা-বিশিষ্ট একটী বেলোয়ারি ঝাড়, গৃহের মধ্যস্থলে ঝুলিতেছে,—বাতির আলো দপ্ দপ্ জ্বলিতেছে। আশ্রয়দাতার আজ্ঞায় অগত্যা মেছুনীরা সেই গদীতে গিয়া শুইল। কিন্তু এত সুখেও তাহাদের ঘুম হইল না। প্রাণ কেমন আইঢাই করিতে লাগিল। সেই সুখশয্যা কণ্টকময় বোধ হইল। তাহাদের নিজস্ব সেই মাটীর ঘর, ছেঁড়া চেটা মনে পড়িল ;—তাহাই যেন অদ্বিতীয় স্বর্গবৎ প্রতীয়মান হইল। অহো! কি বিষম দৃশ্য! বিপদ কি একটা? আবার দেখুন, ফুলের গন্ধে তাহাদের নাক জ্বালা করিতে লাগিল। তাহাদের মনে হইল, যেন অতল নরকে তাহারা ডুবিয়া গিয়াছে। পুষ্প-সুগন্ধে বা দুর্গন্ধে তাহাদের প্রাণ যায়, প্রাণ যায় হইয়া উঠিল। পাগলিনীবৎ শয্যা ছাড়িয়া, মেজেতে আসিয়া শুইল। কিন্তু অবশ্যই গন্ধ তাহাতেও ঘুচিল না,—যেন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইল! কৈলাসচন্দ্র! আপনি বোধ হয় জানেন, মেছুনীদের মাছের পেতের ভিতর মাছধোয়া এক এক খানি ন্যাক্ড়া থাকে; সেখানি আমিষ-গন্ধে নিতান্ত পূর্ণ। তখন সেই নিরুপায়া মেছুনীরা সেইরূপ এক এক খণ্ড ন্যাক্ড়া আনিয়া, নাকের নিকট ধরিয়া কতক প্রাণ পাইল,—ফুলগন্ধ যেন কতক নিবৃত্ত হইল। এইরূপে তাহারা ন্যাক্ড়া নাকে দিয়া, মেজেতে শুইয়া অতি কষ্টে অনিদ্রায় সে রাত্রি অতিবাহিত করিল। সাধু গৃহস্বামীর যত্নে তাহারা উপকৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু পরদিন প্রত্যূষে তাঁহার সহিত দেখা না করিয়াই, মাছের পেতে মাথায় করিয়া পলাইল। বলিল, 'বাবা ধর্ম্মরাজ! তোমাকে একশ গড় করি, এমন বিপদে আর ফেলো না। মাঠে গাছতলায় কাদার উপর শুয়ে থাক্তাম, সেও ভাল ছিল; কিন্তু এ বাগানে দুতালা ঘরের দুর্গন্ধে এখনি নাড়ী উঠে গেছ্লো আর কি?—আর খানিক ন্যাক্ড়াখানি খুঁজে না পেলেই প্রাণটী বেরিয়ে যেতো! বাবা ধর্ম্মরাজ! বড় রক্ষা করেছ! এবার তোমার গাজনে আমরা সন্যেস কর্‌বো!' কৈলাসচন্দ্র! এ গল্পটী অতিরঞ্জিত হইলেও, অপ্রকৃত নহে। ইহার মূলে অখণ্ড সত্য নিহিত রহিয়াছে।

কৈলাস। (যোড়হাতে) আপনি অনুগ্রহ করিয়া আরও বলুন,—আপনার উপদেশে আমি মুগ্ধ হইয়াছি।

ব্রাহ্মণ। আরও দেখুন, বিশুদ্ধ ঘৃত অতি উপাদেয় সামগ্রী। বোধ হয় আপনি এমন বাবুও দেখিয়াছেন যে, ঘি দেখিলেই. ঘৃতগন্ধ তাঁহার নাসারন্ধ্রে ঈষৎ প্রবিষ্ট হইলেই তিনি বমি করিয়া ফেলেন। আবার অনেক ইতরশ্রেণীর ব্যক্তিও, ঘৃতসংযুক্ত সামগ্রী খাইতে বড়ই বিরক্ত। অথচ ঘি'ত জিনিস ভাল!—তবে এমন হয় কেন?—তাই বলি, জিনিসে ভাল মন্দ কিছুই নাই; ভাল মন্দ সমস্তই অন্তরে। আপনার নিমঝোলও তিক্ত নহে, সন্দেশও মিষ্ট নহে—কেবল ব্যক্তিভেদে, ক্ষেত্রভেদে মিষ্ট-তিক্ত-ভেদ হয়, ভাল-মন্দ-ভেদ হয়! বুঝিলেন কি?

কৈলাস মৃদুস্বরে বলিলেন, "এ বিষয় বিশিষ্টরূপ ধারণা করিতে অক্ষম হইলেও, এক রকম বুঝিলাম বটে!—এ সমস্তই অভ্যাসহেতুমূলক।"

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা, তাই ঠিক্! তাই ধরিয়া লউন, অভ্যাস হেতু অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, এ সংসারে মিষ্ট-তিক্ত, ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ ভেদজ্ঞান থাকে না। আর একটা বিষয় ভাবুন। আপনি বোধ হয় বহুচেষ্টা সত্ত্বেও ত্রিশ সেকেণ্ডের অধিক জলে ডুব দিয়া থাকিতে পারেন না। একজন পাকা ডুবারি দুই মিনিট স্বচ্ছন্দে ডুবিয়া থাকিতে সক্ষম। এক মটর আফিঙ খাইলেই সম্ভবত আপনার প্রাণবিয়োগ হয়, কিন্তু যার অভ্যাস আছে, সে প্রত্যহ একভরি আফিঙ খাইয়া হজম করে। বরং আফিঙ অভাবে তাহার মৃত্যু ঘটিতে পারে। কোন বাদসাহ বাল্যকাল হইতে তিল তিল পরিমাণে বিষ-সেবন অভ্যাস করিয়া পরিণত বয়সে পুরামাত্রায় বিষ-সেবন আরম্ভ করেন। এই বিষম বিষের জ্বালায় তিনি কখনও অস্থির হন নাই। যাঁর অভ্যাস আছে, তিনি অনায়াসে দ্বিতল দালান হইতে লাফাইয়া পড়িতে পারেন,—শরীরে কোনও ব্যথা জন্মে না। এদিকে অন্যব্যক্তি হোঁচট খাইয়া মূর্চ্ছিত হন। সজোর লগুড়াঘাতে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই, কেহ বা পুষ্পাঘাতে উহুঃ উহুঃ মরি মরি ডাক ছাড়েন। এ সব কথা সত্য ত?

কৈলাস। সত্য বৈ কি!—কিছুই মিথ্যা কল্পনা নহে!

ব্রাহ্মণ। আপনার প্রশ্ন ছিল,—"আঘাতিত হইলে কষ্ট বা যন্ত্রণা অনুভূত হইবে

না কেন ?' এখন বোধ হয় বুঝিলেন, যাঁর অভ্যাস আছে, বিষম আঘাত পাইলেও তাঁর কোন কষ্ট হইবে না। আর নিদারুণ বা বিষম আঘাতের কোন অর্থই নাই। আপনার পক্ষে যাহা বিষম আঘাত, অপরের পক্ষে তাহা ফুল-চন্দন হইতে পারে। সূক্ষ্মতত্ত্ব ধরিলে, আঘাত বলিয়া কোন জিনিস নাই; সেই একই জিনিস ব্যক্তিভেদে আঘাত বা ফুল-চন্দন হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছি, নিমঝোলও তিক্ত নহে, সন্দেশও মিষ্ট নহে,—কেবল লোকভেদে তিক্ত বা মিষ্ট হয়। গালে চড়ও আঘাত নহে, পুষ্পবৃষ্টিও আমোদকর নহে,—কেবল লোকভেদে যন্ত্রণাদায়ক বা প্রীতিকর হয়। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই আপনি এই সহজ তত্ত্ব অবশ্যই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

কৈলাস। অল্প অল্প বুঝিতেছি সত্য, কিন্তু মন হইতে এখনও সংশয় দূর হয় নাই। যাহারা কুস্তীগীর, জোয়ান, লেঠেল বা মানোয়ারি গোরা, তাহাদের অভ্যাস আছে, হাড় শক্ত, সদাই মারামারি করে,—কাজেই চড়, চাপড়, কীলে বা লাঠিতে তাহাদের কিছুই যন্ত্রণা উপলব্ধি হয় না; কিন্তু আহাদিগকে খুব যদি মারি, তা হলেও কি কষ্ট হবে না ?

ব্রাহ্মণ। তাদের খুব যদি হাড় শক্ত হয়, খুব যদি অভ্যাস থাকে,—তাহা হইলে খুব মারিলেও কখনও লাগিবে না। অভ্যাসের "খুব" আর প্রহারের "খুব"—যখন এক শ্রেণীতে দাঁড়াইবে, তখন নিশ্চয় লাগিবে না। যখন দুটা "খুবই" সমান হইবে, তখন যন্ত্রণা বা কষ্ট বলিয়া কোন জিনিস থাকিতে পারে না।

কৈলাস। আচ্ছা, তা না হয় বুঝিলাম। কিন্তু আপনিত কুস্তীগীর জোয়ানও নহেন, লেঠেলও নহেন,—আমার সেই নিদারুণ গলাধাক্কায় আপনি ব্যথিত হইলেন না কেন ?—

ব্রাহ্মণ এইবার চক্ষু উন্মীলিত করিয়া, কৈলাসের পানে চাহিয়া, হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, "এ প্রসঙ্গে আমার নিজের কথা আনিয়া ফেলিলেন কেন ? আমি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, আমার কথা বাদ দিয়াই প্রশ্ন করা ভাল। আপনার প্রশ্ন বোধ হয় এইরূপ,—'যাঁহারা ব্যায়ামশীল, দৃঢ়কায় নহেন, অর্থাৎ যাঁহারা সহজ-শরীর পুরুষ,—তাঁহাদেরও কি প্রহারে আঘাত লাগিবে না ?'—উত্তর—না। সহজ-শরীর হইলেই যে আঘাত লাগিবে,

তাহা নহে। পূর্ব্বেইত সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝাইয়াছি, আঘাত বলিয়া কোন জিনিস নাই। ব্যক্তি-ভেদে আঘাতের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। যাঁর অভিমান, দম্ভ নাই, যিনি জীবন্মুক্ত পুরুষ, যিনি শরীরকে আত্মা হইতে পৃথক্ বস্তু বলিয়া জানেন,—সেই পরমজ্ঞানসম্পন্ন মুনি ঋষিগণ আঘাতে কখনই ব্যথা পান না। তাঁহাদের শারীরিক বল যেমন কেন হউক না,—আঘাতে তাঁহাদের কোন কষ্ট নাই। শরীরটা যে কিছুই নয়, ইহাই তাঁহাদের ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়াছে। অন্যের শরীরে লাঠি বাজিলে যেমন আপনাকে লাগে না,—সেইরূপ তাঁহাদের পক্ষে, তাঁহাদের শরীর নিজের নহে; সুতরাং সে শরীরে আঘাত করিলে তাঁহাকে লাগিবে না। লাঠিই মারুন,—আর তরবারির চোটই লাগান, জ্ঞানীর কোন কষ্টই হইবে না। কারণ, শরীর তিনি নহেন, আত্মাই তিনি। আত্মার সহিত এই মাংসপিণ্ড জড়দেহের কোনও সম্পর্ক নাই।"

কৈলাস। বড়ই অপূর্ব্ব কথা শুনিলাম। কিন্তু এ তত্ত্বের কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না।

ব্রাহ্মণ। এ বড় কঠিন দার্শনিক কথা,—বুঝিতে পারিবেন কি? এখন মোটামুটি স্থূল কথা শুনুন। বাজীকরকে শূন্যে দড়ীর উপর দিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়াছেন ত? তরবারি জিহ্বার উপর রাখিয়া বাজীকরের হেলন দোলন নৃত্য দেখিয়াছেন ত? শূন্যে অবস্থান দেখিয়াছেন ত? বলুন দেখি, এরূপ কাণ্ড কিরূপে ঘটে? আপনার উত্তর বোধ হয়, ইহা অভ্যাস বা কসরত শিক্ষার ফল। আর এক কথা। জিজ্ঞাসু, ঊর্দ্ধবাহু দেখিয়াছেন কি? ৺কাশীধামে পৌষ মাসের শীতে, কোন উলঙ্গ সন্ন্যাসীকে দশাশ্বমেধের ঘাটে রাত্রিযাপন করিতে দেখিয়াছেন কি? প্রচণ্ড গ্রীষ্মে চারিদিকে অনল জ্বালিয়া সূর্য্যপানে মুখ করিয়া কোন মহাপুরুষকে বসিয়া থাকিতে কখন দেখিয়াছেন কি?

কৈলাস। কতক দেখিয়াছি, কতক শুনিয়াছি।

ব্রাহ্মণ। যদি না দেখিয়া থাকেন,—চলুন আমার সঙ্গে; আমি প্রত্যক্ষ দেখাইব। যাহা হউক, এখন ধরিয়া লউন, সমস্তই সম্ভব। যদি এতগুলা অলৌকিক ঘটনা সম্ভবপর হয়, তবে লাঠির আঘাতে ব্যথিত না হওয়া কি সম্ভবপর হইতে পারে না? শরীর যদি অনল-অনিল-শীত-গ্রীষ্ম-সহনক্ষম হইল, তবে কি লাঠির-আঘাত-সহনক্ষম হইতে পারে না? এই সোজা ভাষা কথাটা কখন শুনেন নাই?

শরীরের নাম মহাশয়।
যা সহাবে তাই সয়॥

শরীরকে যেমন বশ করিবে, সেইরূপই কার্য্য পাইবে। এই শরীরকে স্থূল সূক্ষ্ম, লঘু গুরু সমস্তই করিতে পারেন। অন্তত, এটাও ত দেখিয়াছেন যে, বাজীকর সামান্য ছিদ্র দিয়া, সহজে গলিয়া যায়। শরীর যাহার বশ, লাঠির আঘাতে তাহার কষ্ট হইবে কেন? এখানে বলবান্, বা দুর্ব্বলের কথা হইতেছে না,—দেহকে যিনি আয়ত্তাধীন করিয়াছেন; অর্থাৎ তৎপক্ষে যিনি বলবান্,—আঘাতে তাঁহার দেহের কোন কষ্টই উপলব্ধি হইবে না।

কৈলাস। দেহ কি আগুনে পুড়িবে না, জলেও ডুবিবে না?

ব্রাহ্মণ। না।—যাঁহার তদনুযায়ী শিক্ষা, তদনুযায়ী দেহ বশ,—তাঁহার দেহ অনলে দগ্ধ হয় না, সলিলেও নিমজ্জিত হয় না। আপনার দেহ হয় ত আগুনে পুড়িয়া ছাই হইতে পারে, কিন্তু যাঁরা "সুশিক্ষা" পাইয়াছেন, তাঁহারা পুড়িতে গেলেন কেন? পূর্ব্বেই ত বুঝাইয়াছি, কালকূট মহাবিষেও মনুষ্যশরীরের অবস্থান্তর ঘটে না। দেহনাশ পক্ষে আগুনও যা, বিষও তাই। যখন বিষেও দেহের নাশ নাই, তখন আগুনে হইবে কেন?

কৈলাস। হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনিয়াছি—সন্ন্যাসীরা কোন একটা গাছের শিকড়ের রস মাখাইয়া বুকের উপর হোম করিয়া থাকে; ধূ ধূ আগুন জলে।

ব্রাহ্মণ। দ্রব্যগুণেত একাজ সম্ভবই; লৌহকবচ ধারণ করিলে ত তরবারির চোট লাগিবেই না। কিন্তু বাহ্য দ্রব্যগুণ ব্যতীত কি একাজ সম্ভবপর নহে? বিষ ভক্ষণেও মানুষ মরে না কেন? এক তাল আফিঙে মানুষ মরে না কেন?

কৈলাস। তাহা'ত অভ্যাস নিবন্ধন ঘটিতেছে। তিল তিল পরিমাণ আফিঙ বা বিষ খাইতে খাইতে শেষে তাল তাল পরিমাণ খাওয়া অভ্যাস হইয়াছে। কিন্তু জল বা আগুনের বেলায় কি সেইরূপ দৃষ্টান্ত খাটিবে? প্রত্যহ অল্প অল্প কাল অভ্যাস করিয়া, কেহ কি শেষে এক ঘণ্টাকাল জলে ডুবিয়া থাকিতে পারেন? প্রত্যহ অল্প অল্প আগুনের আঁচ লইতে লইতে শেষে কি কেহ দাবানল মধ্যে স্বচ্ছন্দে বসিয়া থাকিতে পারেন?

ব্রাহ্মণ। (হাসিয়া) কৈলাসচন্দ্র! ইহা কি বড়ই কঠিন কাজ? সাক্ষাৎ

সূর্য্যপ্রতিম, তেজঃপুঞ্জকলেবর, ঈশ্বরের প্রতিকৃতি স্বরূপ যোগেশ্বর ঋষিদের পক্ষে কোন কাজইত অসম্ভব নহে! সূর্য্যদেব কখন কি অগ্নিতে ভস্মীভূত হন? বরুণদেব কখন কি জলে হাবুডুবু খান? যে মহাপুরুষের তেজ, শক্তি সূর্য্যসম বা সূর্য্যাপেক্ষাও অধিক, তিনি সামান্য দাবানলে দগ্ধ হইবেন কেন? শিশুর কোমল করপদ্ম সামান্য অগ্নি-কণায় ব্যথা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু যে বয়ঃস্থ পুরুষের হাতের চামড়া শক্ত, তিনি বোধ হয়, হাত পাতিয়া এক মিনিট কাল জলন্ত অঙ্গার হাতে রাখিতে পারেন। যাঁহার তেজ অগ্নি অপেক্ষা অধিক, তিনি আগুনে পুড়িবেন কেন?

কৈলাস কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ নীরব নিস্পন্দভাবে ব্রাহ্মণের অমৃতোপম কথা শুনিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন, "যে মহাপুরুষের দেহ অগ্নিতে পোড়ে না, তাঁহার শরীর কি খুব গরম? উত্তপ্ত লৌহখণ্ডবৎ সেই দেহ স্পর্শ করিলেই আমার হাতে কি ফোস্কা পড়িবে?"

এইবার ব্রাহ্মণ হো হো হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, "তা কেন হইবে? কাঠ অগ্নিতে সহজে ভস্মীভূত হয়, কিন্তু সুবর্ণ কি সহজে ভস্ম হয়? সুবর্ণের অন্তর্নিহিত উত্তাপ আছে বলিয়াই সুবর্ণ সহজে ভস্ম হয় না। অথচ সোণা'ত স্বয়ং স্বভাবত গরম নহে। যোগী মহাপুরুষের অন্তর্নিহিত শক্তি, তেজ বা উত্তাপ হেতু তাঁহার দেহ দগ্ধ হয় না,—অথচ তাঁহার দেহ কখনই গরম হইবে না—সংস্পর্শে অন্য দেহের ফোস্কার কারণও হইবে না।"

কৈলাস। বড়ই আশ্চর্য্য কথা!

ব্রাহ্মণ। আশ্চর্য্য কিছুই নহে। আজ হিন্দুধর্ম্ম লুপ্তপ্রায়, হিন্দুজাতির মুমূর্ষু অবস্থা—এ অন্তিমকালে, ইচ্ছা থাকিলে, এখনও আপনি দুই চারি জন পরমযোগী প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে পারেন।—বুঝি এ সংসারে আর তাঁহারা তিষ্ঠিতে পারেন না,—বুঝি দিন ফুরাইল—বুঝি আজই তাঁহারা অন্তর্দ্ধান হইবেন।

বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণের কণ্ঠরোধ হইল। চোখে জল আসিল। নিশ্বাস ঘন ঘন বহিল। বুক কাঁপিতে লাগিল। ভাঙ্গা ভাঙ্গা সুরে ব্রাহ্মণ বলিতে আরম্ভ করিলেন, "কৈলাসচন্দ্র! আমি আপনাকে শাস্ত্রকথা কি বুঝাইব? আমি অব্রাহ্মণ, অনধিকারী, ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম জীব,—আমি সংসারী, সুখ দুঃখের অধীন, মোহ-মায়াপাশে বিষম

নিবদ্ধ,—আপনাকে বুঝাইবার, শিক্ষা দিবার, জ্ঞান দিবার আমার শক্তি কৈ? আমি স্বয়ং অজ্ঞান,—আপনাকে জ্ঞানের উপদেশ দিব কেমন করিয়া? আমি স্বয়ং অন্ধ, অন্য অন্ধ ব্যক্তিকে পথ দেখাইব কেমন করিয়া? আমি স্বয়ং বাক্‌শক্তিহীন, বধিরকে সঙ্গীত শুনাইব কেমন করিয়া? আবল তাবল বকিয়া, কত অসংলগ্ন বাক্যব্যয় করিয়া, আমি স্থূল কথা মোটামুটি যথাসাধ্য বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম,—কিন্তু শাস্ত্রকথা লইয়া এরূপ ভাবে বিতর্ক করিতে নাই—।”

কৈলাস। (যোড়হাতে) প্রভু! আপনার উপদেশে আমি অনেক বুঝিয়াছি; আমার প্রশ্নের সদুত্তর পাইয়াছি,—বিষয়, সুমীমাংসিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, “কৈলাসচন্দ্র! আপনি বালক, তাই এমন কথা বলিলেন। শ্রীহরির কৃপা ব্যতীত, ঐকান্তিকভাবে সেই শ্রীনন্দনন্দনের চরণযুগল ধ্যান ব্যতীত,—কাহারও বুঝিবার শক্তি নাই। আপনি উচ্ছৃঙ্খল, ম্লেচ্ছ-ভাবাপন্ন বালক,—আপনি তত্ত্ব কথা বুঝিলেন কেমন করিয়া?—আমার বুঝাইবার শক্তি থাকিলেও, আপনার বুঝিবার শক্তি ত নাই।—তবে আপনি বুঝিলেন কেমন করিয়া? বীজ উৎকৃষ্ট হইলেও, ঊষরভূমে তাহার অঙ্কুর জন্মে না। এখানে বীজও উৎকৃষ্ট নহে, ভূমিও উর্ব্বর নহে, সুতরাং নিশ্চয় অঙ্কুর জন্মে নাই; নিশ্চয় আপনি বুঝেন নাই। হরি রক্ষা কর!—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!!

কৈলাসচন্দ্র। প্রভু! আমায় ক্ষমা করুন!—আমি অপরাধ করিয়াছি!

ব্রাহ্মণ। আপনার অপরাধ নাই। যুগধর্ম্মে মানব মোহিত।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব। শেষে কৈলাস কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিভরে বলিলেন, “আমি চপল-স্বভাব মূঢ় বালক,—আমার অপরাধ লইবেন না, বিরক্ত হইবেন না। আমার মনের ধৈর্য্য আর নাই। আপনার বাক্যসুধা পান করিতে মন বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে—আমি আপনার পাদপদ্ম ছাড়িব না। আমাকে অধম বোধে আপনি ত্যাগ করিতে পাইবেন না।”

এবার ব্রাহ্মণ হাসিলেন। বলিলেন, “আপনি শাস্ত্র আলোচনায় মনোনিবেশ করুন; উপযুক্ত গুরু অন্বেষণ করুন,—ক্রমে সকল বুঝিতে, শিখিতে, জানিতে পারিবেন। উপর উপর, ভাসা ভাসা, মোটামুটি কোন বিষয় শিখিতে নাই, কারণ তাহা বিফল

আগে বর্ণপরিচয়, তার পর গ্রন্থপাঠ। কিন্তু বর্ণপরিচয়ের পূর্ব্বে কখন গ্রন্থপাঠ কি সম্ভব হয়?"

কৈলাসের মন অন্যদিকে। কৈলাস ভাবিতেছেন, "যাঁহারা যোগবলে বলীয়ান্, তাঁহারা প্রকৃতই কি শীতে গ্রীষ্মে, অনলে জলে, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অভিভূত হন না?" আপনা আপনি ঘাড় দুলাইয়া, ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ করিয়া কৈলাস বলিলেন, "ঘটে ঘটে!—ঠাকুর-দাদার কাছে ছেলেবেলায় শুনেছিলাম, ভূকৈলাসের রাজবাটীতে একবার একজন যোগী এসেছিলেন; তাঁকে পরীক্ষার জন্য পাঁচ ঘণ্টাকাল জলে ডুবিয়ে রাখা হয়, তবু তিনি মরেন নাই,—যেমন তেমনি ছিলেন, কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। গুল পুড়াইয়া তাঁর গায়ে ছেঁকা দেওয়া হয়, তবু তিনি কথা কন নাই, কষ্ট বোধ করেন নাই। ঠিক কথা ঘটে!—যোগী পুরুষের কোন কষ্ট নাই!—যোগটা কি?—সমাধিটা কি?"

ব্রাহ্মণ কৈলাসের রকম দেখিয়া বলিলেন, "আপনি প্রকৃতিস্থ হউন। ধৈর্য্য ধরুন।"

কৈলাস। আমাকে বুঝাইয়া বলুন,—তাহলেই আমার প্রাণ শীতল হইবে—নচেৎ আমি বাঁচিব না।

ব্রাহ্মণ। আমার যতদূর সাধ্য মোটামুটিতে সব কথা বলিয়াছি,—

কৈলাস ভাবিলেন, মোটামুটিতেই এই ব্যাপার! না জানি সূক্ষ্মতত্ত্বে আরও কত অশ্রুতপূর্ব্ব নিগূঢ় রহস্য আছে। তখন উন্মত্ত কৈলাস ব্রাহ্মণের পায়ে গিয়া পড়িয়া বলিলেন, "প্রভু! আমাকে বঞ্চনা করিবেন না; মোটামুটি কথা আমি আর শুনিব না; নিগূঢ় সূক্ষ্মতত্ত্ব কি আছে, তাহা আমাকে বলুন—নচেৎ আমি আপনার চরণ-যুগল ছাড়িব না।"

সেই সদানন্দ ব্রাহ্মণ হাসিতে হাসিতে কৈলাসকে হাতে ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, "আপনি স্থির হউন। চিত্তকে বশ করুন। মনকে সংযত না করিতে পারিলে, স্থির-ভাবে একাগ্রচিত্তে না বসিলে, শাস্ত্রকথা বুঝিবেন কেমন করিয়া?—বসুন,—ভাল হইয়া বেঞ্চের উপর বসুন।"

কৈলাস সুস্থিরচিত্তে নীরবে বেঞ্চে গিয়া বসিলেন।

রেলগাড়ী গড় গড় চলিয়াছে। পাণ্ডুয়া, বৈঁচি, মৈমারি ছাড়িয়া লৌহ-অশ্ব শক্তি-গড়াভিমুখে ছুটিয়াছে। কৈলাস কথায় বিভোর—গাড়ীর গতির দিকে লক্ষ্য নাই;

ব্রাহ্মণ সদাই ভাবমগ্ন,—সময় সহজেই কাটিতেছে। কিন্তু সময় কাটে নাই কেবল সেই বাবুর; তাঁর বড়ই দুঃসময় উপস্থিত। কৈলাস ও ব্রাহ্মণের একঘেয়ে কথাবার্ত্তায় তিনি বড়ই বিরক্ত হইয়াছেন। বেঞ্চে পড়িয়া কেবল এপাশ ওপাশ, আই ঢাই করিতেছেন; আর মনে মনে বলিতেছেন, "এ দুটা লোকে করে কি? দুজনেই পাগল হ'লো নাকি? এদের চোখে কি ঘুম নাই; এরা সমস্ত রাত যদি এরূপ বক্ বক্ বকে, তা'হলে উপায় কি? বামুনটার জ্বালায় অস্থির হয়েচি; ওটা এখনও যদি ঘুমায়, তা'হলে ব্যাগ খুলে এক আউন্স ব্রাণ্ডি খেয়েও পরিতৃপ্ত হ'তে পারি। তা, ওকি কম বদমাইস! পাকা ভণ্ড, ১নং জুয়াচোর! কাশী যাচ্চিস বাপু, আস্তে আস্তে, শুয়ে শুয়ে, ঘুমুতে ঘুমুতে যা; তা নয়, কেবল দাঁত বার ক'রে হো হো হাস্‌বে, আর বক্ বক্ বক্‌বে!! ব্যাটা কাশী যেয়ে, বুজ্‌রুকীর ব্যবসা চালাবে নাকি?—ভাল মানুষের ছেলে কৈলাসটার দেখ্‌চি, সর্ব্বনাশ হ'লো—বামুনটা ওর মাথা খারাপ করে দিয়েছে! কৈলাসের কাছে বোধ হয়, কিছু নগদ টাকা আছে; জুয়াচোর বামুনটা তাই সন্ধান পেয়ে বোধ হয় কৈলাসকে যাদু করে ভুলিয়ে কাশী নিয়ে যাবে।—সেখানে গিয়ে কেড়েকুড়ে নিয়ে হয়ত কৈলাসকে মেরে ফেল্‌বে! এখন কৈলাসকে বাঁচাবার উপায় কি?"

মহামহোপাধ্যায় বাবু এইরূপ চিন্তা-জ্বরে জর্জ্জরিত হইয়া, বেঞ্চের উপর পড়িয়া পড়িয়া, আই ঢাই, এপাশ-ওপাশ হা-হুতাশ করিতে লাগিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় ব্রাহ্মণ নিশ্চল। ভাবে ভোর, বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য। অসাড়, অনড়, অটল; হিমগিরিবৎ গম্ভীর।

ক্ষণেক এই ভাবে থাকিয়া, শেষে ধীরে ধীরে, আপনা আপনি, অথচ যেন অন্যকে উদ্দেশ করিয়া, ব্রাহ্মণ বলিতে আরম্ভ করিলেন, "তাহা ত নিশ্চয়ই; সমস্তই ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার; পৃথিবী মিথ্যা; মায়া—মায়া—মায়া!—কিছুই নাই, কিছুই নাই, কিছুই নাই!—কেবল একই সত্য!—"

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে তাঁহার হৃদয়-দ্বার খুলিয়া গেল। ক্রমে আরও ঐরূপ অসংলগ্ন কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। আর নিবৃত্তি নাই,—স্রোত একটানা প্রবল-বেগে চলিতেই লাগিল। ইতর-চক্ষে ব্রাহ্মণ এবার স্পষ্টই পাগলবৎ প্রতীয়মান হইলেন।

তথাচ ব্রাহ্মণ কিছুতেই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি বাঙ্গালা কথা ছাড়িয়া সংস্কৃত শ্লোক ধরিলেন। ব্রাহ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিলেন,—"সেই নন্দের নন্দন শ্রীহরি ভগবান্ বলিয়াছেন,—

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥
যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥
নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥

কৈলাসচন্দ্র! এইবার দেখুন,—সুখ-দুঃখ আত্মাতে থাকে না। আর প্রকৃত তত্ত্ব ধরিলে, অবশ্যই বুঝিবেন, সুখ-দুঃখের আদৌ বিদ্যমানতা নাই!

আহা! ভগবান্ বলিতেছেন,—

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্যুধ্যস্ব ভারত॥
য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥
ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥
বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি॥

কৈলাসচন্দ্র! আপনি বুঝুন—নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করুন! আত্মার ধ্বংস নাই, আত্মা অবিনাশী, আদি-অন্ত-রহিত। আত্মা কখন বধ্য হইতে পারে না। মানব যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নববস্ত্র পরিধান করে, তেমনি আত্মা জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া নবদেহ পরিগ্রহ করেন। ইহাকেই মৃত্যু বলে। পুরাণ কাপড় ছাড়িয়া নূতন কাপড় পরিবার কালে যেমন দেহের কোন বিকৃতি হয় না, সেইরূপ পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেহান্তর গ্রহণ কালে আত্মারও কোন অবস্থান্তর ঘটে না। কারণ আত্মাই একমাত্র সত্য পদার্থ। আত্মা অস্ত্রে কাটে না, আগুনে পুড়ে না, জলে গলিয়া যায় না, বায়ুতে শোষিত হয় না। আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য এবং অশোষ্য। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, যত কিছু আছে, তৎসমস্তই অনিত্য, মিথ্যা,—কেবল একমাত্র আত্মাই সত্য, নিত্য, সনাতন। গিরি, নদী, বৃক্ষ, বাড়ী, খাট, পালঙ, সোণা, রূপা, কাপড়, গহনা, বিভব, বিষয়, টাকা কড়ি, গাড়ী ঘোড়া, যাহা কিছু দেখিতেছেন, এ সমস্তই কিছুই নহে, বাস্তবিকই সব মিথ্যা,—এই সমগ্র সংসার মায়া দ্বারা কল্পিত,—

ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।
সত্যমেকং পরংব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখী ভব॥

কৈলাসচন্দ্র! বুঝিলেন ত?"

কৈলাস অবাক্। ব্রাহ্মণের কথার তিনি বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারেন নাই। কৈলাসের ভাবনা হইল,—ব্রাহ্মণ হঠাৎ এমন অসংলগ্ন প্রলাপ বকিলেন কেন?

অনভিজ্ঞ লোকের ভাবনার বিষয় বটে। মানুষ যখন তাহার কোন প্রিয় বিষয়

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে তাঁহার হৃদয়-দ্বার খুলিয়া গেল। ক্রমে আরও ঐরূপ অসংলগ্ন কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। আর নিবৃত্তি নাই,—স্রোত একটানা প্রবল-বেগে চলিতেই লাগিল। ইতর-চক্ষে ব্রাহ্মণ এবার স্পষ্টই পাগলবৎ প্রতীয়মান হইলেন।

তথাচ ব্রাহ্মণ কিছুতেই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি বাঙ্গালা কথা ছাড়িয়া সংস্কৃত শ্লোক ধরিলেন। ব্রাহ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিলেন,—"সেই নন্দের নন্দন শ্রীহরি ভগবান্ বলিয়াছেন,—

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥
যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥
নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥

কৈলাসচন্দ্র! এইবার দেখুন,—সুখ-দুঃখ আত্মাতে থাকে না। আর প্রকৃত তত্ত্ব ধরিলে, অবশ্যই বুঝিবেন, সুখ-দুঃখের আদৌ বিদ্যমানতা নাই!

আহা! ভগবান্ বলিতেছেন,—

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্যুধ্যস্ব ভারত॥
য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥
ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥
বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি॥

কৈলাসচন্দ্র! আপনি বুঝুন—নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করুন! আত্মার ধ্বংস নাই, আত্মা অবিনাশী, আদি-অন্ত-রহিত। আত্মা কখন বধ্য হইতে পারে না। মানব যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নববস্ত্র পরিধান করে, তেমনি আত্মা জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া নবদেহ পরিগ্রহ করেন। ইহাকেই মৃত্যু বলে। পুরাণ কাপড় ছাড়িয়া নূতন কাপড় পরিবার কালে যেমন দেহের কোন বিকৃতি হয় না, সেইরূপ পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেহান্তর গ্রহণ কালে আত্মারও কোন অবস্থান্তর ঘটে না। কারণ আত্মাই একমাত্র সত্য পদার্থ। আত্মা অস্ত্রে কাটে না, আগুনে পুড়ে না, জলে গলিয়া যায় না, বায়ুতে শোষিত হয় না। আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য এবং অশোষ্য। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, যত কিছু আছে, তৎসমস্তই অনিত্য, মিথ্যা,—কেবল একমাত্র আত্মাই সত্য, নিত্য, সনাতন। গিরি, নদী, বৃক্ষ, বাড়ী, খাট, পালঙ, সোণা, রূপা, কাপড়, গহনা, বিভব, বিষয়, টাকা কড়ি, গাড়ী ঘোড়া, যাহা কিছু দেখিতেছেন, এ সমস্তই কিছুই নহে, বাস্তবিকই সব মিথ্যা,—এই সমগ্র সংসার মায়া দ্বারা কল্পিত,—

ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।
সত্যমেকং পরংব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখী ভব॥

কৈলাসচন্দ্র! বুঝিলেন ত?"

কৈলাস অবাক্। ব্রাহ্মণের কথার তিনি বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারেন নাই। কৈলাসের ভাবনা হইল,—ব্রাহ্মণ হঠাৎ এমন অসংলগ্ন প্রলাপ বকিলেন কেন?

অনভিজ্ঞ লোকের ভাবনার বিষয় বটে। মানুষ যখন তাহার কোন প্রিয় বিষয়

একান্ত মনে ভাবে, তখন সে অন্য বিষয়ের অস্তিত্ব ভুলিয়া যায়। কাব্য-নাটকে নায়ক-নায়িকার বিরহবর্ণনে এ কথার উদাহরণ দৃষ্ট হয়। সখী, নায়িকাকে সম্বোধন করিলেন, "মাধবীলতে! অত্যধিক বেলা হইয়াছে, অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত; অনুমতি করেন ত পাচিকা লইয়া আইসে।" মাধবীলতা বঁধুর বিরহে নিমগ্না, অন্য চিন্তা নাই, তিনি উত্তর দিলেন, "তা, বৈ কি সখি! সেই কুমুদিনীকান্তের আমি ত অনুপযুক্ত হইবই!—তিনি আমাকে গ্রহণ করিবেন কেন? কিন্তু সখি! সে রূপ, সে গুণ, আমি কেমন করিয়া ভুলিব?" সে সময় মাধবীলতার হৃদয় কুমুদিনীকান্তময় হইয়া উঠিয়াছিল, নায়ক তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন কি না, তিনি সেই ভাবনায় ভোর ছিলেন, কাজেই তখন সখীর অন্নব্যঞ্জনের কথা তাঁহার কাণে যায় নাই। একাগ্রচিত্তে দর্শন বিষয়েও ঐরূপ ঘটে। কুরুপাণ্ডবের অস্ত্রবিদ্যা পরীক্ষার্থ, দ্রোণাচার্য্য কাষ্ঠের পক্ষী রচনা করিয়া বৃক্ষশাখায় স্থাপন করিলেন। দ্রোণ প্রথমত যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, শর দ্বারা ঐ কাষ্ঠপক্ষী বিদ্ধ কর। যুধিষ্ঠির ধনুতে শর যোজনা করিলেন। তখন দ্রোণ জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি এক্ষণে কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে দেখিতেছ, আমাকে বল।" যুধিষ্ঠির বলিলেন, "বৃক্ষমধ্যে পক্ষী দেখিতেছি, আর ভূমধ্যে আপনাকে এবং আমার সহোদরগণকে দেখিতে পাইতেছি।" দ্রোণ ক্রোধভরে যুধিষ্ঠিরের হস্ত হইতে ধনুঃশর কাড়িয়া লইয়া তাহা বৃকোদরকে দিলেন। শরযোজনার কালে ভীমসেনও ঐরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে, বলিলেন "আমি গাছপালা, আকাশ পাখী, দাদাকে, আপনাকে—সকলকেই দেখিতেছি।" দ্রোণ অধিকতর কুপিত হইয়া ভীমের হস্ত হইতে ধনুর্ব্বাণ লইয়া একে একে সকল শিষ্যের হস্তে দিলেন, তাহারা পূর্ব্বানুযায়ী সেইরূপ কথাই বলিল। শেষে গুরু ধনুঃশরটী প্রিয়তম শিষ্য অর্জ্জুনের হাতে দিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি কি দেখিতেছ?" অর্জ্জুন বলিলেন "বৃক্ষমধ্যে কেবল মাত্র পক্ষীকেই আমি দেখিতেছি, আর কিছুই দেখি না।" দ্রোণ বলিলেন, "এইবার পক্ষী-অঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া বল, কি দেখিতেছ?" অর্জ্জুন উত্তরিলেন, "আর আমি পক্ষীও দেখিতে পাইতেছি না, কেবল পক্ষীর মুণ্ডসহ আঁখিদ্বয় দেখিতেছি।" দ্রোণ বলিলেন, "আরও ভাল করিয়া দেখ।" অর্জ্জুন উত্তরিলেন, "আমি এ সংসারে আর কিছুই দেখি না, কেবল পক্ষীর গলাটী দেখিতেছি।" দ্রোণাচার্য্য তখন আনন্দিত অন্তরে আজ্ঞা দিলেন, "এইবার পক্ষীর মুণ্ড কাটিয়া পাড়।" অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ পক্ষিশির

কাটিয়া ফেলিলেন। বড়ই আশ্চর্য্য শিক্ষা। অর্জ্জুনের চিত্তের একাগ্রতা নিবন্ধনই এরূপ ঘটিল।

বোধ হয় ব্রাহ্মণও সেইরূপ এখন একাগ্রমনে শাস্ত্রকথা, সংসারের সারতত্ত্ব ভাবিতেছেন,—তাই বুঝি তাঁহার অন্তর্জ্ঞান নাই,—কৈলাস যে গণ্ডমূর্খ, তা' বুঝি তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন,—তাই বুঝি তিনি অনর্গত সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিতেছেন।

ভগবান্ ব্যতীত ব্রাহ্মণের মনের ভাব কে বলিতে পারে? কিন্তু ঘটনা ঐরূপই ঘটিল। কৈলাসকে তত্ত্বজিজ্ঞাসু পরম পণ্ডিত জ্ঞানে, ব্রাহ্মণ যেন বিচারে, মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

কাজেই কৈলাস অবাক্! মুখ দিয়া বাক্য নিঃসরণ হয় না, অথচ ব্রাহ্মণের কথার একটা উত্তর না দিলেও নয়। তখন বিপন্ন কৈলাস অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া যোড়হাতে ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "প্রভু! আমি কিছু বুঝি নাই, আমি নিতান্ত অজ্ঞান, আমাকে সোজাসুজি বুঝাইয়া বলুন।"

ব্রাহ্মণ তদ্বৎ ভাবমগ্ন, আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "মহর্ষি কপিলদেব বলিয়াছেন,—

"অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ। অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইলেই মোক্ষলাভ হয়। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, এবং আধিদৈবিক—মানুষের এই তিন প্রকার দুঃখ হইতে পারে। আধ্যাত্মিক দুঃখ আবার দুই প্রকার—শারীর ও মানস। রোগাদি-জনিত যে দুঃখ, তাহা শরীরগত দুঃখ; আর কামাদিজনিত যে দুঃখ, তাহা মানসিক দুঃখ। ব্যঘ্র-চৌরাদি-জনিত যে দুঃখ, তাহা আধিভৌতিক। আর বায়ু, অগ্নি, বজ্রাঘাত, ভূকম্প প্রভৃতি দ্বারা যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহা আধিদৈবিক। এই তিন রকম দুঃখ ছাড়া মানুষের আর দুঃখ নাই। যে পুরুষের এই ত্রিদুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইয়াছে, তিনিই মুক্তিলাভ করেন। স্থূলতঃ বলিতে পারেন, প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় কোন দুঃখও থাকে না,—কিন্তু সে দুঃখনিবৃত্তি ত অনন্তকালের জন্য হয় না,—ঘুম ভাঙ্গিলেই আবার যে দুঃখ ছিল, সেই দুঃখই উপস্থিত হয়। সুতরাং গাঢ় নিদ্রাকালে যে দুঃখনিবৃত্তি হয়, তাহাকে অত্যন্ত নিবৃত্তি বলা যায় না। এই দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি কিসে হয় বলুন দেখি? ধনাদি দ্বারা দুঃখনিবৃত্তি হয় কি? না। তথাচ শ্রুতিঃ—

অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেনেত্যাদি।

"অর্থাৎ বিত্তের দ্বারা, ধনাদি লৌকিক উপায় দ্বারা, অমৃতত্ব লাভের আশা নাই। মনযোগ পূর্ব্বক শুনুন,—

"প্রাত্যহিকক্ষুৎপ্রতীকারবৎ তৎপ্রতীকারচেষ্টানাং পুরুষার্থত্বম্ ॥

"সর্ব্বাসম্ভবাৎ সম্ভবেঽপি সত্ত্বাসম্ভবাদ্ধেয়ঃ প্রমাণকুশলৈঃ ॥

"উৎকর্ষাদপি মোক্ষস্য সর্ব্বোৎকর্ষঃ শ্রূয়তে ॥

"অবিশেষশ্চোভয়োঃ ॥

"ন স্বভাবতো বদ্ধস্য মোক্ষসাধনোপদেশবিধিঃ ॥

"বুঝিলেন ত? কুঞ্জরশৌচের ন্যায় ধনাদি দুঃখনিবৃত্তির কারণ হইতে পারে না। একটা হাতীকে স্নান করাও, সে তৎক্ষণাৎ ধূলা উড়াইয়া আপন শরীর মলিন করিবে,— সেই স্নান, হস্তীর শরীর-নির্ম্মলতার কারণ কখনই হইবে না; সেইরূপ ধনাদির উপার্জ্জনেও চিরকাল দুঃখনিবৃত্তি হয় না। ধনের ক্ষয়ে পুনর্ব্বার দুঃখ উপস্থিত হয়। বিশেষ, রোগশোকাদিজনিত দুঃখনিবৃত্তি করা ধনের সাধ্যায়ত্ত নহে। আচ্ছা, না হয় ধরিয়া লউন, ধন দ্বারা সর্ব্বপ্রকার দুঃখনিবৃত্তি হয়,—কিন্তু সেই ধন উপার্জ্জন কালে প্রতিবিগ্রহজনিত যে পাপ সংগ্রহ হয়, তাহা ত অবশ্যই দুঃখের কারণ হইবে। যে ধন উপার্জ্জন করিয়া দুঃখনিবৃত্তি করিবে, তাহার উপার্জ্জনেই দুঃখ আছে। অহো!— মনুষ্যের কি ভ্রম!! কৈলাসচন্দ্র! বুঝিলেন ত?"

কৈলাসের মুখে কথা নাই, কাষ্ঠ-পুত্তলিকাবৎ অবস্থিত। ভাল মন্দ কিছুই তিনি বুঝিতেছেন না, কেবল হাঁ করিয়া ব্রাহ্মণের কথা উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে শুনিতেছেন।

ব্রাহ্মণের নিবৃত্তি নাই,—আপন মনে হু হু বলিয়া চলিলেন, "সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিবেন, ধনাদি এবং যাগাদি উভয়ই দুঃখ-নিবৃত্তি-সম্বন্ধে প্রায় তুল্য। ধনে যেমন অত্যন্ত দুঃখের নিবৃত্তি হয় না, সেইরূপ কেবল বৈদিক কর্ম্ম যাগাদি দ্বারাই অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি হইতে পারে না। কেবল একমাত্র সেই জ্ঞানই অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির উপায়, অবিদ্যানাশের হেতু। সেই পরম জ্ঞান জন্মিলেই ত্রিবিধ দুঃখ দূরে পলায়,—

সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের মত, জ্ঞানোদয়ে মায়া দূরীভূত হয়। সেই মায়াপাশ-ছেদ হইলেই অনন্ত সুখের উদয় হয়। ভগবান্ মহাদেব বলিয়াছেন,—

আত্মজ্ঞানমিদং দেবি পরং মোক্ষৈকসাধনম্।

হে দেবি! আত্মজ্ঞানই মোক্ষের একমাত্র কারণ।

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

বোধো হি কো যস্তু বিমুক্তিহেতুঃ।

বোধ কি?—যাহা বিমুক্তির কারণ।

শঙ্করাচার্য্য আরও কি সুন্দর কথা বলিয়াছেন দেখুন,—

অরুণেনৈব বোধেন পূর্ব্বং তমতিমিরে হৃতে।
তত আবির্ভবেদাত্মা স্বয়মেবাংশুমালিব॥

মনু বলেন,—

তপো বিদ্যা চ বিপ্রস্য নিঃশ্রেয়সকরং পরম্।
তপসা কিল্বিষং হন্তি বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥
সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতম্।
তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ॥

অর্থাৎ তপস্যা দ্বারা পাপাসক্তি যায় এবং একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই মুক্তিলাভ হয়। স্বয়ং ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥
ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥
চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুনঃ।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥

ঈশ্বরের ত্রিগুণময়ী দৈবী মায়া অতিশয় দুরত্যয়া, কিন্তু যাঁহারা কর্ম্মসন্ন্যাস করি

কেবল ঈশ্বরেই প্রপন্ন হইতে পারেন, তাঁহারাই এই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম। চারি প্রকার মানুষ ঈশ্বরকে ভজনা করে,—(১) তস্কর, দস্যু, ব্যাঘ্র এবং পীড়াদি দ্বারা অভিভূত ব্যক্তি, (২) ধনকামী দরিদ্র, (৩) তত্ত্বজিজ্ঞাসু, (৪) আত্মতত্ত্ববিৎ। ঐ চারি প্রকার ভক্তের মধ্যে যিনি আত্মতত্ত্ববিৎ, তিনিই প্রধান। যিনি আপন আত্মাকে ঈশ্বরের আত্মা-স্বরূপ বলিয়া বুঝেন, তিনিই ঈশ্বরের পরম প্রিয়। সেই ব্যক্তিই পরম জ্ঞানী।

কৈলাসচন্দ্র! এই দেখুন না কেন?—

বদন্তু শাস্ত্রাণি যজন্তু দেবান কুর্ব্বন্তু কর্ম্মাণি ভজন্তু দেবতাঃ।

আত্মৈকবোধেন বিনাপি মুক্তির্ন সিধ্যতি ব্রহ্মশ[illegible]রেহপি॥

সর্ব্বশাস্ত্র উত্তমরূপে ব্যাখ্যা[illegible] করুন, দেবগণের জন্য যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানই করুন, বিহিত কর্ম্ম সকলই করুন [illegible] সদা দেবতার উপাসনাই করুন,—জীবাত্মা এবং পরমাত্মার অভেদজ্ঞান [illegible] কখনও মুক্তি লাভ হইবে না।

দেখুন,—

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।

জ্ঞানং নরাণামধিকং বিশেষো জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন—ইহা মনুষ্য, পশু সর্ব্ব জীবেরই আছে,—কিন্তু যাহা দ্বারা মনুষ্যগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা জ্ঞান। হায়! জ্ঞানলাভের জন্য আমাদের চেষ্টা নাই। সমগ্র জগৎ ভ্রমমূলক মাত্র,—কেবল জ্ঞান দ্বারাই সেই ভ্রম দূর হয়।

যত্র বিশ্বমিদং ভাতি কল্পিতং রজ্জুসর্পবৎ।

আনন্দঃ পরমানন্দঃ স বোধস্ত্বং সুখী ভব॥

রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম হইতেছে; এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে সত্য বস্তু বলিয়া আপনার বোধ হইতেছে।—কিন্তু বস্তুগত্যা, পৃথিবী মিথ্যা। কৈলাসচন্দ্র! যখন আপনার পরম জ্ঞা[illegible] উদয় হইবে, তখন আপনার রোগশোকে দুঃখ হইবে না, অর্থ-অভাব-জনিত দু[illegible]ঘ্র-চৌরাদিতে কষ্ট দিতে পারিবে না, মাথায় বাজ পড়িলেও আপনার কষ্ট [illegible] এরূপ স্থলে অস্ত্রাঘাতে আপনার কষ্ট হইবে কেন? যদি জীবন্মুক্ত পুরুষে[illegible]র, অস্ত্র দ্বারা কেহ দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলে, তথাচ তাঁহার কোন দুঃখ, কষ্ট, বা

যন্ত্রণা নাই। তাঁহার জড় দেহ ধ্বংস হইবে সত্য, কিন্তু সে ধ্বংসে তাঁহার কি? তিনি সুখ দুঃখ, শোক হর্ষের অতীত পুরুষ।”

ক্ষণৈককাল নীরব থাকিয়া ব্রাহ্মণ আবার আরম্ভ করিলেন,—

“পঞ্চদশীকর্ত্তা বলিয়াছেন,—

ময়াময়ত্বং ভোগস্য বুদ্ধিস্থমুপসংহরন্।
ভুঞ্জানোঽপি ন সঙ্কল্পং কুরুতে ব্যসনং কুতঃ॥

তিনি আরও উপদেশ দিয়াছেন,—

নিদ্রাশক্তির্যথা জীবে দুর্ঘটস্বপ্নকারিণী।
ব্রহ্মণ্যেষা তথা মায়া সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী॥
স্বপ্নে বিয়দ্গতিং পশ্যেৎ স্বমূর্দ্ধচ্ছেদনং তথা।
মুহূর্ত্তে বৎসরৌঘঞ্চ মৃতং পুত্রাদিকং পুনঃ॥
ইদং যুক্তমিদং নেতি ব্যবস্থা তত্র দুর্লভা।
যথা যথেক্ষতে যদ্যৎ তত্তদ্যুক্তং তথা তথা॥
ঈদৃশো মহিমা দৃষ্টো নিদ্রাশক্তের্যদা তদা।
মায়াশক্তেরচিন্ত্যোঽয়ং মহিমেতি কিমদ্ভুতম্॥

কৈলাসচন্দ্র! যাহা কিছু আপনার চক্ষুর গোচরীভূত, তৎসমস্তই নিদ্রার স্বপ্নবৎ অলীক। স্বপ্নকালে দুর্ঘট স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনা সকল যেমন মিথ্যা,—পরমব্রহ্মের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ও সেইরূপ মিথ্যা। স্বপ্নে মানুষ আকাশপথে চলিয়া যায়, আপনার মস্তকচ্ছেদনও করিতে দেখে, মুহূর্ত্তকাল মধ্যে সংবৎসর অতিক্রম করে এবং পরে মৃত-পুত্রাদির পুনর্জ্জীবনপ্রাপ্তিও জ্ঞান করিয়া থাকে। স্বপ্নকালীন ঘটনা সকল বাস্তবিক মিথ্যা হইলেও, তখন—স্বপ্নকালে সে ব্যক্তি তাহা মিথ্যা বলিয়া স্থির করিতে পারে না,—সমুদায়ই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। কিন্তু ঘুম ভাঙ্গার পরই জ্ঞানের উদয় হয়,—তখন স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর মিথ্যাত্ব উপলব্ধি হয়। মায়াপাশে আবদ্ধ মনুষ্যেরও ঠিক এই অবস্থা,—জল, বায়ু, মৃত্তিকা, মনুষ্য, পশু, পতঙ্গ সমস্ত মিথ্যা হইলেও, মায়াধীন সংসারী ব্যক্তি তাহা সমস্তই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে,—কেহ ধনবান্ কেহ দরিদ্র, কেহ হন্তা, কেহ হত,—ইত্যাকার অনুভব করিতে থাকে। কিন্তু মানুষের যখন মোহনিদ্রা ভঙ্গ হয়, মায়া-পাশ হইতে

মুক্তি হয়, দিব্যজ্ঞান লাভ হয়,—তখন সেই জীবন্মুক্ত ব্যক্তি সমগ্র সংসারকে মিথ্যা বোধ করেন। সুতরাং তিনি সাংসারিক কার্য্যজনিত কোন ক্লেশ পান না, শোক দুঃখও অনুভব করেন না। কারণ সবই মিথ্যা। কৈলাসচন্দ্র! ভাবুন, স্বপ্ন দেখিলেন যে, আপনি দুর্ব্বৃত্ত দস্যুদলকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন, অস্ত্রাঘাতে আপনার দেহ জর্জ্জরিত হইয়াছে,—আপনি স্বপ্নাবস্থায় কতই স্বপ্নসম্ভব প্রতীকারের চেষ্টা করিলেন; কতই কষ্ট পাইলেন,—শেষে জীবন্মৃতবৎ পড়িয়া রহিলেন; কিন্তু যাই আপনার ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিল,—অমনি বুঝিলেন সমস্তই মিথ্যা,—সেই দস্যুদল মিথ্যা, অস্ত্রাঘাত মিথ্যা, আর আপনার প্রতীকারের চেষ্টা মিথ্যা, কষ্টও মিথ্যা। মায়াকল্পিত পৃথিবীতে সংসারী জীব সদাই জাগ্রৎ-স্বপ্ন দেখিতেছে, কাজেই তাহার রোগ-শোক-বন্ধন-অস্ত্রাঘাতে কষ্ট বোধ হয়। কিন্তু যাহার সেই জাগ্রৎ-স্বপ্ন-মোহ ভাঙ্গিয়াছে, মায়া এবং অবিদ্যা নাশ হইয়াছে, দিব্যজ্ঞান জন্মিয়াছে, তাঁহার কষ্ট হইবে কেন? সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা তাঁহার বক্ষ বিদারণ করিয়া লবণ নিক্ষেপ করিলেও, তাঁহার কোনও যন্ত্রণা অনুভব হইবে না। কৈলাসচন্দ্র!—অসার সংসারের সবই মিথ্যা,—কেবল সেই একই সত্য বলিয়া জানিও—সেই 'একই সত্য' বুঝিবার জন্য চাই কেবল জ্ঞান,—জ্ঞান,—জ্ঞান! সেই শ্যামল, পদ্মপলাশলোচন, বনমালা-বিভূষিত, ব্রজধামবিহারী, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী যোগেশ্বর শ্রীহরির চরণপঙ্কজ ধ্যান ব্যতীত,—অধিকারীর উপাসনা, অনুষ্ঠান, কর্ম্মাদি ব্যতীত,—এ সংসারে সেই জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা? সেই একমাত্র সত্য, নিত্য, অনন্ত স্বপ্রকাশ অপূর্ব্ব মূর্ত্তি, ভক্ত ব্যতীত আর কাহার নিরীক্ষণের সম্ভাবনা?—কলিকালে ভাগবতই ভবসাগর পার হইবার একমাত্র তরী। কৈলাসচন্দ্র! আপনি ভাগবত পড়ুন, ভক্তি করুন, না বুঝিলেও বুঝিতে পারিবেন! আহা! দেখুন, কেমন অমৃতময়ী কথা!—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥
ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।

শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥
নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥"

দেখিতে দেখিতে রেলগাড়ী বর্দ্ধমানে আসিয়া থামিল। যাত্রীগণ এইখানে আধঘণ্টা কাল বিশ্রামের অবকাশ পাইবে। টিকিট পরীক্ষা হইবে। কেহ পান চুরট কেনে, কেহ লুচি মেঠাই খায়, কেহ গাড়ী হইতে বাহির হইয়া বারেন্দায় পা-চালি করিয়া বেড়ায়। ব্রাহ্মণের কিন্তু বিরাম নাই,—শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অবিরল অবিশ্রান্ত শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় কেবল সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। এমন সময় টিকিট-পরীক্ষক আসিয়া সেই কাম্‌রার দরজা খুলিল। তবু ব্রাহ্মণের চট্‌কা ভাঙ্গিল না। শ্লোক-পাঠও বন্ধ হইল না। সেই ফৈরঙ্গ-অবতার টিকিট-দর্শক যখন ইংরেজীতে বলিল, "টিকিট দেখান" তখন ব্রাহ্মণের যেন ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি ঝটিতি ভাগবত-আবৃত্তি বন্ধ করিয়া, কৈলাসকে জিজ্ঞাসিলেন, "আমরা কি বর্দ্ধমানে আসিলাম?"

কৈলাস হাঁ—বর্দ্ধমানষ্টেসন। আপনার টিকিট কৈ? টিকিট দেখাইতে হইবে।

সেই বাবু, এদিকে আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া সর্ব্বাগ্রে টিকিট দেখাইলেন এবং নিজের মোট পুঁটুলি, বিছানা বালিশ সমস্ত আসবাব উত্তমরূপে বাঁধিতে লাগিলেন। শেষে তিনি হাঁকাহাঁকি আরম্ভ করিলেন, "কুলি, কুলি,—ইধার আও।"

ব্রাহ্মণ এবং কৈলাসের টিকিট দেখিয়া, টিকিট-পরীক্ষক অন্যদিকে চলিয়া গেল। বাবুর হাঁকাহাঁকিও আরও বাড়িল। ব্রাহ্মণ বাবুকে জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি বর্দ্ধমানে নামিবেন নাকি?—"

বাবু হ্যাঁ,—হয়, এ রাত্রে বর্দ্ধমানে আমার বন্ধুর বাসায় যাইব,—না হয়, অন্য গাড়ীতে উঠিব। এ কামরায় আর থাকিব না।

ব্রাহ্মণ। কেন? কেন?—কি হয়েচে?—

বাবু ঠাকুর, তুমি আমায় ক্ষমা করো,—কিন্তু চারঘণ্টা একটানা ধর্ম্মের কথা ভাল লাগে না। আমার কাণ ঝালাপালা হয়েচে,—একটু হাঁপ্‌ ছাড়্‌বার

গাড়ীতে থাকবো না, তোমারা ঠাকুর, মানুষ খুন করতে পারো।—এরচেয়ে বিছের গারোদ ভালো।

সেই সদানন্দ ব্রাহ্মণ হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বুঝিলেন, বাবু প্রকৃতই শাস্ত্রকথায় বিরক্ত হইয়াছেন। ধীরে ধীরে নিকটে গিয়া সাদারে বাবুর হাত ধরিয়া বলিলেন, "মহাশয়! রাগ করিবেন না। বসুন, বসুন, এ ক্ষুদ্রপ্রাণীর উপর ক্রোধ করিয়া লাভ কি?"

বাবু। যখন কেবল বাঙ্গালায় কথা কহিতেছিলেন, তখন এক রকম সহ্য হয়েছিল,—কিন্তু শেষে এই যে ঝাড়া, সংস্কৃত শ্লোক আরম্ভ করিলেন, তা কি কেউ সইতে পারে?—থাক্, ঠাকুর আজ না হয়, আমি বর্দ্ধমানের বাসায় যাই, তোমরা আজ কাশী যাও, আমি কাল যাবো। এ যাত্রা ঘরে ফিরে যেয়ে, আমি না হয় যাত্রা বদ্‌লে আস্‌বো, তবু ঠাকুর তোমার সঙ্গে যাবো না।

ব্রাহ্মণ। (হাসিয়া) তাও কি কখন হয়?—আমরা আপনাকে ছাড়িব কেন?—আপনি যেখানে যাবেন, আমরাও সেখানে সঙ্গে সঙ্গে যাবো।

এইবার কৈলাস ও বাবু উভয়েই ব্রাহ্মণের কথায় হাসিয়া ফেলিলেন। ব্রাহ্মণ আবার বাবুর হাত ধরিয়া বলিলেন, "বসুন, বসুন,—এ রাত্রে যাবেন কোথা?"

বাবু। দোহাই ঠাকুর, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে রক্ষা কর। আচ্ছা, তোমার এই গাড়ীতেই আরও খানিক রহিলাম,—কিন্তু দোহাই মা কালীর দিব্য,—তুমি আর সংস্কৃতে কথা কহিও না।—

ব্রাহ্মণ হো হো রবে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে লাগিলেন। হাসিতে হাসিতে হাতে ধরিয়া বাবুকে আবার বলিলেন,—"আচ্ছা, আচ্ছা,—তাই হবে, আপনি বসুন, বসুন।

এমন সময় এক ঘটনা ঘটিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ষ্টেসনে এক মহা সমারোহ-কাণ্ড উপস্থিত; পাঁচ খানা পাল্কী, কুড়িজন বেহারার কাঁধে ধীর কদমে চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে দাস দাসী, সিপাহী বরকন্দাজ ছুটিয়াছে। তারপর আর একদল লোক; অন্যূন ত্রিশ জন হিন্দুস্থানী বৃদ্ধ, যুবা বালক দিব্য সারি গাঁথিয়া প্লাটফর্মের উপর দিয়া যাইতেছেন। অবশেষে তৃতীয় দল দেখা দিল। এ দলের সম্মুখভাগে হরিনামাঙ্কিত এক ধ্বজা উড়িতেছে। তৎপরে এক প্রিয়দর্শন দীর্ঘকায় পুরুষ দৃষ্ট হইলেন। তাঁহার বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত, লোচন দীর্ঘ ও মনোহর। বদন, কমনীয় ভ্রূযুগলে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে কণ্ঠের গঠন শঙ্খের ন্যায় সুন্দর। বক্ষঃস্থল বিশাল এবং মাংসল। মুখমণ্ডল হইতে উজ্জ্বল আভা নির্গত হইতেছে। মস্তকে উষ্ণীষ। পদদ্বয়ে পায়জামা; অঙ্গে চাকচিক্যময় সাদা রেশমের ক্ষত্রিয়োচিত অঙ্গরক্ষিণী, তদুপরি সাদা কাশ্মীরি শালের জোব্বা। পায়ে জরির জুতা। তাঁহার সেই সুগম্ভীর সৌম্যমূর্ত্তি অবলোকন করিলে মনে হয়,—কে বলে ভারত আজ নিষ্ক্রিয়?—কে বলে ভারত আজ বীরপ্রসবিনী নয়? সেই পরম পুরুষের পশ্চাতে একজন চোগা-চাপকান-শ্যামলাধারী বাঙ্গালী বাবু। বাবুর বামভাগেই একজন ইংরেজ, তিনি ষ্টেসনমাষ্টার। বাবুর সঙ্গে তাঁহার মৃদুমন্দ স্বরে দুচারিটা কথাবার্ত্তা চলিতেছে। তাহার পর দুইজন বৃদ্ধ হিন্দুস্থানী;—শেষে, কটীতটে তরবারি-দোদুল্যমান, বন্দুকস্কন্ধ চারি জন শরীর-রক্ষক। এই দলত্রয়ের নিমিত্ত দুই খানি প্রথমশ্রেণীর, দুই খানি দ্বিতীয়শ্রেণীর এবং চারি খানি তৃতীয়শ্রেণীর গাড়ী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই সমগ্র দল, অদ্যকার রাত্রির গাড়ীতেই পশ্চিমাভিমুখে রওনা হইবেন।

ইহাঁরা কে? গাড়ী-মধ্যস্থ সহস্রাধিক লোক সহস্রাধিক রকম তর্কবিতর্ক করিতে লাগিল। কেহ বলিল, কাশ্মীরের রাজা। কেহ তাহার প্রতিবাদ করিল, নিশ্চয়ই জয়পুরাধিপ। কাহার দ্বারা সংশোধন প্রস্তাবিত হইল, কাশ্মীরও নয়, জয়-পুরও নয়,—সিন্ধিয়া। উচ্চে হিমালয় শৈল হইতে নিম্নে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত,—

বামে সিন্ধুনদ হইতে ডাহিনে পার্ব্বতীয় ত্রিপুরা রাজ্য পর্য্যন্ত—ভারতে যেখানে যত রাজা আছেন, এইরূপে ক্রমশ তাঁহাদের প্রত্যেকেরই নামকরণ হইতে লাগিল। যাঁর যখন যে রাজ্যের কথা মনে পড়ে, তিনিই তখন সেই দীর্ঘকায় সুন্দর পুরুষকে সেই রাজ্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ভারতীয় নরপতিবৃন্দ নিশ্চয়ই সে রাত্রে 'বিষম' খাইয়াছিলেন।

যাই হউক, রাজা মৃদুমন্দ গজেন্দ্রগমনে প্লাটফরমের উপর দিয়া চলিয়াছেন। সেই মধ্যশ্রেণীর কাছে গিয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইলেন। সেই সময় ব্রাহ্মণ হো হো হাসিয়া, বাবুর হাত ধরিয়া 'বসুন বসুন' করিতেছেন। রাজা সেই ব্যাপার অবলোকন করিয়া, যেন অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, ব্যগ্রভাবে হিন্দীতে বলিলেন, "পণ্ডিতজী! আপনি এখানে! কোথায় যাইবেন?"

রাজার সহিত ব্রাহ্মণের কথাবার্ত্তা হিন্দীতেই চলিল। কিন্তু পাঠক পাঠিকার হিন্দী বুঝিবার অসুবিধা হইবে বলিয়া বাঙ্গালাতেই তাহার অনুবাদ দিলাম।

ব্রাহ্মণ তীব্রদৃষ্টিতে রাজার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে রাজা স্বহস্তে গাড়ীর দ্বার খুলিয়া ব্রাহ্মণকে প্রাতঃপ্রণাম করিলেন, পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিলেন। ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বচনে রাজাকে সম্ভাষণ করিয়া, কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসিলেন। যাবতীয় যাত্রী চিত্রার্পিতের ন্যায় সে ব্যাপার দেখিতে লাগিল। কেহ বিস্মিত, কেহ স্তম্ভিত, কেহ বা নিতান্ত হতবুদ্ধি হইল।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্মিত, অধিক স্তম্ভিত, অধিক হতবুদ্ধি হইলেন—সেই বাবু।

বাবু আর কেহই নহেন,—আমাদের সেই নগেন্দ্রনাথ, কমলিনীর সেই ভাবী গৃহশিক্ষক। পাঠকের স্মরণ আছে ত?—ডেপুটী রামচন্দ্র যখন বদলী হইয়া হুগলীতে প্রথম অবস্থিতি করিলেন, সেই সময়েই নগেন্দ্রের সহিত তাঁহার প্রথম আলাপ-পরিচয় হয়। ডেপুটী রামচন্দ্র, নগেন্দ্রের পিতার বাল্যবন্ধু। রামচন্দ্র হুগলীতে আসিয়াছেন শুনিয়া, পিতা, পুত্রকে ডেপুটী বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পত্র লেখেন। পুত্র তখন হুগলীকলেজের বি, এ, ক্লাসে পড়েন। আলাপের সেই প্রথম সূত্রপাত, সেই প্রথমাঙ্কুর। বলা বাহুল্য, তখন রামচন্দ্রের পিতা জীবিত,—কাজেই কমলিনী বা অন্নপূর্ণা তখন হুগলীতে শুভাগমন করেন নাই।

ক্রমে নগেন বি, এ, পাস হইলেন। নগেনের পিতা, বন্ধু-রামচন্দ্রকে পত্রের একটী চাকুরী যোগাড় করিয়া দিবার জন্য এক অনুরোধলিপি লিখিলেন।

ইতিপূর্ব্বে রামচন্দ্র যেদেশে ঐ রাজার বাড়ী, সেই দেশে ছয়মাস কাল ডেপুটীগিরি করিতে গিয়াছিলেন। জঙ্গল-দেশে ডেপুটী বাবু এবং সর্ব্বজনপূজিত দেবতা, প্রায়ই সমান। সুতরাং অচিরে রামচন্দ্রের সহিত রাজার বিশেষ সদ্ভাব জন্মিল।

রাজা প্রতিবৎসর শীতকালে, ছোট বড় সমস্ত রাজকর্ম্মচারীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের জন্য—অর্থাৎ রাজ্যটী অক্ষুণ্ণভাবে বজায় রাখিবার জন্য, কলিকাতায় আসিয়া থাকেন। রামচন্দ্রও, গুরুর নিকট মহামন্ত্র লইবার জন্য, হুগলী হইতে প্রতি শনিবারে সে সময় কলিকাতায় আসিতেন।

রাজা ও রামচন্দ্রে হঠাৎ এক দিন কলিকাতায় সাক্ষাৎ ঘটিল। রাজা, নানারূপ সম্ভাষণ, আদর, অভ্যর্থনার পর বলিলেন, "আমার দেওয়ানজী ভাল ইংরেজী জানেন না; রাজকাছারিতে উত্তম ইংরেজী-নবীশ লোকও নাই; আজকাল সর্ব্বদাই আমাকে কোম্পানীর সহিত চিঠিপত্র লেখালিখি করিতে হয়, তারে খবর পাঠাইতে হয়। আপনার সন্ধানে কোন ভাল ইংরেজী-জানা লোক আছে কি?"

রামচন্দ্র। অতি উত্তম লোক আছেন। তিনি যেমন ইংরেজীতে কৃতবিদ্য, সেইরূপ পবিত্রচেতা। কিন্তু বেতন বেশী না দিলে তিনি সে দেশে যাইতে স্বীকার হইবেন না।

রাজা। শুধু আমার চিঠিপত্র লেখালিখির জন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করিব না। আমার ছেলেটীকেও ইংরেজী পড়াইতে লইবে। আজ আমি লাট সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। লাট সাহেব হিন্দী বুঝেন না। অন্য একজন দোভাষী সাহেব আসিয়া আমার কথা লাটকে বুঝাইলেন এবং লাটের কথা আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। শেষে যখন লাট-দরবার হইতে উঠিয়া আসি, তখন লাট সাহেব হাসিয়া আমাকে বলিলেন, "আপনার ছেলেকে ইংরেজী পড়াইতে আরম্ভ করুন, তাহা হইলে উভয় পক্ষের আর কথা কহিবার কোনও কষ্ট হইবে না।" তাই বলি, একটী ভাল ইংরেজীনবীশ লোক আমাকে দিন।

রাম। খুব ভাল লোকই আছেন। বেতন কত দিবেন?

রাজা। রাজ-সরকারে বেতন অল্প, মাসিক একশত টাকার অধিক নহে। তবে সরকার হইতে প্রত্যহ তিনি সিধা পাইবেন, থাকিবার বাড়ী পাইবেন।

এইরূপে নগেন্দ্র বাবুর বিহার অঞ্চলে চাকুরী হইল চাকুরী হইবার একমাস পূর্ব্বেই রামচন্দ্রের পিতা নরহরির মৃত্যু ঘটে। পিতৃ-মৃত্যুতে রামচন্দ্র যখন এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলিলেন না, নগেন্দ্রই তখন সর্ব্বলোককে বুঝাইয়া এই শ্লোক আবৃত্তি করিয়াছিলেন,—

বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ॥

এ কথাটা পাঠক ভুলেন নাই ত?

নগেন্দ্রনাথের নিবাস নদীয়া জেলায়। পাঁচ ছয় মাস অন্তর নগেন্দ্র চাকুরী-স্থান হইতে বাটী আসিতেন। হুগলীতে নামিয়া, ডেপুটী বাবুর বাসায় রাত্রিমাত্র বিশ্রাম করিয়া, পরদিন নৈহাটী হইয়া, তিনি ঘরে যাইতেন। এইরূপই নিয়ম ছিল। কমলিনী ক্রমশ যখন শিক্ষিতা হইয়া উঠিলেন, তখন একদিন রামচন্দ্র কন্যাকে নগেন্দ্রের নিকট ইণ্ট্রোডিউস্ করিয়া দিলেন,—বলিলেন, "নগেন্দ্রবাবু, আমার কন্যার সহিত একবার আলাপ করুন,—বুঝিয়া দেখুন, কমলিনী কেমন শিক্ষিতা হইয়াছেন।" নগেন্দ্র বলিলেন, "তথাস্তু।" কথিত আছে, সেবার নগেন্দ্রনাথ হুগলীতে তেরাত্রি থাকেন। তারপর হইতেই, চাকুরীস্থান হইতে নগেন্দ্রের ঘর-আনাগোনার মাত্রা বৃদ্ধি হইল। ক্রমশ এমনও ঘটিল যে, নগেন্দ্র বাটী আসিবার নামে ছুটী লইয়া,—'কমলিনী কেমন শিক্ষিত হইয়াছেন বুঝিবার জন্য' হুগলীতে মাঝে মাঝে একসপ্তাহ কালও অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এইরূপ ঘন ঘন বাড়ী আসায় রাজা, নগেন্দ্রের উপর ঈষৎ বিরক্ত হইলেন; তবে তাঁহার ইংরেজীকাজে সন্তুষ্ট ছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে কিছু বলিলেন না।

রাজা কে, তাহা বলিব না; বলিবার আবশ্যকতাও নাই। বিশেষ, সে রাজা এখনও জীবিত; নাম প্রকাশ করিলে, তিনি হয়ত জনসাধারণের একমাত্র লক্ষ্য-স্থল হইতে পারেন। সম্ভবত এ কাজ, এরূপ "রাজপরিদর্শন" রাজার বিরক্তিজনক হইবে।

রাজা পরম হিন্দু—হরিভক্ত। শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহার দেবালয় আছে, অতিথিশালা আছে। ঘরেও তাই। রাজার নিবাস বিহার-বিভাগে। তাঁহার রাজধানী অবশ্যই

জঙ্গলময় নয়। তবে রামচন্দ্র সে দেশকে সদাই জঙ্গল-দেশ বলিয়া অভিহিত করিতেন। কারণ, তাঁহার মতে যেদেশে ইংরেজী-শিক্ষিত লোক খুব কম,—গাছপালা ঝোপ ঝাপ না থাকুক,—সেদেশ নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর জঙ্গলময়।

রাজা সপরিবারে অগ্রহায়ণ মাসে ৺শ্রীক্ষেত্রধামে তীর্থভ্রমণে গিয়াছিলেন। পৌষের শেষে দেশে ফিরিতেছেন। বর্দ্ধমান-রাজের সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল। প্রত্যাগমন কালে বর্দ্ধমান-রাজকর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া, বর্দ্ধমানে দুই দিন কাল মহাসমাদরে অবস্থিতি করেন। আজ রাত্রের গাড়ীতে বাড়ী যাইবেন।—

মাতা, স্ত্রী, পুত্র ও প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গ-সমভিব্যাহারে তীর্থযাত্রাকালে রাজা, নগেন্দ্র বাবুকে বলিয়া যান, "আমার প্রত্যাগমন-কাল পর্য্যন্ত আপনি রাজ্য ছাড়িয়া কোথাও যাইবেন না,—ইংরেজের যা চিঠিপত্র আসিবে, তাহার হয় আপনি উচিতমত জবাব দিবেন, না হয়, তারে আমার নিকট হইতে সংবাদ আনাইয়া উত্তর লিখিবেন। মোদ্দা, রাজ্যে কেহই রহিলেন না,— আপনাকে চব্বিশঘণ্টাই রাজদরবারে থাকিতে হইবে, রাজকাজ দেখিতে হইবে।"

এরূপ রাজাজ্ঞা সত্ত্বেও নগেন্দ্রনাথ লুকাইয়া বাড়ী গিয়াছিলেন। নগেন্দ্র ভাবিয়াছিলেন, "দু-দিনমাত্র থাকিয়া আসিব, রাজা জানিবেন কিরূপে?" দরবারস্থ তাৎকালিক "প্রধান মন্ত্রীকে" গড়িয়া পিটিয়া তিনি শনিবারে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু ফিরিতে তাঁহার দুই দিনের স্থানে দশ দিন হইল।

কেন এমন ঘটিল? প্রায় দুই মাস অতীত হইল, তিনি কমলিনীর কোন হস্তাক্ষরিলিপি পান নাই। কার্ত্তিক মাসের প্রথমে তিনি কমলিনীর নিকট হইতে কেবলমাত্র এই লেখাটুকু পাইয়াছিলেন,—"আপনার সাধের কমল বুঝি এইবার শুকাইল! আর বুঝি তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিলেন না! এ অন্তিমে যে, আপনার সাক্ষাৎ পাইব, সে আশা করি না,—আমার অদৃষ্টও সেরূপ নহে! পরিচ্ছেদ শেষ হইল,—কিন্তু অনেক কথা বাকি রহিল!"

কমলিনীর পত্রে সন তারিখ নাই, ঠিকানা নাই। কোন্ পোষ্টাফীস হইতে পত্র রওনা হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য, নগেন্দ্র, খামের উপর ডাকঘরের মোহর-অঙ্কন দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু সে অস্পষ্ট জোবড়া অক্ষর পড়া গেল না। শেষে দূরবীণ

আনিয়া সে মোহর পড়িবার জন্য অনেক কস্তাকস্তি করিলেন, কিন্তু কিছুতেই ফলোদয় হইল না। তিনি ভাবনা-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। সে রাত্রে আহার করিলেন না, ঘুমাইলেন না,—সারা রাত শুইয়া শুইয়া কেবল কড়িকাঠ পানে চাহিয়া রহিলেন! পর দিন শরীর অসুস্থ বলিয়া রাজবাড়ী গেলেন না। চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর মাথা-হেঁট করিয়া গুম্ হইয়া রহিলেন। বুঝি সেই চতুর্দ্দশবর্ষীয়া "বালিকার" রাঙ্গা রাঙ্গা অধর মনে পড়ে,—আর নগেন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। বুঝি কমলিনীর সেই ভাসা-ভাসা, ফুল্ল চোখ দুখানি মনে পড়ে,—আর নগেন্দ্রের নয়ন ছলছল করে। বুঝি নগেন্দ্রের মনে হইল, সেই পরিম্লানমুখ শ্রীসুরসুন্দরী তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ক্ষীণকাতর-কণ্ঠে বলিতেছেন,—"নগেন্দ্রনাথ! আপনার সাধের কমল বুঝি শুকাইল!"

নগেন্দ্রের অপরাধ নাই। কমলিনীতে নিশ্চয়ই দৈবীশক্তি আছে। তাঁহার কেমন একটা যে ভুবন-ভুলানী মায়া, সহজ-প্রাণী তাঁহাকে একবার দেখিলে আর ভুলিতে পারে না। সেই আধ-আধ হাসি-মাখানো কথা, যিনি একবার শুনিয়াছেন, তিনিই মজিয়াছেন, অগ্নিতে পতঙ্গ ভস্মীভূত হয়, বিলাতী চারে মৎস্যবংশ নির্ব্বংশ হয়।

শরৎশশীর বিমল রশ্মিকে সকলেই ভাবে যে, ইহা তাঁহার আপনার নিজস্ব সম্পত্তি। কিন্তু শশী কাহারও নন। তিনি যথানিয়মে আকাশপটে উদিত হইয়া, সকলকেই সমভাবে কিরণ বিতরণ করেন। আপনাপন কৃত কর্ম্ম অনুসারে, লোকে কখন কম, কখন বেশী শশীকে ভোগ করিয়া থাকে।

নগেন্দ্রই হউন, দেবেন্দ্রই হউন, মহেন্দ্রই হউন আর গুণেন্দ্রই হউন,—অথবা রাম, শ্যাম, নবীন, প্রবীণ বাবুগণই হউন,—কুলপদ্মিনী কমলিনী কিন্তু কাহারও নন। অথচ বাবুরা প্রত্যেকেই ভাবেন, কমলিনী তাঁহার অখণ্ড নিজস্ব সম্পত্তি—কলেক্টরীর তৌজিভুক্ত পাকা জমিদারী। প্রত্যেক বাবুরই দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে, বুঝি তিনি ছাড়া কমলিনীর এ সংসারে আর কেহই নাই! সকলই ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার! কমলিনীর দৈবীমায়া দুরত্যয়া। অধিক কি,—অবমানিত, লাঞ্ছিত বিতাড়িত হইয়াও কৈলাসচন্দ্র বুঝি ভাবেন, "কমলিনী নিরপরাধিনী। যত দুষ্ট লোক একত্র হইয়া, তাঁহার সাধের কমলকে ছিনাইয়া লইয়াছে। কমলিনী এখনও তাঁহারই। ঊষা চিরদিনই অনিরুদ্ধের ; কুমুদিনী চিরদিনই কুমুদবান্ধবের ; কমলিনী চিরদিনই কৈলাসের।" ভোজবাজির বেহদ্দ।

যাহা হউক, নগেন্দ্রনাথ সেই দিনই রেজষ্টরি ডাকে, দীর্ঘচ্ছন্দে 'হা হতোস্মি! হা দগ্ধোস্মি!'—ইত্যাকারে কাদম্বরীর ভাষায়, কমলিনীকে বাটীর ঠিকানায় এক চিঠি লিখিলেন। চিঠি ঘুরিয়া ফিরিয়া, ডেপুটী বাবুর হাত দিয়া, রিডাইরেক্ট হইয়া, কলিকাতায় আসিল। কমলিনী তৎপূর্ব্বেই চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আনীত হন। কিন্তু ঘটনা-চক্রে, চিঠি পৌঁছিবার কয়েকদিন পূর্ব্বেই, কলিকাতা ছাড়িয়া কমলিনী বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য, স্বাস্থ্যলাভ আশায়, পশ্চিমে যাত্রা করেন। চিঠি আবার ঘুরিতে ঘুরিতে প্রেরক নগেন্দ্রনাথের হাতে আসিয়া পৌঁছিল।

বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্য-সভ্যতার নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া, কন্যার নামীয় পত্র, পিতা রামচন্দ্রের হাতে পড়িলেও, তিনি তাহা খুলিয়া না দেখিয়া, কলিকাতায় কন্যার ঠিকানায় রিডাইরেক্ট করিয়া দেন।

প্রিয়-রমণীর পত্র ফেরত পাইয়া নগেন্দ্রনাথ যেন একবারে আকাশ হইতে পড়িলেন। চোকে আঁধারি দেখিলেন। প্রথমতঃ স্থির করিলেন, কমলিনী বুঝি, এসংসারে আর নাই। প্রেমময়ী বুঝি, এ সংসার-অরণ্যে পবিত্র প্রেমের প্রকৃত আধার খুঁজিয়া না পাইয়া, স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন। ক্রমশঃ ধৈর্য্য ধরিয়া, নিবিষ্টচিত্তে ফেরতপত্রের খামখানি পড়িতে লাগিলেন। দেখিলেন, তাহাতে ডেপুটী বাবু স্বহস্তে লিখিয়াছেন, Redirected No—Bowbazar Street, Calcutta, যতই তিনি অনিমিষ লোচনে সেই লেখার প্রতি নিরীক্ষণ করেন, ততই তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিতে লাগিল, ইহা নিশ্চয়ই ডেপুটী বাবুর লেখা। নচেৎ অমন সতেজ, গোটা গোটা, মুক্তাফলনিভ বর্ণমালা আর কাহার সম্ভব হইতে পারে? ভাবিলেন, কমলিনী যদি সত্যসত্যই সংসার ছাড়িবেন, তবে পিতা, তাঁহার পত্র কলিকাতায় রিডাইরেক্ট করিবেন কেন? শেষে স্থির করিলেন, নিশ্চয়ই কমলিনী কলিকাতায় আছেন। তবে বোধ হয়, সে নম্বরের বাড়ী ছাড়িয়া অন্য বাড়ীতে গিয়া থাকিবেন।

তখন নগেন্দ্রনাথ, কলিকাতাস্থ কোন বন্ধুকে এই ভাবে পত্র লিখিলেন,—"নম্বরের বাটীর ভাড়াটিয়ারা হঠাৎ কোন্ বাড়ীতে উঠিয়া গেলেন, তাহার সংবাদ তুমি আমাকে শীঘ্র দিয়া চিরবাধিত করিবে।" বন্ধু পরীক্ষা দিতে কলিকাতায় আসিয়াছেন; কলিকাতা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অপরিচিত। বিশেষ, তিনি বড়ই অধ্যয়নশীল। তিনি

পড়াশুনা করিবেন, না,—হৈ হৈ করে নম্বর খুঁজে বেড়াইবেন? আজ খুঁজিব, কাল খুঁজিব, করিয়া বন্ধুর চারি পাঁচ দিন সে বাড়ীর নম্বর খোঁজা হইল না। এমন সময়ে নগেন্দ্রের নিকট হইতে আবার এক তাগিদ আসিল। বন্ধু তখন বিব্রত হইয়া নম্বর অন্বেষণে বহির্গত হইলেন; কিন্তু প্রথম দিন কোথাও কিছুই কূল-কিনারা করিতে পারিলেন না। এদিকে নগেন্দ্রকে তিনি উত্তর দিলেন, "নম্বরের সন্ধানে আছি, শীঘ্র জানিয়া সবিশেষ সংবাদ লিখিব।" এইরূপে এক সপ্তাহ অতীত হইল। তার পর নগেন্দ্রনাথের তৃতীয় তাগাদাপত্র আসিল। বন্ধুর তখন পরীক্ষা উপস্থিত। তৃতীয় পত্রের উত্তর তিন দিন অপেক্ষা করিয়া, নগেন্দ্রনাথ, বন্ধুর নিকট টেলিগ্রাম পাঠাইলেন। চতুর্থ দিনে পরীক্ষা শেষ হইলে বন্ধু বৈকালে নম্বর অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। একজন মুসলমান গৃহস্থের বাটীতে ঢুকিয়া পড়িয়া, বন্ধু মার খাইয়া, নগেন্দ্রকে কোন সংবাদ না দিয়াই কলিকাতা ছাড়িয়া ঘরে পলাইলেন।

নগেন্দ্রের ছটফটানি আরম্ভ হইল। রাজ্যে রাজা নাই, তীর্থভ্রমণে গিয়াছেন,—তিনি কেমন করিয়া রাজকাজ ফেলিয়া বাটী যান? বিশেষ রাজা তাঁহাকে তাঁহার অনুপস্থিতিকালে বাটী যাইতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। এই সব ভাবিয়া ভাবিয়া, শেষে নগেন্দ্রের বুক ফাটে-ফাটে হইল। তখন যেন দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া, তাৎকালিক "প্রধান মন্ত্রীর" সহিত যোগ করিয়া, রাজাকে লুকাইয়া তিনি বাটী রওনা হইলেন। ইচ্ছা ছিল যে, তিনি দুই দিন পরে কলিকাতা হইতে ফিরিবেন। কিন্তু বিধির বিড়ম্বনায় তাহা ঘটিল না।

নগেন্দ্রনাথ কলিকাতা-সহর পাতি পাতি করিয়া খুঁজিলেন,—কিন্তু কমলিনী মিলিল না। এইরূপে নানা অনুসন্ধানে কলিকাতায় প্রায় একসপ্তাহকাল কাটিয়া গেল। অবশেষে তিনি নদীয়া জেলাস্থ ডেপুটীবাবুর বাসায় গমন করিলেন। সেখানে শুনিলেন, কমলিনা বিষম পীড়িত,—তিনি কলিকাতায় কয়েক দিন থাকিয়া, নীরোগ হইবার জন্য, উক্ত পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। নগেন্দ্রের চক্ষুস্থির হইল! মুখে কথা নাই, নাকে কেবল দীর্ঘনিশ্বাসের ধ্বনি। এত যতন করিলাম, তবু রতন মিলল না। হতাশ হইয়া নগেন্দ্রনাথ ফিরিলেন। অদ্য সন্ধ্যার সময় হাবড়ার ষ্টেসনে রেলগাড়ী চাপিলেন। উদ্দেশ্য, চাকুরীস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করা।

বলা বাহুল্য, নগেন্দ্র এবং কৈলাস, এক মহাব্রতে ব্রতী হইলেও, পরস্পর কেহ কাহাকেও চিনিতেন না। হুগলীতে ডেপুটী বাবুর বাসায় প্রত্যহ হরেক রকম লোকের আমদানি হইত। রাঙ্গা, কালো, পেঁসুটে, হরিতালী রং,—ছোট, বড়, মাঝারি ঢং— ইত্যাদিরূপ কত রকম যে, পুরুষের সমাগম হইত, তাহার সংখ্যা কে করিবে? পরস্পর সকলেই আপন কার্য্যে ব্যস্ত,—কে কাহাকে চিনিবে বলুন?—বিশেষ, বাঁশবনে ডোম কাণা। আর কৈলাসচন্দ্র নবীন সহযোগী। প্রবীণ সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ কৈলাসের মুখপানে তাকাইবেন কেন? প্রকৃত কথা এই,—কৈলাসের স্বত্ত্ব নূতন,—আর, উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষয় আরম্ভ হইল,—অঙ্কুরেই ছাগলে মুড়াইল। দুই সপ্তাহ সময়ও লাগে নাই,—ফুলিল আর মরিল। সম্ভবত এ সময় নগেন্দ্রনাথ চাকুরীস্থান হইতে আদৌ হুগলী গতায়াত আরম্ভ করেন নাই; সুতরাং পরস্পরে চেনাচিনি হইবে কেমন করিয়া? কৈলাসচন্দ্র এত অপরিচিত যে, প্রথমে নগেন্দ্রের তাঁহাকে সাহেব বলিয়াই ভ্রম হয়। নগেন্দ্র-কৈলাসের পরস্পর পরিচয় না থাকুক, পাঠকগণ বোধ হয়, উভয়েরই সম্যক্ পরিচয় পাইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

হঠাৎ সম্মুখে যদি বজ্র পতন হইত, নগেন্দ্র তত চমকিতেন না; যদি আকাশ খসিয়া ভূমণ্ডল ভাসিয়া, হিমালয় উড়িয়া যাইত; তথাচ নগেন্দ্র তত ভীত, ত্রস্ত, কম্পিতকলেবর হইতেন না,—কিন্তু রাজাকে সম্মুখে দেখিয়া তিনি একেবারে যেন জীবন্মৃতবৎ হইলেন,—তাঁহার শরীর ঝিন্ ঝিন্ করিতে লাগিল, মাথা বন্ বন্ ঘুরিয়া উঠিল, জিব্ শুকাইল, কণ্ঠরোধ হইল। মুখে কথা নাই, তিনি অন্তরে কেবল গোঁ গোঁ গোঁ করিতে লাগিলেন। কোথায় যে লুকাইবেন, তাহার একটুও স্থান নাই। রেলগাড়ী! তুমি দ্বিধা হও, নগেন্দ্র তোমার ভিতর পশিতে প্রস্তুত। গাড়ী! তুমি আউট-রেল হইয়া উল্টাইয়া পড়, অথবা ঠোকাঠুকি হইয়া ভাঙ্গিয়া যাও, নগেন্দ্রের তাহাতে শান্তি আছে।

এম, এ, পাস করিলেও নগেন্দ্র ছেলেমানুষ; একশত-টাকা মাহিনার চাকুরী

করিলেও নগেন্দ্র বালক; ইংরেজীতে চিঠি লিখিতে শিখিলেও নগেন্দ্র বিষয়কার্য্যানভিজ্ঞ। থতমত খাইয়া তিনি একবার ভাবিলেন, "মুখটী বিলাতী কম্বলে ঢাকা দি, রাজা দেখিতে পাইবেন না।" আবার ভাবিলেন, "তা হবে না; এই কামরার অপর পার্শ্বে গিয়া, গবাক্ষ দিয়া, মুখটী ঝুলাইয়া থাকি, রাজা দেখিতে পাইবেন না।" শেষে ঠিক করিলেন, "এর কিছুতেই কিছু হবে না, কামরার কোণে মুখটী গুঁজিয়া তক্তার সঙ্গে মিশিয়া থাকি,—রাজা দেখিতে পাইবেন না।"

মুখটী লইয়া নগেন্দ্রনাথ বিপদে পড়িলেন। তখন তাঁহার বোধ হয় মনে হইল, "হায়! আমার যদি এই পোড়ার মুখটা না থাকিত, তবে আজ কি সুখের দিন হইত! আমার নাকটী, কাণ দুটী কাটিয়া, মাথাটী মুড়াইয়া—আমাকে এখনি যদি কেহ নেড়া বোঁচা করিয়া দেয়, তবে কতই আরাম হয়, তা'হলে রাজা আমাকে চিনিতে পারিবেন না। তা, এমন কি কেহ নাই, যিনি একাজ করিতে সক্ষম?"

নগেন্দ্রনাথ যন্ত্রণায় ঐরূপ অস্থির হইতে এবং বিচার বিতর্ক করিতে থাকুন; রাজার কিন্তু তাঁহার প্রতি তাদৃশ লক্ষ্য নাই। তিনি একান্তমনে ভক্তিভরে সেই ব্রাহ্মণের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

রাজা বলিলেন, "আজ আমার সুপ্রভাত হইয়াছিল; নহিলে সাধু লোকের দর্শন পাইব কেন?"

ব্রাহ্মণ হাসিয়া বলিলেন, "সুপ্রভাত আপনার নহে, আমার। বহু দিন,সাত্ত্বিক ভাব দেখি নাই, আজ আপনাতে সে ভাবের লক্ষণ দেখিলাম। আপনি তীর্থ ভ্রমণ করিয়া, দেবাদিদেব ও জগন্নাথদেবের পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া ঘরে ফিরিতেছেন,—আপনাকে দেখিলে পুণ্য আছে।"

রাজা। (বিস্ময়ে) আমি যে পুরুষোত্তমে গিয়াছিলাম, আপনি জানিলেন কিরূপে?

ব্রাহ্মণ। (হাসিয়া) আমরা উত্তম লোকের গতিবিধির সংবাদ রাখিয়া থাকি। তবে হঠাৎ এমন সময় যে আপনি ফিরিবেন, তাহা জানিতাম না। শুনিয়াছিলাম, শ্রীক্ষেত্রে এক মাস থাকিয়া তৎপরে চট্টগ্রামে চন্দ্রনাথ দর্শনে যাইবেন।

রাজা। অদৃষ্টে না থাকিলে তীর্থ-দর্শন ঘটে না। চন্দ্রনাথ যাইবার সমস্তই ঠিকঠাক বন্দোবস্ত ছিল; কিন্তু হঠাৎ সংবাদ পাইলাম, বড়লাট মাঘ মাসে আমার

রাজ্যে শীকার করিতে আসিবেন। শীকারে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে থাকিতে হইবে। হাতী, ঘোড়া, উঠ, তাঁবু সমস্তই আমাকে যোগাইতে হইবে। তাই, এ সকলের বন্দোবস্তের জন্য, আমি তাড়াতাড়ি রাজ্যে ফিরিলাম। বিশেষ, আপনার শ্বশুর যে ইংরেজী-জানা লোকটীকে দিয়াছিলেন, বর্দ্ধমানে আসিয়া শুনিলাম, তিনিও আজ আটদশ দিন হইল, রাজ্যে নাই,—কোথায় গিয়াছেন, কেহ জানে না। নগেন্দ্রকে সুবোধ শান্ত বলিয়া জানিতাম; কিন্তু এখন বুঝিলাম, বড়ই বিশ্বাসঘাতক। তাঁহাকে মাথার দিব্য দিয়া, আমার অনুপস্থিতি কালে রাজ্যে থাকিবার জন্য বলিয়া যাই; কিন্তু নগেন্দ্র হঠাৎ কোথায় চম্পট দিয়াছেন। পণ্ডিতজী! সংসার বড় বিষমস্থান। আজকাল বড়লাটের নিকট হইতে প্রত্যহ কত পত্র, কত টেলিগ্রাম, আসিতেছে,—কিন্তু সে সকলের সুচারু উত্তর যাইতেছে না। আপনি জানেন, ফিরিঙ্গী চাকর রাখা আমার নিয়ম নয়। একজন বাঙ্গালী খুঁজিলাম, কিন্তু আপনার শ্বশুর বেছে বেছে এমন অসৎ লোককে দিলেন কেন?

নগেন্দ্রনাথ মনে মনে ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়িতে লাগিলেন। হায় হায়! কি হইল! কি হইল! এককালে যেন সহস্র বিছায় তাঁহার মর্ম্মস্থান দংশন করিতে লাগিল। এই দেখিল, এই ধরিল,—মজিলাম, এই মরিলাম। নগেন্দ্রনাথের মনে হইল, রাজা যেন ভয়ঙ্কর সিংহমূর্ত্তি ধরিয়া, হাঁ করিয়া, তাঁহাকে গিলিতে আসিতেছে। তিনি যতই দূরে পলাইয়া যান, সিংহ ততই নিকটে আইসে। যে দিকে তিনি আঁখি ফিরান, ঠিক সেই দিকেই সেই সিংহমূর্ত্তি দেখিতে পান। নগেন্দ্রের চারিদিক্ যেন সিংহময় হইয়া উঠিল। নগেন্দ্র ভয়ে চক্ষু বুজিয়া ফেলিলেন; তথাচ সিংহটা দূর হইল না,—মুদ্রিত নয়নে তিনি সেই বিভীষণ মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।—এই গেলাম, এই গেলাম—বাপ্!!

রাজা ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসিলেন, "সে যাহা হউক, আপনার শ্বশুরের অনেক দিন সংবাদ পাই নাই। রামচন্দ্র বাবু এখনও হুগলীতে ডেপুটী মাজিষ্টর আছেন ত?"

কৈলাস, কলের পুতুলের মত, নীরবে রাজা ও ব্রাহ্মণের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন। রাজার কথার আভাসে, কমলিনীর পিতা ডেপুটী রামচন্দ্রই, ব্রাহ্মণের যেন শ্বশুর,—এইরূপ কতকটা বুঝিয়া, তাঁহার চক্ষুস্থির হইল। কৈলাস হাঁ করিয়া রাজা-ব্রাহ্মণের কথা

গিলিতে লাগিলেন! ব্রাহ্মণ, রাজার কথায় উত্তর দিলেন, "না, তিনি এখন হুগলীতে নাই। শুনিয়াছি, তিনি ছুটী লইয়াছেন। এতদিন বোধ হয়, ছুটী ফুরাইয়া থাকিবে।"

কৈলাসের চোখ দুটা কপালে উঠিয়া যেন বাহির হইবার উপক্রম করিল। হাঁ-টা আরও ডাগর হইল। কৈলাস,—আড়ষ্ট—কাঠিমুঠি হইয়া গেলেন। ওদিকে নগেন্দ্রনাথ, আপন যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, আপন মনেই কেবল আপন ভোগ ভুগিতেছিলেন। রাজা-ব্রাহ্মণের কথাবার্ত্তায় যে, ডেপুটী রামচন্দ্র আছেন, তাহা তিনি প্রথমত লক্ষ্য করেন নাই। ক্রমশ তাহার আভাস কাণে গেল, ডেপুটী রামচন্দ্রই যেন এই ব্রাহ্মণের শ্বশুর। হঠাৎ যেন তাঁহার মাথার ভিতর বিদ্যুতের প্রবাহ চমকিয়া গেল। সেই বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাবে নগেন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গ থরথর কাঁপিতে লাগিল। ছিন্ন-ভিন্ন-নাড়ী, বিকারী রোগীর উপসর্গ বৃদ্ধি পাইল,—উর্ব্ধশ্বাস হইল। নগেন্দ্র ইতিপূর্ব্বে রাজাকে সিংহ দেখিয়াছিলেন, এখন ব্রাহ্মণও দুরন্ত ব্যাঘ্রবৎ প্রতীয়মান হইল। সম্মুখে এককালে আক্রমনোদ্যত সিংহ-ব্যাঘ্রকে দেখিয়া, নগেন্দ্র এবার উচ্চরবে বারংবার, বাপ, বাপ্, বাপ্, বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া, বেঞ্চ হইতে পড়িয়া গেলেন।

মহাশব্দে সকলের চমক ভাঙ্গিল। ব্রাহ্মণ ত্বরান্বিত হইয়া উঠিয়া নগেন্দ্রকে পাথুরেকোলা করিয়া ধরিয়া তুলিয়া, বেঞ্চের উপর শোয়াইলেন। তারপর রাজাকে উদ্দেশ করিয়া একটু জল চাহিলেন। রাজা এক বার চাহিবামাত্র অমনি আট দশ জন লোক 'জল জল' করিয়া উঠিল। স্বয়ং ষ্টেসন-মাষ্টার "পানি" বলিয়া এক জলদগম্ভীর আওয়াজ দিলেন। ছুটাছুটি দশজনে দশ ঘটি জল আনিয়া হাজির করিল। ব্রাহ্মণ সেই জল লইয়া নগেন্দ্রের চোখে, মুখে, কপালে, মাথায় অল্প অল্প দিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের সাহায্যার্থ রাজাও গাড়ীর ভিতর উঠিলেন। প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া ষ্টেসন মাষ্টার একটা উজ্জ্বল আলোক গবাক্ষ দিয়া হাত বাড়াইয়া ধরিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে নগেন্দ্রে, সংজ্ঞা হইল। রাজা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণের উদ্দেশে বলিয়া উঠিলেন, "এই যে দেখিতেছি,—ইনিই নগেন্দ্রনাথ! আপনার শ্বশুরই আমাকে এই ইংরেজীজানা বাবুটীকে দিয়াছিলেন।"

ব্রাহ্মণ রোগী পাইলে চিকিৎসক হন। এখন তাঁহার অন্য কোন দিকে কাণ নাই ;—কেবল একমনে উপযুক্ত পরিমাণে জলের ছিটা বর্ষণই করিতে লাগিলেন।

রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "নগেন্দ্রবাবু! আপনার কি কোন রকম মূর্চ্ছা রোগ আছে?"

ব্রাহ্মণ রাজার কথায় বাধা দিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "থাক্ থাক্, এখন ও সব কথা থাক্।"

ব্রাহ্মণের সেবায় চেতনা লাভ করিয়া, নগেন্দ্রনাথ দেখিলেন, সম্মুখেই রাজা। মনে মনে ভাবিলেন, "আমি কি কারাবাসে বন্দী হইলাম? আমার কি পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের দশা হইল?" শেষে স্থির করিলেন, "আমি আর চক্ষু চাহিব না। চোখ বুজিয়া, অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকি। যা ঘটে, ঘটুক।"

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় নগেন্দ্রনাথ, বিপদসাগরে ভাসমান হইয়া, মূর্চ্ছার ভাণে নয়নযুগল মুদিত করিয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণের শত জল-ছিটাতেও আর তিনি চক্ষু খুলিলেন না। ঘুমন্ত মানুষকে সহজে উঠান যায়, কিন্তু যে ব্যক্তি জাগিয়া ঘুমায়, শত ডাকেও সে সাড়া দেয় না।

বর্দ্ধমান ষ্টেসনে আধ ঘণ্টা গাড়ী থামে; ক্রমে সে সময়ও উত্তীর্ণ হইয়া আসিল; তথাচ নগেন্দ্রনাথের মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল না। ষ্টেসনমাষ্টার বলিলেন, "মহারাজ! এমন রোগীকে গাড়ীতে রাখা হইতে পারে না,—যদি বলেন, উঁহাকে আপাততঃ ষ্টেসনেই নামাইয়া রাখি—রেলওয়ের ডাক্তার ডাকাইয়া, অথবা সিবিল-সার্জ্জনকে আনাইয়া উঁহার চিকিৎসা করাই।"

রাজা বলিলেন, "এই বাবুটী আমারই রাজসরকারের কর্ম্মচারী। বর্দ্ধমানে আমার একজন দেওয়ান আছেন, আমার বাসাবাটীও আছে,—সেই খানেই নগেন্দ্র বাবুকে লইয়া যাওয়া হউক, আমি ইহার উত্তম চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া যাইতেছি।"

রাজার সঙ্গে বর্দ্ধমান-রাজের এক জন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি অতি বিনীত ভাবে যোড়হাতে রাজাকে বলিলেন,—মহারাজ! যদি অনুমতি করেন, তবে রোগীকে আমি রাজবাটীতে লইয়া যাইয়া উত্তম স্থানে রাখিয়া, সহরের শ্রেষ্ঠ কবিরাজ এবং ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করাই—"

রাজা। আচ্ছা, যদি একান্তই, আপনার এ ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে রোগীকে আপনি লইয়া যাইতে পারেন।

তখন একটা খাটে শোয়াইয়া, কয়েকজন মুটে ধরাধরি করিয়া নগেন্দ্রকে স-খাট বহিয়া লইয়া চলিল। তথাচ তিনি চোখ খুলিলেন না।

এদিকে গাড়ী ছাড়ে-ছাড়ে হইল। রাজা বলিলেন, "পণ্ডিতজী! আসুন,—ফার্ষ্ট-ক্লাসে;—আপনার মুখনিঃসৃত ধর্ম্মকথা শুনিয়া সুখে রাত্রি অতিবাহিত করিব।"

ব্রাহ্মণ। (হাসিয়া) আজ না হয় থাক্!—আমি এক মাস পরে আপনার রাজ্যে উপস্থিত হইব। এ গাড়ী ছাড়িয়া যাওয়ার বিশেষ একটু অসুবিধা আছে।

রাজা। কেন? কেন?

ব্রাহ্মণ। কৈলাসচন্দ্র এখানে আছেন, উহাঁর সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হইতেছে।

রাজা। তা, কৈলাসচন্দ্রও ফাষ্ট ক্লাসে আসুন না কেন?—তিনিও আমাদের কাছে থাকিবেন।

ব্রাহ্মণ। আরও একটু অসুবিধা আছে।

রাজা। কি?—কি?—

তখন ব্রাহ্মণের চোখ ছল ছল্ করিল,—গণ্ডস্থল বহিয়া জল পড়িল!—কণ্ঠরোধ হইল।

রাজাআরও ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কি?—কি?—কি হইয়াছে, আমাকে বলুন।"

ব্রাহ্মণ ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "আমার পিতৃদেব ৺স্বর্গধামে গিয়াছেন। এক বৎসর কাল অশৌচ। কম্বলাসন আমার শয্যা। আমি কেমন করিয়া ফাষ্ট ক্লাসের নরম গদী-আঁটা বিছানায় গিয়া বসিব?—আজ গমন করুন, এক মাস পরে গিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

রাজা। পণ্ডিতজী! বলেন কি? আপনার পিতৃদেবের ৺স্বর্গপ্রাপ্তি হইল,—এ কথা কৈ আমাকে এতদিন বলেন নাই কেন?—হায়! তিনি সাধু পুরুষ ছিলেন!—আহা! তাঁর সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনে আমার একটীবার মাত্র সাক্ষাৎ হইয়াছিল। পণ্ডিতজী! তাঁর শ্রাদ্ধের সময় আমাকে সংবাদ দেওয়া আপনার উচিত ছিল।

ব্রাহ্মণ। থাক্ ও কথা—শোকের বিষয় যাইতে দিন,—অদ্য এই মধ্যশ্রেণীতে আমি কম্বলাসনেই উপবিষ্ট থাকি; কল্য প্রাতে যে কোন ষ্টেসনে হউক, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

রাজা। তাহা হইবে না।

ব্রাহ্মণ। হাসি হাসি মুখে নীরব।

রাজা আবার জোরের সহিত বলিলেন, "তাহা কখনই হইবে না—আমি আপনার সঙ্গ ছাড়িব না। আজ আমি এই গাড়িতেই থাকিব—"

ব্রাহ্মণ। এখানে থাকিলে সম্ভবত কষ্ট হইতে পারে,—

রাজা। যে ব্যক্তি ক্ষীরোদ সমুদ্রে শয়ান, সামান্য গুড় অভাবে তাহার কষ্টবোধ হয় না। সম্মুখে সুধা,—মাকাল ফল অভাবে দুঃখ কি? এখানে থাকিলে আপনার কথামৃতে আমার প্রাণ জুড়াইবে। মনের সন্তোষ থাকিলে, কাষ্ঠাসন হেতু দেহের কষ্ট হইবে কেন? আমি আজ এই মধ্যশ্রেণীতেই আপনার নিকট থাকিব।

ব্রাহ্মণ হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তবে থাকুন।"

তখন সেই রাজা, প্রথম শ্রেণীর গাড়ী ছাড়িয়া, দাস দাসী, সিপাহী শান্ত্রী, অধিক কি, অমাত্যবর্গকে ছাড়িয়া, সেই মধ্যশ্রেণীতে কাষ্ঠাসনে ব্রাহ্মণের সম্মুখে উপবেশন করিলেন। ভৃত্যগণ বিছানা বালিস লইয়া আসিল; কিন্তু রাজা তাহা গ্রহণ করিলেন না।

ভারত ঘোর নিদ্রায় অভিভূত বটে; কিন্তু আজও অস্তিত্ব হারায় নাই। গভীর সমুদ্রে ভারত নিমজ্জিত বটে, কিন্তু এখনও সংজ্ঞাহীন হয় নাই। ভারত কঙ্কালবিশিষ্ট বটে; কিন্তু এখনও প্রাণবায়ু বহির্গত হয় নাই। এখনও ধর্ম্মরক্ষক রাজা আছেন, স্বধর্ম্ম-নিরত ব্রাহ্মণও আছেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

রাজা একখানি বেঞ্চে একা উপবেশন করিলেন। তাঁহার সম্মুখের বেঞ্চে কৈলাস এবং ব্রাহ্মণ বসিলেন। গাড়ী রিজার্ভ হইল,—সে কামরায় অপর কেহ উঠিতে পারিবে ন সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হইলে, লৌহ-অশ্ব গুড় গুড় চলিতে আরম্ভ করিল।

কৈলাসের মুখে আর কথাটী নাই। তিনি জীবিত আছেন, কি মরিয়াছেন,—সহজে তাহা বুঝা যায় না। কৈলাস ভাবিতে লাগিলেন,—"এই সাধু, সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষ, সত্য সত্যই কি কমলিনীর স্বামী? এই তীক্ষ্নবুদ্ধি তেজঃপুঞ্জ-কলেবর, কঠোরব্রত, বিশুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণের সমীপে কেমন করিয়া কুলটা কমলিনী এক মুহূর্ত্তের জন্যও তিষ্ঠিতে সক্ষম হইবে? ব্রাহ্মণের এই নিষ্পাপ, নির্ম্মল করকমল,—কেমন করিয়া সেই কুক্কুরী কলঙ্কিনী কমলিনীর করদ্বয় স্পর্শ করিবে? যাহার পানে তাকাইলে, যাহার ছায়া মাড়াইলেও পাপ আছে, তাহার সহিত এই ব্রাহ্মণকুলতিলক কিরূপে একত্র সহবাস করিবে? অমৃতের ভিতর কালকূট বিষ কেমন করিয়া পশিবে? পুণ্যাত্মা দেবতা কেমন করিয়া নরককুণ্ডে ডুবিবে? বিধাতার কি এই বিড়ম্বনা?—"

যে কমলিনীর দায়ে কৈলাস পাগলপ্রায় হইয়া বিবাগী হইতেছিলেন,—যাহার জন্য পিতৃদেবকে পরিত্যাগ করিয়া, জননী জন্মভূমির কূলে কালী দিয়া কৈলাস সাহেব সাজিয়াছিলেন,—সে কৈলাসের মতি আজ এমন হইল কেন? যে কমলিনী নাম কোটী কোটীবার কলকণ্ঠে কূজন করিয়াও কৈলাস-কোকিলের তৃপ্তিসাধন হইত না;—যে নাম কৈলাসের অহর্নিশি ধ্যান, ধারণা, জপ, তপ হইয়াছিল,—যে মহিমাময় নাম-মধ্যে, তিনি রবি, শশী, তারা, গিরি, নদী, প্রস্রবণ,—অনল, অনিল, সলিল,—স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সদাই দেখিতে পাইতেন, সে নাম শুনিলে আজ তাঁহার হুঙ্কার আইসে কেন?

কেন? তাহা কেমন করিয়া বলিব? কিন্তু বাস্তবিকই কৈলাস এখন কমলিনীকে পিশাচী অপেক্ষাও অধমা দেখিলেন। বাস্তবিকই কৈলাসের বমি আসিল।

কৈলাস বালক; নবযৌবনের এই আরম্ভ। কৈলাস বুদ্ধিমান, কিন্তু বিজ্ঞ নহেন। স্কুলেই কি, আর ঘরেই কি—কৈলাস কখন শিক্ষা পান নাই। অশিক্ষিত বা অজ্ঞান পুরুষ, পশু ভিন্ন আর কিছুই নহে। চিত্ত চঞ্চল, মন তরল, দেহ দুরন্ত রিপুর বশীভূত। কৈলাসের কচি কল্পনাক্ষেত্রে হঠাৎ এক অপূর্ব্ব কল্পতরু দেখা দিল। শিক্ষা নাই—পশু; সুতরাং কৈলাস লোভ-নিবৃত্তি করিতে সক্ষম হইলেন না।

কাঁচা-কৈলাসের মনটী মাখমে গড়া, মোমে ঢালা, যে দিকে নোয়াও, সেই দিকেই নত হইবে। যে দিকে ফিরাও, সেই দিকে ফিরিবে। কুপথ সুপথ কিছুই জানে না,

বুঝে না, ভাবে না, অন্ধ; জ্ঞান নাই, তাই দেখিতে পায় না; বিদ্যুদ্বৎ চঞ্চলবুদ্ধি আছে—ঝোঁকে, দম্ভে চলিয়া যায়—কাঁটা খোঁচা বাধা বিপত্তি মানে না।

কৈলাস-পশু এখনও পাকে নাই,—তেলে জলে শিশিরে এখনও শক্ত হয় নাই!—পাকে নাই, তাই রক্ষা! পাকিলে, ভাঙ্গিত, তবু নত হইত না।—কাটিয়া টুকুরা টুকুরা কর, তাহাও সহিত, তবু নত হইত না। পিষিয়া গুঁড়া কর, ১ নং চালুনিতে চালিয়া ফাঁকি কর, তবু নত হইত না। তাই আনন্দে আবার বলি, পাকে নাই, তাই রক্ষা!!

কাঁচা-কৈলাস কুটাবৎ ভাটার টানে ভাসিয়া যাইতেছিলেন; পূর্ব্বজন্মার্জিত পুণ্য ছিল, তাই মধ্য-পথে জুয়ার আসিল।

কৈলাস আপন ঝোঁকে অনন্ত নরকে নামিতেছিলেন; সুকৃতি ছিল, আবার স্বর্গের সিঁড়ি পাইলেন।

ঝোঁক-ঝড়ে কৈলাস-নৌকা উল্‌টী-পাল্‌টী খাইল, কূলের কাছে গিয়া আবার ফিরিল।

ব্রাহ্মণের সহিত কৈলাসের যখন প্রথম কথাবার্ত্তা, সদালাপ আরম্ভ হয়, তখনও কমলিনী কৈলাসের হৃদয়মাঝারে বসিয়াছিলেন। ক্রমে কথার যতই প্রস্ফুটন হইতে লাগিল, কমলিনীকে মনোমধ্যে বহিতে কৈলাসের যেন ততই ভারবোধ হইতে লাগিল; কেমন বাধ-বাধ ঠেকিল, কেমন যেন বিরক্তি উপজিল! বাধ বাধ ঠেকুক, বিরক্তি হউক,—তখনও কিন্তু কৈলাসের একবার বিদ্যুৎচমকান-গোছ মনে হইতে লাগিল, "কমলিনী যদি একটী কথা কহেন, একবার ফিরিয়া চাহেন, তবুও কতক শ্রম সার্থক হয়, কতক জ্বালা নিবৃত্তি হয়।" কিন্তু জানি না কেন, কোন্ দৈববলে ক্রমশই কৈলাসের হৃদয়ক্ষেত্রস্থিত কমলিনী-কল্পতরু কেমন যেন শুকাইতে আরম্ভ করিল! দেখিতে দেখিতে ফুল ঝরিল, পাতা খসিল, ডাল ভাঙ্গিল, ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর, শুষ্ক হইতে শুষ্কতর হইতে লাগিল।

শেষে কৈলাস যখন শুনিলেন, কমলিনী তাঁহার গুরু-পত্নী, ব্রাহ্মণের সহধর্ম্মিণী, তখন তাঁহার হৃদয় হইতে কমলিনী-কাণ্ড সমূল উৎপাটিত হইল। শুধু তাহাই নহে, কৈলাসের হৃদয়ক্ষেত্রটাকে গোবর জল ছড়ছড়া দিয়া পবিত্র করা দরকার হইল। কৈলাস ভাবিতে লাগিলেন, "ছি ছি ছি! মহাপাপ, মহাপাপ! ইহার কি কোন

প্রায়শ্চিত্ত নাই ? কি করি, কোথায় যাই ?" কৈলাস দিব্যচক্ষে দেখিতে লাগিলেন, "কমলিনী যেন প্রেতিনী, ঠিক যেন তাড়কা রাক্ষসী ! কমলিনীর আর কুন্দকলিবৎ দন্ত নাই, করাল কাদম্বিনীবৎ কেশকলাপ নাই, "নিন্দি-ইন্দীবর" নয়ন নাই, কেশরী জিনিয়া কটীতট নাই,—গমনে মরাল, বাহুতে মৃণাল, কণ্ঠেতে কোকিল আর লজ্জা পায় না।" কৈলাস তখন দেখিতে পাইলেন, "কমলিনীর রাঙ্গা বাঙ্গা, তামার বরণ, গোল গোল চোখ দুটা যেন অগ্নিবৃষ্টি করিতেছে।—ঝাঁজে কাছে এগোয় কে ? হাঁ-করা, চেপ্টা, মুখটা যেন আঁ-আঁ শব্দে ব্রহ্মাণ্ড গিলিতে আসিতেছে ! আধ হাত লম্বা, চাকা চাকা, ধারালো, ছুঁচালো দাঁতগুলা যেন পাহাড় চর্ব্বণ করিতে উদ্যত হইয়াছে ! কালো কালো, ফুলো ফুলো অধর-ওষ্ঠে সাদা সাদা কৃমি-কীট কিলি কিলি করিতেছে। আর তাহার সর্ব্বাঙ্গ-ময় পচা, ধসা, গলা, ঘায়ে পুঁজ, রক্ত, পোকা বজ্ বজ্ করিতেছে,—দুর্গন্ধে মহীতল মাৎ হইয়া উঠিতেছে !" কৈলাসের বমি আসিল।

সৎসঙ্গই স্বর্গ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

রাজা, ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "পণ্ডিতজী ! নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে আপনার এত আলাপ কবে হইতে হইল ? উঁহার হাত ধরিয়া এত কথা, এত হাসি কেন হইতেছিল ?"

ব্রাহ্মণ মৃদুমন্দ হাসিয়া বলিলেন, "আলাপের আরম্ভ এবং শেষ—সমস্তই এই গাড়ী মধ্যে।—থাক্ সে কথা।" (কৈলাসকে দেখাইয়া,)—"ইহাঁর সঙ্গে শাস্ত্রালাপ হইতে-ছিল,—মায়ার কথা হইতেছিল।"

রাজা। উত্তম কথা !

ব্রাহ্মণ। কথা উত্তম বটে ; কিন্তু বুঝা বড় কঠিন। প্রকৃত পণ্ডিত, প্রকৃত অনুভব-শীল ব্যক্তি ব্যতীত, এ সব গূঢ়তত্ত্ব কেহই বুঝিতে সক্ষম নহেন।

রাজা। সে কথা-ত বটেই !

ব্রাহ্মণ। বিশেষ, আমার এখন শিক্ষার অবস্থা ;—আমি নিজে শিক্ষার্থী, কৈলাস-চন্দ্রকে শিক্ষা দিব কেমন করিয়া ?—আর একটা কথা ; শাস্ত্র-বিচার এরূপ ভাবে গাড়ীতে বসিয়া হয় না।—কত অসংলগ্ন, অপ্রাসঙ্গিক কথা আসিয়া পড়ে।

রাজা। পণ্ডিতজী! ঠিক্ ঠিক্!—আমরা নিতান্ত অনভিজ্ঞ,—তাই শাস্ত্রকথা শুনিতে মন বড় ব্যাকুল হয়। সেই ৺ শ্রীবৃন্দাবনধামে আপনার মুখে শেষবার শাস্ত্রকথা শুনিয়াছিলাম, তারপর আর অনেক দিন শুনি নাই। পণ্ডিতজী! মনে আছে কি? একবার রাজসভায় সাত দিনকাল বেদান্তদর্শনের কথা লইয়া বিচার হয়। আপনার জয় হয়।

ব্রাহ্মণ। (হাসিয়া) আজও সেই বেদান্তদর্শনের কথা। আজও সেই সুখ দুঃখের কথা লইয়া মায়ার কথা উঠিয়াছে।

রাজা। পৃথিবী যে অনিত্য, সমস্তই কল্পিত, কাহারও অস্তিত্ব নাই,—ইহা আমি বুঝিব কেমন করিয়া ?

ব্রাহ্মণ। কেন ?—ইহা ত বুঝা সহজ। শাস্ত্রে বিশ্বাস থাকিলেই সব বুঝিবেন। শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, সকলেই,—জগতের মিথ্যাত্ব একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা আর উত্তম প্রমাণ কি আছে ?

রাজা। শাস্ত্রে আমার বিশ্বাস আছে ; বুঝিলাম সবই মিথ্যা, কেবল একই সত্য। কিন্তু উপলব্ধি ত কিছুই করিতে পারি না,—ইহাই দুঃখ। বৃক্ষ, নদী, পর্ব্বত, বাড়ী,—যাহা সদাই দেখিতেছি, স্পর্শ করিতেছি, তাহা মিথ্যা, অস্তিত্বহীন, কেমন করিয়া বলিব ?

ব্রাহ্মণ। যখন জ্ঞান জন্মিবে, তখন প্রত্যক্ষ দেখিবেন,—বুঝিবেন, অনুভব করিবেন—সংসার শূন্যাকার! এখন আপনি অজ্ঞান—অন্ধ—দেখিবেন কেমন করিয়া, বুঝিবেনই বা কেমন করিয়া ? পাগল ব্যক্তি মনে মনে কল্পনা করে, আমি রাজা, আমি যোদ্ধা, আমি এত লম্বা যে, হাত বাড়াইলে স্বর্গ পাই ; কিন্তু যতক্ষণ তার সেই পাগল-রোগ থাকে, ততক্ষণ তাহাকে কিছুতেই বুঝান যায় না যে, সে রাজাও নয়, যোদ্ধাও নয়, লম্বাও নয়। আমাদের গ্রামে একজন দরিদ্র কায়স্থসন্তান একবার পাগল হইয়াছিল। তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, শ্রীমতী ভিক্টোরিয়া তাহাকে ভারতের প্রতিনিধির পদ

দিয়াছেন। সে এই হিসাবে প্রতিদিন প্রাতে দপ্তরখানা পাড়িত, অনেকরূপ হিসাবপত্র লেখাপড়া করিত,—কোন খাতায় লিখিত, "সৈন্যাধ্যক্ষ! তোমাকে আজ্ঞা দিলাম, আজ তুমি দশ হাজার সৈন্য লইয়া, কাবুল গমন কর;" কখন লিখিত, "হে পূর্ত্তসচিব! সীমলা পর্ব্বতে এক কোটী টাকায় আমার দেলখোস বাগ তৈয়ারি কর" কখন গ্রামস্থ কোন লোকের নামে দিত, "আজ তোমাকে বগুড়ার জজ করিলাম।" কাহাকেও বা ডাকিয়া বলিত "তোমাকে হিজ্‌লি-কাঁথির দারোগা করিলাম,—আজই রওনা হইও।" পাগল মহা আনন্দে দিন অতিবাহিত করিত। সেবা-শুশ্রূষায়, শেষে যখন সে আরাম হইল—তখন দেখিল, কেবল চালাঘর আর ছেঁড়া মাদুর বিদ্যমান। যেই জ্ঞান জন্মিল, অমনি বড়লাটগিরি ঘুচিল। সব মিথ্যা দেখিতে পাইল। পরম জ্ঞান জন্মিলে, সেইরূপ আপনিও দেখিতে পাইবেন—সবই মিথ্যা—সম্বল কিছুই নাই,—সম্বল কেবল একমাত্র নন্দের নন্দন শ্রীহরি।

একটা স্থূল কথা বুঝুন, যাত্রার দলে কেহ রাজা, কেহ প্রজা সাজে; কেহ মন্ত্রী, কেহ বাঁদর সাজে; কেহ মুনিগোঁসাই, কেহ মেথরাণী সাজে,—আপনাপন নির্দিষ্ট অংশ অনুযায়ী সকলেই কর্ম্ম করে, রঙ্গভঙ্গ করে। যাত্রা অবসানে সাজ খুলিয়া দেখে, রাজাও নাই, মন্ত্রীও নাই, বাঁদরও নাই, মেথরাণীও নাই—সব মিথ্যা,—সবই ভেল্কী,—সবই ভুয়াবাজী।—হরি রক্ষা কর—হরিবোল, হরি বোল—হরি!!

রাজা। জ্ঞান জন্মিলে কি প্রকৃতই দেখিতে পাইব,—সবই মিথ্যা?—তখন কি বুঝিতে পারিব,—রাজ্য, বাড়ী, পাহাড়, পর্ব্বত, সবই কিছুই নয়?

ব্রাহ্মণ। রাজ্য, বাড়ী, পাহাড়, পর্ব্বত যে কিছুই নয়—তাহা'ত এখনই বুঝা যায়। কিন্তু রাজ্য ঘর দ্বার সংসার যে কিছুই নয়, তাহা বুঝিয়া সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া ঠিক তদনুযায়ী কার্য্য করা, সেই দিব্যজ্ঞান ব্যতীত, কিছুতেই সম্ভবে না।

রাজা। এই রাণীগঞ্জের পাহাড়টা যে কিছুই নহে, তাহা আমি কেমন করিয়া বুঝিব? আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক বুঝাইয়া দিন।

ব্রাহ্মণ। প্রলয়ে পৃথিবী জলমধ্যে বিলীন হয়। সেই জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ মনেতে, মন বুদ্ধিতে, বুদ্ধি অহঙ্কারে, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব মায়াতে এবং মায়া পরমাত্মাতে লয়প্রাপ্ত হয়। আবার সৃষ্টিকালেও ঐ ভাব,—পরমাত্মা

হইতে মায়া, মায়া হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে মন, মন হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। প্রলয়কালে সমস্তই সঙ্কুচিত হইয়া সূক্ষ্ম ভাবে, কারণরূপে পরমাত্মায় লীন হইয়া থাকে, সৃষ্টিকালে সমস্তই বিকাশ হইয়া বিস্তাররূপে দৃষ্ট হয়।

রাজা। কঠিন তত্ত্ব। মন কি, বুদ্ধি কি, অহঙ্কার কি, আত্মা কি, পরমাত্মা কি,—এসব বিষয় না বুঝিলে আমি কেমন করিয়া সৃষ্টি প্রকরণ বুঝিব?

ব্রাহ্মণ। এ বিষয় এখন বুঝাইবার সময় নহে এবং আপনার বুঝিবারও কাল নহে। এখন বুঝাইতে আরম্ভ করিলে, রাত্রি পোহাইয়া যাইবে,—অপিচ সাত দিনেও শেষ হইবে কি না সন্দেহ। আপনার গুরু যিনি আছেন, তাঁহাকে ডাকিয়া এসব তত্ত্ব বুঝাইয়া লইবেন। গুরুর শরণাগত হইলে, তিনি অবশ্যই রহস্য ভেদ করিয়া দিবেন।

রাজা। তাহাই হইবে।

ব্রাহ্মণ। এই সৃষ্টিতত্ত্ব উত্তমরূপ বুঝিলে, আপনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন,—এ সংসারে সবই মিথ্যা, কেবল একমাত্র পরমব্রহ্মই সত্য।

রাজা সৃষ্টিতত্ত্বই,বুঝিলাম না,—তবে, একমাত্র পরব্রহ্মই সত্য, আর সব মিথ্যা—একথা কেমন করিয়া বুঝিব?

ব্রাহ্মণ (হাসিয়া) আচ্ছা, তবে মোটামুটি এই কথাটা বুঝুন;—যে যে পদার্থ বিকারের মধ্যে গণ্য, তৎসমস্তই বাস্তবিক পক্ষে মিথ্যা পদার্থ,—অর্থাৎ কিছুই নহে। এই যে আমি থান কাপড় খানি পরিয়া আছি, ইহা কি সত্য পদার্থ? কখনই নহে। কাপড় কিছুই নহে,—কেবল সূত্রসমূহের একত্র সংস্থান মাত্র। সূত্রও কিছুই নহে—তূলার বিকার মাত্র। আবার দেখুন, তূলার উৎপত্তি কার্পাস হইতে। সুতরাং তূলার পক্ষে কার্পাসই সত্য পদার্থ। কিন্তু কার্পাসও কিছুই নহে—উহা কেবল মৃত্তিকার বিকার মাত্র! এতক্ষণে বুঝিলাম, কাহারই বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই, কিছুই সত্য নহে,—কেবল মৃত্তিকাই একমাত্র সত্য। যদি আর একটু চিন্তা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে বুঝিবেন, মৃত্তিকাও মিথ্যা, মৃত্তিকারও বাস্তবিক সত্যতা ঘটে না,—পরমাণুরাশির একত্র সন্নিবেশকে মৃত্তিকা বলা যায়। আবার পরমাণু রাশি যখন উৎপন্ন পদার্থ, একটা 'কথার' কথা মাত্র

বাস্তবিক কোন পদার্থই নহে।—যে বস্তু হইতে পরমাণুরাশির বিকাশ হয়, তাহারই একটা নামান্তর মাত্র "পরমাণু"। ঘট বলিয়া যে জিনিস ব্যবহৃত হয়, উহা যেন মৃত্তিকাখণ্ড হইতে পৃথক্ বস্তু,—ইহাই অনেকের ধারণা। কিন্তু বাস্তবিক তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে, ঘটকে কি মৃত্তিকা হইতে অতিরিক্ত কোন পদার্থ বলিয়া নির্ণয় করা যায়? কখনই নহে। মৃত্তিকারই অবস্থা-বিশেষকে ঘট কহে। এই যে সুরম্য হর্ম্ম্য—তাহাও মৃত্তিকা। এক একখানি ইট বসাইয়া দালন হয়,—চুণ সুর্‌কিতে ইট গাঁথা হয়,—কিন্তু সেই ইট, চুণ এবং সুর্‌কি—এই ত্রিবিধ পদার্থই মৃত্তিকার বিকার ভিন্ন আর কিছুই নহে!—মহারাজ! এ সংসার সব মাটী, সব মাটী!!

রাজা। বড়ই জ্ঞানগর্ভ কথা!

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! যদি ভাবিয়া দেখেন, তাহা হইলে বুঝিবেন, এই জড় দেহটাও মাটী। মাথায় চেরা সিঁথি না কাটিলে যে দেহের সুখ হয় না, আঙ্গুলে হীরক-অঙ্গুরী না পারিলে যে দেহের সুখ হয় না, দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় শয়ন না করিলে যে দেহের সুখ হয় না,—মহারাজ! দেহাভিমানীর সে দেহটা আর কিছুই নহে, কেবল মাটী, কাদা, পাঁক মাত্র। দেহ কি?—ইহা অস্থি, মাংস, মজ্জা, মেদ, নাড়ী প্রভৃতির সমষ্টি স্বরূপ একটা যন্ত্র মাত্র। আর একটু সূক্ষ্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে দেখিবেন,—ঐ যন্ত্রটাও অন্ন, ব্যঞ্জন, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি কতকগুলি ভুক্ত পীত দ্রব্যের একটু রূপান্তর ব্যতীত, আর কিছুই নহে! লোকে যে সকল দ্রব্য আহার করে, সেই সকল দ্রব্যই নানাপ্রকার কৌশল ও ক্রিয়া দ্বারা কিছুদণ্ড পরে দেহের অস্থি ও মাংসাদি আকারে পরিণত হয়। অতএব দেহ সম্বন্ধে সেই অন্ন ব্যঞ্জনাদি পদার্থই সত্য, আর অস্থি মাংসাদির সমষ্টির দেহটা মিথ্যা। তবে কি না, কথাবার্ত্তা ও ব্যবহারের সুবিধার নিমিত্ত, একটু অবস্থান্তরে পরিণত সেই অন্ন ব্যঞ্জনাদি দ্রব্যগুলিকেই "দেহ" বলিয়া একটা সংজ্ঞা বা নাম দেওয়া যায়। বাস্তবিক, দেহটা সেই দাইল তরকারি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

রাজা। পণ্ডিতজী! আপনার মুখ-নিঃসৃত এই পরমতত্ত্ব শুনিয়া আজ আমার যে কি অপার আনন্দ হইতেছে,—তাহা আমি এক মুখে বর্ণন করিতে অক্ষম।

ব্রাহ্মণ। আবার দেখুন, দাইল, তরকারিও মিথ্যা,—কারণ উহারা মাটীর বিকার

মাত্র। সেই শুশুনি, কল্মীশাক্—পুকুর ধারে পাঁকে জন্মে,—একহাঁটু জলকাদার উপর ধান জন্মে,—অতএব এই দেহটা কাদা পাঁক ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে শরীরের তুমি এত দম্ভ অভিমান কর, তাহা কাদা ও পাঁকের বিকার মাত্র। হায়! লোকে, মাটী, কাদা, পাঁক পাইয়া, এত অভিমান করে কেন? এই যে কল্পনাপ্রিয় কবিগণ যুবতী নায়িকার রূপবর্ণন কালে বলিয়া থাকেন, "পদ্মিনীর মুখ, পদ্মের সৌরভে অলিকুল আসক্ত হইয়া ঝঙ্কার দিতেছে; সুন্দরীর অধর-পল্লব-বিনিঃসৃত হাসিতে সুধা ক্ষরিতেছে; বিশালাক্ষীর বঙ্কিম হরিণ-নয়নে কোটী কাম বিমোহিত হইতেছে; প্রসন্নময়ীর পীনোন্নত পয়োধরভারে কটীতট ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে;—"এসব কথা কি?—ইহা নিতান্ত অলীক,—রজ্জুকে সর্প কল্পনা মাত্র। মায়ায় মুর্খেরই মন ভুলিয়া থাকে; যিনি প্রকৃত পণ্ডিত—তত্ত্বজ্ঞানী, তিনি মহামায়ার অপূর্ব্ব কৌশলময় রাজ্য-বিস্তৃতি দেখিয়া কেবল হাস্য করেন।

রাজা গদ্‌গদচিত্তে ব্রাহ্মণের উপদেশ-সুধা কর্ণ দ্বারা পান করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ আরও স্ফূর্ত্তির সহিত বলিতে আরম্ভ করিলেন, "মহারাজ! দেখুন—কত কত কামুক পুরুষ, পরকীয়া সুন্দরীর কঠোর কুচকুম্ভ কামনায় জীবন বিসর্জ্জন দিতেছে—অধরের অমিয় লালসায় ঠিক পাগলবৎ পরিভ্রমণ করিতেছে, চারুচক্ষের একটী বার বাঁকা চাহনির জন্য দিবারাত্রি কেবল ছটফট্, আইঢাই করিতেছে!—কিন্তু সেই মূঢ় ব্যক্তি একটীবারও ভাবে না যে, সে, এ পণ্ডশ্রম কেন করিয়া মরে? বিষয়টা কি,—যাহার জন্য এত উৎসর্গ-প্রাণ? সামান্য মাংসসমষ্টির জন্য—শরীরপাত! এত অশান্তি, এত লাঞ্ছনা,—এত যন্ত্রণা!—ছি ছি ছি! স্তনদ্বয়কে কঠিন প্রস্তরের সহিত, হিমগিরির সহিত তুলনা করিয়া কল্পনা-বলে মনে মনে এক মহা ছবি আঁকা হয়! কেন বাপু?—যদি পাহাড় পাইলেই এত সুখ হয়, তবে হিমাচল-শৃঙ্গে গিয়া বারমাস বাস কর না কেন? চোখই কি, নাকই কি, কাণই কি, সমস্তই—কেবল এক একটু মাংস মাত্র,—সেই শাক, দাইল, ভাতের বিকার মাত্র,—সেই কাদা, পাঁক, মাটীর গঠন মাত্র?—বল দেখি, সেই ভটভটে, দুর্গন্ধময়, পচা পাঁকের জন্য তুমি এত অধীর হও কেন?—একটু তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেই,—গুরুর নিকট একটু উপদেশ পাইলেই,—তুমি সমস্তই বুঝিতে পারিবে,—সংসারের জ্বালা যন্ত্রণার হাত হইতে এড়াইবে। তখন দেখিবে, সে অধর-পল্লবও নাই, কুচ-কুম্ভও নাই, কুন্দ-দন্তও নাই, হরিণ-নয়নও নাই, মুখ-চন্দ্রও

নাই,—আছে কেবল রক্ত মাংস শিরা! আরও একটু ভাবিলে দেখিবে,—আছে কেবল কাদা আর মাটী!—আরও ভাবিলে, দেখিবে—আছে কেবল পরমাণু আর পরমাণু!—আর, যদি তোমার আরও ভাবিবার শক্তি জন্মিয়া থাকে, যদি অবিদ্যা নাশ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বশেষে দেখিবে,—সংসারে আর কিছুই নাই,—রবি শশী গ্রহ তারা নাই,—মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ নাই,—নদ নদী হ্রদ সাগর নাই,—গিরিগুহা বন প্রস্রবণ নাই, আছেন কেবল সেই এক শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী শ্রীনন্দের নন্দন শ্রীহরি।—মহারাজ! উৎপত্তি এবং বিনাশবিশিষ্ট পদার্থের বাস্তবিক অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতা থাকিতে পারে না। কিন্তু মহামায়ায় মুগ্ধ হইয়া আমরা বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া লইতেছি মাত্র। ভ্রান্তি দৃষ্টিতে, মৃগ-তৃষ্ণায় প্রতীয়মান জল যেরূপ মিথ্যা পদার্থ, অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে বৃক্ষাদিতে প্রতীয়মান ভূত প্রেতাদি যেরূপ মিথ্যা পদার্থ, সেইরূপ ঘরবাড়ী দ্বার, স্বজন, সংসার, স্ত্রী পুত্র পরিবার সমস্তই মিথ্যা পদার্থ! কিছুই নাই, কিছুই নাই, কিছুই নাই!—একবার হরি হরি বল!

ব্রাহ্মণ, রাজা এবং কৈলাস,—তিন জনেই সমস্বরে, উচ্চকণ্ঠে তিনবার বলিয়া উঠিলেন,—

হরি হরি বল! হরি হরি বল! হরি হরি বল!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কৈলাসচন্দ্রের কথা কহিবার আর সামর্থ্য নাই; কেমন যেন বিভীষিকা লাগিয়াছে, কেমন যেন দিশাহারা হইয়াছেন;—তাঁহার কেমন যেন আছি, আছি, নাই-নাই, থাকি-থাকি, যাই-যাই ভাব হইয়াছে।

কিন্তু ব্রাহ্মণ যখন বলিলেন, 'সকলে একবার হরি হরি বল'—বোবা কৈলাস তখন আর নীরব থাকিতে পারিলেন না,—কেমন একটা দৈবশক্তি আসিয়া তাঁহাকে উত্তেজিত করিল, জিহ্বার জড়তা ঘুচিল;—তাই কৈলাসও উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—

হরি হরি বল।

অঙ্গের ত্বক্ পুড়িতেছে, কি হাড় কন্‌কন্ করিতেছে, কি প্রাণটা বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে,—কৈলাস ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কৈলাস ভাবিতে লাগিলেন, "আমি কি তুষানলে ধিকি ধিকি পুড়িতেছি ?—তুষানলের কি এতই যন্ত্রণা ?—তাহা কখন হইতে পারে না। শত তুষানলেও এ মর্ম্মভেদী যাতনা, হয় কি না সন্দেহ। বিষাক্ত ছুরিতে আমার প্রত্যেক হাড় চিরিয়া, তাহাতে কি কেহ নুন টিপিয়া টিপিয়া দিয়া, তদুপরি লঙ্কা বাঁটিয়া প্রলেপ দিতেছে ?—তাহাতেই বা এত বেশী জ্বালা হইবে কেন ? তবে কি কেহ আমার বক্ষ বিদারণ করিয়া সজোরে হৃদিমূল টানিয়া উপাড়িবার উপক্রম করিতেছে ?

"কিন্তু কৈ ?—কেহ ত কিছুই করে নাই ! তবে কি আমি স্বপ্ন দেখিতেছি ? তবে কি আমি ঘুমের ঘোরে পড়িয়া এই বিভীষিকায় আতঙ্কিত হইতেছি ? তবে কি আমি দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় দিশাহারা হইয়াছি ?—তবে কি আমি এখানে নাই ?—তবে কি এই গাড়ী মিথ্যা, রাজা মিথ্যা, ব্রাহ্মণ মিথ্যা ?—এই কথাবার্ত্তা মিথ্যা, এই অঘটন ঘটনা মিথ্যা ?

"যদি স্বপ্নই হয়,—একবার জাগি না কেন ? ঘুম ভাঙ্গিলেই সব ঘোর ঘুচিবে ! নিদ্রা হইতে উঠিয়া ব্রাহ্মণের গায়ে একবার হাত বুলাইয়া দেখি না কেন, ব্রাহ্মণ এখানে আছেন কি না ?

"কিন্তু জাগিব কেমন করিয়া ?—জাগিয়াই ত আছি ?—এই ত চক্ষু চাহিলাম ;—এই ত গাড়ী, রাজা, ব্রাহ্মণ সকলকেই দেখিতে পাইলাম,—সকলেরই ত অস্তিত্ব উপলব্ধি করিলাম,—সকলেই ত ঐ রহিয়াছেন। তবে ইহাকে আর স্বপ্ন কেমন করিয়া বলিব ?

"না,—স্বপ্নই বটে ! মানুষ স্বপ্নে জাগে, স্বপ্নে দেখে, স্বপ্নে শুনে, স্বপ্নে কথা কয় ! আমি বোধ হয় সেইরূপই স্বপ্নে অভিভূত হইয়াছি। স্বপ্নে কখন কখন ভূত আসিয়া, বুকের উপর হাঁটু দিয়া, বুক চাপিয়া ধরে ! তাই বা আজ ধরিল ? তাই বুঝি প্রাণটা যায় যায় হইয়াছে ?

"আচ্ছা, তবে কি হাবড়া ষ্টেসনে আমার টীকিট কেনাও মিথ্যা ? ব্রাহ্মণকে ধাক্কা দেওয়া, বৃদ্ধাকে তাড়াইয়া দেওয়া, পোষাক খুলিয়া পৈতা বাহির করা—এ সবই কি মিথ্যা ?—এ সবই কি স্বপ্নের ভিতর ? স্বপ্নের আরম্ভ কোথা হইতে ? আরম্ভটা হাবড়া-

ষ্টেসনে, না কলিকাতার বাসায়? কলিকাতায় যখন মিষ্টার ঘোষের বাসায় সাহেবী-পোষাকে সাহেব সাজিলাম, মুখে পাউডার মাখিলাম,—পাছে বাঙ্গালি বলিয়া কেহ ধরিয়া ফেলে, এই ভয়ে যখন ঘোষের নিকট ইংরেজী-সুর শিখিলাম, যখন ইংরেজী-ধরণে বাঁকা-চলন শিখিলাম, যখন ইংরেজী-মতে দাঁত বাহির করিয়া, হুমুকী দিয়া, কালা বাঙ্গালীকে তাড়াইবার কৌশল শিখিলাম,—তখনই ইকি আমার এ স্বপ্নের আরম্ভ? না,—এই স্বপ্নের আদিম নিবাস হুগলী?—পিতা যে আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করিয়াছেন,—আমার আর মুখ দেখিবেন না বলিয়াছেন,—তাহাও কি স্বপ্ন? নবঘনশ্যাম নন্দীকে প্রহার, বীরেশ্বর বাবুর বিচার, ব্রাহ্ম-স্কুল-বালকমণ্ডলীর অনাচার—এসব ব্যাপ্যারও কি এই মহাস্বপ্নের অন্তর্গত? আর সেই ডেপুটী-কন্যা কমলিনীর সহিত আমার সেই ভাব, ভালবাসা, আলাপ, প্রণয়, পরিত্যাগ, বিচ্ছেদ,—ইহাও কি স্বপ্ন? সেই পাপীয়সী, প্রেতিনী, পিশাচীর পানে, সেই কুলটা কমলিনীর পানে তাকাইলেও যে আমার এখন বমি আসে, অন্নপ্রাশনের অন্ন পর্য্যন্ত উঠিয়া পড়িবার উপক্রম হয়,—ইহাও কি স্বপ্ন? তবে কি আমি সত্য সত্যই অনন্ত স্বপ্নসাগরে ডুবিয়া গিয়াছি?—আর কি উঠিব না, জাগিব না, চক্ষু মেলিয়া চাহিব না?—আর যে বাঁচি না, চক্ষু চাহিতে পারি না!—প্রাণ যে যায়!—বুঝি আজ ঘোর আবর্ত্তময়, তরঙ্গ-সঙ্কুল, স্বপ্ন-মহাসমুদ্রে হাবুডুবু খাইয়া, দম আটকাইয়া, বিগত-প্রাণ হইলাম!

"না,—স্বপ্ন কেন? ঐ যে রাজা ঐ যে ব্রাহ্মণ—উভয়েই উপবিষ্ট রহিয়াছেন? ঐ যে উভয়েই পরমানন্দে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। তবে আমি একবার উঠিয়া দাঁড়াই; চলিয়া ব্রাহ্মণের নিকট যাই,—ব্রাহ্মণের চরণ-যুগল স্পর্শ করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লই। হাতে ধূলা লাগিলে, নিশ্চয় বুঝিব, ইহা স্বপ্ন নহে,—ঘটনা নিতান্ত প্রকৃত!

"তবে এই উঠিলাম। আচ্ছা, আমার এই গমন, পদরজ গ্রহণ, আর ধূলার চিহ্ন,—এ সমস্তই যদি স্বপ্ন হয়, তখন আমি কি করিব?—তবে যাইয়া লাভ কি?

"তবে কি আমি পাগল হইলাম?—আমি কি?"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

রাজাও সংশয়-দোলায় দোদুল্যমান। যদি সবই মিথ্যা, তবে আর বৃথা রাজ্যভার বহি কেন? এত জ্বালা-যন্ত্রণা সহি কেন?—তবে এই তীর্থপর্য্যটনই বা কিসের জন্য? শাস্ত্রপাঠ, উপদেশ-শ্রবণ, নাম-সঙ্কীর্ত্তন, পূজা, সেবা, আরাধনা—এই সবই বা কিসের জন্য? আমি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া গহন গিরি-গুহায় বসিয়া, অহরহঃ কেবল ঈশ্বরের নাম জপ করি না কেন?

রাজা এইরূপ নানা কথা ভাবিয়া ভাবিয়া, শেষে হঠাৎ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসিলেন,—"পণ্ডিতজী! যদি সবই মিথ্যা, তবে কি আমিও মিথ্যা!"

ব্রাহ্মণ হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, "এই নিমিত্তই ঋষিগণ, প্রকৃত অধিকারী ব্যতীত, যখন তখন, যাঁকে তাঁকে, শাস্ত্রকথা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ আপনার মনোমধ্যে নানারূপ সন্দেহ উঠিয়াছে। আপনি হয় ত মনে করিতেছেন, যদি সবই মিথ্যা, তবে এত ক্রিয়াকর্ম্মে, ধ্যানধর্ম্মে প্রয়োজন কি? বোধ হয়, সর্ব্বশেষে আপনি এইরূপ ভাবিয়াছেন, যদি সবই মিথ্যা, তবে'ত আমিও মিথ্যা,—যদি আমিই মিথ্যা হইলাম, তবে'ত আমার ক্রিয়াকর্ম্মও মিথ্যা হইবে!

রাজা। ঠিক কথা!—পণ্ডিতজী! আমি ইহাই ভাবিতেছিলাম।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! শুনুন,—আপনি এবং আপনার দেহ স্বতন্ত্র পদার্থ। দেহটা কিছুই নহে, কিন্তু আপনি অর্থাৎ আপনার আত্মাই সত্য। সুতরাং আপনি এমন কথা প্রশ্ন করিতে পারেন না, "তবে কি আমিও মিথ্যা?" আপনি, আমি এবং সংসারের সমস্ত প্রাণীই সত্য, নিত্য, অক্ষয়। এই দেহোৎপত্তির পূর্ব্বেও আমরা ছিলাম, ভবিষ্যতেও থাকিব এবং এখনও আছি। কারণ, আত্মা অবিনশ্বর,—আত্মার জন্ম, মৃত্যু, জরা, বার্দ্ধক্য কিছু নাই। মৃত্যুতে দেহেরই পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, আত্মার কিছুই হয় না। দেহটা জুতা তুল্য,—ছিঁড়িলেই, আত্মা, নূতন জুতা পরিগ্রহ করেন। মহারাজ! বুঝিলেন কি?—এই দেহের জন্য, এই ছেঁড়া জুতার জন্য, আমরা কি না করিয়া থাকি?

রাজা। পণ্ডিতজী! বলুন, বলুন,—আপনার মুখে শাস্ত্রতত্ত্ব বড়ই মিষ্ট লাগে।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! বেদে দ্বিবিধ নিষ্ঠার কথা উক্ত হইয়াছে,—একটী জ্ঞান-নিষ্ঠা,

অপরটী কর্ম্ম-নিষ্ঠা। ব্রহ্ম-নিষ্ঠা বা জ্ঞান-নিষ্ঠা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা বিবেকজ্ঞান-সম্পন্ন, যাঁহারা সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, যাঁহারা পরমহংস পরিব্রাজক, যাঁহারা একমাত্র আত্মারাম, তাঁহাদের পক্ষেই জ্ঞান-নিষ্ঠা। আর, আপনার আমার পক্ষে কর্ম্মনিষ্ঠাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কারণ, নিষ্কাম-ভাবে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে, পুরুষ কখনই জ্ঞান-নিষ্ঠায় অধিকারী হয় না। আগে কর্ম্ম, পরে জ্ঞান। যাঁহার তত্ত্বজ্ঞানের সম্যক্ পরিস্ফুরণ হয় নাই, তিনি কখনই বিহিত-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারেন না; যিনি জোর করিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহার কখনই সিদ্ধিলাভ হয় না। কর্ম্ম দ্বারাই জ্ঞানলাভ হয়। নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে করিতেই ক্রমে বুদ্ধি বিশুদ্ধ হয়, তত্ত্বজ্ঞান-গ্রহণের উপযুক্ত হয়,—তৎপরে তিনি জ্ঞাননিষ্ঠায় অধিকারী হন। আপনি কিংবা আমি, যদি এখন উঠিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া, পাহাড়ের উপর বসিয়া থাকি, তাহা হইলে নিতান্ত পাগলের মত কার্য্য করা হইবে,—পাগলের সাধনায় কখন সিদ্ধিলাভ হয় না। একটু বসি ভাবিয়া দেখেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন, তত্ত্বজ্ঞান না জন্মিলে আদৌ ক্রিয়াপরিত্যাগই সম্ভবে না;—যতক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার আত্মা, মন হইতে সমস্ত কামনা নিঃশেষরূপে পরিত্যাগ করিতে সক্ষম না হইবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ক্ষণকালের নিমিত্তও আপনার নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকা চলে না। আপনি বাহিরে বাহিরে বহুকষ্টে হস্তপদাদির ক্রিয়া না হয় বন্ধ করিলেন, কিন্তু অন্তরে অন্তরে আপনাকে কোন না কোন কার্য্য করিতেই হইবে। মহারাজ! এ অবস্থায় হঠাৎ আপনি সন্ন্যাসী সাজিয়া কি করিবেন? ভগবান, অর্জ্জুনকে কি সুন্দর অপূর্ব্ব কথাই বলিয়াছেন,—

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥
নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্ম্মণঃ॥
যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥

যে ব্যক্তি বাহিরে বাহিরে, লোক-দেখানে-গোছ পরমহংস হয়,—যে ব্যক্তি মাথায় এক হাত লম্বা টীকিটী রাখিয়া, নাকে দীর্ঘচ্ছন্দে তিলকটা কাটিয়া, পৈতাগাছটা ধোপা-বাড়ী হইতে কাচিয়া আনিয়া, রেশমের চিক্‌চিকে নামাবলী গায়ে দিয়া, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হয়, সে ব্যক্তি নিতান্ত কপটাচারী। তাই ভগবান্ বলিতেছেন, যে ব্যক্তি হস্ত-পদ-শিশ্নাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল বাহিরে সংযত করিয়া, মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয়-গুলি নিয়তই স্মরণ করিতে থাকে, সেইরূপ বিমূঢ়াত্মা ব্যক্তিকে মিথ্যাচার বা কপটাচার বলা হয়। আর যিনি কামনা-জয়ের দ্বারা, মনে মনে ইন্দ্রিয়গণকে আয়ত্ত করিয়া, অনাসক্তভাবে কেবল বাহিরেই কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিহিত-কর্ম্ম করিয়া থাকেন, হে অর্জ্জুন! তিনিই শ্রেষ্ঠ। অতএব তুমিও ফল-কামনাশূন্য হইয়া, আপনার জাত্যুচিত যে কর্ম্ম বিহিত আছে এবং যাহা, নিত্য ও নৈমিত্তিক, অর্থাৎ কাম্য নহে, সেই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। তোমার ন্যায় অধিকারীর পক্ষে কর্ম্ম-পরিত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্ম করাই শ্রেষ্ঠতর কল্প। বিশেষত, তুমি যদি হস্তপদাদি সমস্ত বাহেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াই একবারে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমার শরীর-যাত্রা কিরূপে চলিবে? উক্তরূপে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তাহার কর্ম্মফল-স্বরূপ সংসারবন্ধন হয় না, (কারণ নিষ্কামভাবে কেবলমাত্র ঈশ্বরার্থ যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তদ্ব্যতীত অন্য কর্ম্ম দ্বারাই অর্থাৎ কামনামূলক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই লোকের সংসারবন্ধন হইয়া থাকে) অতএব হে কৌন্তেয়! তুমিও, সমস্ত কামনা বা আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কেবল ঈশ্বরার্থেই বিহিত ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করিতে থাক। কিন্তু ঈশ্বরের প্রীতিতেও যেন তোমার কামনা থাকে না; কেননা, তাহা হইলেও তোমার সকাম ক্রিয়াই করা হইল, অতএব কেবল "ঈশ্বরের প্রেরণা আছে অতএব করি" এইমাত্র তোমাকে মনে করিতে হইবে।

মহারাজ! ভগবানের এই পরম কথা শ্রবণ করিলেন কি? মহারাজ! কর্ম্মই হিন্দুর ধর্ম্ম। কর্ম্ম ব্যতীত জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই।

রাজা। এমনও ত অনেক মুনি-ঋষির কথা শুনিয়াছি, যাঁহারা ইহজীবনে কোন কর্ম্ম না করিয়াও, প্রথম হইতেই জ্ঞান-নিষ্ঠায় জীবন অতিবাহিত করেন। ইহজীবনে তাঁহারা কর্ম্ম ত কৈ করেন নাই?

ব্রাহ্মণ। যাঁহাদের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা বুদ্ধি-শুদ্ধি হইয়া থাকে

তাঁহাদের এ জন্মে আর কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যক করে না। মহামুনি শুকদেব, মাতৃগর্ভ হইতেই তত্ত্বজ্ঞানী। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম দ্বারা তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। তাই ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি, তিনি মায়াজাল হইতে মুক্ত,—পরমহংস, আত্মারাম, দিগম্বর! শুকদেবের সঞ্চিত কর্ম্ম ছিল বলিয়াই, ইহজন্মে তাঁহার আর কর্ম্মের প্রয়োজন হয় নাই।

রাজা। বুঝিলাম। কিন্তু কর্ম্ম কাহাকে বলে, কর্ম্মটা কি,—তাহা ভাল বুঝিলাম না।

ব্রাহ্মণ। বিহিত-কর্ম্ম কি, আর নিষিদ্ধকর্ম্মই বা কি,—তাহা আর আমাকে বুঝাইতে হইবে না; শাস্ত্রকারগণ—তত্ত্বজ্ঞানী ঋষিগণ, এ সমস্ত কথাই লিখিয়া গিয়াছেন,—বিধি নিষেধ সমস্তই তাঁহারা বিধিবদ্ধ, নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। সেজন্য আপনার ভাবিবার আবশ্যকতা নাই। উপযুক্ত গুরুর নিকট ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করুন, ঋষিবাক্যে ভক্তি-শ্রদ্ধা করুন এবং তদনুযায়ী কর্ম্ম করিতে থাকুন, তাহা হইলেই সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে, আত্মার উন্নতি হইবে এবং পরিশেষে, ইহজন্মে না হউক, পরজন্মে বা তৎপরজন্মে, আপনি ব্রহ্মনিষ্ঠায় অধিকারী হইয়া, জীবন্মুক্ত হইয়া, মোক্ষলাভ করিতে পারিবেন।

রাজা একমনে গভীর চিন্তা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণও মুদ্রিতনয়নে ভাবমগ্ন যোগীর ন্যায় উপবিষ্ট রহিলেন। কৈলাস কিন্তু বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায়, কোণে অর্দ্ধশায়িত হইয়া, আইঢাই ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে গাড়ী মধুপুর-ষ্টেসনে আসিয়া থামিল। এখানেও গাড়ী বিশ মিনিটকাল অবস্থিতি করে। কেল্‌নারের হোটেল-অভিমুখে সাহেব-ফিরিঙ্গিগণ গাড়ী হইতে নামিয়া চা খাইতে দৌড়িল। রাজাও মধ্যশ্রেণী হইতে অবতরণ করিয়া যেখানে স্ত্রী পুত্র, অমাত্য ভৃত্যগণ আছেন, সেই স্থানে গেলেন। কৈলাসও ধীরে ধীরে, গুটি গুটি, অতি সঙ্কুচিত হইয়া, যেন ভয়ে ভয়ে গাড়ী হইতে নামিলেন। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসিলেন, "কোথায় যান?" কৈলাসচন্দ্র এ প্রশ্নের কোনও উত্তর দিলেন না।

রাজা কিছুক্ষণ পরে, অমাত্য এবং ভৃত্যগণ-সমভিব্যাহারে প্রত্যাগত হইলেন। ভৃত্যগণের স্কন্ধে ও হস্তে উৎকৃষ্ট শাল, বনাত এবং কম্বল সুশোভিত। রাজা বলিলেন, "পণ্ডিতজী! বড়ই শীত! মধুপুর ছাড়াইলে শীতে থরথর কাঁপিতে থাকিবেন। বেঞ্চের উপর এই কম্বল পাতুন, আর এই শালখানি ভাল ক'রে গায়ে দিন্।"

ব্রাহ্মণ হাসিয়া বলিলেন, "এমন ভাল শালখানি আমাকে দিয়া বৃথা নষ্ট করিবেন কেন? আমি শালের মর্ম্ম বা মাহাত্ম্য বুঝি না। এই বনাতেই আমার শীত বিদূরিত হইতেছে। শালখানি আপনি সাত্ত্বিকভাবে দান করিতেছেন,—অবশ্যই আমি গ্রহণ করিলাম। কিন্তু ইহা আপনি নিতান্ত অপাত্রে দান করিলেন,—কোন গরীব-দুঃখীকে বা শীতার্ত্ত ব্যক্তিকে দিলে অধিক ফল হইত। আর, ঐ কম্বলেত আবশ্যকই নাই। বিশেষ, এত ভারবোঝা সাত-সতের লইয়া আমি কি করিব?"

রাজা হাসিলেন। ইঙ্গিত মত ভৃত্যগণ, দুইখানি বেঞ্চে চারি আঙ্গুল পুরু কাশ্মীরি কম্বলের তিনটী শয্যা প্রস্তুত করিল। রাজা তখন স্বহস্তে শাল লইয়া, ভাঁজ খুলিয়া, ব্রাহ্মণের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, "আপনি যদি স্বয়ং ইহা গায়ে না দেন, তবে আমি এই শাল আপনার গায়ে জড়াইয়া দিব!"

ব্রাহ্মণ হাসিতে হাসিতে, সেই জরাজীর্ণ ছিন্নভিন্ন বনাতখানি ছাড়িয়া, শাল লইয়া গায়ে দিলেন।

রাজা। পণ্ডিতজী! এবার আপনার নিশ্চয়ই শীত ভাঙ্গিয়াছে।—খুব আরাম-বোধ হইতেছে।

ব্রাহ্মণ। (হাসিয়া) না,—শীতকালের চিরসহচর বনাতখানির জন্য বাস্তবিকই আমার মন-কেমন করিতেছে। মহারাজ! আমি বনাত গায়ে দিয়া বেশ ছিলাম,—আপনার এ শালে কেমন বাধ-বাধ ঠেকিতেছে।

রাজা। পণ্ডিতজী! আমায় ক্ষমা করিবেন,—আমার এক প্রশ্ন আছে। কথা অতি সামান্য; কেবল আমার সংশয় দূর করিবার জন্যই আপনাকে একথা জিজ্ঞাসিতেছি,—

ব্রাহ্মণ। (হাসিয়া) মহারাজ! নিঃশঙ্কচিত্তে যে কথা হয় বলুন, তাহাতে আমার কোনও বিরাগ জন্মিবে না।

রাজা। পণ্ডিতজী! ছেঁড়া বনাতই আপনাকে ভাল লাগে,—শাল ভাল লাগে না! আচ্ছা, বেশ কথা! তবে আপনাকে তৃতীয়শ্রেণী ভাল লাগিল না কেন?—মধ্যশ্রেণীতে আসিলেন কি হেতু? যখন আপনার কাছে শাল বনাত সমান!—(সমানই কৈ? ছেঁড়া বনাতটাই শ্রেষ্ঠ হইল) তখন আপনার কাছে তৃতীয়শ্রেণী মধ্যশ্রেণী সমান

হইল না কেন?—সমানই বা কেন হইবে?—তৃতীয় শ্রেণীটা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বোধ হইল না কেন?

ব্রাহ্মণ হো হো হাসিতে লাগিলেন। হাসি নিবৃত্তি হইলে ধীরস্বরে বলিলেন, "মহারাজ! এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কথার জন্য প্রশ্ন-জিজ্ঞাসার এত আড়ম্বর? ইহা বড়ই ছোট কথা! এত ছোট কথা যে, ইহার উত্তর হয় না,—অথবা উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।"

রাজা। পণ্ডিতজী! আমি যোড়হাতে বলিতেছি, আমার এই ঘোর সন্দেহ দূর করিতেই হইবে।

ব্রাহ্মণ আরও হাসিতে লাগিলেন। রাজা আবার বলিলেন,—"পণ্ডিতজী! আমার অপরাধ লইবেন না। আমি কোন কু-অভিপ্রায়ে, বা আপনাকে ঠকাইবার জন্য অথবা আপনার জ্ঞান-পরীক্ষা হেতু,—এ প্রশ্ন করি নাই!—আমার মনে কেমন একটা কৌতূহল জন্মিয়াছে, তাই জিজ্ঞাসিতেছি।"

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! আমরা গৃহী সংসারী,—আচার, অনুষ্ঠান, নিষ্ঠা, ব্রত সমস্তই আমাদিগকে পালন করিতে হইবে। তবে এ কলিকালে, যুগধর্ম্মে, ম্লেচ্ছ-সংস্পর্শে, আমরা নিতান্ত অব্রাহ্মণ হইয়া পড়িয়াছি, তাই যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিয়াও, সকল সময় স্বধর্ম্ম পালন করিতে সক্ষম হই না। মহারাজ! আমার সঙ্গে একটী মোট আছে,—উহা পরমপবিত্র গ্রন্থনিচয়ে পূর্ণ। প্রায় আধ মণ ভারি। আমি একটী হিন্দু-মুটের মাথায় দিয়া, এই মোট কলিকাতা হইতে হাবড়ার ষ্টেসনে আনি। মুটে মোট নামাইয়াই চলিয়া গেল, কিছুতেই রহিল না। ষ্টেসনের মুটেগণকে বড়ই অনাচারী বলিয়া মনে হইল,—কিছুতেই এ মোট তাহাদের মাথায় দিতে সাহস হইল না। তৃতীয়শ্রেণীর টীকিটঘর পানে একবার চাহিয়া দেখিলাম, মনে হইল, যেন মানুষের মহারণ্যে মহাঝড় উঠিয়াছে,—মহীরুহশ্রেণী যেন বিষম দুলিতেছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান,—একত্র মাখামাখি করিয়া মিশিয়াছে। মোট ঘাড়ে করিয়া, সেই ছত্রিশজাতি-পূর্ণ ম্লেচ্ছ-মহোৎসবে মিশিয়া, তৃতীয়শ্রেণীর টীকিট লইতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। বিশেষ, মোটটী প্রায় আধমণ ভারি,—তৃতীয়শ্রেণীর টীকিট লইলে, কেবল পনের সের মাত্র ভার, বিনামূল্যে লইতে পারা যায়। সুতরাং অতিরিক্ত পাঁচ সের ভারের জন্য

আমার নিকট ভাড়া চাহিতে পারে,—হয় ত একজন ম্লেচ্ছ বা যবন আসিয়া মোট ওজন করিতে পারে,—হয় ত এই মোট ব্রেক্‌ভ্যানে দিতে পারে,—এই সব নানা কারণে আমি তৃতীয়শ্রেণীর টীকিট লইলাম না। মধ্যশ্রেণীর টীকিটঘরে লোক কম। স্বয়ং মোট হাতে করিয়া, কতকটা স্বচ্ছন্দে, মধ্যশ্রেণীর টীকিট কিনিলাম। মহারাজ! ব্রাহ্মণের পক্ষে মধ্যশ্রেণীতেই কি, আর তৃতীয়শ্রেণীতেই কি, রেলগাড়ীতে চাপাই বিড়ম্বনা!

দেখিতে দেখিতে বিশ মিনিট ফুরাইয়া আসিল। প্রথম ঘণ্টা বাজিল। গাড়ী ছাড়ে-ছাড়ে হইল।

রাজা তখন গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন,—স্বয়ং ষ্টেসন-মাষ্টার স্বহস্তে গাড়ীতে চাবি দিতে আসিয়া রাজাকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসিল, "আপনার কোন ত কষ্ট নাই? সমুদায় বন্দোবস্ত ত ঠিক হইয়াছে?"

রাজা। হাঁ।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! বড়ই অনর্থপাত দেখিতেছি,—কৈলাসচন্দ্র এখনও ফেরেন নাই। তাঁহার কোন বিপদ ঘটিল না কি? তিনি কোথায় গেলেন?

রাজা। কৈলাস্ কোন্ দিকে গিয়াছেন? আর'ত সময় নাই! অন্বেষণ করে কে?

ব্রাহ্মণ। আমিই অন্বেষণ করিব, অদ্য এইখানেই নামিব!—

ষ্টেসন-মাষ্টার সেইমাত্র গাড়ী ঘরে চাবি দিয়া যাইতেছিল,—রাজা তাহাকে উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন, "এ গাড়ী হইতে একটী লোক নামিয়াছে, কিন্তু সে ব্যক্তি আর ফেরে নাই। তাহার মোট, ব্যাগ সমস্তই রহিয়াছে। কোথায় গেল, একবার শীঘ্র দেখ।"

ষ্টেসন-মাষ্টার। বড় দুঃখের বিষয়, আর সময় নাই, আর এক মিনিটও সময় নাই! আচ্ছা, আমি সংবাদ লইতেছি। সেই পলায়িত লোকটীর নাম কি?

রাজা। কৈলাসচন্দ্র।

তখন কৈলাস-অন্বেষণের একটা মহাগোল পড়িয়া গেল। ষ্টেসনের চারি পাঁচ জন সাহেব, পুলিসদল, আরও কত বাজে লোক একত্র হইয়া প্লাটফরমে কত কলরব করিল। কিন্তু কৈলাস ধৃত হইলেন না। গাড়ী ছাড়িতেও চারি মিনিট বিলম্ব হইল।

ব্রাহ্মণ মধুপুর-ষ্টেসনে, তাঁহার সেই আধ মণ ভারি মোট লইয়া হঠাৎ নামিয়া পড়িলেন। নামিয়া রাজাকে তিনি বলিলেন, "আমি কৈলাসের বড়ই বিপদ আশঙ্কা করিতেছি।" রাজা, ব্রাহ্মণকে হারাইয়া, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ক্ষুণ্ণমনে একাকী সেই মধ্যশ্রেণী গাড়ীতেই বসিয়া রহিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

বড় রসিয়া নাগর হে!
গভীর জ্ঞান-সাগর হে॥
কখন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ব্রহ্মচারী,
কখন বৈরাগী, যোগী, দণ্ডধারী,
কখন স্পেন্‌সার, মিল-আজ্ঞাকারী,
অবধূত জটাধর হে!
কখন যেটেল, কখন কাঁড়ারী,
কখন খেটেল, কখন ভাঁড়ারী,
কখন লুটেরা, কখন পসারী,
কভু চোর কভু চর হে!
কখন উকীল, কখন শিক্ষক,
কখন নায়ক, কখন চেটক,
কখন ঘটক, কভু সম্পাদক,
ডাক্তর ম্যানেজর হে!

৺বৈদ্যনাথধামে আজ মহামহোৎসব! আর পাঁচ দিন পরেই শিবরাত্রি। নানা দেশ হইতে নানা লোকের সমাগম হইতেছে। অতিথি, উদাসীন, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, সংসারী, কুলবধূ, বাবু—দলে দলে স্ত্রীপুরুষ, বালক-বালিকা,

ভূতভাবন ভগবান্, দেবাদিদেব মহাদেবকে দেখিবার জন্য, ভক্তবৃন্দের হৃদয়-কমল উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। "জয় শিব শঙ্কর! জয় বৈদ্যনাথজীকি জয়"—মাঝে মাঝে মানব-কণ্ঠ হইতে এই মধুর-গম্ভীর-উল্লাসময় ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। হে দীনবন্ধো! দরিদ্র-দুঃখ-ভঞ্জন! দয়াময় প্রভো! ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর,—হে সদানন্দ, সদাশিব! অপার সংসার-সাগর হইতে পার করিয়া আমাকে অভয় দাও!—ভক্তের মন এইভাবে বিহ্বল হইয়াছে।

বৈদ্যনাথ গ্রামের বহির্ভাগে এক ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে। নাম নন্দনপাহাড়। মাঠের মধ্যে শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসুজ মহাশয় এক্ষণে যে বাঙ্গালা-ঘরে অবস্থিত করেন, তথা হইতে ঐ পর্ব্বত অর্দ্ধক্রোশ দূরবর্ত্তী। মনে হয়, পাহাড়টা যেন তাঁহার বাড়ীর লাগাও।

পাহাড় একটা নয়,—তিনটা; তন্মধ্যে যেটা বড়, সেটা দুইশত হাতের অধিক উচ্চ হইবে না। তাহার চূড়ায় ইটের একতলা একটা ঘর আছে; বহুদিন সে ঘরের মেরামত নাই,—অনেক ইট খসিয়া ভাঙ্গিয়া পাহাড়ের উপর পড়িয়াছে।

নন্দন-পর্ব্বতের শিখরদেশ বড়ই মনোরম। প্রভাতে ভ্রমণচ্ছলে সেই পর্ব্বতোপরি উঠিলে মনে হয়, যেন স্বর্গে আসিলাম;—নন্দন নাম সার্থক রাখা হইয়াছে। শরীর-প্রাণ-স্নিগ্ধকর কেমন ঝুর্‌ঝুর্ বায়ু বহিতেছে!—সর্ব্বাঙ্গে বাতাস লাগে,—আর ইচ্ছা হয়, হাঁ করিয়া খানিক বাতাস গিলিয়া ফেলি। ইচ্ছা হয়, খানিক বাতাস সিন্দুকে পুরিয়া কলিকাতায় আনি। ইচ্ছা হয়, এই বাতাস-সাগরে বারমাস ডুবিয়া থাকি। অদূরে স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বতী ধিকি ধিকি বহিতেছে। বুঝি সেই পার্ব্বতীয় বাতাসকে জলকণায় পূর্ণ করিয়া মিঠা করিবার জন্যই, বিধাতা ঐ নদীর সৃষ্টি করিয়াছেন।

নন্দন-পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়া চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ কর, দেখিবে, মেঘবর্ণ পর্ব্বতরাজী তোমাকে চক্রাকারে বেষ্টন করিয়া আছে। ধরিত্রীদেবী যেন পর্ব্বত-মালার মেখলা পরিয়া আনন্দে হাসিতেছেন। উপরে নীল আকাশ, নিম্নে শস্যশ্যামল ক্ষেত্র,—মধ্যপথে আমি;—মনে হয়, আমি আর নীচেও নামিব না, উপরে আকাশেও উঠিব না,—যত দিন বাঁচি, এইখানেই থাকিয়া যাই।

আজ এক সপ্তাহকাল এক নবীন সন্ন্যাসী আসিয়া, নন্দনগিরির সেই ইষ্টকনির্ম্মিত

ভগ্নগৃহের নিকট আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি এই সাত দিন নিম্নে গ্রাম মধ্যে আসেন নাই, স্বর্গেও উঠিয়া যান নাই,—গিরিচূড়ায় বাঘছাল বিছাইয়া ঠাঁর একস্থানে বসিয়া আছেন।

বহু যাত্রী এই সন্ন্যাসীকে লইয়াই বিব্রত হইয়াছে। দেবদর্শন দূরে গেল, সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্যই মন চঞ্চল! প্রভাতে, অপরাহ্নে, দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ নন্দনপর্ব্বতাভিমুখে ধাবিত হন; বিশেষ, স্ত্রী-মহলে সন্ন্যাসীর বড়ই প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

শিবরাত্রির দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, সন্ন্যাসীর কথায় বৈদ্যনাথ গ্রাম ততই তোলপাড় হইতে লাগিল। সেই কথা জল আন্দোলন-আগুনে যেন টগ্‌বগ্‌ ফুটিতে আরম্ভ হইল। যেদিকে কাণ পাত, সেইদিকে সেই সন্ন্যাসীর কথাই শুনিবে।

এই যে একদল মেয়ে, পাহাড় হইতে নামিয়া পথ দিয়া যাইতেছে,—শুন না কেন,—উহারা কি বলে? একটী আধা-বয়সী স্ত্রীলোক বলিতেছে, "সন্নিসী নয়,—ঠিক্ যেন একটী রাজ-পুত্তুর! বাছা যেন ননীর পুঁতুল! রঙটী যেন কাঁচা সোণা; পটল-চেরা চোখ দুখানি সদাই ঢল্ ঢল্ কর্‌চে; ঠোঁট দুখানি রাঙ্গা টকটক্ কর্‌চে! অল্প অল্প কচি কচি গোঁপ-দাড়ি উঠ্‌চে বাছা! তুই কোন্ মায়ের প্রাণে দাগা দিয়ে, এ কাঁচা বয়সে গেরুয়া কাপড় পরে, সন্নিসী সেজেচিস্,—বল্ দেখি? পায়ে জুতা নেই, মাথাটী রুখু, কটা কটা ঝাঁকড়মাকড় চুল, আঙ্গুলে বড় বড় নখ,—বাছা! তোর গায়ে টুসি মার্‌লে রক্ত পড়ে,—তোর এ বয়সে সন্নিসী হওয়া সাজে কি বাছা? ধন্যি মা বাপের কঠিন প্রাণ!—"

দ্বিতীয় স্ত্রীলোক। দিদি! ওর মা বাপ থাক্‌লে কি আর, ও অমন করে বেরোয়? ওর তিনকুলে কেউ থাক্‌লে কি আর ওকে সন্নিসী হতে দিত? এই দেখ না কেন, আমরা'ত পর-মানুষ—আমাদেরই ইচ্ছা হচ্চে, ছেলেটীকে কামিয়ে-জুমিয়ে, আভাঙ ক'রে তেল মাখিয়ে, নাইয়ে ধুইয়ে, একখানি কালাপেড়ে ধুতি পরাইয়া রাখি! ওর মা থাকলে কি আর ছেলের অমন চেহারা দেখ্‌তে পারতো! সে এতক্ষণ নিজে কাঁচি ধ'রে ছেলের জটা পাকানো চুলগুলি কেটে দিতো!—যা'হোক দিদি! সন্নিসী ঠাকুর জাগ্রত বটেন!

নন্দন-পাহাড়ে নবীন-সন্ন্যাসী।

তৃতীয় স্ত্রীলোক। জাগ্রত না হ'লে কি আর সন্নিসী একাসনে সাত দিন সাত রাত ব'সে থাক্‌তে পারেন?—আর একটী মজা দেখেচ বুন্! ওঁর চোখের পলক পড়ে না;—একদৃষ্টে চেয়েই আছেন!—একবার ঠাউরে দেখ্‌লে জান্‌তে পার্‌তে!

চতুর্থ স্ত্রীলোক। উকি সন্নিসী? না, অমন ছেলে কখন সন্নিসী হয়ে থাকে? উনি সাক্ষাৎ দেবতা? কোন্ দেবপুত্তুর স্বগ্গ থেকে নেবে এসেচেন!—ওঁর মনে কি আছে, তা কে বল্‌তে পারে? দিদি! তিথ্যিস্থানে অমন অনেক ঘটে থাকে! বল্‌তে নেই,—আমি যেবার ছিক্ষেত্তর গেছ্‌লাম, সেবার একটী ঐ রকম সন্নিসী দেখেছিলাম্!—তা, ওঁরা কি আর এক যায়গায় থাকেন!—যখন যেখানে মন হয় সেইখানে যান।

পর্ব্বত হইতে নামিয়া গ্রাম-মুখে আসিবার পথের ধারে ঘাটি দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে, সন্ন্যাসী সম্বন্ধীয় এইরূপ নানা কথা,—নানা বিচার-বিতর্ক শুনিতে পাইবে। ঐ যে আর একদল বাঙ্গালী-যাত্রী আসিতেছেন,—শুন, উহাঁরা কি বলেন। দলে চল্লিশ অবধি ষাট বর্ষ পর্য্যন্ত বয়স্ক পাঁচজন লোক। পশ্চাতে একজন বৃদ্ধ-পাণ্ডা, সম্মুখে একজন ছোকরা-পাণ্ডা। দলের প্রথম এবং প্রধান ব্যক্তি বলিতেছেন, "যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহাই ঠিক মিলিল। যোগ অভ্যাস করিলে কি না হয়—সমাধিতে সমস্তই সম্ভবে। যোগীর বয়স সাড়ে তিনশত বৎসর, কিন্তু অঙ্গে নবযৌবনের আভা। একটীও দাঁত পড়ে নাই, একগাছিও চুল পাকে নাই, মাংস একটুও লোল হয় নাই, ঠিক যেন ছোকরাটী বসিয়া আছেন,—"

২য় ব্যক্তি। উঃ, বলেন কি?—এত বয়স হবে কি?—মানুষ কি কখন তিন চারি শত বৎসর বেঁচে থাক্‌তে পারে?—

৩য় ব্যক্তি। মহাভারত রামায়ণে কি পড় নাই, কোন কোন মুনি-ঋষি দশ হাজার বৎসর তপস্যা করেন,—কেহ ষাট হাজার, কেহ বা লক্ষ বৎসর যোগাবলম্বনে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন? সাড়ে তিনশত বৎসর'ত অতি সামান্য কথা!

৪র্থ ব্যক্তি। সন্ন্যাসীর বয়স যে সাড়ে তিনশত বৎসর, তার প্রমাণ কি?

বৃদ্ধ-পাণ্ডা পশ্চাতে ছিল, দ্রুত-পদে সম্মুখে আসিয়া বলিল,—"আজ একশত বার বৎসর হইল, ঐ সন্ন্যাসী-ঠাকুর একবার বৈদ্যনাথে এসেছিলেন। আমার পিতামহ,

আমার পিতামহের সঙ্গে ঠাকুরের খুব তখন আলাপ-পরিচয় হয়। পরদিন আমি উহাঁর কাছে যাই। রাত্রি একপ্রহরের পর যখন পাহাড়ে লোকজন বড় কেহ রহিল না,—তখন আমি সন্ন্যাসীকে প্রণাম ক'রে যোড়হাতে বলিলাম,—"প্রভো! আপনার কথা সব জানি।" এই কথা বলিতে না বলিতে তিনি অমনি চমকিয়া উঠিলেন। ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "যদি জানিয়া থাক, তবে এ কথা অন্য কাহাকেও বলিও না।" আমি পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলাম,—"আজ একশত বার বৎসর পূর্ব্বে আপনি একবার বৈদ্যনাথ তীর্থধামে আসিয়াছিলেন। আমার পিতামহের উপর আপনার অনুগ্রহ হয়। তাঁর সেবায় পরিতুষ্ট হয়ে আপনি তাঁকে বর দিয়াছিলেন। তখন আপনার বয়ঃক্রম দুইশত চল্লিশ বৎসর ছিল। বালক-কালে ঠাকুরদাদার মুখে এ সমস্ত কথাই শুনিয়াছি। প্রভো! আপনাকে আমি চিনিয়াছি; আমাকে আর ছলনা করিবেন না। এ দাস আপনার পদতলে পড়িয়াই থাকিবে।—" এই বলিয়া আমি দণ্ডবৎ করিয়া ঠাকুরের চরণতলে পড়িলাম। ঠাকুর তখন হাসিতে হাসিতে আমাকে তুলিয়া বলিলেন, "পাণ্ডাজী! এ সব বড়ই গূঢ় রহস্য; যাকে তাকে আপনি এ কথা বলিবেন না।" আমি এ কথা এ পর্য্যন্ত আর কাহাকেও বলি নাই, কেবল আপনাদিগকে বলিয়াছি। উহাঁর বয়স যে ৩৫২ বৎসর, তাহাত নিশ্চয়ই। উনি আকব্বর বাদসাকে দেখেছেন।"

৫ম ব্যক্তি। এ সংসারে কিছুই অসম্ভব নয়। ভগবানের কৃপাদৃষ্টি থাকিলে, বাবা বৈদ্যনাথের পাদপদ্মে মতিরতি থাকিলে, মানুষ মৃত্যুঞ্জয় অমর হইতে পারে,—তা, ৩৫২ বৎসর'ত কোন্ তুচ্ছ কথা!

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে এই দল চলিয়া গেলে কিছুক্ষণ পরেই তৃতীয় দল সম্মুখে দেখা দিল। এবার একজন হেড-মাষ্টার দলপতি,—সঙ্গে দুইটী নিম্নশ্রেণীর শিক্ষক। হেড-মাষ্টার বলিতেছেন, "আমার বোধ হয়, সন্ন্যাসীর কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে! উনি সমস্ত কথা ফুটিয়া বলেন না বটে, (আর বলিবেনই বা কেন) কিন্তু উহাঁর কথার আভাসে যতদূর বুঝিলাম, তাহাতে আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে, উনি নিশ্চয়ই একজন ছদ্মবেশী রাজনৈতিক পরিব্রাজক। কাল আমি পণ্ডিত মহাশয়ের কথা শুনে হেসে উড়িয়ে দিয়াছিলাম; পণ্ডিত এসে বল্লেন,—"একজন ইংরেজী-বাঙ্গালা-সংস্কৃত-পার্শী-জানা নবীন অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী এসেছেন। তিনি অতি চমৎকার ইংরেজীতে

কথা কহিতে পারেন। একটী এন্‌ট্রেন্সক্লাসের ছেলে তাঁকে ঠকাইবার অভিপ্রায়ে কাউপারের টাস্ক হইতে এক অতি কঠিন স্থানের অর্থ জিজ্ঞাসা করে। সন্ন্যাসী ঠাকুর হাসিয়া প্রায় দুই পৃষ্ঠা কাউপার অনর্গল মুখস্থ বলেন,—শেষে ইংরেজীভাষায় সেই কঠিন স্থল এমন সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, বালকটী থ হইয়া রহিল। আর একটী বালক তাঁহাকে একটা শক্ত একুষ্ট্রা প্রশ্ন করে। ঠাকুর পাহাড়ের উপর খড়ি পাতিয়া সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করিয়া, একুষ্ট্রা কসিয়া দিলেন।' ভয়ঙ্কর সন্ন্যাসী! এমন কখন দেখি নাই!" পণ্ডিতের এই কথা শুনিয়া আমি হাসিয়াই আকুল; বলিলাম, "কোথা থেকে একজন বুজরুগ্‌ ভণ্ড এসেছে, পণ্ডিত মহাশয়! সে কিনা আপনাকেও ঠকালে!" এই কথা শুনিয়া পণ্ডিত বলিলেন, "তবে কাল আপনাকে একবার দেখ্‌তে যেতে হবে।" পণ্ডিতের কথা শুনিয়া এখানে আসিয়া আজ যাহা দেখিলাম, তাহা অপূর্ব্ব, অননুভূত, অনুপমেয়! সন্ন্যাসীর ত যেমন-তেমন ইংরেজী জানা নহে, ইংরেজী-ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার আছে! মিলের গ্রন্থগুলি তাঁহার কণ্ঠস্থ,—স্পেন্‌সারের উপর প্রগাঢ় ভক্তি! এদিকে আবার বায়রণ, শেলি, সেক্সপীয়র—এ সকলেও বেশ জ্ঞান আছে। দেখিলাম, শেলির নামে তিনি বড়ই আমোদ প্রাপ্ত হন, তাঁহার গণ্ডস্থল উৎফুল্ল হয়। কথায় কথায় শেলির কবিতা উদ্ধৃত করেন। আর অন্যদিকে শকুন্তলা, উত্তররামচরিত, রঘুবংশ হইতে নানা সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করিয়া, ইংরেজী-কবিতার সহিত পরস্পর মিল দেখাইয়া দিলেন। সেক্সপীয়র যে, শকুন্তলা হইতে অনেক ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বিশদরূপে বুঝাইলেন। তাঁহার মতে জগতের মধ্যে শেলিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি।"

পার্শ্বস্থ দ্বিতীয় শিক্ষকের হাত ধরিয়া, হেড-মাষ্টার আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আপনি যদি আর একটু আগে পাহাড়ে উঠিতেন, তাহা হইলে এই অদ্ভুত রহস্যময় কথা স্বকর্ণে শুনিতে পাইতেন। আমি যাহা বলিলাম, তাহা ত সম্পূর্ণ সত্য বটেই, তবে আপনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিলে, আপনার চক্ষু-কর্ণের বিবাদ মিটিত।"

২য় শিক্ষক। সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্য যে রাজনৈতিক, তাহা বুঝিলেন কেমন করিয়া?

হেড-মাষ্টার। আমার সঙ্গে তাঁহার প্রায় একঘণ্টা কাল কথা হয়। আমি কৌশলে নানা কথা উত্থাপন করিলাম,—শেষে লর্ড মেকলের বিষয় উঠিল। বাঙ্গালীকে মেকলের গালাগালি সর্ব্ববিদিত। তিনি মেকলে নাম শুনিয়া প্রথমত নাসিকা কুঞ্চিত

করেন। তারপর চোখ দুটা লাল করিয়া তিনি জলদ-গম্ভীরস্বরে "ইয়া-হু" "ইয়া-হু" করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। আমি তখনই বুঝিলাম, সন্ন্যাসীর হৃদয়ে নিশ্চয়ই অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক অগ্নি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছে।

২য় শিক্ষক। দেখিতেছি, ইংরেজের উপর তাঁহার বড়ই সঞ্জাতক্রোধ। দেশে রাজনৈতিক বীজ বপন করিবার জন্য তিনি কিরূপ যোগাড়-যন্ত্র করিয়াছেন,—তাহা কিছু বুঝিলেন কি?

হেড-মাষ্টার। কোন কথা তিনিত প্রকাশ করিয়া বলেন না! আর বলিবেনই বা কেন? আমার সঙ্গে আজ এই নতুন আলাপ,—আমাকে [illegible] চেনেন না,—সুতরাং আমার সাক্ষাতে গোপনীয় কথা কহিবেন কেন?— যা হোক, শুভলক্ষণ যাহা দেখিলাম, তাহা বড়ই আশাপ্রদ!!

২য় শিক্ষক। কি লক্ষণ? কি লক্ষণ?

হেড-মাষ্টার। দেশীয় রাজগণের কথা আমি যখন উত্থাপন করিলাম, তখন তিনি কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিলেন। ইহার অর্থ এই যে— ও কথা আর কহিও না, ও পুরাণ শোক তুলিও না,—ভারতীয় নরপতিবৃন্দ যদি মানুষ হইত, তা হ'লে আজ ভারতের ভাবনা কি ছিল? মনে মনে এই কথা বলিয়া তিনি এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। আমারও চোখের কোণে এক ফোঁটা জল আসিল।—তখন আমি সন্ন্যাসী-প্রভুকে বলিলাম,— 'আচ্ছা, ওকথা আজ যাইতে দিন, অন্য একদিন নিভৃতে এ সম্বন্ধে পরস্পর মধুর আলাপ হইবে।"

২য় শিক্ষক। ব্যাপার বড় গুরুতর বলিয়া বোধ হইতেছে।—বোধ হয়, শীঘ্রই রাজনৈতিক গগনে মহা ঝড় উঠিবে। চক্‌চক্ চপলা চমকিবে। গুরুগম্ভীর মেঘমালা গুড়ুম্ গুড়ুম্ গর্জ্জিবে! ভীষণ ভূকম্পে ভবধাম টল্‌টল্ টলিবে। কালিন্দীর কাল জল কল্‌কল্ উছলিবে।

হেড-মাষ্টার! (নরমসুরে) থাক্ থাক্,—রাস্তা ঘাটে এখন ওসব কথা থাক্! (কাণের কাছে মুখ দিয়া) আপনি এখানে নূতন এসেছেন,—কিন্তু, ইহা আমাদের কলিকাতা নহে, সাঁওতাল পরগণা। এখানে বিচার আচার নাই—ধরে আর জেলে

পুরে। আপনি একটু সাবধানে কথা কহিবেন,—আর ওসব কথা আমার বাসায় সেই গুপ্তগৃহে রাত্রি ৯ টার পর নির্দ্দিষ্ট সময়ে, যথানিয়মে কহিলেই চলিবে;—পথে ঘাটে ওসব কথা বলা ভাল নয়!

২য় শিক্ষক। এঁ এঁ!—বলেন কি? (পশ্চাৎপানে পথ নিরীক্ষণ)

হেড-মাষ্টার। আমি সঙ্গে থাকিতে কোন ভয় নাই।· যাউক, ওকথা!—তার পর বুঝ্‌লেন,—সন্ন্যাসীতে আর একটী মহৎ আশ্চর্য্যকাণ্ড দেখিলাম!

২য় শিক্ষক। কি? কি?—

হেড-মাষ্টার। সন্ন্যাসীটী বড়ই সুসংস্কারাপন্ন,—আমি যতদূর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে বুঝিলাম, সন্ন্যাসীতে কুরুচি কুসংস্কার নাই। বেশ লিবারেল ভিউজ্, র‍্যাডিকাল ওপিনিয়ন, নারীজাতির দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার কেবল অন্তর কাঁদে!

২য় শিক্ষক। বলেন কি? এ সন্ন্যাসীকে যে ফুলচন্দন দিয়া, পূজা করিতে ইচ্ছা হইতেছে!—বাঃ, বাঃ! আচ্ছা,—স্ত্রী-স্বাধীনতাতে তাঁর মত আছে কি?

হেড-মাষ্টার। পূর্ব্বেই বলেছি,—সকল কথা তিনি খুলিয়া প্রকাশ করেন না,—ঠারে, ঠোরে, ইঙ্গিতে ইশারায় মনের ভাব ব্যক্ত করেন। যখন শেলির কথা হইল, তখন তিনি বলিলেন, "হায়! ভারতে এমন দিন কবে হবে, যবে শেলির কবিতা প্রত্যেক নারী-কণ্ঠে কূজিত হইতে থাকিবে।" ইহাতেই বুঝা গেল, সন্ন্যাসী স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষ।

২য় শিক্ষক। আহা!—আজ কি সুন্দরী কথা শুনিলাম রে!

ঘাটীর কাছে, মোড়ে দাঁড়াইয়া, এইরূপ খানিক কথাবার্ত্তা কহিয়া, শিক্ষকবৃন্দ প্রস্থান করিলেন।

ঐ যে ওদিকে দেখুন,—কি হইতেছে! ক্রমে যে হাতাহাতি হইবার লক্ষণ দেখিতেছি। একটী প্রবীণ লোকের চাদর ধরিয়া দুইটী যুবক টানাটানি করিতেছে! কি বিভ্রাট! চলুন চলুন,—গিয়া দেখিগে, ব্যাপারটা কি? ঈস্!—ক্রমশই যে বাড়াবাড়ি হইতে লাগিল!

[দূরেই সৌন্দর্য্যের আবাস-ভূমি। নিকটে গেলেই খেঁদা নাক, মুখে বসন্ত-খেকো দাগ, ঠোঁট পুরু, দাঁত উঁচু, চোখ বসা—এ সমস্ত স্বভাবের শোভাই দৃষ্টিগোচর হয়। শেষে ঘৃণা উপস্থিত হয়। মনে হয়, এঃ, এর জন্যেই এত যত্ন, এত পণ্ডশ্রম করিয়া বৃথা

মরিলাম!—ছি! ছি! অল্পবুদ্ধি মানবের পক্ষে কি ছোট, কি বড়, কি মাঝারি, কি উত্তম, কি অধম—সর্ব্ববিষয়েই এ নিয়ম খাটে!

দূর হইতে চাদর ধরিয়া টানাটানি দেখিয়া, এই যে আমরা মনে মনে কতই সুখ-কল্পনা করিতেছিলাম, কতই আনন্দ-কৌতূহল উদ্দীপিত হইতেছিল, কিন্তু কাছে গিয়া দেখিলাম, সব ভোঁ-ভাঁ!—কোথাও কিছুই নাই,—তিনটী লোক পরস্পর হাসি-তামাসা করিতেছে! আমরা মারামারির মজা দেখিব বলিয়া দৌড়িয়া আসিলাম!—দেখিলাম কি না,—হাসি-তামাসা, ভাব-ভালবাসা! ভাবিয়াছিলাম, মারামারিতে একটা লোক আধখুন হবে,—কনষ্টেবল এসে দুটাকে চালান দিবে, একটা ছুটকে পালাবে,—আর আমরা এই আশদ গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে, লুকিয়ে লুকিয়ে মজা দেখ্‌বো!—এমন ধারা ঘটনাটী হ'লেত মনে সুখ হতো!—তাই ছাই না হয়, একটু কম করেই মারামারি হৌক!—কিন্তু এ যে মূলে ফাঁক! উল্টাস্রোত! পোড়া অদৃষ্টে কি বিধাতা সুখ লেখেন নাই?

ঘটনাটী এই, যিনি প্রবীণ, তিনি বলিতেছেন, "না, আজ আর আমি সন্ন্যাসী দেখিতে নন্দন-পাহাড় যাইব না,—তোমরা যাও।" অন্য দুটী লোক তাঁহারই বন্ধু—এক আফিসে কর্ম্ম করেন,—তাঁহাকে ধরিয়াছেন, "আপনাকে যেতেই হ'বে।"—তাই তাঁহারা তামাসা-ছলে চাদর ধরিয়া কয়েকবার টানিয়াছিলেন। এই ত ক্ষুদ্র ব্যাপার!—কিন্তু তাহা লইয়া মনে মনে এক মহান্ স্বর্গরাজ্য অঙ্কিত করা হইল! বেশ যাহোক কিন্তু!!

এখন কাছে এসেছ ত, মন দিয়া শুন, প্রবীণ ব্যক্তি কি কথা বলিতেছেন,—"ওহে ভায়া! এ-বয়সে আমি ঢের সন্নিসী দেখিচি! তোমরা যাও—একা একা কেন,—যোড়ে যাও,—এক একটা ক'রে ছেলে হবার মাদুলি গলায় বাঁধ,—দুবেলা সন্নিসীর পায়ের ধূলা লও,—যা ইচ্ছা তাই কর, আমি মোদ্দা আর যাচ্চি না—"

তখন চাদর ধরিয়া টানাটানি থামিয়াছে।

১ম যুবক। ঠাকুরদাদা! তুমি না গেলে কি আমোদ হয়? কাল নাকি তোমাকে সন্ন্যাসী মারতে উঠেছিলেন?

প্রবীণ। (হাসিয়া) মারতে উঠেন নাই বটে, কিন্তু আর খানিক থাকলেই সন্নিসী পালাতো।—

ঠাকুরদাদার মুখটা কিছু দরাজ! ছুট্ বিছুট্ বড় বাধে না। খোলাপ্রাণে তিনি কথা চাপিয়া রাখিতে পারেন না।

১ম যুবক। কেন? কেন?—হঠাৎ সন্ন্যাসীর আপনার উপর এমন রাগ হয়ে উঠ্‌লো কেন?

প্রবীণ। আরে ভায়া, সে কথা ছেড়ে দাও!—যেখানে দেখ্‌বে এত ছোক্‌রা বয়সে সন্নিসী, সেইখানেই বুঝ্‌বে, এর ভিতর মেয়ে-মানুষ আছে! আমরা কি জান ভায়া,—অনেক দেখে, অনেক ঠেকে, শিখেচি।

২য় যুবক। ঘটনাটা কি?

প্রবীণ। কথা সহজ! আমি জিজ্ঞাসিলাম, "ঠাকুর, তোমার বিবাহ হয়েছে কি?—স্ত্রীটীর বয়স কত?" এই কথা শুনিয়াইত ছোক্‌রা-সন্নিসী ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠ্‌লো,—বল্লে, "আমি তোমার সহিত কথা কইতে চাইনে।" আমি বলিলাম, "ঠাকুর, অত চট কেন? আমরা বুড়ো-হুড়ো মানুষ, কি বল্‌তে কি বলে ফেলি;—তোমরা সন্ন্যাসী-মানুষ, তোমাদের কি কোন কথায় রাগ কর্‌তে আছে? তা যাউক, স্ত্রীর কথা নাই না বল্‌লে,—তোমার মা বাপ বেঁচে আছেন কি?"—সন্নিসী তখন চোখ দুটা কপালে তুলে কটমট করে আমার পানে চেয়ে রইলো,—রেগে গোখ্‌রো সাপের মত ফোঁস্ ফোঁস্ কর্‌তে লাগ্‌লো।

১ম যুবক। বড় মজার কথা ত!

প্রবীন। এখনি মজার হয়েচে কি?—শোন, কত রগড় আছে!—ঠাকুর রাগুক আর যাই করুক, আমি ও আর ছাড়বার পাত্র নই, আমি বলিলাম, "দোহাই ঠাকুর, রাগ ক'রো না,—তা, আমাকে সে কথা বল্‌তে কোন দোষ নাই,—আমি এই বদ্দিনাথ সহরটার ঠাকুদ্দাদা!" আমার রকম সকম দেখে সন্নিসীত' চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মাথা নুইয়ে গুম্ হ'য়ে রইলো,—কোন কথাটী কইলে না—

২য় যুবক। তারপর কি হ'লো?—

প্রবীণ। আমি দেখ্‌লাম, ঘোর বিপদ; কথা না কইলেই ত সন্নিসীর মনের কথা টেনে আনা যায় না। আমি তখন সন্নিসীর কাছে একটু সরিয়া গিয়া আস্তে আস্তে

বলিলাম, "এখানে মেলা লোক জন আছে বলে, ঠাকুর, যদি সে কথা না বল্‌তে পার, তবে চল, আমরা দুজনে না হয়, এই ঘরটার ভিতর ঢুকি!—তা, আমাকে বল্‌লে কোন দোষ হবে না!—থাক্‌, থাক্‌—যাক্‌ সে কথা! তা মেয়ে-মানুষই যত অনর্থের গোড়াকাটী!—তা, বেশ! মা, বাপ, ভাই—সবাই সুখের কাঁটা! কেউ কিছু নয়!—আজ দু তিন মাস রোদে রোদে বেড়িয়ে ঠাকুরের মুখটী শুকিয়ে গেচে,—আহা! যার জন্ত এত ভাবি, সে কিন্তু কিছুই ভাবে না।"—আমি এই সব কথা ধীরে সুস্থে, জুড়িয়ে জুড়িয়ে, মুখ-রস দিয়ে দিয়ে, বল্‌তে বল্‌তে ছোক্‌রাটী আমার পানে একবার তাকালে—

২য় যুবক। শীঘ্র বলুন না, কি হলো?—

প্রবীণ। সেই তাকানো দেখে আমার আশা হলো,—ছোক্‌রা এখন কথা কইলেও কইতে পারে। আমি অমনি বলিলাম, "দেখ ঠাকুর!—এ সংসারে কখন দুঃখ, কখন সুখ, কখন বিচ্ছেদ, কখন প্রণয়, কখন ভাব, কখন অভাব—এসব হয়েই থাকে,—তা, কি জান, আবার সময়েই সব মিল্‌বে।" ছোকরার তখনও রাগ পড়ে নাই, তবে মুখের ভাবটা যৎকিঞ্চিৎ যেন নরম বোধ হইল। সন্নিসী নাকি-সুরে বলিলেন, "দেখুন ভদ্রলোক! আমাকে আপনি আর বিরক্ত করিবেন না, এইমাত্র আপনাকে কথা কহিতে নিষেধ করিলাম, আপনি কোন্ ভদ্ররীতির অনুরোধে আবার বাক্যালাপ আরম্ভ করিলেন? আপনি কি সভ্যতার নিয়মাবলী জানেন না?" আমি তখন যোড়হাতে বলিলাম, "দোহাই! সন্নিসী ঠাকুর! রাগ করো না. তা, আমাদের বদ্দিনাথে তুমি পায়ের ধূলা দিয়েচ, তা তোমার সঙ্গে আলাপ-সম্ভাষণ না করা আমাদের ভাল দেখায় কি?" ছোক্‌রা বলিল, "দেখুন, কেবল ভদ্রতার অনুরোধে আমি আপনাকে ক্ষমা করিতেছি.—ফের যদি কথা কহেন, তাহা হইলে পুলিস ডাকিয়া আপনাকে ধরাইয়া দিব।" আমি বলিলাম, "ঠাকুর, এ পাহাড়ের উপরত একটীও কনষ্টেবল নাই, আপনি ডাকিবেনই বা কাকে? ধরিবেই বা কে? আর পুলিস-থানা এখান হইতে প্রায় তিন পোওয়া পথ, সেখানে উঠিয়া গিয়া খবর দিবেই বা কে? আপনি ত আজ সাত দিন একাসনে বসে আছেন, আপনার ত উঠিবার যো নাই, তাই বলি, থানায় সংবাদ দিবে কে? আর যদিই আপনি স্বয়ং আসন পরিত্যাগ করিয়া থানায় উঠিয়া যান, তবে আমাকে এখানে আটক করিয়া রাখিবে কে? আপনি একা

দিয়া পাহাড় হইতে নামিলে আমি ওদিক্ দিয়া দৌড়িয়া পলাইব। আর, গুহামধ্যে লুকাইয়া থাকিলে, আপনি খুঁজিয়া বাহির করিবেনই বা কেমন করিয়া ?"

২য় যুবক। বড় মজা ত!

১ম যুবক। ঠাকুদ্দা, এত দেরী করচো কেন ? শেষে কি হ'লো, শীঘ্র বলিয়া ফেল না ?

প্রবীণ। ওহে ভায়া! সব কথা খুলে-খেলে না বল্‌লে, বুঝ্‌তে পারবে কেন ? শোন, শোন, আমার সেই কথা না শুনে, সন্নিসী দাঁত কিড়মিড় করতে লাগলো, পাহাড়ের উপর একটা কীল মারিয়া বলিল, "দেখুন. আপনি যদি এখনই না উঠিয়া যান, আপনার নামে এখনি আমি ফৌজদারীতে মাজিষ্টর সাহেবের নিকট অভিযোগ আনিব; তাহাতে কোন ফল না হয়, হাইকোর্টে আপীল করিব; সেখানেও যদি কোন সুফল না ফলে, তবে ব্রিটিশ পার্লমেণ্ট পর্য্যন্ত লড়িব; আপনি জানেন, আমি কে ?" আমি বলিলাম, "তা জান্‌লে, আর এত দুঃখ কিসের ? তাই জানিবার জন্যই ত যোড়হাতে এত অনুনয় বিনয় করিতেছি।" সন্ন্যাসী, মিহি অথচ খুব তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল, "চুপ্ করুন।" আমি বলিলাম, "চুপই ত করিয়া আছি; তা, আমি এখনি উঠে যাচ্চি, কেবল একটা কথার উত্তর শুনিয়া উঠিব; এই যে আমার নামে পার্লমেণ্টে নালিস হইবে, তাহা কোন্ আইনের কোন্ ধারা অনুসারে হ'বে ?" সন্ন্যাসী আবার বলিল, "চুপ্ করুন।" আমি তখন ঈষৎ কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলাম, "তোমার সঙ্গে আমার শত্রুতা নাই, আর তোমাকে জ্বালাতন করাও আমার ইচ্ছা নহে, তবে বন্ধুবান্ধবের অনুরোধ পড়লে রাখ্‌তে হয়। তিনি আমার ছেলেবেলার বন্ধু ছিলেন, অতি কাতর হয়ে চিঠি লিখেচেন, তাই খুঁজ্‌তে সন্ধান নিতে এসেচি, তা না হলে, এ পাহাড় ভেঙ্গে, উঠে কে ?" দম দিয়া এই কথা বলিবামাত্র ছোকরা বাবাজী যেন চম্‌কে উঠ্‌লো, যেন সমস্ত রাগ পড়িয়া গেল; খুব নরম, কেঁচোর মত হইয়া ধীরস্বরে বলিল, "আপনি কে ? আপনার নিবাস কোথায় ?" আমি বলিলাম, "ঠাকুর, তুমি তোমার ঘর-বাড়ীর নাম বল্‌লে না, আমি তোমাকে বলিব কেন ?" তখন সন্নিসী আমাকে যোড়হাতে বলিল, মহাশয়, আমি যত কথা বলিয়াছি, তার কোন কথাই ধরবেন না,—ক্ষমা

করুন,—আপনার দুটী পায়ে পড়ি,—আপনি—আপনি—।" সন্ন্যাসীর মুখ দিয়া আর কথা সরিল না। আমি বলিলাম, "তা, দোষ কি? এ বয়সে, এমন হয়েই থাকে! সেটীর নাম কি বল দেখি?" সন্ন্যাসী তখন আমার পায়ে ধরিয়া বলিল, "আপনি সবই জানেন, আপনি আর এখানে থাকিবেন না।" সন্ন্যাসীর গতিক দেখিয়া আমি হাসিতে হাসিতে চলিয়া আসিলাম।

১ম যুবক। বল কি ঠাকুদ্দা? সন্নিসী তবে আসল ভণ্ড!—

২য় যুবক। না, না,—ঠাকুদ্দার যেমন কথা!—কাল আমি অনেকের মুখে শুনেছি, সন্ন্যাসী বড় পণ্ডিত লোক,—বড়ই জ্ঞানবান্! হেড-মাষ্টার বাবু এবং হেড-পণ্ডিত মহাশয়, তাঁর কথা সব জানেন,—চলুন, তাঁদের বাসায়; সেখানে সব ঠিক জানা যাবে—

প্রবীণ। একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে যদি কেউ বলে, সন্নিসী সাধু, তবু আমি তাহা বিশ্বাস করি না,—সাধু হ'লে আমার পায়ে ধর্‌বে কেন?—আমার কথায় অমন চম্‌কে উঠ্‌বে কেন?—আমি বুক ঠুকে বল্‌চি, নিশ্চয়ই ভিতরে একটা মেয়েমানুষ আছে। তা, মেয়েটাকে ও-ছোক্‌রা, খুনই ক'রে আসুক, বা মেয়েটাই ওকে ছাড়িয়া দিগ্‌,—এ দুয়ের মধ্যে একটা ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটেচে। ছোঁড়াটার চেহারা দেখ্‌লেই যে সব টের পাবে!—মুখটী যেন কুরকুর করচে,—একটু সোমত্ত গোলগাল মেয়েমানুষ দেখ্‌লেই একদৃষ্টে তার পানে চেয়ে থাকে,—হেসে হেসে তাদের সঙ্গে কথা কয়,—আড়-চোখে চাহনির বাহার দেখে কে?—তবে, যে কারণেই হউক, মনে অবশ্য একটা ওর বিকার জন্মেছে—

এইরূপ কথাবার্ত্তা-অন্তে প্রবীণ পুরুষ এবং যুবকদ্বয় গ্রামাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

তীর্থস্থানে পর্ব্ব উপলক্ষে নানারূপ লোকের সমাগম হইয়া থাকে। একদিকে ধার্ম্মিক, সাধু, সুবোধ, অন্যদিকে ঠক, ঠেটা, গাঁটকাটা; একদিকে স্বাধ্বী সহধর্ম্মিণী, অন্যদিকে কুলটা-কলঙ্কিনী; একদিকে ভক্ত, অন্যদিকে ইয়ার; পাপ-পুণ্যের, শ্বেত-কৃষ্ণের, শীত-গ্রীষ্মের বড়ই বিচিত্র সম্মিলন!

কলিকাতাবাসী কয়েকটী নবীন নাগর, নধর যুবক, বৈদ্যনাথে শিবরাত্রির মজা দেখিতে আসিয়াছেন। বাঁকাটেড়ী, কচিদাড়ী, হাতে ছড়ী,—সেই যুবকবৃন্দ ঝিমু আওয়াজে গান ধরিয়া, হেলিয়া দুলিয়া, হাসিয়া পর্ব্বত পরিদর্শনের পর, সেই পথ

দিয়া যাইতেছেন। সন্ধ্যা-সমীরণের সহিত সেই গীতের মধুর সুর মিশিয়া, সেই প্রান্তর-ভূমিকে আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে। গায়কগণ নিকটবর্ত্তী হইলে গানটী বেশ বুঝা গেল।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

যাইব সাগরে, আশা-নগরে,
তোমারে আশীষ করি হে রায়।
তুমি হে ভূপতি, গুণান্বিত অতি,
সুখমতি দেখে তোমায়॥
দেশে বিদেশে করি শ্রবণ,
তোমারি কন্যা করেছে পণ,
আনহে রাজন, দেখিব কেমন,
রাজগণ নাকি হেরে পলায়॥
বিচারে যদি জিনিতে পারি,
ঘটাব সিদ্ধি করিব নারী,
আমি যদি হারি, দাস হব তারি,
জটা মুড়াইব তাহারি পায়॥

গান থামিলে একজন গায়ক বলিল, "তুমি যা বলেচ, ভাই! তাই ঠিক বটে!—সন্ন্যাসীটী প্রেমরসে ডোবা;—আদিরস করুণ-রসের একত্র সম্মিলন!—"

২য় গায়ক। দেখলে না,—কেমন বাঁকা বাঁকা ফিক্‌ফিক্ হাসি!—আর মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস!

৩য় গায়ক। রাজনীতির কথাও তিনি ত বলিলেন,—শুধু তাঁহাকে প্রেমনৈতিক ব'লে দোষ দাও কেন?

২য় গায়ক। হাঁ,—দুই-ই বটে,—তবে এখন প্রেমনৈতিক-মহাদ্রাবকে রাজনৈতিক প্রস্তর গলিয়া গিয়াছে। প্রেম-নদীই প্রবলা,—ভিতরে দুই চারিটা রাজনৈতিক রুই-মাছও থাকিতে পারে।

১ম গায়ক। আমরা যখন পাহাড় হইতে একটু নামিয়াই ঐ গানটী ধরিলাম,— তখন একটা রঙ্গ দেখেছিলে!—স্যান্নসী কাণ খাড়া করে গান শুনেছিল।

২য় গায়ক। সন্ন্যাসীর কাণ্ড দেখিব বলিয়াই ত, ঐ গান আমি প্রথম আরম্ভ করি।

৩য় গায়ক। আচ্ছা, কাল প্রাতে এসে সন্ন্যাসীর সঙ্গে আরও খুলে খেলে কথা কওয়া যাবে! খানিক কথা হইলেই, সে কেমন পাকা ইয়ার বুঝা যাবে। আমাদিগকে সে কতক্ষণ ভাঁড়িয়ে থাকবে?

সকলেই এ প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন। গমনকালে আবার তাঁহারা গান ধরিলেন;—

ওহে বিনোদ রায় ধীরে যাও হে।
অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে॥
নবজলধর তনু, শিখিপুচ্ছ শক্রধনু,
পীতধড়া-বিজলীতে, ময়ূরে নাচাও হে।
নয়ন চকোর মোর, দেখিয়া হয়েছে ভোর,
মুখ-সুধাকর-হাসি-সুধায় বাঁচাও হে॥
নত্য তুমি খেল যাহা, নিত্য ভাল নহে তাহা,
আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে।
তুমি যে চাহনি চাও, সে চাহনি কোথা পাও,
ভারত যেমত চাহে সেই মত চাও হে॥

পরদিন প্রত্যূষে দুইটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক কাঁদিতে কাঁদিতে নন্দনগিরি হইতে নামিতেছে! চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে; ক্রন্দনের রবে পাহাড় প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ক্রন্দনের সুর এইরূপ;—"বাবা, কোথা গেলে বাবা!—আমরা তোমার পায়ে কি অপরাধ করেচি বাবা, যে, আজ আর তুমি দেখা দিলে না?—বাবা, এই যে তোমার জন্য দুদ গঙ্গাজল এনেছিলাম, এ নিয়ে এখন কি কর্‌বো বাবা? তা, আমাদের পোড়া অদেষ্টে কি পুণ্যি আছে,—আমাদের হাতে থেকে সন্নিসী-ঠাকুর দুদ গঙ্গাজল নেবেন কেন?—আহা! কাল থেকে অব্‌দি মানস রেখেচি, বাবাকে দুদ গঙ্গাজল দিয়ে পূজা ক'র্‌বো! তা হতভাগীদের অদেষ্টে—বাবা আজ কোথা লুকিয়েচেন।"

স্ত্রীলোকদ্বয় এইরূপ কাঁদিতে কাঁদিতে গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিল। দণ্ড দুই মধ্যে বৈদ্যনাথে প্রচার হইল,—নবীন সন্ন্যাসী নন্দন-পর্ব্বতে আর নাই। একজন বৃদ্ধ পাণ্ডা বলিল, "রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় আমি এক অতি আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখেছি। নন্দন-পাহাড় থেকে আকাশ পানে এক আগুনের শিখা উঠিতে লাগিল। সেই দপ্‌দপে আলোতে পৃথিবীটা হঠাৎ একেবারে ঝক্‌মক্ করে উঠ্‌লো।—আমি বুঝিলাম, এ সমস্তই সেই সন্নিসী ঠাকুরের কাজ। সন্নিসীর স্বর্গে উঠ্‌বার পর আলো নিবে গেল।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

নগেন্দ্রনাথের পিতা বহুদিন পুত্রের সংবাদ পান নাই। সেই-যে পূজার ছুটীর পর কার্ত্তিক মাসে পুত্র রাজবাটীতে গিয়াছেন,—আর কোন খবর নাই। ক্রমে অগ্রহায়ণ গেল, পৌষ গেল, মাঘ আসিল,—তথাচ পুত্রের একখানিও পত্র নাই। পিতা, পৌষ মাঘ মাসে উপরি উপরি পাঁচ খানি পত্র লিখিলেন, তথাচ তাহার উত্তর নাই।

নগেন্দ্রের, পিতাকে পত্র-লেখা-অভ্যাসটা বড়ই কম ছিল। পিতা প্রার্থনা করিতেন, অন্তত, সাপ্তাহিক পত্র;—পুত্র মঞ্জুর করিতেন, মাসিক পত্র। পুত্র কারণ দর্শাইতেন, তাঁহার কাজের এত ঝঞ্ঝাট যে, বাটীতে পত্র লিখিতে অবসর হয় না। বাস্তবিকই নগেন্দ্রের সময় বড় কম। প্রাতে উঠিয়া চা তামাক খাইতে একঘণ্টা সময় যাইত। তারপর তোয়ালে দিয়া হাতমুখ ঘষিতে বেলা আটটা হইত। অবশেষে ডেলিনিউস লিখিতে বসিতেন। সে বুলু-ব্ল্যাক কালি, সে গজদন্ত-বিনির্ম্মিত ষ্টীল পেন, সে বড় বড় চৌকা খাম, সে চিক্‌কিকে চিঠির কাগজ—ডেলিনিউস চালাইবার সে আস্‌বাবের বাহার দেখে কে? বিশেষ্য-বিশেষণ, সন্ধি-সমাস, ভাব-ভঙ্গি ঠিক রাখিয়া প্রবন্ধ রচিতে প্রত্যহ প্রায় দুই ঘণ্টার অধিক সময় লাগে। তারপর স্নানাহার করিয়া রাজবাটী গমন। তথা হইতে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আসিয়া কখন কখন ডেলিনিউসের সান্ধ্য-সংস্করণ বাহির করিতে

হইত,—কাজেই আর সময় কৈ?—সুতরাং পিতার ভাগ্যে পক্ষান্তে একখানি লিপিও লিখিত হইত না।

মফস্বলে, জঙ্গলদেশে, ডেলিনিউস (দৈনিক পত্রিকা) আবার কি? "কি"—বড় নয়!—আছে, আছে!! যাহা ছিল, তাহা ডেলিনিউসের বাবা। নগেন্দ্রনাথ নিত্যকর্ম্ম-নিয়মানুসারে প্রত্যহ প্রাতে যাহা লিখিতেন, তাহাতে নিশ্চয়ই দুখান ধাউস ডেলিনিউস চলিত। তবে সে দেশে ছাপার কল ছিল না বলিয়া ছাপা হইত না,—এই যা একটু দোষ। নচেৎ নগেন্দ্রের লিখিবার ত কামাই ছিল না।

সেই প্রাত্যহিক-পত্র কমলিনীর নামে উৎসর্গ হইত। পত্রের গুরুত্ব এত যে, ডাকমাশুল দুই আনা লাগিল। কোন কোন দিন পত্রখানি এত অধিক 'গুরুগম্ভীর' হইত যে, রেজষ্টরি না করিলে তাহা যাইত না।

ডেলিনিউস কি,—তাহা বুঝা গেল। এখন সান্ধ্য-সংস্করণটা কি,—বুঝিলেই নিশ্চিন্ত। সেটা আর কিছুই নয়,—বেলা ১১টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত আর যাহা নূতন খবর জমিত, তাহারই একটু ছোট-আড়ার পত্র লেখা হইত।

অতএব পিতার জন্য বরাদ্দ ছিল,—মাসিক-পত্র।

কিন্তু এই মাসিক-পত্রিকাতেও পিতৃদেব আজ তিন মাস বঞ্চিত। পিতা অগ্রহায়ণ মাসে ভাবিলেন,—ছেলে, কাজকর্ম্মের ভিড়ে চিঠি লিখিতে পারে নাই। আজ চিঠি আসে, কাল চিঠি আসে,—করিয়া পৌষ মাস অতিবাহিত হইল। মাঘ মাসে পিতার চক্ষু স্থির। যখন পাঁচখানি পত্রের প্রত্যুত্তর পাইলেন না, তখন পিতা, পুত্রের সংবাদ জানিবার জন্য, খোদ রাজাকে রেজেষ্টরি করিয়া এক চিঠি লিখিলেন। কিন্তু যেদিন এই পত্র রওনা হইল, সেই দিনই রাজবাটীর মোহরাঙ্কিত এক পত্র ডাকে নগেন্দ্রের পিতার বরাবর আসিল। পিতা অতি ব্যস্ত হইয়া পত্র খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পত্রের মর্ম্ম এইরূপ;—

১। ইতিপূর্ব্বে নগেন্দ্রের নামে আপনি যে তিনখানি পত্র লিখিয়াছেন, তাহা আমি খুলিয়া দেখিয়াছি।

২। আজ তিন সপ্তাহ কাল নগেন্দ্রনাথ যে কোথায় গিয়াছেন তাহা বলিতে পারি না।

৩। নগেন্দ্র যদি বাটী গিয়া থাকেন, তবে শীঘ্র সংবাদ দিবেন।

৪। আপনি বিশেষ চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন হইবেন না। আমি যথাসাধ্য তাঁহার অনুসন্ধান লইতেছি।

৫। আমি যখন ৺ শ্রীক্ষেত্রে যাই, তখন নগেন্দ্রকে রাজ্য ছাড়িয়া অন্য কোথাও যাইতে বারংবার নিষেধ করিয়া যাই। কিন্তু নগেন্দ্র সে আজ্ঞা না শুনিয়া কলিকাতা অঞ্চলে গিয়াছিলেন। কোন বিশেষ কারণ বশত আমি পুরুষোত্তম হইতে শীঘ্রই স্বরাজ্যে ফিরিতে বাধ্য হই। বর্দ্ধমান ষ্টেসনে নগেন্দ্রকে আমি দেখি। তিনি মধ্যশ্রেণীর গাড়ীতে মূর্চ্ছা যান। ষ্টেসন-মাষ্টারের পরামর্শমত, আমার বন্ধু বর্দ্ধমান-রাজের বাটীতে নগেন্দ্রকে পাঠান হয়। সুচিকিৎসায় সে রাত্রি তিনি বর্দ্ধমান-রাজবাটীতে বেশ সুস্থ ছিলেন, সেই মূর্চ্ছারোগের আর কোনও চিহ্নমাত্র ছিল না। কিন্তু পরদিন প্রাতঃকালে কাহাকেও কিছুই না বলিয়া, হঠাৎ যে তিনি কোথায় চলিয়া গেলেন, তাহা কেহই জানেন না।

৬। কেহ কেহ এরূপও অনুমান করেন, নগেন্দ্র আমারই ভয়ে লুকাইয়াছেন। বলা বাহুল্য, আজ্ঞা-লঙ্ঘনের দরুণ নগেন্দ্রের উপর আমার ঈষৎ বিরক্তি জন্মে;—কিন্তু ইহাতে তাঁহার ভয়ের কোন কারণ নাই। আর, এখন আমার সে বিরক্তিও নাই, নগেন্দ্র যদি ঘরে থাকেন, তাঁহাকে শীঘ্র এখানে পাঠাইয়া দিবেন।

৭। কেহ কেহ বলেন, নগেন্দ্র সেই দিন প্রাতে বর্দ্ধমানের বাজারে গেরুয়া কাপড় কেনেন। শেষে সন্ন্যাসীর মত সাজিয়া হাঁটাপথে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করেন।

৮। আমি ব্যাপার কিছুই ভাল বুঝিতে পারিতেছি না।

৯। আপনি পুত্রের নিরুদ্দেশ-সংবাদ শুনিয়া ভাবিত হইবেন বলিয়া, প্রথমে সংবাদ দিই নাই। ভাবিয়াছিলাম, নগেন্দ্রকে খুঁজিলেই পাওয়া যাইবে। বিশেষ, যেদিন আমি রেলগাড়ী করিয়া রাজ্যে প্রত্যাগমন করি, সেই দিন রাণীদের গাড়ীতে একটা চুরি হইয়া গিয়াছে। বহু মূল্যবান্ সম্পত্তি অপহৃত হইয়াছে। চোরাদি ধৃত করিবার জন্য ব্যস্ত আছি।

১০। নানা কারণে আপনার পুত্রের নিরুদ্দেশ-সংবাদ দিতে কিছু বিলম্ব হইল বটে,

কিন্তু সেজন্য আপনি কিছু মনে করিবেন না। আমি খোঁজ-তল্লাসের ক্রটী করিতেছি না।

পত্র পাঠান্তে পিতা আকাশ হইতে পড়িলেন। ক্রমশঃ অশ্রুজলে নয়নদ্বয় টব্ টব্ করিতে লাগিল। বৃদ্ধের অনেকগুলি ছেলে পিলে, তন্মধ্যে নগেন্দ্রই মানুষের মত হইয়া উঠেন। অর্থাৎ তিনি ইংরেজীবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া একশত টাকা বেতনের পদ প্রাপ্ত হন। বৃদ্ধের যত আশা ভরসা, সমস্তই ঐ ছেলেটীর উপর ন্যস্ত ছিল। কিন্তু সে ছেলে যে কোথা, তাহা কেহ জানে না। রহিল, কি ইন্দুরে কাটিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

কলিকালে পিতা-জাতীয় লোকগুলার কাঁদিতেই জন্ম হইয়াছে; নগেন্দ্রের পিতার নয়নবারিতে ধরাতল অভিষিক্ত হইল।

তখন পিতৃভবন হইতে দুই ব্যক্তি নগেন্দ্র-অন্বেষণে বহির্গত হইল। যাত্রাকালে পিতা তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন, "শ্রীবৃন্দাবন ভাল করিয়া খুঁজিও।"

বিংশ পরিচ্ছেদ।

কলি-কলুষ-নাশিনী কুল-পঙ্কজিনী কমলিনী কোথায়? সেই বঙ্গভূমি-দুন্দুভি, সেই দেব-দৈত্য-দানব-দলনী দিগম্বরী, সেই ত্রিতাপ-নাশিনী তারা ত্রিনয়নী কোথায়? সেই সদানন্দ-সমর-রঙ্গিণী, সেই অনন্তরূপিণী ভুবন-ভুলানী উন্মাদিনা কোথায়? সেই শিক্ষিত-পুরুষ-প্রাণহারিণী, সেই ভবধামে ভ্রাতাময়-জীবনী, সেই আদর্শরমণী, মডেল ভগিনী আজ কোথায়?

কমলিনী বৃন্দাবনে।

অহো! আজ কমলিনীর সহিত শ্রীবৃন্দাবনের সুখময় নাম করিতে হইল। অমৃতের অনন্তসাগরে নরকের নৌকা বাহিতে হইল! ভক্তপূজিত দেব-নৈবেদ্যে কুক্কুরীর কুক্রিয়া দেখিতে হইল! অহো! কি মন্দভাগ্য! বিধির কি বিড়ম্বনা! সমস্তই বুঝি যুগধর্ম্মের ফল!

যে বৃন্দাবন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি, সেখানে আমি পাপিনীর পাপকাহিনী কেমনে কীর্ত্তন করিব? একবার ভক্তিভরে বৃন্দাবন পানে চাহিলে হৃদয়ে কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাব-তরঙ্গের উদয় হয়! যেন প্রত্যক্ষই দেখিতেছি,—

সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে যদুনন্দন
বিহরত যমুনাক তীর।
প্রিয়দাম শ্রীদাম সুবল মহাবল
গোপ গোয়াল সঙ্গে বলবীর॥
বাজত ঘন ঘন বেণু।
হৈ হৈ রবে হাম্বারব গরজন,
আনন্দে চরত সব ধেনু॥

যেন দেখিতেছি,—

বংশীবটতট, কদম্ব নিকট,
মণিকর্ণিক ধীর সমীর।
সঙ্কেত কেলী- কদম্ব-কুসুম বন,
সুশীতল কুণ্ডল তীর॥
কালিন্দী পুলিন, বৃন্দাবন ঘন,
নিধুবন কেলি-বিলাস।
কুঞ্জ নিকুঞ্জ বন, গোবর্দ্ধন কানন,
গোপীগণ সহিত রাস॥

দেখ, দেখ, ঐ দেখ,—যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, সরস বসন্তে গোপীগণের সহিত বিহার করিতেছেন,—

ললিতলবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমলমলয়সমীরে।
মধুকরনিকরকরম্বিত-কোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে॥ ১॥
বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে।
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং, সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে॥

আবার ঐ দেখ,—শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধিকার দুর্জ্জয় মান কেমন ভঙ্গ করিতেছেন,—

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম্॥
স্থলকমলগঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনং জনিতরতিরঙ্গপরভাগম্।
ভণ মসৃণবাণি করবাণি চরণদ্বয়ং সরসলসদলক্তকরাগম্॥
স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারম্।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো হরতু তদুপাহিতবিকারম্॥

আহা! কোথাও ভগবান্ ব্রজকামিনীগণের বসন হরণ করিয়া, কদম্ব বৃক্ষে বসিয়া হাস্য-পরিহাস করিতেছেন। প্রেমবিহ্বলা, বিবসনা, লজ্জিতা গোপিকা সকল কালিন্দীর শীতল জলে আকণ্ঠমগ্ন হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কহিতেছেন,—"হে শ্রীকৃষ্ণ! হে শ্যামসুন্দর! অন্যায় করিও না। হে নন্দগোপ-পুত্র! আমরা তোমাকে ভালবাসি। আমরা জানি, ব্রজের মধ্যে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা ভদ্র। হে মদনমোহন! আমাদিগের বস্ত্র প্রত্যর্পণ কর। হে অনাথবন্ধু! আমরা কম্পিত হইতেছি। আমরা তোমার দাসী। তুমি যাহা আজ্ঞা কর, তাহাই করি। হে বঞ্চক! বস্ত্র দান কর; নতুবা রাজাকে বলিয়া দিব।"

শ্রীভগবান্ কহিলেন, "হে চারুশীলে! ব্রজসুন্দরি। যদি তোমরা আমারই দাসী, আমারই আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে, তবে আমি এই আজ্ঞা করিতেছি, তোমরা নিকটে আইস, কদম্ববৃক্ষ হইতে আপন আপন বস্ত্র স্বয়ং গ্রহণ কর। তাহা না হইলে আমি বস্ত্র প্রত্যর্পণ করিব না। রাজা রাগ করিয়া আমার কি করিবেন?"

আবার ঐ দেখুন, গোপীগণের গর্ব্ব-অভিমানে শাস্তি-বিধান জন্য ভগবান্ মধুবন হইতে অন্তর্হিত হইলে, বিরহ-কাতরা ব্রজকামিনীগণ কতই বিলাপ করিতেছেন। তখন উন্মাদিনীবৎ তাঁহারা বনস্পতিদিগের সহিতই কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। কেহ অশ্বত্থ বৃক্ষকে জিজ্ঞাসিতেছেন,—"হে অশ্বত্থ! তুমি কি বনমালাবিভূষিত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছ? শ্রীনন্দের নন্দন, হাস্য-বিলাস কটাক্ষের দ্বারা আমাদের মন চুরি করিয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছেন, তুমি কি তাহা দেখিয়াছ?" কেহ বলিতেছেন, "হে কুরবক! হে চম্পক! হে অশোক! যাঁহার হাস্য মানিনীদিগের মান হরণ করে, সেই রামানুজ কি এই দিক্ দিয়া গমন করিয়াছেন? হে কল্যাণি তুলসি! হে

গোবিন্দচরণ-প্রিয়ে! তোমার অতিপ্রিয় মাধব, অলিকুলের সহিত তোমাকে ধারণ করিয়া থাকেন, তুমি কি তাঁহাকে দেখিয়াছ? আমরা বিরহিণী ব্রজরমণী;—অনাথিনী চিত্তশূন্য, দিশাহারা;—হে মালতি! হে মল্লিকে! কোন্ পথে শ্রীকৃষ্ণ, বলিয়া দাও! হে বকুল! হে কদম্ব! হে বিল্ব! হে পরপ্রয়োজন-সাধনের নিমিত্ত সমুৎপন্ন যমুনা-তীরবাসী সমগ্র বৃক্ষরাজি! কোন্ পথে শ্রীকৃষ্ণ, বলিয়া দাও। আহা! পৃথিবি! তুমি কতই তপস্যা করিয়াছিলে! কেশবের পাদস্পর্শে তোমার আজ কতই আনন্দ জন্মিয়াছে,—তাই বুঝি তুমি বৃক্ষরাজি দ্বারা রোমাঞ্চিতের ন্যায় লক্ষিত হইয়াছ!” এইরূপ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, করিতে করিতে গোপিকা সকল একেবারে কৃষ্ণময়প্রাণা হইয়া উঠিলেন, সংসারে কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

মধুময় বৃন্দাবন নামে ভাবের শত ফোয়ারা এককালে ফুটিয়া উঠে! নামের এমনি অনির্ব্বচনীয় মহিমা!

কমলিনী শ্রীবৃন্দাবনে দশদিন মাত্র আসিয়াছেন। পাঠকের স্মরণ আছে, শ্বশুরের, মৃত্যু শুনিয়া কমলিনী যেদিন প্রথম হবিষ্যান্ন গ্রহণ করেন, সেই দিনই আহারান্তে তিনি পড়িয়া মূর্চ্ছা যান। রোগ ক্রমশ গুরুতর হয়, তারপর ডাক্তার মহেন্দ্রনাথের সহিত সুচিকিৎসার জন্য, কলিকাতায় আসেন। সেখানেও নীরোগ হইলেন না দেখিয়া, ডাক্তার মহেন্দ্র কমলিনীকে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য উত্তর পশ্চিমে লইয়া গেলেন। সঙ্গে, ভ্রাতা বিপিন, কপিল খান্‌সামা এবং রামচন্দ্রের পিসীমাতাও চলিলেন। বলা বাহুল্য, মহেন্দ্রনাথ ইহাঁদের অধ্যক্ষস্বরূপ নিযুক্ত হইলেন।

কমলিনী প্রথমেই ৺কাশীধামে গমন করেন। কিন্তু একমাস পরে তথায় রোগ ভাল হইল না, অর্থাৎ মন টিকিল না বলিয়া, বৈদ্যনাথে ফিরিয়া আইসেন। এখানে একমাস থাকিতে না থাকিতেই, কয়েকজন বৈদ্যনাথ-বাসী বাঙ্গালীর সহিত মহেন্দ্রনাথের বিবাদ-বচসা হয়। স্কুলের ছেলেরা মহেন্দ্রকে দেখিলেই বলিত, “ঐ যাচ্চেরে, ঐ ঐ —।” কেহ বা হাততালি দিয়া ধেই ধেই নাচিত। মহেন্দ্র তখন বৈদ্যনাথের উপর বিষম বিরক্ত হইয়া, দেড়ক্রোশ দূরবর্ত্তী রোহিণীতে গিয়া আশ্রয় লইলেন। সেখানে কাকস্য পরিদেবনা, মাঠের মধ্যে কেবল দুইটী বাঙ্গালা ঘর;—জনপ্রাণী নাই,—রাত্রে কেবল শৃগালের স্বর শুনিতে পাওয়া যায়। রোহিণীতে একমাসকাল পরমানন্দে

কমলিনীর চিকিৎসা-কার্য্য চলিল। বলা বাহুল্য, দেবদর্শনের অসুবিধা হইবে বলিয়া পিসীমা বৈদ্যনাথের বাসায় একজন সম্ভ্রান্ত পাণ্ডার তত্ত্বাবধানে রহিলেন; সপ্তাহান্তে একবার করিয়া তিনি রোহিণীতে আসিতেন।

রোহিণীর সুচিকিৎসায় কমলিনী কতক আরোগ্য লাভ করিলেন। তখন পিসীমা বৃন্দাবন যাইবার কথা পাড়িলেন। কমলিনী বা মহেন্দ্রের তাহাতে বিশেষ কিছু আপত্তি হইল না। কারণ, স্থান যেমন কেন সুন্দর স্বাস্থ্যকর হউক না, তাঁহারা একস্থানে বহুদিন থাকিতে বড় ভালবাসিতেন না। ওদিকে ডেপুটী রামচন্দ্রও মহেন্দ্রকে এই ভাবে চিঠি লিখিবেন, "কন্যা যদি আরোগ্য হইয়া থাকেন, তবে শীঘ্র দেশ ফিরিবেন। কারণ, আমার প্রিয়তমা প্রণয়িণী অন্নপূর্ণার মন, কমলিনীকে দেখিবার জন্য বড়ই চঞ্চল হইয়াছে।" মহেন্দ্র এই ভাবে উত্তর দিলেন,—"আমার সুচিকিৎসায় এবং স্থানের গুণে মূলরোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছে। তবে ভগিনী এখন অল্প দুর্ব্বল আছেন। বৃন্দাবন যাওয়া স্থির হইয়াছে। সেখানে একমাসকাল থাকিয়া সকলেই গৃহে প্রত্যাগমন করিব।" রামচন্দ্রের অনুমতি-পত্র আসিলে সকলে বৃন্দাবন গেলেন।

সুতরাং কমলিনী এখন বৃন্দাবন-বিলাসিনী; পাকা-ইমারতে, দ্বিতলগৃহে অবস্থিতা। সন্ধ্যাকাল। কপিল খানসামা ব্যতীত বাসায় কেহই নাই। পিসীমা, বিপিন, দেবদর্শনে বহির্গত হইয়াছেন। ডাক্তার মহেন্দ্র কোন বিশেষ-কার্য্য উপলক্ষে মথুরায় গিয়াছেন, —সম্ভবত অদ্য ফিরিবেন না।

সেই দ্বিতল-গৃহে কমলিনী চেয়ারে উপবিষ্টা; পদদ্বয়ে জুতা আঁটা! সেই জুতা প্রান্তে কুশাসনের উপর একজন সন্ন্যাসী সমাসীন! গৌরবর্ণ; অঙ্গে গেরুয়া বসন; গলায় রুদ্রাক্ষমালা; মাথায় জটা; হস্তে চিমটা কমণ্ডলু, অঙ্গে ভস্ম-মাখা; বয়স কিন্তু কাঁচা।

কমলিনী নয়নদ্বয় রাঙ্গা রেশমী রুমাল দ্বারা আচ্ছাদন করিয়াছেন;—মাঝে মাঝে নাক হইতে লম্বা নিশ্বাস ফসফস শব্দে বহির্গত হইতেছে। এক কথায়, বালিকাটী দিতেছেন।

সন্ন্যাসী-বাবাজী, বালিকার চরণপদ্মে নয়নচকোর নিহিত করিয়া ধার-মধুর-কণ্ঠে বলিতেছেন, "প্রিয়তমা ভগিনি! আমি সমগ্র সংসার ছাড়িয়া দিয়াছি; ত্যাগ-স্বীকাররূপ

মহাব্রতে আমি এখন দীক্ষিত। আপনি আমাকে আর কোন উপরোধ অনুরোধ করিবেন না,—সংসারের সর্ব্বসুখে আমি জলাঞ্জলি দিয়াছি।"

কমলিনী চোখে তদ্বৎ রুমাল লাগাইয়াই আছেন। ক্রন্দনের সুরে বলিলেন,—"প্রাণাৎ প্রিয়তম ভ্রাতা! আমাকে বুঝাইয়া বলুন,—ভিখারিণী ভগিনার ভালবাসা কোন্ অপরাধে উপেক্ষা করিয়া আজ সন্ন্যাসী সাজিয়াছেন? যদি সন্ন্যাসী সাজিবারই বাসনা একান্ত বলবতী হইয়াছিল, তবে এ সংবাদ পূর্ব্বে আমাকে দিলেন না কেন? তাহা হইলে আমি কি আর নিশ্চিন্ত হইয়া নীরবে বসিয়া থাকিতাম? তখনই প্রিয়তম ভ্রাতার সহিত এই প্রিয়তমা ভগিনী সন্ন্যাসিনী সাজিত।"

সন্ন্যাসী। হে প্রকৃত-পবিত্র-প্রণয়-পয়োধির প্যাসিফিক্ ওসেন! হে নবীনা-নাগরী-কুল-শিরোমণি! চক্ষুঃ-প্রস্রবণ হইতে মুক্তাফলনিভ বারিধারা ঝরঝর্ ঝরিয়া, তব কঠিন কুচযুগে পতিত হইয়া, বিচূর্ণিত হইতেছে। আহা! এ দৃশ্য আর আমাকে কতক্ষণ দেখিতে হইবে? হে কমলদলবাসিনি কমলিনি! আর ক্রন্দন করিবেন না! আপনার অশ্রু-বিসর্জ্জন আমি যে কখনই সহ্য করিতে পারি না।

কমলিনী তখন ঝটিতি চোখ হইতে রুমাল খুলিয়া ফেলিয়া, কটমট চাহিয়া, ক্রোধভরে বলিলেন,—"কঠিন-হৃদয়! আপনি কি বলিলেন,—আমি আর কাঁদব না?—আমি আর চোখের জল ফেলিব না?—তাহা কখনই হইবে না! আমি যাবজ্জীবন কাঁদিব, যাবৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছে, তাবৎ কাঁদিব!—"

সন্ন্যাসী। (স্বগত) কমলের কিবা কমনীয় সরস কথা! যেন মধুমাসে মদন-মহোৎসবের মহাধ্বনি!!

কমলিনী। যতদিন বাঁচিব, ততদিন ত কাঁদিবই,—অপিচ দেহান্তে (যদি আত্মা থাকে) আমার আত্মাও কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইবে!

সন্ন্যাসী। হে গভীর-গুণবতি! হে স্বর্গাদপি গরীয়সি গৃহিণি! তোমার এই গুণেই ত জ্ঞানীগণ গৃহত্যাগ করে! কিন্তু আর না!—আর কাঁদিও না!—বক্ষে শেল বিঁধিও না!

কমলিনী। অবশ্যই কাঁদিব। আজ পৃথিবীতে এমন শক্তি নাই, যদ্দ্বারা আমার চক্ষুজলের নিরোধ হইতে পারে!—ভাবুন দেখি, অদ্যকার বৈকালিক ঘটনা কি ভয়ঙ্করী!

আমার বড়ই কঠিন প্রাণ, তাই এখনও ফাটিয়া দ্বিখণ্ড হইয়া যায় নাই!—যখন আপনি এই যোগিবেশে অদ্য বেলা ৫টা ৫৮ মিনিট ৩০ সেকেণ্ডের সময় আমাকে প্রথম দর্শন দিলেন, তখন আমি আহ্লাদে স্ফীত-কলেবর হইয়া, পবিত্র প্রণয়ে গদগদ হইয়া, আপনার করপদ্ম মর্দন করিতে এবং আপনাকে প্রেমালিঙ্গন দিতে গেলাম। কিন্তু আপনি কি পাষাণপ্রাণ!—আপনি বলিলেন, "আমি সন্ন্যাসী হইয়াছি, আমাকে স্পর্শ করিবেন না,"—এই বলিয়া আপনি হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া লইলেন। আমি অভিমানে মরিয়া গেলাম,—হাত গুটাইয়া সরিয়া আসিলাম,—মনে মনে বলিলাম "পৃথিবি! তুমি যদি এখন দ্বিধা বিভক্ত হইতে পার, তাহা হইলে সম্ভবত আমি তাহাতে প্রবেশ করিতে প্রস্তুত আছি।"

সন্ন্যাসী। অহো! কি দুর্দৈব!

কমলিনী। তখন আরও বলিলাম, "পৃথিবি! তুমি শ্রীমতী সীতাসুন্দরীকে অঙ্কে স্থান দিয়াছিলে, আমাকে লইবে না কেন?"

সন্ন্যাসী। আর ওকথা বলিবেন না, আমার বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইতেছে!

কমলিনী। পৃথিবীকে এই কথা বলিয়া মনে মনে অলক্ষ্যে কতই কাঁদিলাম। আপনি কষ্ট পাইবেন বলিয়া তখন বাহিরে কিছুই প্রকাশ করিলাম না, কিন্তু অন্তরটা—অভ্যন্তরটা শোক-জলে ভাসিয়া গেল।

সন্ন্যাসী। আহা-হা-হা!

কমলিনী। শেষে ভাবিলাম,—"উনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন, হউন; আমি উঁহার ব্রত ভঙ্গ করিয়া উঁহার সুখের কণ্টক হইতে চাই না।" তখন আমি আপনাকে স্বতন্ত্র কুশাসন আনিয়া দিলাম!

সন্ন্যাসী। কমলে! আমি কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতেছি, আপনি নীরব হউন—

কমলিনী। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সন্ন্যাসী হইলে কি স্ত্রী-অঙ্গ স্পর্শ করিতে নাই?

সন্ন্যাসী (ঈষৎ চিন্তা করিয়া) হাঁ,—নাই-ও বটে, আছে-ও বটে;—কখনও আছে কখনও নাই। (ঘাড় নাড়িয়া) তা সে কার্য্য সময়-বিশেষে আছে, সর্ব্বদা নাই। রামচন্দ্র যখন জটা-বল্কল পরিধান করিয়া, সন্ন্যাসী সাজিয়া, সন্ন্যাসীর

সহিত বনে গমন করেন, তখন যে আদৌ তিনি সীতা-অঙ্গ স্পর্শ করেন নাই—এ কথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব? সত্যব্রত যুধিষ্ঠির বহুদিন বনে বাস করেন; তিনি যে এতকাল মধ্যে একটী দিনও দ্রৌপদীর গায়ে হাত দেন নাই,—এ কথা কি কখন সম্ভবপর?—কঠোরব্রত, মহামুনি পরাশর, আজন্মতপস্বী হইলেও মৎস্যগন্ধার অঙ্গে অঙ্গ দিতে সঙ্কুচিত হন নাই। কি ঋষি, কি সন্ন্যাসী, কি রাজা,—গুপ্ত-চরিত্র অনুসন্ধান করিলে, একটা না-একটা ঐ রকম দোষ প্রত্যেকেরই দেখিতে পাওয়া যায়! কিন্তু বিচার'ত গুপ্তদৃশ্য লইয়া নহে, এ সংসারে বিচার কেবল বাহ্যদৃশ্য দেখিয়া। মহামতি মিলেরও ঐ মত। অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা, মন্দোদরী,—হিন্দুদের এই পাঁচজন রমণী আদর্শস্থানীয়া। কিন্তু এই পঞ্চ-মহিলার যদি গুপ্তচরিত্র খুঁটে খুঁটে অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, তাহা হইলে বুঝিবেন,—এই পাঁচজন রমণীই খাটি পবিত্রপ্রেমে আসক্ত হইয়া অন্য-পতিপরায়ণা ছিলেন,—তাই এই পঞ্চকন্যার পবিত্র নাম প্রাতঃস্মরণীয় হইল। ঘরে একটা পতি থাকিলে, বাহিরে যে অন্য পতির আশ্রয় লইতে নাই,—এমন কথা মিলের কোন গ্রন্থে লিখিত নাই। ঘরের পতি গৃহদেবতা; বাহিরের পতি বাহির-দেবতা; অরণ্যের পতি বনদেবতা;—ইহা ফরাসী খাল-খনন-কর্ত্তা মেঁাসে ডি লেসেপের অভিপ্রায়!—

"সন্ন্যাসী হইলে, স্ত্রী-অঙ্গ স্পর্শ করিতে নাই"—কমলিনীর এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সন্ন্যাসী ভুলিয়া গিয়া, বক্তৃতা-স্রোতে অন্য কথা আনিয়া ফেলিলেন।

কমলিনী বলিলেন, "হে সন্ন্যাসি-কুলতিলক! ধন-জন-যৌবন-সর্ব্বস্ব-ত্যাগী উদাসিন্! বহুদিন আজ এমন সরস, সরল, সুমধুর সারগর্ভ কথা শ্রবণ করি নাই! আহা! যতই শুনিতেছি, ততই হৃদয়-মাঝারে কি যেন একটা কেমন ভাবের উদয় হইতেছে!—আমি অতি মন্দভাগিনী,—নহিলে এসুখে এতদিন বঞ্চিত থাকিব কেন?—(দীর্ঘনিশ্বাস)—কিন্তু হে কঠোর-ব্রতধারী সন্ন্যাসিন্!—আমার পূর্ব্বকথার কি মীমাংসা করিলেন?—একবার সেই বীণানিন্দিত মধুর কণ্ঠে তাহা সুপ্রকাশ করিয়া শীঘ্র বলুন—"

সন্ন্যাসী। (সুগভীর চিন্তা করিয়া) যখন তখন সন্ন্যাসীরা নারী-অঙ্গ স্পর্শ করিতে পায় না বটে;—হেঁ-এ,—আচ্ছা, এখন ও-কথা থাক্! এ বিষয়টা মন দিয়া শুনুন;—

এ সংসারে একবিংশতি প্রকার সন্ন্যাসী আছেন ; কেহ কর্ম্ম-সন্ন্যাসী, কেহ যোগ-সন্ন্যাসী, কেহ ব্রত-সন্ন্যাসী, কেহ প্রেম-সন্ন্যাসী, কেহ—

কমলিনী। আমি আর ধৈর্য্য ধরিতে পারি না,—আমি আর এত সাত-সতের কথা শুনিতে পারি না,—আপনি শীঘ্র এ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া সত্বর শুভ উত্তর প্রদান করুন।—

সন্ন্যাসী। হা জীবন-সর্ব্বস্ব-ভগিনী-ধন! হা ভব-জলধি-জলের এক মাত্র রতন! আপনার কথায় আমি বড় কাতর হইয়াছি, বড়ই সঙ্কটে পড়িয়াছি। সবে মাত্র আমি এই তিন মাস কাল ব্রত ধারণ করিয়াছি ; আরও কিছুকাল এই কঠোর-ব্রত-অনুযায়ী কার্য্য করিব সঙ্কল্প করিয়াছি। হে সুন্দরি! ব্রতকালে নারী-অঙ্গ স্পর্শ না করাই নিয়ম।

কমলিনী। আপনার ব্রতটা কি?—কিসের জন্যই বা ব্রত?—এ চিরদুঃখিনী কি তাহা জানিতে পাইবে না?—

সন্ন্যাসী। ব্রতকথা প্রকাশ করা যদিও নিষিদ্ধ বটে, কিন্তু আপনার কাছে ত কোন কথা কখন গোপন করি নাই,—করিতেও নাই। সুতরাং বলিব,—শ্রবণ করুন,—আমি ঘোর পরোপকাররূপ মহাব্রতে এখন দীক্ষিত। পরোপকার, পরোপকার, পরোপকার,—ইহাই আমার বুলি। পরোপকারই—আমার একমাত্র ধ্যান, জ্ঞান, ধারণা। আমার অন্য কোন কার্য্য নাই,—এই পরোপকার ব্রতেই আমি জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছি। সুতরাং হে পদ্মপলাশ-লোচনি! প্রাণ-পদ্মিনি! এই নিমিত্তই আমি সংসার ছাড়িয়াছি; আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বন্ধু পরিত্যাগ করিয়াছি; গৃহস্থধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়াছি;—অতএব হে সুভগে! যতদিন না এ ব্রতের উদ্‌যাপন হয়, ততদিন আমি নারী-অঙ্গ স্পর্শ করিব না। এ পরোপকার-ব্রত বড়ই কঠোর—বহুকাল পূর্ব্বে একবার মার্টিন লুথার এই মহাযোগ অবলম্বন করিয়াছিলেন,—

সন্ন্যাসীর কথা শেষ না হইতে হইতেই, কমলিনী একগাছি মালতীর মালা তর্জ্জনী দ্বারা ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"হে সন্ন্যাসিন্! হে পরোপকার-ব্রতধারিন্! আপনি যদি পরেরই উপকার জন্য প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, তবে আমার একটী মাত্র উপকার করিয়া আমাকে এ যাত্রা রক্ষা করুন;—একবার বহুকাল পরে আমি আপনার হাতে হাত দিয়া প্রাণ-ভরিয়া সেকহ্যাণ্ড করিব,—আমার এই মনোবাঞ্ছা

পূর্ণ করিয়া আপনি পরোপকার-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি প্রদান করুন!—আমার বাসনা পূর্ণ করিলে বুঝিব, আপনার ব্রতধারণ যথার্থ!—বুঝিব, প্রকৃতই আপনি পরোপকারময় পরমপুরুষ!"

নবীন সন্ন্যাসী তখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষীণকণ্ঠে, ম্লানমুখে, ছলছল চোখে বলিলেন,—"কিন্তু কমলিনি! তুমি কি আমার পর? তুমি যে কেবল আমার,—আমার,—আমার! তোমার উপকার পরোপকার কিসে হইবে? তোমার উপকার করিলে, সে যে আমারই নিজের উপকার হইবে, নিজ দেহের উপকার হইবে, নিজ আত্মার উপকার হইবে!"

সন্ন্যাসী তখন উর্দ্ধবাহুবৎ দুই হস্ত উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া, সেই দ্বিতল-গৃহের কড়িকাঠ পানে চাহিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, "হা নিরাকার ঈশ্বর! হা পরমব্রহ্ম! শেষে কি প্রাণের কমলিনীও আমার পর হইল? সেও কি আমাকে পর মনে করিল? যদি সে তাহাই না ভাবিবে, তবে সে মৎকৃত তদীয় উপকারকে পরোপকার বলিবে কেন? তাই বলি, হা ঈশ্বর! তুমি কোথায়? হা জগদ্বন্ধু! হা দয়াময়!—এ অসময়ে একবার দেখা দেও।—এ জীবনে আর যন্ত্রণা সহিতে পারি না।"

চেয়ারে উপবিষ্টা কমলিনী হঠাৎ মালতীর মালা ঘুরান বন্ধ করিলেন। নয়নদ্বয় কপালে উঠিল। "আ—আ—আমি ম-রি-লা-ম,—এই বলিয়া তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া, চেয়ার হইতে উঠিয়া, সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে পড়িয়া কর দ্বারা সন্ন্যাসীর পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিলেন। সন্ন্যাসী বলিয়া উঠিলেন,—"একি? একি?—মূর্চ্ছা, মূর্চ্ছা,—কপিল, অ অ কপিল!—"

তখন উর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসী থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। উপবেশন-মাত্র মূর্চ্ছিতা কমলিনী তাঁহার মাথাটী সন্ন্যাসীর কোলে উঠাইয়া দিলেন। কপিল খানসামা জল আনিলে, সন্ন্যাসী, অঞ্জলি করিয়া জল লইয়া, কমলিনীর নাকে চোখে মুখে দিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে কমলিনীর মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল। কমলিনী অমনি বিদ্যুদ্বেগে ভড়াক্ করিয়া সন্ন্যাসীর কোল হইতে উঠিয়া পড়িলেন লজ্জায় জিহ্বা কাটিয়া ফেলিলেন, ক্ষোভে কপালে করাঘাত করিলেন। বলিলেন,—"হায়! হায়! হায়!—কি করিলাম! সন্ন্যাসী আমাকে স্পর্শ করিয়া ফেলিলেন!!—তবে'ত জাঁর,

কমলিনীর মূর্চ্ছা।

ব্রতভঙ্গ হইল। অহো! আমিই তাঁর ব্রতভঙ্গের কারণ হইলাম! এ প্রাণ আম রাখিতে চাহি না! অদ্যই আমি, হয় জলে ঝাঁপ দিব, না হয় আগুনে পুড়িয়া মরিব"—এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে কমলিনী পুনরায় চেয়ারে গিয়া বসিলেন।

সন্ন্যাসী। আর খেদ করিবেন না!—আপনার নবনীবৎ যেরূপ কোমল দেহ, তাহাতে বিলাপ করিলে, শরীর আরও দুর্ব্বল হইতে পারে!—আবার মূর্চ্ছা যাইতে পারেন! ব্রতভঙ্গ হইয়াছে, হউক;—তজ্জন্য শোক করিবেন না। এ সকলই সেই একব্রহ্ম-দ্বিতীয়নাস্তি ঈশ্বরের আদেশ! এ সংসারে তাঁহার আজ্ঞা কে লঙ্ঘন করিতে পারে?

এই বলিয়া সন্ন্যাসী, কমলিনার চক্ষে এবং অধরে শীতল জল আবার দিতে লাগিলেন। কমলিনী আড়ঘোমটায় বলিলেন, "না, না,—আমাকে ছুঁইবেন না,—আমার স্পর্শনে আপনার অঙ্গে পাপ স্পর্শিতে পারে।—"

সন্ন্যাসী। আমার ব্রত'ত ভঙ্গই হইয়াছে!—সুতরাং দ্বিতীয়নার স্পর্শনে আর পাপ কি?—আপনি সে সন্দেহ আর করিবেন না। আপনার কোমলাঙ্গ কোটী কোটী বার স্পর্শ করিলেও আমার পাপ নাই। এ'ব্রত ভঙ্গ করাই ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল,—আপনি উপলক্ষ মাত্র।—সুতরাং আপনার ইহাতে দোষও নাই, পাপও নাই।

কমলিনী। আর একবার বলুন,—আমার কোনও দোষ নাই, পাপ নাই,—

সন্ন্যাসী। একবার কেন, কোটী কোটীবার বলিতেছি, আপনার কোনও দোষ নাই, পাপ নাই,—কোনও দোষ নাই, পাপ নাই,—দোষ নাই, পাপ নাই,—দোষ নাই, পাপ নাই,—দোষ নাই, পাপ নাই—

সন্ন্যাসী ইত্যাকারে অনর্গল ঐ কথা বলিয়াই চলিলেন। কমলিনী তখন বলিলেন, "থাক্ থাক্,—হইয়াছে!—আর বলিতে হইবে না।"

সেই শীতল জল লইয়া সন্ন্যাসী, কমলিনীর চোখে মুখে অল্প অল্প দিতে লাগিলেন। ইঙ্গিত-মত কপিল খানসামা আর একখানি চেয়ার আনিল। তখন সেই সন্ন্যাসী চেয়ারে বসিয়া কমলিনীর দক্ষিণ-করকমল ধরিয়া, মধুর আলাপ আরম্ভ করিলেন।

একাবংশ পারচ্ছেদ।

বহুদিনের পর ভ্রাতা-ভগিনীতে প্রথম সাক্ষাৎ। কাজেই উভয়েই হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দিয়া, পুলকে পূর্ণ হইয়া, কথা আরম্ভ করিলেন। কখন হাসি-তামাসা, কখন দীর্ঘনিশ্বাস, চোখের জল,—কখন আদিরস, কখন করুণরস,—নানা রসরঙ্গে সেই কথা-সাগরে তরঙ্গ-ভঙ্গ খেলিতে লাগিল। পূর্ব্বস্মৃতি এক একটা জাগিয়া উঠে,—তজ্জনিত, হয় হাসি উঠে, নয় কান্না আসে! সে মাত্রাহীন, ওজন-হীন, আদি-অন্ত-মধ্য হীন—এলোমেলো কথার কেমন করিয়া বর্ণন করিব? সংক্ষেপত সন্ন্যাসীর শেষ কথার ভাব-অন্বয় এইরূপ;—

"ভগিনি! আপনি আজ পাঁচ মাস কাল আমাকে পত্র না লিখিয়া কেমন করিয়া রহিলেন বলুন দেখি? আপনার পত্র না পাওয়াতে আমার প্রাণটী একেবারে ঠোঁটে আসিয়াছিল।—যখন কোথাও আপনার সন্ধান পাইলাম না, তখন সন্ন্যাসী সাজিলাম,—যে কদিন বাঁচি, পরোপকারে জীবন কাটাইব স্থির করিলাম। আরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলাম, এই যোগিবেশে সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া আপনাকে অন্বেষণ করিব,—যদি খুঁজিয়া পাই, তবেই দেশে ফিরিব,—নচেৎ আজীবন বনে বনে ভ্রমণ করিব।—কলিকাতা, বর্দ্ধমান, বৈদ্যনাথ, গয়া, কাশী, এলাহাবাদ, অযোধ্যা ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষে বৃন্দাবনে আসিয়া আপনার দর্শন পাইলাম। এতদিন হবিষ্যান্নভোজন, বাঘছালে উপবেশন, বৃক্ষতলে শয়ন করিতেছিলাম। মাছ, মাংস, চা, চুরুট, ঘি, দুধ, নারী-স্পর্শ সমস্তই ত্যাগ করিয়াছিলাম। কত কত পাহাড়ে উঠা-নামা করিয়া, পা দুখানি কাটিয়া গিয়াছে। তৈল বিনা চুলগুলি কটা হইয়াছে। রোদে রোদে বেড়াইয়া গায়ের এমন গোলাপী রঙ লালছিটে মারিয়াছে। চোখের কোলে কালী মাড়িয়াছে। এতদিন নখ কাটি নাই, কামাই নাই, জুতা পায়ে দিই নাই, পান খাই নাই, সুপারি গাছের দিক্ দিয়া পথ চলি নাই,—একমাত্র হরীতকীই সম্বল ছিল; কিন্তু হে কমলপত্রাক্ষি! কমলিনি!—আপনি কিন্তু আমার জন্য একবারও ভাবেন নাই।"

কমলিনীর কথার মর্ম্ম এইরূপ;—"আপনি এমন কথা বলিবেন না। আপনি

যদি একবার আমার অন্তস্তল ভেদ করিয়া তলাইয়া বুঝেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বলিবেন, এ কমলিনী আপনাকে ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না। আমার এ দারুণ রোগ কিসের জন্য?—সে কেবল আপনার জন্যই ভাবিয়া ভাবিয়া। আমি, গয়া কাশী বৈদ্যনাথ বৃন্দাবন বেড়ালাম, কাহার জন্য?—সে কেবল আপনার জন্যই। আমি এ বৃন্দাবনের বিজনবনে বাস করিতেছি, কাহার জন্য?—সে কেবল আপনার জন্য। আমার এই আমিত্বটুকু কাহার জন্য?—সে কেবল আপনারই জন্য। হে সন্ন্যাসিকুলগুরো! তথাপি আপনি বলিবেন,—'আমার জন্য একবারও ভাবেন নাই!' এ দুঃখ আমার মরিলেও যাইবে না! পুনরায় যদি এমন কথা বলেন, তাহা হইলে এখনি আমি এ প্রাণ ত্যাগ করিয়া ফেলিব।"

সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, "না না, না,—আমি না বুঝিয়াই বলিয়াছি। এমন কথা আর কখন বলিব না! আপনি কিন্তু কখনই প্রাণত্যাগ করিতে পাইবেন না।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে ভ্রাতা-ভগিনীতে ক্রমশ মাখামাখি ভাব হইল। তখন সোজা সরল কথা চলিল।

সন্ন্যাসী কে? পাঠক তাহা অবশ্যই বুঝিয়া থাকিবেন। সেই রেলগাড়ীতে মূর্চ্ছিত, বাজবাটী হইতে পলায়িত, পিতাকর্ত্তৃক অন্বেষিত, সেই নগেন্দ্রনাথই সন্ন্যাসী।

নগেন্দ্রনাথ, কমলিনীর হস্ত আপন কপালে রাখিয়া বলিলেন, "কমল! আপনার হাতটা এত গরম কেন? হাত কি কি জ্বালা করিতেছে?"

কমলিনী। উহাই ত আমার অসুখ। বৈকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত আমার হাত পা চক্ষু জ্বলে, মাথা টিপ্‌টিপ করে, কাণ ভোঁ ভোঁ করে, জিহ্বা শুষ্ক হয়, ব্রহ্মাণ্ডটা বন্‌ বন্‌ ঘোরে, প্রাণটা কেমন আঁটাই করে। আপনারই জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া হুগলীতেই এই অসুখের প্রথম সূত্রপাত হয় এবং শেষে ঐ অসুখের জন্যই দেশত্যাগী হইয়াছি।

নগেন্দ্র। এ বৃন্দাবনে আসিয়া অসুখের কি কিছুই উপশম হয় নাই?

কমলিনী। ব্যাধি আরোগ্য হয় দুইরূপে;—এক সুচিকিৎসার গুণে; দুই সুস্থানের গুণে; কিন্তু পিতা মহাশয় সঙ্গে যে ডাক্তারটিকে দিয়াছেন, সেটা অতি মূর্খ,—তাহাকে দেখিলে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে। দ্বিতীয়, এ স্থানের বায়ু নিতান্ত মন্দ নয়

ঘটে,—কিন্তু আমি অবলা সরলা বঙ্গীয় বালা,—কেমন করিয়া বৃন্দাবনের পথে হাওয়া খাইতে বাহির হইব? ইহার চারিদিকেই যে কুরুচি!—বৃন্দাবন বড়ই অশ্লীলতাপূর্ণ,—ইহার নাম মনে ভাবিলেও, হৃদয়ে কলঙ্ককালিমা অঙ্কিত হয়।

নগেন্দ্র। এঁ—বলেন কি?—বলেন কি?

কমলিনী। এ কথার এক বিন্দুও মিথ্যা নয়। আজ তিন দিন হইল, আমি নগরপ্রান্তে বেড়াইতে গিয়া এক মনোহর বৃক্ষতলে বসিলাম। একজন বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ, মহেন্দ্র বাবুকে বুঝাইতে লাগিলেন, "শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীদের বস্ত্র হরণ করিয়া এই বৃক্ষে বসিয়াছিলেন।" আমি বস্ত্রহরণের কথা শুনিয়া একেবারে শিহরিয়া উঠিলাম। মনে বড়ই একটা কুরুচির ভাব উদয় হইল। দৌড়িয়া পলাইয়া অন্য বৃক্ষের তলায় গেলাম। সেখানেও শুনিলাম, ইহা কদম গাছ। তথা হইতে পলাইয়া, অন্য এক বৃক্ষশূন্য স্থানে পৌঁছিলাম,—তথায় বসিতে না বসিতে, বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মা! এই স্থানকে প্রণাম কর; এইখানেই শ্রীকৃষ্ণ মহারাসলীলা প্রদর্শন করেন।" রাসের কথা শুনিয়া আমি অমনি লজ্জায় জড়সড় হইয়া গেলাম। মূর্চ্ছিতা হব-হব হইলাম। বহুকষ্টে সংজ্ঞালাভ করিয়া অন্য পথে ধাবিত হইলাম। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'মা, এই পথের মাটী লইয়া মাথায় দাও,—এই পথ দিয়াই গোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণ-অন্বেষণে বাহির্গত হন।" আমি ভাবিলাম, কি বিপদ্!—যাই কোথা!—আর'ত বাঁচি না! প্রকাশ্যে, মহেন্দ্র বাবুকে বলিলাম, "বাসায় চলুন,—আর এ স্থানে থাকিব না।" মূর্খ মহেন্দ্র অবশ্যই আমার মনের ভাব বুঝেন নাই। তিনি বলিলেন, "আজ গোবর্দ্ধনগিরি দেখিয়া যাইব,—ফিরিতে না হয়, রাত দশটা হইবে।" বৃদ্ধ ব্রাহ্মণও জেদ করিয়া বলিল, "মা, গিরিগোবর্দ্ধন দর্শন করিলে বড়ই পুণ্য। ঐ পর্ব্বতোপরি উঠিয়া, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাধে রাধে বলিয়া বংশীধ্বনি করিতেন। বাঁশীর মধুর রবে, প্রেমভরে পর্ব্বতও গলিয়া দ্রব হইত।" এই কুরুচিময়ী কুকথা শুনিবামাত্র আমি নাসিকা বিকুঞ্চন করিলাম,—মনে পৈশাচিক ঘৃণা উপজিল। ঈষৎ তীব্রস্বরে মূর্খ মহেন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলাম, "না—এখানে থাকিব না,—শীঘ্র পাল্কী উঠাইয়া দিন্।" তাই বলি, বৃন্দাবনের বায়ু ভাল হইলেও, কুরুচির জ্বালায় বাহির হইবার যো কৈ?

নগেন্দ্র। কমলে! মহেন্দ্রবাবু ত এন্‌ট্রেন্স পাস করিয়া মেডিকেল কলেজে প্রবেশ

করেন! অন্তত তাঁর কতক শিক্ষাও হইয়াছিল। তিনি আপনাকে এসব কুস্থান দেখাইলেন কি বলিয়া? ছি! ছি! ছি!—

কমলিনী। পূর্ব্বেইত বলিয়াছি,—মহেন্দ্র মহামূর্খ! আপনার মত তাঁহার সুশিক্ষা থাকিলে ভাবনা কি?—

নগেন্দ্র। তবে এ দেশে আর থাকিয়া কাজ নাই; শীঘ্র ঘরে ফিরিয়া চলুন,—বিশেষ, এখানে আমি অন্য একটা বিপদ্ আশঙ্কা করিতেছি।

কমলিনী। (সচকিত নেত্রে) কি বিপদ! কি বিপদ!

নগেন্দ্র। আপনি যে এখানে আছেন, তাহার সন্ধান আমি কল্যই পাইয়াছিলাম। প্রথম ভাবিয়াছিলাম,—আপনাকে আমি আর দেখা দিব না,—কেবল আমিই প্রত্যহ আপনাকে দূর হইতে দেখিয়া যাইব—

কমলিনী। কি কঠিন হৃদয়!

নগেন্দ্র। পূর্ব্ব কথা ছাড়িয়া দিন্।—সে যা হোক,—কিন্তু কাল রাত্রে সম্মুখে যখন ঘোর বিপদ্ দেখিলাম, তখন আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলাম না! মনে হইল, সেই বিপদ্-রাক্ষস আপনাকে শীঘ্রই গ্রাস করিয়া ফেলিবে।

কমলিনী। শীঘ্র বলুন, কি বিপদ!

নগেন্দ্র। কাণে কাণে বলিব—

কাণে কাণে কথা বলা হইলে, কমলিনী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "সে কথা আমি জানি,—সে পোড়ার-মুখো আজ পাঁচ দিন হইল আমাদের বাসায় আসিয়াছিল। সে কথা আর গোপন কি?—"

নগেন্দ্র। এঁ্যা,—বলেন কি?—সে পাপিষ্ঠ পাগলটা আপনার বাসায় আসিতে সাহস করিয়াছিল নাকি? আপনি তাহাকে থাকিবার স্থান দিয়াছিলেন নাকি? সেই অসভ্য বর্ব্বরের সহিত বাক্যালাপ করিয়াছিলেন নাকি? উত্তম আহারাদি দিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন নাকি?—

কমলিনী হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

নগেন্দ্র। না, না,—আপনি হাসিবেন না, এ হাসির ব্যাপার নয়! বিপদ্‌কালে হাসি সর্ব্বনাশী।

কমলিনী ফিক্ ফিক্ হাসিয়াই আকুলা হইলেন!

নগেন্দ্র। বলুন বলুন, তবে প্রকাশ করিয়া বলুন, ব্যাপার কি?

কমলিনীর হাসি-ব্যাধি দূর হইলে বলিলেন, "প্রাণের নগেন্দ্র! ক্ষমা করুন! সে বিতিকিচ্ছি বদমাইসটার বিবরণ বলিতে আমি অক্ষম। তার নাম শুনিলেই আমার পেট কামড়ায়, মাথার চুল হইতে পায়ের নখ পর্য্যন্ত ধূ ধূ জলিয়া উঠে! ওঃ নামটাতে যেন কুরুচি মাখানো!

নগেন্দ্র। ঠিক কথা! "রাধা-শ্যাম" নামটা মোলায়েম বটে, কিন্তু বড়ই অশ্লীল-ভাব-ব্যঞ্জক!

কমলিনী। উঃ, রাধা আর শ্যাম,—এই দুজনে বৃন্দাবনে কোন্ অকর্ম্মই না করিয়াছিল? সেই দুটা নামের সংমিশ্রণে ঐ একটা নাম তৈয়ারি হইয়াছে। দুইটা বাড়বানল একত্র মিলিত হইলে দেশ দগ্ধ করিয়া ফেলে! থাক্, সে পাপ কথা!

নগেন্দ্র। আপনার যদি সে কথা বলিতে একান্তই ঘৃণাবোধ বা কষ্ট হয়, তবে খানসামা কপিল বলুক না কেন?

অনুমত্যনুসারে কপিল বলিতে আরম্ভ করিল,—"বুঝ্লেন বাবু! সে কথা আর কি বল্বো? আমি দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে উঠেচি,—ডাক্তার বাবুর বেতের ছড়িটা হাতে ক'রে দোয়ার গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় জামাই বাবু এলেন, পায়ে জুতা নেই, গায়ে জামা নেই, ঠিক্ যেন একটা মুটে মজুর। জামাই বাবুর নাম শুনে বুড়াদিদি (রামচন্দ্রের পিসীমা) বেরিয়ে এলেন। তিনি এসে তাঁকে কত আদর-অভ্যর্থনা কল্লেন, কিন্তু জামাই ভাল গদী-আঁটা বিছানায় বস্লেন না, একটা কালো কম্বল চাইলেন,—বুড়ীদিদি সেদিন তাঁকে বাসায় রাখ্বার জন্য তাঁর কত সাধ্যসাধনা কল্লেন, তবু তিনি রইলেন না। একটু জল খাওয়াবার জন্য তিনি কত কাকুতি মিনুতি কল্লেন, তবু, জামাই খেলেন না। একটা ছেঁড়া কম্বলে বসে তিন চার ঘণ্টাকাল কি যে হো-হো হাস্লেন, তার আমি কিছুই বুঝ্তে পার্লেম না। দেখুন বাবু, আমার বোধ হয় জামায়ের একটু ছিট্ আছে!—কেমন যেন তিনি এলোমেলো বকেন!—তাঁর একটা কথারও ঠিক আমি পাই না!"

কমলিনী কেবল বিধু-মুখে মুচ্কি-হাসি হাসিতে লাগিলেন। নগেন্দ্র বলিলেন,—

"কমলিনি! আপনার সহিত সে জানোয়ারটা কি একবার দেখা-সাক্ষাৎ করিতে চাইলে না?"

কমলিনী। (হাসিয়া) বুড়ী, তাকে অনেকক্ষণ-ধরে থাকবার কথা বলিতে লাগিল!—আমার মনে হইল, বুড়ীর মাথায় এখনও বাজপড়ে না কেন? শেষে সেই বোকা বেল্লিক পাগলটা বলিল,—"আমার অশৌচ অবস্থা, এখানে থাকিবার যো নাই।" এ কথা শুনে আমি ত আর হেসে বাঁচি না!—তারপর সেটা, বিপিনকে ডাকিয়া কাছে বসাইল! বিপিনের পিঠে হাত বুলাইতে, বুলাইতে কি যে বক্ বক্ বকিতে লাগিল, তার কিছুই অর্থবোধ হইল না।—থাক্ সে কথা, আমার কেমন গা বমি-বমি করিতেছে!

নগেন্দ্র। কর্পূরের শিশিটা নাকের কাছে ধরিব নাকি? বাসায় অটোডিরোজ নাই কি? নাসিকার নিকট গন্ধদ্রব্য রাখিয়া নিদানপক্ষে আর দুই চারিটা কথা সে সম্বন্ধে আপনাকে বলিতে হইবে। এখানে আসিবা নিশ্চয়ই তাহার কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে। আচ্ছা,—সে হঠাৎ কেন এখানে আসিল, তাহার কিছু কারণ দর্শাইল কি?

কমলিনী। সেটা আসিয়া বলিল, কৈলাসচন্দ্রকে খুজিতে আসিয়াছি। হুগলী-নিবাসী কৈলাস, রেল-গাড়ী হইতে কোথায় পলাইয়াছে; তাহার সন্ধান লইবার জন্যই আমার বৃন্দাবন আগমন। আমি ত একথা শুনিয়াই অবাক্! কৈলাস কেগো! আমাদের বাপ-চৌদ্দপুরুষে কখনও কৈলাসকে চেনে না! কৈলাস কালো কি গোরো, তা আমি কখন চোখে দেখি নাই। কৈলাস বাঙ্গালী কি হিন্দুস্থানী,—খৃষ্টান কি যবন, তা আমি জানি না। অধিক কি, এ নারীজন্মে এ পর্য্যন্ত কৈলাস নামটী আমি কখন শুনি নাই। সেই বাটপাড়টা তবু কিনা বলে,—"কৈলাসচন্দ্র নিশ্চয়ই বৃন্দাবনেই এসেছেন।" তবে কি কৈলাসকে আমি বুক-পকেটে লুকিয়ে রেখেচি! মরণ আর কি! মদখোর মিনসে খোঁজবার আর জায়গা পায় নাই কি? আর কৈলাস বাবু যদি বৃন্দাবনেই এসে থাকেন, তা তোর কি? তিনি এসেচেন, খুব করেচেন, তুই তাকে খুঁজে বেড়াবার কে? সে তোর কে হয়?—পোড়া মুখ! পাপিষ্ঠ! দুরাচার!

নগেন্দ্র। ওকথা যাইতে দিন। অধিক ক্রোধের উদয় হইলে, আপনার এখনি

মাথা ধারতে পারে। এ যে ইন্দুমুখে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিয়াছে!—মরি! মরি!—প্রভাতকমলে যেন শিশির-শোভা!—

কমলিনী। আচ্ছা, আপনার অনুরোধে আমি ক্ষান্ত হইলাম। কারণ, গুরুবাক্য কখন আমি লঙ্ঘন করি না।

নগেন্দ্র। আর একটা অতি গোপনীয় কথা আছে। যে কথা বলিবার জন্য অদ্য এখানে আসিয়াছি, সে কথা এখনও বলিতে বাকি।—সে বিষয়টা কাণে কাণে বলিব।

কমলিনী শুনিয়া বলিলেন, "তাহাও আমি জানি; সেইজন্যই ত মহেন্দ্রনাথকে মথুরায় পাঠাইয়াছি। কোন চিন্তা নাই,—আমি দশ হাজার টাকা ব্যয় করিতে প্রস্তুত। এখন এক-চালে বাজী মাৎ করিব। আপনি অদ্য এখানে থাকুন,—কল্য প্রাতে মহেন্দ্র বাবু আসিলে, তাঁহার মুখে সব কথা শুনিয়া সময়োচিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন।"

কমলিনী নগেন্দ্রের দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি খুটিতে খুটিতে আবার বলিলেন,—"ভ্রাতেশ্বর! আপনি কি আমার সে কাজের সহায় হইবেন?"

নগেন্দ্র। অয়ি কঠিন-হৃদয়ে! এ কথা কি আর বক্তব্য?—আপনি না বলিলেও, আমি আপনা হইতেই সে কার্য্যে অগ্রণী হইলাম। এখন প্রাণপর্য্যন্ত পাত করিয়া স্বকার্য্য-উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইলাম।

কমলিনী নগেন্দ্রের কাণে কাণে আর একটা কথা বলিলেন।

নগেন্দ্রনাথ অমনি আনন্দে হাততালি দিতে লাগিলেন। কমলিনী হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান ধরিলেন,—

ওহে যোগিরাজ! কোথা হে বিরাজ
রমণী-সমাজ, আসা কি আশায়?

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

সেই রাজার উপর যেন শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে। নিয়তই অর্থনাশ, মনস্তাপ ঘটিতেছে। কোন কার্য্যেই সুখ স্বস্তি নাই। প্রথম, চন্দ্রনাথ-তীর্থ-দর্শনে বাধা-বিঘ্ন; দ্বিতীয়, রেল-গাড়ীতে পণ্ডিতজীর দর্শন পাইয়াও অদর্শন; তৃতীয়, লাট-শীকারে বিপুল অর্থনাশ; চতুর্থ, রেল-গাড়ীতে হীরা-মণি-মুক্তাদি অপহরণ; পঞ্চম, শীকারে বহুসংখ্যক হস্তী-অশ্ব-উষ্ট্রের অপমৃত্যু; ষষ্ঠ, রাজ্যে সর্ব্বত্র গোমড়ক; সপ্তম, উপর্য্যুপরি দুই বৎসর অনাবৃষ্টি এবং অজন্মা-নিবন্ধন প্রজাবর্গের ভয়ঙ্কর অন্নকষ্ট; অষ্টম, রাজস্ব অনাদায়।

প্রকৃতই রাজা বড় বিব্রত। প্রজারা রাজকর-প্রদানে অক্ষম,—রাজ-ভাণ্ডার অর্থশূন্য,—অথচ রাজাকে, গ্রামে নগরে সর্ব্বত্র সদাব্রত বসাইয়া, কাতরে অন্ন বিতরণ করিয়া, প্রজাপ্রতিপালন করিতে হইল।

খাল, বিল, পুকুর জলশূন্য। জলাশয়ের পুনঃসংস্করণ জন্য, রাজাকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হইল।

লাট-শীকারে প্রায় বিংশতি-সহস্রমুদ্রা অপব্যয়িত হয়। লাট সাহেব, রাজ-অভ্যর্থনায় বিশেষ আপ্যায়িত হইয়াও, বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াও, শেষ একটু "কিন্তু" রাখিয়া গেলেন। সেই "কিন্তু-টুকু" এই,—"এ রাজ্যে কোন ইংরেজ-ম্যানেজার থাকিলে, রাজ্যের বিশেষ উন্নতি হইতে পারিত। অন্তত উপরিতন তিন চারি জন কর্ম্মচারী ইংরেজ হইলে রাজ্য স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে।" লাট-মুখে এই কথা শুনিয়া, রাজা আপাতত অন্তত দুইজন ইংরেজকে চাকুরি দিতে মনঃস্থ করিলেন। কিন্তু মনে বড় তাঁর কষ্ট হইল। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, ম্লেচ্ছের সঙ্গ কেমন করিয়া সাক্ষাৎ সংস্রব রাখিব? বিশেষ, ইহাতে ব্যয়-ভার বিষম বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু উপায় নাই,—ইহা লাট-অনুমোদিত।

রাণীদের গাড়ীতে চুরিতেও রাজা বড়ই বিব্রত হইয়াছেন। গহনার বাক্সে হীরা

জহরত সোণা যা ছিল, সমস্তই গিয়াছে। শাল বনাতের মোটও অপহৃত হইয়াছে। অধিক কি, রাণীদের রেশমী কাপড় চোপড়ও কিছুই নাই।

পাঠক জানেন, রাজা মধুপুর ষ্টেসনে একাকীই মধ্যশ্রেণীর গাড়ীতে বসিয়া রহিলেন। গাড়ী বৈদ্যনাথ ষ্টেসনে আসিয়া থাকিতে না থাকিতে রাজ-খানসামার মত পোষাক পরা দুই জন লোক, ফাষ্ট ক্লাসে রাণীদের গাড়ীর নিকট গিয়া বলিল, "রাণীমা! শীঘ্র জহরতের বাক্স, শালের বাক্সপ্রভৃতি দিউন,—রাজা চাহিতেছেন,—তিনি ঐ ওদিকের গাড়ীতে আছেন,—এ সব জিনিস তিনি নিজের নিকট আপন হেফাজতে রাখিতে চাহিয়াছেন,—রাত্রিকালে,—কি জানি যদি কোন চোর আসে! শীঘ্র দিন্—গাড়ী বুঝি ছাড়িল।"

ইতিপূর্ব্বে মধুপুরে রাজা স্বয়ং নামিয়া একটা শাল-বনাতের মোট রাণীদের নিকট হইতে নিজ গাড়ীতে লইয়া যান। রাণীরা ভাবিলেন, হবেও বা রাজা সমস্ত জিনিসই এবার চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। বিশেষ রাত্রিকাল,—রাণীরা পোষাকের সাদৃশ্য দেখিয়া সেই চোরদ্বয়কে ঠিক রাজ-খানসামা মনে করিলেন। আর চোরেরাও, "গাড়ী ছাড়িল, গাড়ী ছাড়িল, শীঘ্র দিন্, শীঘ্র দিন্"—ইত্যাকার কথা ধীরে ধীরে বলিয়া রাণীদিগকে বিব্রত করিয়া তুলিল। তখন দাসীগণ, রাণীদের অনুমতি অনুসারে, ত্বরায় ঐ সমস্ত জিনিস তাহাদিগকে দিল। সেই অন্ধকার রাত্রে চোরেরা জিনিস লইয়া কোথায় যে সরিয়া পড়িল, তাহা কেহ দেখিতে পাইলেন না।

বলা বাহুল্য, রাজা জহরতের বাক্সপ্রভৃতি আনিতে কাহাকেও অনুমতি করেন নাই। তিনি মধ্যশ্রেণীতে যেমন নীরবে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, বৈদ্যনাথে সেইরূপই চিন্তা করিতে লাগিলেন;—গাড়ী হইতে আদৌ অবতরণ করেন নাই। নওয়াদি-ষ্টেসনে তিনি চুরির বিষয় অবগত হন। সেইদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত "খোঁজ খোঁজ" চলিয়াছে,—কিন্তু অপহৃত দ্রব্যের কোনও কিনারা হইল না। সবশুদ্ধ পঞ্চাশ হাজার টাকার সম্পত্তি চুরি যায়।

রাজা, রাজ্যে আসিয়াই চোর ধরিবার বহুবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই ফলোদয় হইল না। শেষে তিনি ঘোষণা দিলেন,—"যে কেহ চোর ধরিয়া দিবেন, অথবা চোরাই-মালের সন্ধান দিতে পারিবেন,—তাঁহাকে রাজ-সরকার হইতে এক হাজার টাকা পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।" ভারতের নানা স্থানে ঘোষণার কথা

প্রচারিত হইল। ইহাতে এই ফল হইল যে, কতকগুলি নিরপরাধ ব্যক্তি, পুলিস-কর্ত্তৃক গো-অভিযোগে ধৃত হইলেন। বহুলাঞ্ছনার পর ইহাঁরা মুক্তিলাভ করিলেও, পুলিসের অত্যাচারে প্রথমে ইহাঁদের যন্ত্রণার অবধি ছিল না। রাজা এই সব ব্যাপার দেখিয়া, আরও বিব্রত হইলেন।

সর্ব্বদিকে অশুভ লক্ষণ দেখিয়া রাজা কেমন ভীত হইলেন। চারিদিকে চর পাঠাইয়াও তিনি, ব্রাহ্মণ, নগেন্দ্র বা কৈলাসের কোনও সংবাদ পাইলেন না। মন্ত্রিবর্গকে সদাই বলিতেন, "পণ্ডিতজীর কি আর দেখা পাইব না? তিনি কি আর এখানে পায়ের ধূলা দিবেন না?" ক্রমে তাঁহার হৃদয় বিষাদমগ্ন হইয়া উঠিল। রাজা প্রমাদ গণিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

কাল পূর্ণ হইলে, ঘটনাপ্রবাহ বিদ্যুৎ অপেক্ষাও অধিক বেগে ছুটিতে থাকে! তীর, তারা, উল্কা, বায়ু, তাহার সঙ্গে চলিতে পারে না। গিরি বন, নদ নদী, প্রান্তর মরুভূমি—শত শত যোজন কিছুই মানে না,—তৎসমস্তকেই তাহা, সবেগে লম্ফ দিয়া, লঙ্ঘন করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে চলিয়া যায়। অবশ্যম্ভাবী ঘটনা-প্রবাহকে কেহই প্রতিরোধ করিতে সমর্থ নহেন। কাল, কাহারও হাতধরা নহে।

কমলিনীর স্বামী শ্রীযুক্ত রাধাশ্যাম ভাগবতভূষণ কৈলাসের অন্বেষণার্থী হইয়া, নানা দেশ ভ্রমণ করিলেন। তাঁহার পরিচিত নানা স্থানে সংবাদও পাঠাইলেন। শেষে তিনি কাশীধামে উপনীত হইয়া তাঁহার গুরু, জনৈক উলঙ্গসন্ন্যাসীর নিকট এ সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিলেন। উলঙ্গবাবাজী শিষ্যের কথা শুনিয়া হাসিলেন। বলিলেন;—

"কর্ম্মফল! মন্দভাগ্য! এ জন্মে ও জন্মে অপরাধ করিলে নানাভোগ ভুগিতে হয়। তুমি কৈলাসকে অন্বেষণ কর নাই,—কালে অন্বেষণ করাইতেছে; কাল-প্রণোদিত হইয়া সংসারচক্রে সদাই তুমি ঘুরিতেছ। পৃথিবীতে এমন শক্তি নাই যে, তোমার এই ভ্রমণ-গতির নিরোধ করিতে পারে। আমি দিব্যচক্ষে সমস্তই দেখিতেছি, বুঝিতেছি,

কিন্তু উপায় নাই। কৈলাসের নিমিত্ত তুমি বড়ই উৎকণ্ঠিতপ্রাণ হইয়াছ। যাও শ্রীবৃন্দাবনে,—কৈলাস গঙ্গা কন্যা সেইখানে পৌঁছিয়াছেন। এক উপদেশ শ্রবণ কর; সহস্র বিপৎপাত হইলেও, কখন বিচলিতমনা হইও না,—স্বধর্ম্মচ্যুতি যেন কখন না ঘটে। অথবা আমার এই উপদেশ বৃথা,—কারণ, কাল অতিক্রম্য নয়। কি আর উপদেশ দিব? সেই অনাথবন্ধু, অগতির গতি, ভগবানকে কখনও ভুলিও না।"

সন্ন্যাসী আবার হাসিলেন।

ব্রাহ্মণ, কৈলাস-অন্বেষণে বৃন্দাবনাভিমুখে চলিলেন। বৃন্দাবনে পৌঁছিয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণী কমলিনী এইখানে আছেন জানিয়া, প্রথম দিনই তিনি সে বাসায় যান। তথায় যে কিরূপ আদর-অভ্যর্থনা পান, তাহা পাঠক পূর্ব্বেই অবগত আছেন।

সে বৎসর অন্নকষ্ট যে কেবল বিহার-অঞ্চলে—সেই রাজার রাজ্যে সমুপস্থিত হইয়াছে, তাহা নহে। সমগ্র উত্তর-পশ্চিমে ধিকি ধিকি—নীরবে, দুর্ভিক্ষ-বহ্নি জ্বলিতেছে। সংসারে যার কেহ নাই, যে অনাথ,—সে মরিলে কাঁদিবে কে?—শোকধ্বনি তুলিবে কে?—ভারতবাসী অনাথ—তাহার মৃত্যুতে ক্রন্দনের কাতর রোল উত্থাপিত করিবে কে? তাই ভারতবাসীর দেহ নীরবে পঞ্চভূতে মিশাইতেছে!

আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন—এই ভূখণ্ড নিদারুণ অন্নকষ্টে লোক অস্থির হইয়াছে। মজুরে মজুরি পায় না,—অনেকে অন্নচেষ্টায় দূরদেশে পলাইতেছে। মুষ্টিভিক্ষাও বন্ধ হইয়া আসিল। অথচ ভিখারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। দেবালয়ের অতিথি-শালায় স্থান কুলায় না; অন্নছত্রে লোক ধরে না;—দলে দলে দরিদ্রলোক উদর-জ্বালায় পথে ঘাটে মাঠে ছটফট করিয়া বেড়ায়। সঙ্গতিপন্ন যাত্রী দেখিলে, তাহারা দু-চার কড়া কড়ার জন্য তাহার পা-তলে পড়িয়া যায়, ভূমে গড়াগড়ি দেয়, কাঁদে, উপদ্রব করে। দোকানঘরে কোন যাত্রী জল খাইতে বসিল,—আর দশ বার জন, দীন দুঃখী, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, 'একটু দাও, একটু দাও' বলিয়া হ্যাংলাটী করিতে লাগিল। চটীতে কেহ রাঁধিয়া বাড়িয়া ভাত খাইতেছে, অন্নাভাবে জীর্ণ, অনাথ, উলঙ্গ বালকগণ অনিমিষ-লোচনে ঠায় সেই ভাতের পানে চাহিয়া আছে, পথিক যখন হাতে করিয়া ভাত তুলিতেছে, তাহারা তখন তাহাই দেখিতেছে, যখন মুখে দিতেছে, তখনও দেখিতেছে, যখন সেই অন্ন গলাধঃকরণ করিতেছে, তখনও দেখিতেছে। পথিকের আর খাওয়া

হইল না। অবশিষ্ট অন্ন বালকগণকে বিলাইয়া দিল। এত নিদারুণ অন্নকষ্ট, তথাচ টু শব্দ নাই। ভারত-সংসার যেন সুখে, স্বচ্ছন্দে, পরমানন্দে চলিতেছে।

শিক্ষিত নগেন্দ্র বা শিক্ষিতা কমলিনী, সুশিক্ষার সুপ্রভাবে এ কষ্ট আদৌ দেখিতেই পান নাই। বৃহস্পতি-বুদ্ধি নগেন্দ্র-কমলিনীর চক্ষু-চতুষ্টয় অগাধ-বিদ্যার আবরণে আচ্ছাদিত হইয়াছে;—সুতরাং তাঁহারা পার্থিব পদার্থ দেখিতে পাইবেন কেন? তাই কপিল খানসামা, ভিখারী দ্বারস্থ দেখিলেই দূর করিয়া দেয়। ভিখারীরা বেশী গোলমাল করিলে, কখন বা তাহাদিগকে ধরিয়া, বাঁধিয়া পুলিস-থানায় চালান দেওয়া হয়। দরিদ্র-গাত্রগন্ধে বায়ুমণ্ডল দূষিত হইতেছে ভাবিয়া, শ্রীমতী কমলিনী প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে বাসার উঠানে দুই বোতল করিয়া লাবেণ্ডার জল ছড়াইয়া দেন।

কিন্তু সেই অসভ্য বর্ব্বর ব্রাহ্মণ, দরিদ্র-ব্যক্তিগণের গাত্র-গন্ধে বিচলিত হন নাই। বিচলিত হওয়া দূরে যাউক, তিনি যেন তাহাদের সহিত মিশিতে ভালবাসেন। দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত, দুঃখভারে জর্জ্জরিত, দীনদুঃখীকে দূরে দেখিলেও, তিনি তাহাকে বাহুপ্রসারণ দ্বারা সম্বোধন করিয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "বাপু, তোমার চলে কিসে?" ক্রমে আর কাহাকেও ডাকিতে হয় না, জিজ্ঞাসিতেও হয় না,—পথে বাহির হইলেই, ব্রাহ্মণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহুদরিদ্র আপনা হইতেই চলিতে থাকে।

ব্রাহ্মণ প্রত্যেককে আধ-সিকি পয়সার কম দিলেও, তাহারা তাহাতেই আহ্লাদে আটখানা হইত। ব্রাহ্মণের মধুর আদরে তাহারা গলিয়া যাইত। মথুরার কয়েক ঘর স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সম্ভ্রান্ত দোকানদার, সঙ্গতিহীন ব্রাহ্মণের সৎকর্ম্মে মতিগতি দেখিয়া নিয়তই তাঁহাকে সাধুবাদ করিতে লাগিল;—ব্রাহ্মণ, বিতরণার্থ আট আনার জিনিস চাহিলে, তাহারা দুই টাকার জিনিস দিত।

ব্রাহ্মণের বাসা ছিল,—মথুরায়। একজন পরম-হিন্দু বৈশ্য-দোকানদার, আপন দোকানের পার্শ্বে এক গৃহে তাঁহাকে মহাসমাদরে, বাসা দিয়াছিল। তিনি তথায় আহারাদি করিতেন, রাত্রে শুইয়া থাকিতেন,—দিবসে কৈলাসের অন্বেষণে চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী চারি পাঁচ ক্রোশ স্থান বেড়াইতেন। কখন বা আট দশ ক্রোশ অন্তরে দূরপথে চলিয়া যাইতেন। তিন-চারিদিনে মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান যথাসাধ্য খুঁজিলেন। তবে এ সময়ে বর্ষা-বাদল বলিয়া তাঁহার অনুসন্ধানের তত সুবিধা হইল না। পথে কাদা,

আকাশে টিপ্‌টিপ্ জল, কখন বা মুষলধারে ঝড়বৃষ্টি,—তবু ব্রাহ্মণের বিরাম নাই, ভিজিতে ভিজিতে গুটী গুটী চলিয়াছেন;—কেমন যে তাঁহার অনির্ব্বচনীয় ঝোঁক, তাহার প্রকৃত তত্ত্ব কেমন করিয়া বলিব?

বাদলে অন্নকষ্ট অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। গৃহস্থবাড়ী, গরীব লোকের যা এক আধ দিন মজুরি জুটিত, এক আধ স্থানে যা অল্প স্বল্প মুষ্টিভিক্ষা মিলিত,—বর্ষা-বাদলে তাহাও জুটে না, তাহাও মিলে না। বিশেষ, ভিজিয়া ভিজিয়া ভিক্ষা করিতেও দশগুণ শ্রম বৃদ্ধি হয়। কাজেই কষ্টের আর অবধি থাকে না।

সপ্তাহান্তে বাদল ছাড়িল। নির্ম্মল নীল আকাশে সতেজে সূর্য্য উঠিল। পৃথিবীতে রোদ ফুটিল। জগৎ হাসিল!

আজ বড় আনন্দের দিন। দরিদ্র-দল ভাবিল, আজ আর ভিক্ষার ভাবনা নাই; বহু ব্যক্তি পথে ঘাটে বাহির হইবে,—যাকে তাকে ধরিয়া ভিক্ষা লইব। ক্ষুদ্র-প্রাণী কেরাণী ভাবিল,—আজ আর জুতা, হাতে করিয়া, ছেঁড়া-ছাতা মাথায় দিয়া, হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া, সঙ সাজিয়া আফিস যাইতে হইবে না,—ঠিক বাবুটী হইয়া বাহির হইব। দোকানদার ভাবিল, ক দিন খরিদ-বিক্রয় ভাল হয় নাই, আজ দ্বিগুণ খরিদদারের মুখ দেখিব। গৃহস্থ ভাবিল, আজ দুর্ম্মূল্যতা ঘুচিল, জিনিস পত্র এখন সমান দরে পাইব। গোপাল ভাবিল, আজ গোঠে গাভী লইয়া যাইব। বিলাসী ভাবিল, আজ প্রমোদ-উদ্যানে ভ্রমণের সুবিধা পাইব। আর সেই ব্রাহ্মণ, কমলিনীর স্বামী সেই রাধাশ্যাম ভাগবতভূষণ ভাবিলেন, আজ তন্ন তন্ন করিয়া কৈলাসকে খুঁজিব।

অদ্য ব্রাহ্মণ প্রাতে স্নানাহ্নিক করিয়া, প্রথমত তাঁহার সেই আধ-মণ ভারী মোটটী খুলিলেন। মোটের ভিতর দুইটী পুঁটুলি;—একটা ছোট, অপরটী বড়। যেটী বড়, সেটীতে কেবল হস্তলিখিত পুঁথি, আর ছাপার পুস্তক;—শ্রীমদ্ভাগবত, ষড়্‌দর্শন, শান্তি-পর্ব্ব মহাভারত, মার্কণ্ডেয়-চণ্ডী, বিষ্ণুপুরাণ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, ভগবদ্গীতা, মনুসংহিতা এবং চৈতন্ত-চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ। অন্য পুঁটুলিতে কেবল কয়েকখানি কাচা কাপড় ও চাদর আছে; আর, সেই ছেঁড়া বনাত ও রাজ-প্রদত্ত সেই শালখানিও তাহাতে আছে।

কয়েকদিন বর্ষায় মাটীর ঘর সোঁতা হইয়াছে—এবং জলের অল্প ছাট লাগিয়া সেই মোটটীও অল্প ভিজিয়াছে। শাল্‌টায় বৃষ্টিজল লাগিয়া, কেমন একরকম দাগ ধরিয়াছে।

ব্রাহ্মণ দোয়ারে কম্বল পাতিয়া, আগে—পুঁথি-পুস্তকগুলি রোদে দিলেন। একখানি মাদুরের উপর কাপড়গুলি বিছাইলেন। শালখানি শুকাইবার আর স্থান কুলাইল না। ঘরের কাছেই একটা কদম গাছ ছিল, ব্রাহ্মণ তাহারই উপর সূর্য্য-মুখে, পাট খুলিয়া বাঁধিয়া, শালখানিকে রাখিয়া আসিলেন।

শালখানি আসল কাশ্মীরি—রঙ লাল। মাঝারে এক-বর্গ-হস্ত-পরিমিত জমীতে কেবল কোন কাজ নাই,—বাকি চারিধারে সোণার সূক্ষ্ম কাজ। মূল্য তিন হাজার টাকার কম নহে। রাজা, ফরমাস দিয়া, আপন পছন্দমত কাশ্মীরের প্রধান কারিকর দ্বারা এ শাল তৈয়ারি করাইয়াছিলেন। এ জিনিসটী রাজার বড় সখের, সাধের জিনিস ছিল;—শালের তিন ধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাগরী অক্ষরে লেখা ছিল;—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

চতুর্থ ধারে, তাঁহার নিজ নাম, রাজ্যের নাম এবং সন তারিখ লেখা ছিল।

বড় বেশী সাধের ছিল বলিয়াই, ভক্তিভাবে রাজা শালখানি পণ্ডিতজীকে সেই পৌষের ভয়ঙ্কর শীতে দান করিয়াছিলেন। শালখানি যে, রাজার এত সাধের সামগ্রী, ব্রাহ্মণ তাহা বুঝেন নাই; সাত্ত্বিকভাবে দান বলিয়াই তাহা গ্রহণ করেন।

ব্রাহ্মণ আরও বুঝেন নাই যে, শালখানির এত বাহার! সেই কালরাত্রি পোহাইলে, ব্রাহ্মণ যখন সেই শালের চকমকে, ঝকমকে এত অদ্ভুত, বিচিত্র, বিপরীত বাহার দেখিলেন, তখন তিনি গাত্র হইতে শাল খুলিয়া পুঁথিতে বাঁধিলেন—আর গায়ে দিলেন না। পূর্ব্বের সেই নিজস্ব ছেঁড়া বনাতই অঙ্গের আভরণ হইল।

ভক্তি-দত্ত সামগ্রী মিছা নষ্ট করিতে নাই, তাই আজ ব্রাহ্মণ সেই আর্দ্র শালখানিকে গাছে টাঙ্গাইয়া শুকাইতে দিলেন।

শালের উপর নবোদিত সূর্য্যকিরণ পড়িয়া ঝকঝক করিতে লাগিল। মনে হইল, যেন পূর্ণমার চাঁদখানি আজ গাছে বাঁধা পড়িয়াছে; সেই চন্দ্র-রশ্মিতে সমুদায় বৃক্ষটী

যেন চন্দ্রময় হইয়া উঠিয়াছে। ঘোর দুর্দ্দিনের পর বুঝি বিধাতা সদয় হইয়া, গগনে তপন, ভূতলে চন্দ্র,—এককালে উদয়ের আজ্ঞা দিয়াছেন!

গৃহকার্য্য সমাপন করিয়া, ব্রাহ্মণ ভাগবতের পুঁথি খুলিলেন,—যে যে পাতায় একটু অধিক জল লাগিয়াছিল, সেই সেই পাতা পৃথক্‌রূপে বাছিয়া রোদে দিতে লাগিলেন। পাতা বাছিতে বাছিতে ভাগবতের কোন কোন স্থান মনে মনে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কত হাসিলেন, কত কাঁদিলেন,—শেষে পাতা শুকাইতে দেওয়া ভুলিয়া গেলেন। তখন ভরত-উপাখ্যানে ভবাটবীর ভীষণ বর্ণন নিবিষ্ট মনে পড়িতে লাগিলেন ;—

"লোক-সমূহ মায়াকর্ত্তৃক দুর্গম পথে নীত হয়। সুখলাভেচ্ছায় ভবারণ্যে ভ্রমণ করে। কিন্তু কোথাও কখনও সুখ প্রাপ্ত হয় না। ঐ বনধ্যস্থিত ছয় জন প্রসিদ্ধ দস্যু বলপূর্ব্বক উহাদের সমস্ত ধন অপহরণ করে। কখন উহারা লতা-গুল্ম তৃণে সমাচ্ছন্ন গুহায় প্রবিষ্ট হইয়া তাক্ষ্ণদংশ মশকের দংশনে অস্থির হয়,—কখন বা সম্মুখে মায়ানগর দর্শন করে; কখন বা অগ্নিশিখাতুল্য জাজ্বল্যমান পিশাচকে দেখিতে পায়। বাসস্থান, জল ও ধন—এই দ্রব্যসমূহ উপার্জ্জনের জন্য তাহারা অটবীর নানা স্থানে ভ্রমণ করে। কিন্তু কোথাও বাত্যোত্থিত ধূলিপটলে দিক্ সকল ধূম্রবর্ণ এবং নয়নযুগল আচ্ছন্ন হওয়াতে, উহারা কোন দিক্‌ই নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না। অদৃশ্য ঝিল্লীগণের ধ্বনি শূলের ন্যায় কোন স্থানে উহাদিগের কর্ণ বিদ্ধ করে। কোথাও বা মরীচিকাকে জল জ্ঞান করিয়া ধাবিত হয়। কোথাও খাদ্যসামগ্রীর অভাব হওয়াতে একজন অপরের নিকট যাচ্ঞা করে; কোথাও দাবাগ্নির নিকটবর্ত্তী হইয়া অগ্নিতাপে তপ্ত হয়। কোথাও বা যক্ষের হস্তে পতিত হইয়া প্রাণ হারায়। কোথাও বা বলিষ্ঠ ব্যক্তিকর্ত্তৃক অপহৃত-ধন হইয়া বিষণ্ণচিত্তে শোক করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হয়। কোথাও বা মায়া-নির্ম্মিত পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া সুখিতের ন্যায় মুহূর্ত্তকাল আমোদ প্রমোদ ভোগ করে। কোন স্থানে কোন ব্যক্তি, অজগরকর্ত্তৃক গিলিত এবং বিপিন মধ্যে পতিত হইয়া কিছুই জানিতে পারে না। কোথাও বা বৃশ্চিকাদি-কর্ত্তৃক দষ্ট,—জ্ঞানশূন্য হইয়া, গাঢ়-অন্ধকারাচ্ছন্ন কূপে পতিত হইয়া অবস্থিতি করে। কেহ কোন স্থানে যৎকিঞ্চিৎ মধুর সন্ধানে গমন করত মধুমক্ষিকাকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া যাতনা ভোগ করে। কোথাও কতকগুলি লোক শীত, বাত, রৌদ্র ও বর্ষা হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে না পারিয়া বসিয়া

থাকে। এই ভবারণ্যমধ্যে কোন কোন স্থানে শয্যা, আসন, ধন, রত্ন পরের নিকট হইতে প্রার্থনা করিয়া যখন কেহ কেহ পায় না, তখন সে পরদ্রব্যে অভিলাষী হয় এবং সেই হেতু অপমান সহ্য করে। মায়া যে সকল মনুষ্যকে সংসারমার্গে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি অদ্যাপি যথার্থ তত্ত্ব জানিতে সমর্থ হয় নাই।"

ব্রাহ্মণ ওদিকে ভবাটবীর ভাবে মুগ্ধ,—এদিকে কিন্তু সেই দ্বারের নীচে ঘাসের উপর জমীতে জমিয়া জমিয়া ক্রমশ দশ বার জন ভিখারী আসিয়া দাঁড়াইল। ক্রমে লোক যত অধিক হইতে থাকিল, ততই কলরব বাড়িতে লাগিল। ব্রাহ্মণ তখন ভাগবত গ্রন্থ যথাস্থানে রাখিয়া তাহাদের প্রতি চাহিলেন। দেখিলেন,—মলিনবদন, কোটর-গত চক্ষু, রুক্ষকেশ, বিশুষ্ক উদর, উন্নত পঞ্জর জীর্ণ বাহু, শীর্ণ পদ, ধরাতলে বিকশিত হইয়া সংসার-উদ্যানের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। দেখিলেন,—ভিখারিগণের সর্ব্বাঙ্গ বর্ষাবারি-বিধৌত হইয়া, প্রফুল্ল কাশপুষ্পের ন্যায়, পরিষ্কার দেখাইতেছে। দেখিলেন,—তাহাদের রসনায় আর রস নাই, বিশুষ্ক জিহ্বা যেন বলিতেছে; আজ সমুদ্র পাইলে শোষণ করিয়া ফেলিব। বিশুষ্ক অধর-ওষ্ঠ যেন বলিতেছে, পরিত্যক্ত ফেন-জলে আজ অধর ভিজাইব। চক্ষু বলিতেছে, আজ অন্ন দেখিলে, কেবল এই চক্ষু-তেজেই তুলিয়া লইয়া খাইব। নাসিকা বলিতেছে, আজ ক্ষুদকুঁড়া যা পাইব, তাহাই দীর্ঘনিশ্বাসে উড়াইয়া মুখে পুরিব। পদ বলিতেছে, আজ দশ ক্রোশ দূরে ভিক্ষা মিলিলে তথায় দৌড়িয়া যাইব। বাহুদ্বয় বলিতেছে, আজ সম্মুখে যাহা পাইব, তাহাই বলপূর্ব্বক টানিয়া মুখে তুলিব। উদর বলিতেছে, আজ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গর্ভে ধারণ করিব।

ব্রাহ্মণ ব্যাপার দেখিয়া বড়ই কাতর হইলেন। মধুরস্বরে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, "বাপু হে! তোমাদিগকে এ দুদিন দেখি নাই কেন?"

তাহারা নানাজনে নানারূপ উত্তর করিল। কিন্তু সে কথার মোট ভাবার্থ এইরূপ;—"ঠাকুরজী! ছেলেপিলে সব মরে গেল, আর তাদিগে বুঝি বাঁচাতে পারিলাম না। জল-ঝড়ে এ দুদিন ভিক্ষায় বা'র হতে পারি নাই,—ঠাকুরজী! আমরা পেটের জ্বালায় জ'লে মরিলাম!"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমার এমন সম্পত্তি কি আছে যে, তোমাদিগকে দিয়া সন্তুষ্ট করিব? আজ এক একটী পয়সা দিতেছি, তাহাই হৃষ্টচিত্তে প্রত্যেকে গ্রহণ কর।"

ভিখারীরা বলিল, "না, ঠাকুরজী! আমাদের পয়সায় কাজ নাই। আজ আমরা আপনার পাতে পেসাদ পাইব। ছেলে পিলে লইয়া পেট পূরিয়া পেসাদ খাইব।"

ব্রাহ্মণ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমি একলা মানুষ,—এক পোয়া চাউল রাঁধি,—আমার প্রসাদে তোমাদের পেট ভরিবে কেন?—তরকারির মধ্যে শাক, নুন আর তেল। এর খাবেই বা কি, আর খেয়ে তৃপ্ত হবেই বা কি?"

ভিখারী-দল। ঠাকুরজী! আপনার পাতের আধ মুঠা ক'রে ভাত পেলেই আমাদের ঢের হবে,—তাতেই আমাদের ভোরপুর হবে! ঠাকুরজী! আপনার পাতের একটা ভাত পেলে, তাই অমৃত ব'লে খাব।

ব্রাহ্মণের চোখে জল আসিল। বহু কষ্টে অশ্রুবেগ সংবরণ করিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"আচ্ছা, তবে তাই হবে।"

ভিখারীরা আনন্দে "জয় রাধে কৃষ্ণ জয়" "জয় রাধে জয়" ধ্বনি করিয়া উঠিল।

ব্রাহ্মণ। তোমরা এখন অন্যত্র ভিক্ষার্থ যাও—বেলা আড়াই প্রহরের সময় আসিও।—তোমরা সবশুদ্ধ কয় জন লোক বল দেখি?

ভিখারী। এখন আমরা এগার জন আছি,—ছেলে পিলে লইয়া প্রায় ২০ জন হইবে।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর তাহারা চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ মধ্য-পূজায় বসিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

পূজা শেষ হইলে, দোকানদার ব্রাহ্মণের কাছে আসিয়া যোড়হাতে বলিল, "ঠাকুরজী! করিয়াছেন কি?—শুনিতেছি, আপনি আজ কাঙ্গালি-ভোজন করাইবেন। এ যে বড় ভয়ঙ্কর কথা!"

ব্রাহ্মণ। কেন?—এত ভয় কিসের?

দোকানদার। এ কথা একবার রাষ্ট্র হ'লে এখনি পাঁচ শত কাঙ্গালী একত্র হবে।—আপনি খাওয়াবেন কি ক'রে?

ব্রাহ্মণ। এত হবে কেন?—কুড়ি জন ভিখারী আসিবে বলিয়া গিয়াছে! না হয়, কুড়ির জায়গায় পঞ্চাশই হউক! আর কত বেশী হবে?

দোকানদার। ঠাকুরজী! এ মথুরা বৃন্দাবনের ব্যাপারত আপনি জানেন না,—পাঁচ জন লোক খেতে বোল্‌লে পঞ্চাশ জনের আয়োজন করিতে হয়। যাহোক, আপনি কুড়িজন লোককে আসিতে বলিয়াছেন,—অন্তত এক শত লোকের উপযুক্ত উদ্যোগ করুন। কিন্তু আপনি একা, এত লোকের রসুই করিতে পারিবেন কেন?

ব্রাহ্মণ। (হাসিয়া) রন্ধনের জন্য কোন চিন্তা নাই. আমি একাই পাঁচ শত লোককে রাঁধিয়া খাওয়াইতে পারি। সে ভাবনা তুমি ভাবিও না। এখন লোকগুলি যাহাতে ভাল করিয়া খাইতে পায়, তাহার বন্দোবস্ত কর।

ব্রাহ্মণের পুঁটলিতে ন্যাকড়ায় বাঁধা ২৬টী টাকা ছিল। সেই ন্যাকড়ামধ্য হইতে দশ টাকা লইয়া দোকানদারের হাতে দিলেন। দোকানদার বলিল, "আমি টাকা লইব না,—যা জিনিস পত্র দরকার হইবে, আমরা দুই দোকানে ভাগাভাগি করিয়া দিব। আপনি দশ টাকা দিতে কোথা পাবেন? টাকা আমি কিছুতেই লইব না।"

ব্রাহ্মণ হাসিয়া বলিলেন, "তা কি কখন হয়?"

দোকানদার। না ঠাকুরজী! টাকা আমি লইতে পারিব না!—এই আপনার টাকা লউন।

ব্রাহ্মণ আবার মৃদুমন্দ মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমার এ পুণ্যাংশের ভাগ তোমাকে দিব কেন?—তোমার অর্থ ব্যয়ের যদি এতই ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আমার এই অনুরোধ,—তুমি অন্য একদিন এই দশ টাকা খরচ করিয়া কাঙ্গালী ভোজন করাইও।"

দোকানদার আর বাক্যব্যয় না করিয়া টাকা লইয়া চলিয়া গেল।

তখন স্বতন্ত্র রন্ধন-শালায় রন্ধনের মহা ধুম পড়িল। ব্রাহ্মণ স্বয়ং ইন্দেরা হইতে কলসী করিয়া, জল তুলিয়া জালা ভর্ত্তি করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে দোকানদার সমগ্র দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিল। দেড় মণ চাল, ত্রিশ সের ডাল, আধমণ দই, পাঁচসের চিনি, উপযুক্ত মত নুন, তেল, তরকারি, হাঁড়ি, কাঠ, সরা, মালসা, হাতা, বেড়ী সমস্তই আসিয়া পৌঁছিল।

রাধাশ্যামের রন্ধন।

ব্রাহ্মণ কোমর বাঁধিয়া দুইটা উনন ধরাইলেন। বড় হাঁড়ি করিয়া একটায় ভাত চড়িল, অন্যটায় ডাল চড়িল, বেলা তখন দুই প্রহর।

ভাত ডাল চড়িলে, ব্রাহ্মণ শীলে ঝাল হলুদ বাঁটিতে আরম্ভ করিলেন। আর, মাঝে মাঝে ফুটন্ত ভাতে কাঠি দিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের যেন ভীমপরাক্রম হইল। দেখিয়া শুনিয়া, দোকানদার অবাক্।

বেলা তিন প্রহরের মধ্যে সমস্ত রন্ধনকার্য্য শেষ হইল। শ্যামাঙ্গ ব্রাহ্মণের মুখ অগ্নির উত্তাপে যেন লালবর্ণ দেখাইতে লাগিল। সর্ব্বাঙ্গ দিয়া অবিরল ঘাম ঝরিতে লাগিল। তথাচ ব্রাহ্মণের বিরাম নাই—স্বকার্য্য-সাধনের নিমিত্ত চারিদিকে বন্ বন্ ঘুরিতে লাগিলেন।

প্রায় একশত পঁচিশ জন ভিখারী আহারার্থী হইয়া দাঁড়াইল। ব্রাহ্মণ, দোকানের সম্মুখে, কদমতলার বিস্তীর্ণ উঠানে ভিখারিগণকে বসাইয়া দিলেন। প্রত্যেককে এক একখানি পাতা বণ্টন করিলেন। ব্রাহ্মণ তখন সেই বৃহৎ ভাতের হাঁড়ি কাঁধে করিয়া আনিয়া, ভিখারিগণের মধ্যস্থলে রাখিলেন,—তার পর সেইরূপে আর দুই হাঁড়ি ভাত ও ডাল এবং এক হাঁড়ি শাক আনিলেন। দ্রুতপদে দৌড়াদৌড়ি করিয়া এই সমস্ত কার্য্য সমাধা করিলেন। বেগবান্ ব্রাহ্মণের দেহ যেন বিশাল, বিস্তৃত, দীর্ঘ হইয়া উঠিল। নয়নদ্বয় হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। বাহুদ্বয় যেন আজানুলম্বিত হইল। বদনমণ্ডলে মূর্ত্তিমান কর্ত্তব্যকর্ম্মের ছবি যেন কে আঁকিয়া দিল।

আহারীয় সামগ্রী আনীত হইলে কাঙ্গালিদল উল্লাসে বলিয়া উঠিল ;—

জয় জয় রাধে! জয় জয় রাধে! জয় জয় রাধে!

বীরকেশরী ব্রাহ্মণ পরিবেশন করিতে দাঁড়াইলে, আবার ধ্বনি উঠিল ;—

জয় কৃষ্ণ রাধে! জয় হরি রাধে! জয় শ্যাম রাধে!

প্রথম, পাতে পাতে লবণ নেবু দেওয়া হইলে, তৃতীয় বারে দুই দলে বিভিন্ন প্রকার ধ্বনি উঠিল,—

এক দল।—রাধা রাধা বল।

অন্য দল।—হরি হরি বল॥

এক দল।—রাধা রাধা বল।
অন্য দল।—হরি হরি বল॥
এক দল।—রাধা রাধা বল।
অন্য দল।—হরি হরি বল॥

রাধা-নামে এবং হরি-নামে পৃথিবী পূর্ণ হইয়া উঠিল। অবশেষে সেই মহাধ্বনি আকাশ-পথে উড়িয়া চলিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

পশ্চাদ্ভাগে এক বিষম গোলযোগ উত্থিত হইল। হাকাহাঁকি দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ হইল;—"ঐ যায়, ঐ পলায়,—ধর্, ধর্, ধর্"— শব্দ শুনা গেল। সর্ব্বলোক যেন ভয়-চকিত হইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল। ব্রাহ্মণও সেই দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন। বামে চক্ষু হেলাইয়া কদম্ববৃক্ষ পানে চাহিলেন। দেখিলেন, বৃক্ষের উপর রাজপ্রদত্ত সেই শালখানি আর নাই। আরও দেখিলেন,—দুইজন দোকানদার দ্রুতপাদ-বিক্ষেপে একটা লোকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে; সে লোকটাও প্রাণপণে নক্ষত্র-বেগে দৌড়িতেছে। ব্রাহ্মণ ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "ও কিছুই নহে,—তোমরা উদ্বিগ্ন হইও না—"

ভিখারিগণ বলিল, "কি ঠাকুরজী! কি হইয়াছে?—"

ব্রাহ্মণ। এই কদমগাছে একখানি শাল শুকাইতেছিল,—কে লইয়া পলাইতেছে,—তাই দোকানদারেরা তাহাকে ধরিতে ছুটিয়াছে,—ও কিছুই নয়,—তোমরা খাইতে ব'স!

ব্রাহ্মণ তখন প্রত্যেকের পাতে ভাত দিতে আরম্ভ করিলেন। ওদিকে চোর এবং দোকানদারদ্বয় যে কোথায় নিভাও হইয়া দৌড়িয়া গেল, তাহা আর কেহ দেখিতে পাইল না। ভাত দেওয়া শেষ হইলে, শাক দেওয়া আরম্ভ হইল। শাক দিতে না দিতেই

কেহ কেহ শুধু-ভাত খাইতে আরম্ভ করিল। এমনি জঠর-জ্বালা! কোন পাতে শাক দিতে গিয়া দেখেন, মোটেই ভাত নাই,—কেবল নুন ও নেবুর সাহায্যে সমস্ত অন্নই উদরসাৎ হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ তখন ভিখারিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাপু হে! একবার একটু ক্ষান্ত হও,—আমি একাকী;—পরিবেশনে একটু বিলম্ব হইতেছে বটে,—কিন্তু উপায় নাই;—একটু ধৈর্য্য ধর—শুধু-ভাত খাইও না,—শাক আর ডাল শীঘ্রই দিতেছি।"

ব্রাহ্মণের বাক্যে ভিখারিগণ শুধু ভাত খাইতে ক্ষান্ত থাকিল।

ব্রাহ্মণ শাকের থালা রাখিয়া, যে যে পাতে ভাত ফুরাইয়াছিল, সেই সেই পাতে আবার ভাত দিলেন। তার পর আবার শাক দিতে আরম্ভ করিলেন। শাক দেওয়া শেষ হইলে, ব্রাহ্মণ কাঙ্গালীগণকে বলিলেন, "আর একটু থাম,—আর অল্পক্ষণ অপেক্ষা কর,—আমি শীঘ্রই ডাল দিতেছি,—পাতে পাতে ডাল পড়িলে, তবে খাইতে আরম্ভ করিও।"

আর বিলম্ব সহে না; মন-মাতঙ্গ আর ধৈর্য্য-অঙ্কুশ মানে না। জঠরানল জ্বলিয়া উঠিলে, উপদেশ ভাল লাগে না। ব্রাহ্মণের কথা ভিখারিগণকে বিষবৎ বোধ হইল। কেহ কেহ হাতে গরাস তুলিয়া খাই-খাই করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ শীঘ্রহস্তে ডাল দিতে দিতে আবার বলিলেন, "আর একটু থাক,—ডাল দেওয়া প্রায় হইয়া আসিল।" ক্ষুৎ-ভিখারিগণ ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া, হাতে ভাত করিয়া বসিয়া রহিল।

ঐ দেখ,—তীরবেগে পাঁচজন অশ্বারোহী ছুটিয়া আসিতেছে। অশ্ব-ক্ষুরধ্বনিতে ক্ষিতিতল কাঁপিতেছে। ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়া ছুটিয়াছে নাকি? ক্রমে দড় দড় শব্দ নিকটবর্ত্তী হইল। ভিখারিগণ চমকিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিল।

অশ্বারোহিগণ অস্ত্রশস্ত্রে বিভূষিত। সূর্য্যকিরণে শাণিত তরবারি ঝলমল করিতেছে। সেই রাগ-রক্তিম মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হইল, ইহারা আজ সম্মুখে যাহাকে পাইবে, তাহাকেই কাটিয়া ফেলিবে।

অশ্বারোহিগণ মধ্যে দুই জন শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ,—তিন জন কৃষ্ণাঙ্গ হিন্দুস্থানী।

দোকান-ঘরের সম্মুখস্থ পতিত-জমির উপর ভিখারীরা ভাত খাইতে বসিয়াছিল। সেই পতিত-জমীর পরই সদর রাস্তা। স্থানের সঙ্কীর্ণতা বশত কয়েকজন ভিখারী রাস্তা

ঘেঁসিয়া বসিয়াছিল। পাতা, পতিতজমীর উপরেই ছিল ; কিন্তু তাহাদের দেহ ছিল, রাস্তার উপর। ঘোড়া-চাপা পাড়বার ভয়ে প্রায় পঁচিশ জন ভিখারী রাস্তা হইতে উঠিয়া, দৌড়িয়া দোকানের কাছে পলাইয়া আসিতে লাগিল। একজন হিন্দুস্থানী অশ্বারোহী বলিল, "ডাকু সব ভাগ্‌তা হ্যায়—জল্‌দি চলিয়ে—"

দেখিতে দেখিতে অশ্বারোহিগণ সম্মুখবর্ত্তী হইল। যাহারা প্রাণভয়ে পলাইতেছিল, তাহাদের কাছে দুই জন অশ্বারোহী গিয়া অথালি পাথালি প্রহার আরম্ভ করিল। "বাপ, বাপ,—গেলাম, মরিলাম" বলিয়া ভিখারীরা বিকট চীৎকার করিতে লাগিল।

অন্য তিন জন অশ্বারোহী বন্দুক উঁচাইয়া, পথে দাঁড়াইয়া রহিল।—বলিল, "যে পলাইবে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ গুলি করিয়া মারিব।" কাঙ্গালিগণ হাতে ভাত করিয়া ভেউ ভেউ কাঁদিতে লাগিল। অশ্বারোহিত্রয় কখন ধীরে, কখন জোরে ঘুরিয়া ফিরিয়া বন্দুক ধরিয়া, রাজপথে খেলাইয়া বেড়াইতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ দেখিলেন, সর্ব্বনাশ উপস্থিত। অত্যন্ত দৃঢ়মনা হইলেও তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। ব্যাপার কি ?—কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এখন কর্ত্তব্য কি ?—তাহাও ঠিক করিতে পারিলেন না। উপায় কি ?—তাহাও কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

তথাচ ব্রাহ্মণ সাহসে ভর করিয়া একজন হিন্দুস্থানী অশ্বারোহীর নিকট গিয়া যোড়হাতে, কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "মহাশয়, বুঝাইয়া বলুন, ব্যাপার কি ?—হইয়াছে কি ?—ঘটিয়াছে কি ? আমরা যাহা জানি, তৎসমস্তই আপনাকে বলিব,—কিছুই গোপন করিব না ;—আপনি বলুন, ব্যাপার কি ?"

অশ্বারোহী প্রথমত ভ্রূকুটী করিল। পার্শ্বস্থ দ্বিতীয় অশ্বারোহী, প্রথম অশ্বারোহীকে ধীরে ধীরে বলিল, "বামুনকে একবার কাছে ডাকিয়াই সে কথা জিজ্ঞাসা কর না কেন ? হয়ত কথায় কথায় অনেক কথা বাহির হইয়া পড়িবে।"

তখন প্রথম অশ্বারোহী ব্রাহ্মণকে বজ্রনিনাদে ডাকিল, "এ দিকে এস।"

এমন সময় অদূরে দেখা গেল, প্রায় পঞ্চাশ জন সশস্ত্র কনষ্টেবল দ্রুতপদে অগ্রগামী হইতেছে। একজনের হস্তে প্রস্ফুটিত রক্তকমলের ন্যায় সেই শাল খানি চারিদিকে শোভা বিকিরণ করিতেছে।

প্রথম অশ্বারোহীর নিকটবর্ত্তী হইলে, সে ব্রাহ্মণকে কঠোরস্বরে জিজ্ঞাসিল,—

"শালের সংবাদ তুমি কি জান শীঘ্র বল ?—মহারাজ শ্রী——সিংহের অন্যান্য সম্পত্তি কোথায় আছে, তাহাও শীঘ্র দেখাইয়া দেও।"

ব্রাহ্মণ, এ কুরুক্ষেত্র ব্যাপারের কতক বিবরণ বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,—"মহাশয়, ঐ শালখানি আমার। ঐ রাজাই আমাকে উহা দান করিয়াছেন। শালে জল লাগায়, আমি অদ্য উহা কদম গাছে শুকাইতে দি। তা, এইমাত্র গাছ হইতে উহা কে লইয়া পলাইয়াছিল। চোর যদি গ্রেফতার হইয়া থাকে, উত্তম কথা!—কিন্তু অনর্থক এই ক্ষুধার্থ কাঙ্গালীগণকে কষ্ট দেন কেন?"

রক্তলোচন অশ্বারোহী ভ্রূভঙ্গী করিয়া হাসিল। পার্শ্বস্থ অশ্বারোহিদ্বয়ের সহিত সে কি কাণাকাণি করিল।

এমন সময় সেই পঞ্চাশজন কনষ্টেবল রঙ্গভূমে গিয়া পৌঁছিল। তাহাদের মধ্যস্থলে দোকানদারদ্বয়,—হাতে হাতকড়া, পায়ে বেড়ী। যে ব্যক্তি প্রকৃত শাল-চোর, তাহারও হস্তপদ বিষম বদ্ধ।

কনষ্টেবল-দল আসিবামাত্র প্রধান শ্বেতাঙ্গ অশ্বারোহী প্রথমত ব্রাহ্মণকে ধরিয়া বাঁধিতে আজ্ঞা দিল। আজ্ঞামাত্র ব্রাহ্মণ ধৃত হইলেন; হস্তপদে লৌহ-শৃঙ্খল পরিলেন। ধৃত হইবার সময় ব্রাহ্মণ কোনও বাধা, বিঘ্ন বা আপত্তি উত্থাপন করিলেন না। নীরবে সমস্ত সহিলেন। কেবল মুখে একবার বলিলেন, "আহা! কাঙ্গালিগণ কিছুই খাইতে পাইল না। আহা! তারা মুখের গ্রাস মুখে তুলিয়া নামাইয়া রাখিল!—বিধির কি এতই বিড়ম্বনা?"

ব্রাহ্মণকে ধৃত হইতে দেখিয়া ভিখারিগণ ভয়ে চারিদিকে পলায়ন আরম্ভ করিল। মহা কলরব উত্থিত হইল। অদূরে প্রায় দুই সহস্র দর্শক একত্র হইল। তখন পঞ্চজন অশ্বারোহী এবং পঞ্চাশ জন পদাতি বীরমদে মত্ত হইয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। পাঁচটা বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ হইল। শূন্যে শাণিত তরবারি ঘুরিতে লাগিল। অশ্বারোহিগণ দড়বড় দড়বড় শব্দে সেই ভিড়-মধ্যে ঘোড়া লইয়া প্রবেশ করিল। ঘোড়ার চাপানে চারি পাঁচটা লোক পড়িয়া গেল। পদাতিগণ তাহাদিগকে ধরিয়া প্রাণপণে প্রহার আরম্ভ করিয়া দিল। একটী ছোট ছেলে অশ্বপদতলে বিমর্দ্দিত হইয়া প্রাণ হারাইল। দুইটী স্ত্রীলোক ঠেলা-ঠেলিতে পড়িয়া গিয়া আবধুন হইল। প্রায় দশ

জন পুরুষ প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া গভীর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। কাহারও নাক ভাঙ্গিয়া গেল; কাহারও আঙ্গুল কাটিয়া গেল; কাহারও হাত ছেঁচিয়া গেল; কাহারও মাথা দিয়া হু হু রক্ত পড়িতে লাগিল। কেহ বা পলাইবার সময় পা পিছলিয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইল। দেখিতে দেখিতে পঞ্চাশ জন ভিখারী বাঁধা পড়িল। তখন জয়োল্লাসে অশ্বারোহিগণ কেবল ছুটাছুটি করিতে লাগিল। একজন শ্বেত অশ্বারোহী কিছু রঙে ছিল। সে, ঘোড়া হইতে আপনা আপনি হঠাৎ চিৎপাত হইয়া পড়িল। মাথায় বিষম আঘাত লাগিল। চারিজন কনষ্টেবল তাহাকে ধরাধরি করিয়া ধীরে ধীরে বাসাভিমুখে লইয়া চলিল।

এদিকে সেই দোকানদারের ঘরে খানাতল্লাসি আরম্ভ হইল। সিন্দুক, পেড়া, বাক্স, যেখানে যা ছিল, সমস্তই উঠানে নামাইয়া খোলা হইতে লাগিল। কাপড় চোপড়ে, থালা-বাটীতে, টাকা-কড়ীতে উঠান পূর্ণ হইয়া উঠিল। দোকান হইতে বস্তা বস্তা চাল, ডাল, হাঁড়া হাঁড়া ঘি, তেল, বাহির করিয়া পথে ছড়াইয়া ফেলা হইল। স্ত্রীলোকের আবরু শরম আর রহিল না। প্রত্যেকের কাপড় ঝাড়া লইয়া বাড়ী হইতে একে একে কুলবধূগণকে বাহির করা হইল। করুণ বিলাপস্বরে গৃহ পূর্ণ হইল! নয়নজলে বুক ভাসিল!

এইরূপে রণজয়ী হইয়া, সেই অশ্বারোহী এবং পদাতি-সৈন্য, সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় পঁচাশী জন বন্দীকে সঙ্গে লইয়া, জয়ডঙ্কা বাজাইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল!

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন এলাহাবাদের কোন ইংরেজী-সংবাদপত্রে এইরূপ তারের সংবাদ প্রকাশিত হইল;—

"মথুরায় অদ্ভুত-কাণ্ড ঘটিয়াছে। পুলিস-সৈন্যের এরূপ অপূর্ব্ব বীরত্ব ভারতবর্ষে আর কখনও দৃষ্ট হয় নাই। পুলিস-অধ্যক্ষ যেরূপ সৎসাহস, কার্য্য-কৌশল এবং রণ-দক্ষতা দেখাইয়াছেন, তাহা ইতিহাসে স্বর্ণ-অক্ষরে অঙ্কিত হইবার যোগ্য। সংবাদ

বড়ই আনন্দ-দায়ক। আজ তিন বৎসরকাল যে দস্যুদল সুদূর বঙ্গদেশ হইতে দিল্লিপর্য্যন্ত ডাকাতি, লুণ্ঠন, পরস্ত্রাপহরণ, নরহত্যা, গৃহদগ্ধ করিতেছিল, তাহার অধিকাংশ লোক, মায় দলপতি ধরা পড়িয়াছে। আজ তিন মাস হইল, এই মথুরা সহরে চোর ডাকাতির বিষম প্রাদুর্ভাব হয়। পুলিস-অধ্যক্ষ বিশেষ যত্ন-চেষ্টা করিলেও চোর ধরিতে পারেন নাই। ইতিপূর্ব্বে বিহাররাজ শ্রীযুক্ত——সিংহের প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার দ্রব্য রেল গাড়ীতে অপহৃত হয়। পুলিস-সাহেব অভাবনীয় কৌশলে বামাল শুদ্ধ চোরগণকে গ্রেফ্‌তার করিয়াছেন। সেই রাজ-দ্রব্যের অপহারকগণও এই ডাকাত-দলের অন্তর্ভূত। ইহাদের দলে প্রায় পাঁচ শত লোক আছে। অদ্য ইহারা ছদ্ম-বেশে প্রকাশ্য রাজ-পথের উপর বসিয়া আনন্দ-ভোজন করিতেছিল। পুলিস-অধ্যক্ষ সংবাদ পাইয়া তৎ-ক্ষণাৎ সে স্থানে উপস্থিত হন। তাঁহার সঙ্গে পঞ্চাশজন মাত্র লোক ছিল; এদিকে ডাকাতদল সংখ্যায় পাঁচ শতের অধিক। পুলিস-অধ্যক্ষকে দেখিয়া তাহারা মার্‌মার্‌ শব্দে তাঁহার উপর ধাবিত হইল। অৰ্দ্ধঘণ্টা কাল যুদ্ধ হয়। অধ্যক্ষ মহাশয়, সেই ঘোর-যুদ্ধের মধ্যস্থলে স্বয়ং গিয়া যুদ্ধ করেন। দুইবার তাঁহার জীবন যায় যায় হইয়াছিল। একবারে দশটা লাঠির আঘাত তাঁহার মাথায় পতিত হওয়ায় তিনি অশ্ব হইতে পড়িয়া যান। প্রথমত সকলে ভাবিল, অধ্যক্ষ প্রাণ হারাইয়াছেন। শেষে দেখা গেল, তিনি জীবিত আছেন। ক্ষণেক পরে তিনি বীরদর্পে ভূমি হইতে উঠিয়া বলিলেন, আমি আবার যুদ্ধ করিব। কিন্তু সহচরগণের অনুরোধে তিনি যুদ্ধে ক্ষান্ত থাকিলেন। এই বিষম যুদ্ধে শত্রুপক্ষীয় বার জন লোক আহত, তিনজন হত এবং পঁচিশ জন বন্দী হইয়াছে। ভারতের আজ কি শুভ দিন! প্রজাগণ এইবার নিষ্কণ্টকে, নিরুপদ্রবে, নিঃশঙ্কচিত্তে তাহাদের পরিশ্রম-অর্জ্জিত রুটী খাইতে পারিবে।"

সম্পাদক মহাহর্ষে এই তারের সংবাদের উপর নিজ মন্তব্য লিখিলেন,—"এই যুদ্ধে পুলিস-অধ্যক্ষের যদি কোন অঙ্গহানি হইয়া থাকে, তবে এখনি তাঁহাকে পুরা পেন্‌শনে গবর্ণমেণ্টের অবসর দেওয়া কর্ত্তব্য। অদ্য আমরা এই যুদ্ধের বিশেষ বিবরণ বর্ণন করিবার জন্য একজন বিশেষ সংবাদ-দাতাকে রণ ক্ষেত্রে পাঠাইলাম। একজন চিত্রকরও সঙ্গে চলিল; তিনি যুদ্ধের ছবি আঁকিয়া পাঠাইবেন।"

রয়টার এই সংবাদ তৎক্ষণাৎ তারযোগে ইংলণ্ডে পাঠাইলেন।

নানা দেশীয় সংবাদপত্রে এই বিষয় উদ্ধৃত, অনুবাদিত, পরিবর্ত্তিত, পরিশোধিত, সংস্কৃত হইতে লাগিল।

ভারত-ভুবন ভরিয়া উঠিল। চারিদিকে ধন্য ধন্য ধ্বনি পড়িয়া গেল। সেই উলঙ্গ-সন্ন্যাসীর কথা স্মরণ করিয়া, বন্দী ব্রাহ্মণের অধরপ্রান্তে হাসি আসিল।

পাঠক! ব্যাপার বুঝিলেন কি? "চোর ধরিয়া দিতে পারিলে হাজার টাকা পুরস্কার দিব"—রাজার এই ঘোষণার কথা স্মরণ আছে কি?—ভারতের প্রত্যেক পুলিস থানায় এই ঘোষণা প্রচারিত হয়। টাকার লোভে পুলিস-কর্ম্মচারিগণ চোর-অন্বেষণে বহু চেষ্টা করে। কিন্তু এতদিন কৃতকার্য্য হয় নাই।

অন্নকষ্ট-নিবন্ধন মথুরা সহরে প্রকৃতই সে সময় চোর-ডাকাইতের অধিক প্রাদুর্ভাব ঘটে। পুলিসও চোর ধরিবার জন্য বড়ই বিব্রত হয়। দুই মাস মধ্যে এক শত চুরি এবং দশটা হাপ্-ডাকাতি হইলেও একজনও চোর বা ডাকাত এপর্য্যন্ত গ্রেফ্‌তার হয় নাই। পুলিস লজ্জিত এবং বিমর্ষ ছিল।

কদম গাছে বহুমূল্যের শাল টাঙ্গান দেখিয়া একজন সঙ্গতিপন্ন পাকা বদমাইস চোর, প্রাতঃকাল হইতেই তাহা অপহরণ করিবার জন্য আঁচ করিয়া ওত করিয়া ছিল। কিন্তু সুবিধা না পাইয়া, এতক্ষণ রাস্তা দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছিল। যখন কাঙ্গালিগণ ভাত খাইতে বসিল, যখন পরিবেশন-কার্য্যে ব্রাহ্মণ বিব্রত হইলেন, যখন দোকানদারগণ কাঙ্গালী-ভোজন একাগ্রমনে দেখিতে লাগিল,—তখন সেই চোর সুবিধা পাইয়া, গাছ হইতে শাল খুলিয়া লইয়া দৌড়িল। খানিক দৌড়িয়া গেলে, দোকানদারদ্বয়ের তাহার উপর নজর পড়িল। তাহারাও ভোজন-স্থানে কোন গোলমাল না করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। খানিক দূর গিয়া দৌড়িতে দৌড়িতে তাহারা চেঁচাইতে লাগিল,—"ঐ যায়, ঐ পলায়।" যে পথে পুলিস-থানা, ঘটনাক্রমে চোর সেই পথেই গিয়া পড়িল। চোর তখন হাত হইতে শাল ফেলিয়া দিল। একজন দোকানদার শাল কুড়াইয়া লইল। এমন সময় পাঁচজন কনষ্টেবল এবং একজন জমাদার আসিয়া তাহাদের সকলকে গ্রেফ্‌তার করিল। দোকানদারেরা বলিল,—"এই চোর, শাল লইয়া পলাইতে-ছিল,—আমরা ধরিতে আসিয়াছি।" চোর বলিল, "একজন ব্রাহ্মণ এই শাল আমাকে

বাজারে বেচিতে পাঠান। কিন্তু এই দুইজন দোকানদার, জোর করিয়া আমার কাছ হইতে শালখানি কাড়িয়া লইতে চায়। তাই আমি প্রাণ-ভয়ে থানায় পলাইয়া আসিতেছি। সেই বামুনকে এই দোকানদার বাসা দিয়াছে। বামুনের কাছ থেকে কম দামে, বামুনকে ঠকাইয়া, এই বহু মূল্যের শালখানি কিনিবার মতলব,—ইহারা করিয়াছিল। কিন্তু বামুন এত কম দামে ইঁহাদিগকে শাল না দিয়া, আমাকে বাজারে যাচাই করিয়া বেচিতে বলে। তাই ইহাদের জাতক্রোধ হইল,—জোর করিয়া শাল কাড়িয়া লইবার জন্য আমার পেছু পেছু ছুটিল। এই দুইজন দোকানদার বড় বদমাইস। ইহারা ফাঁসুড়ে, লোকের গলা কাটে, চোরাই-মাল খরিদ করে।"

প্রকৃত চোরের নাম গোবর্দ্ধন। সে কাঁদিতে কাঁদিতে আবার বলিল, "দোহাই হুজুর! আমাকে রক্ষা করুন! এই দোকানদারেরা আমাকে কেটে ফেল্‌বে বলেছে। আপনি বিচার ক'রে, যদি আমার দোষ দেখেন, তবে আমাকে ফাঁসি দিন।"

গোবর্দ্ধনের বক্তৃতা ও ক্রন্দন শেষ হইলে, জমাদারের অনুমতিক্রমে তিনজনকেই থানার ঘরে লইয়া যাওয়া হইল।

একজন হিন্দুস্থানী পুলিস-ইন্সপেক্টার সেই অপূর্ব্ব শালখানি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সে হঠাৎ একবারে আহ্লাদে স্ফীত হইয়া লাফাইয়া উঠিল; দরজার চৌকাঠ তাহার মাথায় ঠক্ করিয়া ঠেকিল; আনন্দে ইন্সপেক্টার সে আঘাত দৃক্‌পাত করিল না। তখন সে কাণে কাণে পুলিস-অধ্যক্ষকে কি কথা বলিল। অধ্যক্ষ, শাল লইয়া স্বয়ং দেখিলেন। ইন্সপেক্টার শালের নাগরী লেখা পাঠ করিল, "শালের অধিকারী মহারাজ শ্রী———সিংহ।" অধ্যক্ষ-সাহেব আহ্লাদে বলিলেন, "হাজার টাকা পাইলে তোমাকে সিকি ভাগ দিব, শীঘ্র চোরের অনুসন্ধান কর।"

গোবর্দ্ধন সব কথা কাণ পাতিয়া শুনিতেছিল। সে যোড়হাতে বলিল "হুজুর! এই দোকানদার দুজনের ঘরে আজ পাঁচ শত ডাকাত একত্র হয়েছে। একা গেলে চলিবে না। আপনারা সকলেই বন্দুক হেতের লইয়া চলুন। সঙ্গে ৫০।৬০ জন কনষ্টেবল লউন। নচেৎ তারা আপনাকে কাটিয়া ফেলিবে।"

[illegible] চারিদিকে সাজ সাজ সাড়া পড়িয়া গেল। বড় সাহেব এবং ছোট সাহেব [illegible] ঘোড়ায় চড়িলেন,—অন্য তিন জন ইন্সপেক্টার অশ্বারোহণে তাহাদের

অনুগমন করিল। ঘোড়া ছুটাইবার কালে অধ্যক্ষ, জমাদারকে বলিয়া গেলেন, "তুমি সত্বর ৫০ জন কনষ্টেবল লইয়া আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস। এখন এই তিন ব্যক্তিকেই বাঁধিয়া সঙ্গে লও।"

ইহার পর যত ঘটনা ঘটিল, তাহা পাঠক অবগত আছেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

আজ মথুরা নগরে ঘরে ঘরে হাহাকার! ধনবান্, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, সন্ন্যাসী, বিষয়ী,—প্রায় সকলেরই মুখকান্তি পরিম্লান, বিষাদময়। ক্রমে সকলেই জানিল, সকলেই বুঝিল, সকলেই জানিল,—ব্রাহ্মণ সাধু, বাঙ্গালিগণ নিতান্ত নিরপরাধ। এ কথায় যতই আন্দোলন হইতে লাগিল, ততই বন্দিগণের উপর নগরবাসীর সমধিক সহানুভূতি জন্মিতে লাগিল। অনেকের চক্ষু দিয়া শোকাশ্রু প্রবল বেগে বহিল!

রামপ্রসাদ নামক একজন সম্ভ্রান্ত জমাদার, কয়েকজন ভদ্র ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া বন্দিগণকে জামীনে খালাস করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এক দরখাস্ত করিলেন। দরখাস্ত তৎক্ষণাৎ নামঞ্জুর হইল। রামপ্রসাদের উকীল ধমক খাইল।

রামপ্রসাদ তেজী পুরুষ। তিনি সেই দিনই সন্ধ্যাকালে মাজিষ্টর সাহেবের কুঠিতে গিয়া সাহেবকে বলিলেন, "বড় দুঃখের বিষয়, আপনি বিনা কারণে অদ্য জামীন নামঞ্জুর করিয়াছেন।"

মাজিষ্টর। বড়ই দুঃখের বিষয়, আপনি ডাকাতদলের তদ্বিরকারী হইয়াছেন।

রামপ্রসাদ। আমি, সাধু এবং নিরপরাধ ব্যক্তিগণের [illegible] আপনি কোন্ প্রমাণে উঁহাদিগকে ডাকাত সাব্যস্ত করিলেন? [illegible] বিচারের পূর্ব্বেই আপনার এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করা অসঙ্গত এবং অন্যায় নহে কি?

মাজিষ্টর। মোকদ্দমার কথা আপনি বাসায় বলিবেন না,—যে ব্যক্তি বিচারকের মন, কৌশলে ভুলাইতে আইসে, সে আইন অনুসারে দণ্ডনীয়। আপনি ও-সব কথা আর কহিবেন না। অন্য কেহ হইলে, আজ এখনি তাহার সমুচিত প্রতিফল দিতাম।

রামপ্রসাদ। উপরে ধর্ম্ম আছেন; তিনি এত অবিচার-অত্যাচার কখনই সহ্য করিবেন না। মানুষে না পারুক, ভগবান্ আপনাকে নিশ্চয়ই এই অপকর্ম্মের প্রতিফল দিবেন।

এই কথা বলিয়াই রামপ্রসাদ দ্রুতপদে চলিয়া আসিলেন। মাজিষ্টর ক্রোধভরে বলিলেন, "শীঘ্র গৃহ ত্যাগ করুন।"

রামপ্রসাদের রাগ বাড়িয়া গেল। তিনি ঘরে আসিয়াই, সেই রাত্রি বন্ধুবান্ধবের সহিত পরামর্শ করিলেন। বলিলেন, "ব্রাহ্মণের মুক্তির জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিব—যদি সর্ব্বস্বান্ত হই, তাহাও স্বীকার, তথাচ সাধুর উদ্ধারার্থ যত্নের কখন ক্রটী করিব না।"

তখন রামপ্রসাদের উদ্যোগে নির্দ্দোষিতার প্রমাণ-প্রয়োগ সংগৃহীত হইতে লাগিল। এলাহাবাদ হইতে বারিষ্টার আনিবার জন্য তারযোগে সংবাদ গেল। মথুরার বড় বড় উকীল মোক্তার সকলেই রামপ্রসাদের পক্ষভুক্ত হইলেন।

এদিকে ব্রাহ্মণকে এবং কাঙ্গালিগণকে দোষী সাব্যস্ত করিবার জন্য পুলিস-পক্ষ হইতেও তদ্বিরের ক্রটী হইল না।

সহানুভূতি এক দিকে সকল সময় থাকে না। ক্রিয়ার পর প্রতিক্রিয়া হয়। যে কারণেই হউক, মথুরা-বৃন্দাবনের কয়েকজন অধিবাসী ক্রমশ পুলিসের পক্ষে দাঁড়াইল। কমলিনীর গৃহ চিকিৎসক ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সুবিধা পাইয়া, এই উপলক্ষে মথুরায় আসিয়া, পুলিস-দলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মহেন্দ্রনাথের মথুরা-আগমন পাঠক ইতিপূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। কমলিনী সন্ন্যাসী নগেন্দ্রনাথকে কাণে কাণে যে কথা বলিয়াছিলেন,—যে কথা শুনিয়া নগেন্দ্র আনন্দে কেবল অনবরত হাততালি দিয়াছিলেন; —পাঠক, তাহা শুনুন;—কমলিনী বলেন, "প্রাণের ভাই নগেন! রাজবাটীর শাল-চুরির মোকদ্দমায় আপনাকে সাক্ষ্য দিতে হইবে। আপনি রাজবাটীর একজন প্রধান কর্ম্মচারী,—আপনার সাক্ষ্য প্রবল বলিয়া গণ্য হইবে। অলভ্যটা যাহাতে যাবজ্জীবন দ্বীপ-চালান হইয়া যায়, তাহার চেষ্টা আপনাকে করিতেই হইবে।"

কাণে কাণে এই গূঢ় গোপনীয় কথা শুনিয়া নগেন্দ্রনাথ পুলকপ্রাণে পরোপকার-ব্রত-পালনে বদ্ধপরিকর হইলেন।

পুলিসের বিশ্বাস কি, ধারণা কি,—তাহা কেমন করিয়া বলিব? পুলিস যদি কর্ত্তব্য-পরায়ণ হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই স্থির করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ প্রকৃতই ডাকাতের সর্দ্দার এবং কাঙ্গালীগণ প্রকৃতই ডাকাত।—তাই বুঝি, দুর্ব্বৃত্ত দুশ্চরিত্র দস্যুদলের বিনাশসাধনার্থ পুলিস এত যত্নবান্! তাই বুঝি পুলিস, ন্যায় অন্যায় না দেখিয়া, সদসৎ যে কোন উপায়ে হউক, ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে প্রমাণ-সংগ্রহে উদ্যোগী হইয়াছেন। হয়ত পুলিস ভাবিয়াছেন, এই ডাকাতদলকে সমূলে বিনাশ করিতে পারিলেই, দেশ নিষ্কণ্টক হয়; রাজ্যের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়; ভারতভূমি স্বর্গ হয়। পুলিসের উদ্দেশ্য সাধু,—তবে কার্য্য-প্রক্রিয়ার একটু দোষ আছে। তা, স্থল-বিশেষে আইন-আদালত লঙ্ঘন করিয়া, অনাচার অত্যাচার না করিলে, সত্য তত্ত্ব প্রকাশ পায় না, সাধু উদ্দেশ্য সফল হয় না, দেশের দুর্গতি ঘুচে না। তাই বুঝি পুলিস, হৃদয়-পদ্মে সদুদ্দেশ্যের মধুটুকু সঞ্চিত রাখিয়া, ভারতবর্ষের কল্যাণ-কামনায়, কেবল মৌখিক দুই একটা উপদ্রব আরম্ভ করিলেন।

তাই কি?—আচ্ছা, এমনও ত হইতে পারে যে, পুলিস পাপী,—পিশাচ অপেক্ষাও ঘৃণিত, দুরাচার দস্যু অপেক্ষাও অধম। পুলিস বিড়াল অপেক্ষা লোভী, সর্প অপেক্ষা হিংস্র, বাঘ অপেক্ষা দুরন্ত, কুক্কুর অপেক্ষা নীচ। কেহও এমনও ভাবিতে পারেন, পুলিস কেবল সেই হাজার টাকা পুরস্কারের লোভে এই কাজ করিতেছে; কেবল আপন কৃতিত্ব দেখাইয়া সম্মান-গৌরব বাড়াইবার জন্য পুলিস এই অপকর্ম্মে হাত দিয়াছে।

কোন্ কথা সত্য, তাহা কেমন করিয়া বলিব? হয়, পুলিস অদ্বিতীয় সাধু—ঈশ্বরের অবতার বিশেষ, না হয়, নরকের কৃমিকীট। পুলিস,—এই দুয়ের মধ্যে এক নিশ্চয়ই। ভগবান্ জানেন, পুলিস—কি?

পুলিস সৎ হউক, আর অসৎ হউক, উদ্দেশ্য সাধু হউক, আর অসাধুই হউক,—নগরে কিন্তু নানা কুকথা রটনা হইল। কেহ বলিল, বন্দিগণের একরার্ লইবার জন্য পুলিস তাহাদের উপর বিষম উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছে। কোন কাঙ্গালীকে জলবিছাতি দেওয়া হইয়াছে; প্রহারে কাহারও পিঠের চামড়া উঠিতেছে; কেহ বিছা-পূর্ণ গৃহে নিক্ষিপ্ত হইতেছে; কেহ বা একঠেঙ্গে হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। যে যে বন্দী শপথপূর্ব্বক আপন দোষ স্বীকার করিতেছে, অর্থাৎ বলিতেছে, "আমি

শালচোর,"—সেই সেই বন্দী পরম সমাদরে, জামাই-আদরে অন্ন ব্যঞ্জন দধি দুগ্ধ ক্ষীর ছানা খাইতেছে,—মহাসম্মানে সম্মানিত হইতেছে।

এদিকে একথা রাষ্ট্র হউক, ওদিকে এলাহাবাদের সেই ইংরেজী-সংবাদপত্রে, বিশেষ-সংবাদদাতার লিখিত এক ইংরেজী-পত্র প্রকাশিত হইল। সেই পত্রের মর্ম্মানুবাদ এইরূপ ;—

"অদ্য ডাকগাড়ীতে ফার্ষ্ট ক্লাসে মথুরায় আসিয়া পৌছিলাম। প্রথমেই ডাকাত-বৃন্দের দলপতির সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। দেখিলাম, তিনি নির্জ্জন কারাগৃহের এক প্রকোষ্ঠে বসিয়া কতই ভাবিতেছেন,—পলাইবার উপায়-কৌশল কতই কল্পনা করিতেছেন। আমি নিকটে যাইবামাত্র তিনি আমার পানে চাহিলেন—তাঁহার চক্ষের তারা দুইটী ঘুরিতে লাগিল। আমি তখন নিবিষ্টচিত্তে তাঁহার মূর্ত্তি অবলোকন করিতে লাগিলাম। তিনি দৈর্ঘ্যে চারি ফিট এগার ইঞ্চি, প্রস্থে এক ফীট সাড়ে নয় ইঞ্চি। তাঁহার রঙ কৃষ্ণবর্ণ,—তবে তাহা ঈষৎ ধূম্রবর্ণও বটে। তিনি ওজনে এক মণ বাইশ সের, আধ পোয়া. এক কাঁচ্চা মাত্র। আমি যখন এলাহাবাদ হইতে যাত্রা করি, তখন ভাবিয়াছিলাম, দলপতি নিশ্চয়ই হৃষ্টপুষ্ট, দীর্ঘ, বলবান্ পুরুষ হইবেন। কিন্তু দলপতিকে দেখিয়া নিরাশ হইলাম। হৃদয় ভগ্ন হইল। প্রাচ্য দেশের দলপতিগণ স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া থাকে,—যথা, রামা এবং ভীমা। যে ব্যক্তি স্বয়ং যুদ্ধ করে, সে নিশ্চয়ই অদ্বিতীয় বলশালী হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান দলপতি এমন ক্ষীণকায়, ক্ষুদ্রদেহ কেন? এই বিষয়টা মনোমধ্যে আলোড়ন করিতেছি, এমন সময় শুনিলাম, বর্ত্তমান দলপতি অস্ত্র দ্বারা বাহুবলে যুদ্ধ করেন না ; তিনি মন্ত্রসিদ্ধ ; বুজ্‌রুগ্ ; দৈববলে বলীয়ান্। তাঁহার মহামন্ত্রের গুণে দেশশুদ্ধ লোক বশ হইয়াছে। তাঁহার মন্ত্র-ক্ষমতার পরিচয় লইবার জন্য এক দিন তাঁহাকে পরীক্ষাও করা হইয়াছিল। গত পরশ্ব লৌহ-শলাকা অগ্নির উত্তাপে পুড়াইয়া টক্‌টকে লালবর্ণ করিয়া, দলপতি ব্রাহ্মণের হাতে ছেঁকা দেওয়া হয়। ব্রাহ্মণের ভ্রূক্ষেপ নাই,—বেশ সহজ-শরীরে বসিয়া রহিলেন,—শেষ একটু হাসিলেন। তিনি বলিয়াছেন, তরবারির দ্বারা দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেও আমি দৃক্‌পাত করি না। আর একটা আশ্চর্য্য অলৌকিক কথা আপনার পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি। দলপতি প্রথম তিন দিন—প্রায় ৭২ ঘণ্টাকাল অনাহারে থাকিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি

হাজতে আসিয়া বলিলেন, "আমি স্বপাক ভিন্ন অন্য কাহারও অন্ন গ্রহণ করি না।" কিন্তু কারাবাসের নিয়মানুসারে তাঁহাকে অন্য ব্যক্তি দ্বারা প্রস্তুত অন্ন প্রদান করা হয়। দলপতি সে অন্ন স্পর্শ করিলেন না। প্রথমত কারাধ্যক্ষ মনে করিলেন, লোকটা পাকা বদমাইস,—তাই নানারূপ দুষ্টামি করিতেছে। কারাধ্যক্ষ বল-প্রয়োগ দ্বারা এ কার্য্য সমাধার চেষ্টা করেন,—কিন্তু তাহাতে সফলকাম হন নাই। তারপর তিনি দলপতিকে মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া ভোজনের জন্য যত্ন করেন,—কিন্তু তাহাও বিফল হইল। দলপতি রাত্রিকালে কি এক রকম মধুর স্বরে গান করেন,—তাহাতেই নাকি তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হয়! শেষে যখন কারাধ্যক্ষ দেখিলেন, স্বপাক ভিন্ন ব্রাহ্মণ কিছুতেই অন্ন গ্রহণ করিবেন না, তখন তিনি তাঁহাকে স্বপাকের আজ্ঞা দেন। কিন্তু এই ৭২ ঘণ্টা অনাহারে থাকা সামান্য মানুষের কাজ নহে। নিশ্চয়ই দলপতির দৈবশক্তি আছে। দলপতির সহিত আমার বশেষ বন্ধুত্ব হইয়াছে। ইঁহার সম্বন্ধে অন্যান্য কথা পরে বলিবার বিশেষ বাসনা রহিল।

"যুদ্ধটা প্রথমত বড়ই ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। দলপতির পক্ষে প্রায় হাজার যোদ্ধা ছিল। তাহারা আহারাদি করিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ পুলিস-অধ্যক্ষ একাকী, সহস্র সমর-কুশল যোদ্ধাকে আক্রমণ করেন। তখন অধ্যক্ষের দলস্থ অন্যান্য সেনা আসিয়া পৌঁছে নাই। ভাবিয়া দেখুন, সংগ্রাম কত বিষম! একদিকে একাকী অধ্যক্ষ—অন্য দিকে সহস্র রণবীর। তখন ঘোর যুদ্ধ বাধিল, রণডঙ্কা উভয় পক্ষে বাজিয়া উঠিল, যুদ্ধের কল্লোল-কোলাহলে কর্ণ বধির হইল। এমন সময় আমাদের সাহায্যকারী সৈন্য আসিয়া পৌঁছিল। ওয়েলিংটন বুলুচারকে পাইলেন,—নেপোলিয়ান পলাইলেন। তখন অধ্যক্ষ দ্রুতগামী অশ্বারোহণে বিদ্যুৎবেগে দলপতির ঘাড়ে গিয়া পড়িলেন; সেই সময় প্রায় পঞ্চাশ জন শত্রুপক্ষীয় সৈন্য অধ্যক্ষকে আক্রমণ করিল; একেবারে পঞ্চাশ খানি প্রহরণ তাঁহার উপর পড়িল। কাজেই অপর পক্ষে কেবল সংখ্যাবলের আধিক্য হেতু অধ্যক্ষ অশ্ব হইতে পতিত হইলেন। এমন সময় আমাদের পক্ষীয় সৈন্যদল উপস্থিত দলপতিকে ধরিল। অধ্যক্ষের বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া আমার লেখনী নিরস্ত হইতে পারিতেছে না। তিনি যদি বেগে অশ্ব ছুটাইয়া একাকী অগ্রগামী না হইতেন, তাহা হইলে ডাকাতদল নিশ্চয়ই

ধৃত হইত না। সুতরাং বলিতে হইবে, তিনি একাকীই রণজয় করিয়াছেন! হানিবল কেনিতে যে সাহস দেখাইতে পারেন নাই, নেপোলিয়ান অষ্ট্রালিটজে যে সাহস দেখাইতে পারেন নাই, লিওনিডাস থার্ম্মপিলিতে যে সাহস দেখাইতে পারেন নাই,—অদ্য অধ্যক্ষ মথুরার রণক্ষেত্রে সে সাহস বা তদপেক্ষা অধিক সাহস দেখাইয়াছেন। রুষের সহিত মধ্য-এসিয়ায় যেদিন আমাদের যুদ্ধ বাধিবে, সেদিন অধ্যক্ষ মহাশয় প্রধান সেনাপতিপদে বরিত হইবেন,—এরূপ আশা করি।"

সংবাদপত্রে এই পত্র প্রকাশিত হইলে, ইংরেজ-কুলললনাগণ অধ্যক্ষের মঙ্গল কামনায় গির্জ্জায় গিয়া একদিন ভজন গাহিলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

অন্ধকারময় কারাগৃহে ব্রাহ্মণ আসীন। নয়নযুগল মুদ্রিত। দুই চক্ষের কোণ দিয়া বারিধারা পতিত হইতেছে। ব্রাহ্মণ ভাবিতেছেন,—"এই একশত দীন দুঃখী গরীব লোক কি আমার মন্দভাগ্যের ফল ভোগ করিল? এই পাপীর সহিত মিশিয়াছিল বলিয়া কি ইহারাও আজ এই বিপজ্জালে পতিত হইল? হা ভগবন্! এই অধমের সঙ্গদোষে দুইটী স্ত্রীলোক, একটী বালক প্রাণ হারাইল;—এ দারুণ শোক আমি কেমন করিয়া বিস্মৃত হইব?—উপায় কি কিছুই নাই?—রক্ষক কি কেহই নাই?—ভগবান্ই ভবসমুদ্রের কাণ্ডারী! সেই অর্জ্জুন-রথ-রজ্জুধারী শ্রীনন্দের নন্দন শ্রীহরি এই ভিখারি-বৃন্দের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা।"

ব্রাহ্মণ তখন উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"একবার ভাই!

হরি বল। হরি হরি বল।

হরি হরি হরি বল।"

কাঙ্গালীগণও ব্রাহ্মণের কথায় উচ্চকণ্ঠে সমস্বরে মধুর হরিনাম করিয়া উঠিল। হরিনামের গুণে কারাগৃহ যেন বৈকুণ্ঠধাম হইল! যেন শোক, দুঃখ, সন্তাপ, যন্ত্রণা দূরে

পলাইল। মনে হইল, বুঝি সমগ্র সংসার ভক্তিরসে গলিয়া গিয়াছে,—আর দ্বেষ হিংসা নাই, উৎপীড়ক-উৎপীড়িত নাই,—সংসার সুখ-সাগরে ভাসিতেছে!

ব্রাহ্মণ, বন্দিগণকে অভয় দিয়া বলিলেন, "ভয় নাই, ভয় নাই,—ভগবান্ তোমা-দিগকে রক্ষা করিবেন। আজ বিচারের দিন; কেবল হরির নাম হৃদয়ে জপ কর। হরি ভিন্ন পথ নাই, হরি ভিন্ন গতি নাই, হরি ভিন্ন মুক্তি নাই।"

জনৈক প্রহরী আসিয়া, কারা-গৃহের চাবি খুলিয়া, ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া, সঙ্গে করিয়া, একজন হিন্দুস্থানী রাজপুরুষের নিকট লইয়া গেল।

ব্রাহ্মণ হাসি-হাসি মুখে রাজপুরুষকে বলিলেন, "মহাশয়! আজ আবার কি সংবাদ?—আজ আবার লোহা পুড়াইয়াছেন নাকি?"

রাজপুরুষ। আমাদিগকে আপনি নিষ্ঠুর ভাবিবেন না। সেদিন একটা বিষয় পরীক্ষা করিবার জন্যই আপনার হস্তে উত্তপ্ত লৌহখণ্ড বিদ্ধ করা হয়,—আপনি যে ইহাতে কষ্ট পান, এমন কাহারও উদ্দেশ্য ছিল না। আজও কি ঘা শুকায় নাই?

ব্রাহ্মণ। (হাসিয়া) দিব্য পরীক্ষা!—সজীব দেহ দাহ করিয়া পরীক্ষা!!

রাজপুরুষ। ঠাকুরজী! আপনি রাগ করিবেন না,—ভবিষ্যতে আমরা আপনার ভাল করিব। কিন্তু আপনাকে অদ্য এক অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে। আপনার নিকট আমরা অদ্য এক অনুগ্রহ-ভিখারী। অদ্য আপনি একটু পরোপকার করিয়া আমাদের মান রক্ষা করুন।

ব্রাহ্মণ। পরোপকার করিতে আমি একান্ত অক্ষম। অর্থহীন, সহায়হীন, বলহীন বন্দী দ্বারা আপনি যে কি উপকার প্রত্যাশা করেন, তাহা ত কিছুই বুঝিতেছি না।

রাজপুরুষ। আপনাকে আমরা মহারাণীর সাক্ষী করিব মনঃস্থ করিয়াছি।

ব্রাহ্মণ। সে আবার কি রকম ব্যাপার? তা হইলে, কি হয়?

রাজপুরুষ। আপনি মাজিষ্টরকে গুটা দুই কথা বলিবেন;—আর, মাজিষ্টর আনন্দে আপনাকে খালাস দিবেন, রাহাখরচ দিবেন,—আর আমরাও চাঁদা করিয়া প্রায় একশত টাকা তুলিয়া আপনাকে পান খাইতে দিব।

ব্রাহ্মণ মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, "আজ আমার উপর আপনারা হঠাৎ এত সদয় হইলেন কিসে?"

রাজপুরুষ। আপনাকে আমরা চিরদিনই ভক্তি করি, ভালবাসি। আপনি এখন আমাদের একটী কথা রাখুন, আপনার মঙ্গল হইবে। মহারাণীর সাক্ষী হউন,— যাবজ্জীবন সুখে থাকিবেন।

ব্রাহ্মণ। আমাকে কি করিতে হইবে, তাহা বুঝাইয়া বলুন।

রাজপুরুষ। কিছুই নয়।—অতি সহজ! মুখের কথা একটু খসানোমাত্র। আজ আদালতে মাজিষ্টর সাহেব যখন জিজ্ঞাসিবেন, "আপনি দোষী, কি নির্দোষ?"— আপনি তখন বলিবেন, "হাঁ, আমি দোষী,—আমিই শাল-চোর,—আমার দলে প্রায় পাঁচশত লোক,—ইহাদের সকলেরই চুরি ডাকাতি ব্যবসায়।" এই কথা বলিলেই আপনি মহারাণীর সাক্ষ্যশ্রেণী মধ্যে গণ্য হইবেন, অর্থাৎ মাজিষ্টর আপনাকে মুক্তি দিবেন।

ব্রাহ্মণ। (স্বগত) কি দুরাত্মা, কি পিশাচ, কি নরাধম! ভগবানের সৃষ্টিতে এমন জীবও আছে!—(প্রকাশ্যে হাসিয়া) আচ্ছা, আমার দলস্থ পাঁচশত লোকই যদি ঐ রকম একরার করে, তবে তাহারাও কি খালাস পাইবে?

রাজপুরুষ। (স্বগত) মাছ টোপ ঠোকরাইতেছে,—হরিণ ফাঁদে পা দিয়াছে। (প্রকাশ্যে) তা, আমরা সব করিতে পারি। কিন্তু আমাদের দয়া কেবল আপনার উপরই; আপনার দলস্থ লোক খালাস না পাইলে আপনার ক্ষতি কি?

ব্রাহ্মণ। ক্ষতি আর কিছুই নহে,—তবে এই এক ক্ষতি যে, আমি একাকী খালাস পাইয়া কি করিব?—একলা কেমন করিয়া ডাকাতির দল বাঁধিব?—একলা কেমন করিয়া লুণ্ঠনকার্য্যে ব্রতী হইব? দলশুদ্ধ মুক্তি না পাইলে ত ব্যবসা চলিবে না।

রাজপুরুষ। সে কথা বটে, কিন্তু আপনি মুক্ত হইলে সহজেইত দল বাঁধিতে পারিবেন।

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা, আমি যদি প্রকৃত চোর না হই,—তাহা হইলেও কি আমাকে আদালতে চোর বলিয়া পরিচয় দিতে হইবে?

রাজপুরুষ। আপনি বুদ্ধিমান হইয়াও আজ অল্পবুদ্ধির পরিচয় দিলেন। একরার না করিলেত মহারাণীর সাক্ষী হওয়া যায় না। আর মহারাণীর সাক্ষী না হইলে মুক্তিলাভ হয় না। আপনি স্বীকার করুন যে, 'আমি চোর', তৎক্ষণাৎ খালাস পাইবেন।

ব্রাহ্মণ। মনে করুন, আমি আদালতে গিয়া বলিলাম, 'আমি নির্দোষ, নিষ্পাপ,—চোর নহি,'—সুতরাং অবশ্যই আমার গুরুতর দণ্ড হইল,—হউক, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই ;—কিন্তু ইহাতে আপনাদের কোন ক্ষতি আছে কি? বিশেষ কোন অনিষ্ট আছে কি?

রাজপুরুষ। আজ কেমন যেন আপনি পাগলের মত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন।—ভাল করিয়া, তলাইয়া বুঝুন, আপন হিতাহিত ভাবুন, তবেত আমার কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন।

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা, প্রথমত আমাকে একটা কথা বুঝাইয়া দিউন। 'আমি চোর' এ কথা বলিলে মুক্তি পাইব,—'আমি চোর নহি' বলিলে জেলে যাইব, আদালতের এ কেমন বিচার, আইনের এ কি রকম সূক্ষ্ম তর্ক,—তাহা ত বুঝি না।

রাজপুরুষ হাসিয়া বলিলেন, "আপনি চুরি ডাকাতিই ভাল বুঝিবেন,—আইন আদালতের কথা জানিবেন কিরূপে? যার যা ব্যবসা, সে তাহা ভাল বুঝে। এখন আমার কথা মন দিয়া শুনুন,—আমি যাহা বলি, তাহা করুন ;—মাজিষ্টর সাহেবকে আপনি যদি 'চোর নহি' বলেন,—তাহা হইলে নিশ্চয়ই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হইবেন। কারণ আপনার প্রমাণ নাই ; আর, আপনার কেবল কথা বিশ্বাসযোগ্য হইবে না। সুতরাং আমার সুপরামর্শ এই, আপনি আদালতের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া বলুন, 'আমি চোর' ;—আদালত দয়াপরবশ হইয়া আপনাকে মহারাণীর সাক্ষ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইবেন,—আপনি মুক্তি পাইবেন।"

ব্রাহ্মণ। এতক্ষণে বুঝিলাম, আমি চোর না হইলে, আপনার মনোভিলাষ পূর্ণ হয় না। মানুষ চোর হইলে, আপনার আনন্দ বাড়ে,—মানুষ নির্দোষ বা সাধু হইলে, আপনার দুঃখের পরিসীমা থাকে না।—এ শিক্ষা আপনাকে কে শিখাইল? কিসে আপনি পিশাচ অপেক্ষাও অধম হইলেন?

ব্রাহ্মণের চোখে জল আসিল!

রাজপুরুষ। (ঈষৎ ক্রোধে) আপনি কি মনে করেন, আদালতে দাঁড়াইয়াই একবার, নির্দোষ বলিলেই আপনি মুক্তি পাইবেন?—আপনি ন্যাকড়া-পরা গরীব ভিখারী

কে বিশ্বাস করিবে? দানের কথা বলিলেই, আপনাকে সকলে পাগল বলিয়া উড়াইয়া দিবে। সাবধান,—খুব সাবধান! আদালতে কদাচ দানের কথা মুখে আনিবেন না। দান বলিলেই আপনার সর্ব্বনাশ হইবে!

ব্রাহ্মণ। আমার সর্ব্বনাশ হয় হউক,—কিন্তু তাহাতে আপনার ত কোন সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা নাই!—সুতরাং দানের কথা বলিলে আপনার ক্ষতি কি?

রাজপুরুষ। (স্বগত) বিটল বামুনটাত বড় বদমাইস দেখিতেছি! কিছুতেই যে বাগ মানিতেছে না! (প্রকাশ্যে) ঠাকুর! তোমার কথা শুনিবে কে? দান বলিলেই তৎক্ষণাৎ তোমাকে পাগলা-গারদে দিবে।

ব্রাহ্মণ। কেন, যদি মাজিষ্ট্রেকে বলি,—রাজাকে পত্র লেখা হউক,—রাজা এখানে আসিয়া নিশ্চয়ই দানের কথা বলিবেন।

রাজপুরুষ। (ক্রোধে) রাজা কি তোমার ভগিনীপতি যে, তিনি আদালতে দাঁড়াইয়া তোমার জন্য মিথ্যা কথা বলিয়া যাইবেন? রাজা স্বয়ং ঘোষণা দিয়াছেন, তাঁহার জহরত শাল প্রভৃতি চুরি গিয়াছে,—সেই শাল পুলিসের চেষ্টায় ধরা পড়িল। এখন তিনি কোন্ মুখে বলিবেন, শাল চুরি যায় নাই,—দান করা হইয়াছে? স্বয়ং রাজা যদি মিথ্যা সাক্ষ্য দেন, তবুও তোমার নিষ্কৃতি নাই। শালের গায়ে যে দেবনাগর অক্ষরে রাজার নাম লেখা আছে, তাহা কি রাজা জানেন না? এরূপ কথা বলিলে, রাজাও মিথ্যা-সাক্ষ্য দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হইতে পারেন,—তাঁহার দণ্ড হইতে পারে। বিচারালয় কেমন স্থান, তাহাত আপনি জানেন না!—তাই আপনি পাগলের মত কথা বকিতেছেন। ফল কথা, দানের কথা বলিলে নিশ্চয়ই আপনার দণ্ড হইবে।

ব্রাহ্মণ হো হো হাসিতে লাগিলেন

রাজপুরুষ আবার বলিলেন,—"আমার পরামর্শমত চল, ভবিষ্যতে তোমার ভাল করিয়া দিব। সাবধান, দানের কথা বলিলেই মারা যাইবে,—রাজার শুদ্ধ বিপদ্ ঘটিবে। আমাকে তুমি শত্রু ভাবিও না,—পরম মিত্র বলিয়া জানিও।"

এই কথা বলিয়া রাজপুরুষ উঠিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ আবার হাজত-গৃহে আনীত হইলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মথুরার ধর্ম্মাধিকরণে আজ আর লোক ধরে না। তরঙ্গ-সঙ্কুল, আবর্ত্তময়, ভীষণ লোক-সমুদ্র উছলিয়া উঠিয়া যেন পৃথিবী প্লাবিত করিতে উদ্যত হইয়াছে। পথে লোক, গাছে লোক, ছাদে লোক,—সর্ব্বত্রই লোকময়। সর্ব্বলোক, সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণের বিচার দেখিতে সমাগত হইয়াছে। যেদিকে দৃষ্টিপাত করি,—সেই দিকেই লোক, লোক, লোক! ক্ষিতিপথে, ব্যোমপথে,—সর্ব্বপথেই লোক-সাগরের ঢেউ উঠিতেছে। কণ্ঠনিনাদ,—তরঙ্গধ্বনি; গাড়ী পাল্কী,—জাহাজ নৌকা; শুভ্র বসন,—ফেনপুঞ্জ; আদালত-গৃহ,—গভীর আবর্ত্ত; উকীল মোক্তার,—দাঁড়ী মাঝী; ব্যারিষ্টার আটর্ণি,—মেট কাপ্তেন; আর, স্বয়ং বিচারপতি মাজিষ্টার,—সর্ব্বগ্রাসী জলাধিপতি বরুণ!

একদল গোরা-সৈন্য এবং আর একদল সিপাহী, অদ্য শান্তিরক্ষার জন্য, আদালত-গৃহের সম্মুখে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। চারিজন গোরা-অশ্বারোহী, যেন দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া, চারিদিকে ছুটিয়া, ছুটিয়া দর্শকবৃন্দকে দূরে তাড়াইয়া দিতেছে। রাজপথে স্থানে স্থানে গোরা-কনষ্টেবল রুল ঘুরাইয়া মানব-মনে ভীতি উৎপাদন করিতেছে। জাহাজের পুচ্ছ-ধরা জলি-বোট-সদৃশ সহচর কালা-কনষ্টেবলগণ গরীবের গলায় ধাক্কা মারিয়া হাতের আরাম করিয়া লইতেছে। এত ধরাধরি, মারামারি, কড়া-কড়ি—তথাচ লোক সরিতে চাহে না,—ক্রমে লোকের যেন জমাট্ বাঁধিয়া গেল,—যেন সর্ব্বলোক একত্র সংসক্ত, মিলিত হইয়া, একটী মাত্র লোকের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। অযুত মুখ একমুখ হইল, অযুত দেহ একদেহ হইল। পরমাণু-প্রমাণ পরার্দ্ধ পরার্দ্ধ প্রস্তর-কণা মিলিত হইয়া এক মহা হিমালয়গিরি প্রতিষ্ঠিত হইল।

বেলা ১১ টা। বিচারক মাজিষ্টর ইতিপূর্ব্বেই আদালতে আসিয়াছেন। তবে তিনি এখনও বিচারাসনে উপবিষ্ট হন নাই,—খাস্‌কামরায় বসিয়া শূন্য মনে চুরুট খাইতেছেন; আর মাঝে মাঝে একখানি ইংরেজী-সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনস্তম্ভ পড়িতে-ছেন। শাম্পেনের দর চড়িয়াছে দেখিয়া কেবল নাসিকা কুঞ্চিত করিতেছেন।

মাজিষ্টর, সহস্র-যোজন-দূরবর্ত্তী শ্বেতদ্বীপজাত ইংরেজ। বিশাল বপু,—দীর্ঘ প্রস্থ

আয়তনে প্রায় এক কাঠা হইবেন। মিস্ত্রী ডাকিয়া, ফরমাইস্ দিয়া, মাপ লইয়া, তাঁহার বসিবার চেয়ার তৈয়ারি করিতে হইয়াছে। দৈহিক উন্নতি দেখিয়া, পিতা মাতা প্রথমত ইংলণ্ডের কোন স্থানের সামরিক-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন। তথায় পড়াশুনায় কিছুমাত্র মনোযোগ না দিয়া, কেবল ঘুষাঘুষিতেই তিনি নিদারুণ চিত্তসংযোগ করিলেন। স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণ বিব্রত হইয়া তাঁহার নাম কাটিয়া দিল।

মা বাপ ছেলেকে কাছে রাখিতে আশঙ্কা করিল। এমন দিন ছিল না যে, তিনি প্রতিবেশী বালকবৃন্দের সহিত ঝগড়া, হাঙ্গাম, দাঙ্গা না বাধাইতেন। কখন বা জনক জননীকেই প্রহারে উদ্যত হইতেন; আকর্ষণী শক্তি-প্রভাবে কখন বা পরদ্রব্য লোষ্ট্রবৎ টানিয়া আনিতেন; কখন বা আদিরস অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া, কল্যাণী কামিনীকুলকে কৃতার্থ করিতেন।

পিতা, সন্তানের গতি-মুক্তির নিমিত্ত সুপথ খুঁজিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডীয় অনেক বড় বড় রাজকর্ম্মচারীর সহিত, নানা কারণে পিতার সদ্ভাব ছিল—কুটুম্ব-কুটুম্বিতা ছিল। তাঁহারা সকলে একমত হইয়া নানারূপ যুক্তি-পরামর্শ করিয়া, পুত্রকে ভারত পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। অবশেষে নানা প্রক্রিয়ার পর, নানা রাসায়নিক সংযোগের পর, পদার্থবিজ্ঞানের চরম উন্নতির পর, পুত্র, বিচারক হইয়া ভারতে আগমন করিলেন।

ভারতবর্ষে শুভাগমন মাত্র, দার্বিনের মতানুসারে, লম্ফালম্ফে তাঁহার ক্রমোন্নতি আরম্ভ হইল। কয়েক বৎসর মধ্যেই তিনি পূর্ণ ম্যাজিষ্টরী-পদ প্রাপ্ত হইলেন। একাদশ বৃহস্পতির ফলই ঐরূপ।

বিরাট-মূর্ত্তি ম্যাজিষ্টরের অঙ্গে অঙ্গে নবযৌবনের তরঙ্গ-ভঙ্গ খেলিয়া বেড়াইতেছে। নবীন লাবণ্যের চিক্‌চিকে বার্নিস্, কে যেন তাঁহার মুখে মাখাইয়া দিয়াছে। সংবাদপত্র পাঠ শেষ হইলে, পকেট হইতে এক বিলাতী ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি বাহির করিলেন। চারুহাসিনীর চারু চিত্র নিরীক্ষণ করিয়া ম্যাজিষ্টর মহোদয়, গম্ভীর মনে কতই কল্পনা করিতে লাগিলেন। শেষে সেই ছবিখানিরই অধর বারংবার চুম্বন করিতে লাগিলেন। উকীল মোক্তার আমলাগণের মধ্যে এ কথা রাষ্ট্র হইয়াছিল, "সাহেবের বিলাতে এক বাইশ-বছুরী বিবির সঙ্গে সম্বন্ধ হইতেছে; শীঘ্রই বিবাহ করিতে তিনি বিলাত যাইবেন।

থাকেন,—কাছারির কাজে মন দেন না।” সত্য হউক, মিথ্যা হউক, কথাটা এইরূপই প্রকাশ পাইয়াছিল।

ওদিকে রাজপথে তফাৎ, তফাৎ, তফাৎ শব্দ উঠিয়াছে। পশ্চাতে ও সম্মুখে পঞ্চাশ জন করিয়া সঙ্গান-হস্ত সৈনিক পুরুষ তালে তালে পা ফেলিয়া চলিয়াছে; মধ্যস্থলে হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ি-বাঁধা সেই ডাকাতদল অবস্থিত; প্রত্যেক ডাকাতের দুই পার্শ্বে দুইজন করিয়া খাপ-খোলা কনষ্টেবল; সেই দলপতি ব্রাহ্মণ ডাকাতকে ষোলজন কনষ্টেবল ঘেরিয়া আছে। সেই বন্দিশ্রেণী রাজপথের বিকট শোভা বর্দ্ধন করিয়া আদালত-গৃহাভিমুখে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রগামী হইতেছে।

একজন বন্দী কাতরস্বরে ব্রাহ্মণকে বলিল,—“ঠাকুরজী! ছেলেপিলে, স্ত্রী-পরিবার শুদ্ধ আমাদিগকে এরূপ ভাবে কোথায় লইয়া যাইতেছে?—চারিদিকে এত লোক কেন?”

ব্রাহ্মণ। ভীত হইও না। আমরা সেই বিচারালয়েই নীত হইতেছি। অদ্য যে বিচারের দিন,—তাহা'ত তোমাদিগকে বলিয়াছি। ভয় নাই, ভয় নাই, কাঁদিও না,—এ সকলি সেই পূর্ব্বজন্মসঞ্চিত কর্ম্মরাশির ফল। কেবল “হরি হরি” বল।

বন্দিগণ উচ্চকণ্ঠে “হরি হরি” বলিয়া উঠিল। তখন দর্শকবৃন্দ আর নীরব থাকিতে পারিল না। তাহারাও বলিল,—“হরি হরি বল।” এককালে চারিদিক্ হইতে সহস্র সহস্র কণ্ঠে হরির নাম উচ্চারিত হইতে লাগিল। পৃথিবী চমকিত হইল,—ব্যোমপথ প্রতিধ্বনিত হইল,—সেই মহারবে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন টল্ টল্ কাঁপিতে লাগিল।

মাজিষ্ট্রর, বিলাতী-বিবির বিচিত্র চিত্র দেখিতেছিলেন; ঘোর শব্দ শুনিয়া, টেবিলের উপর চিত্র ফেলিয়া, সভয়ে বারেন্দার দিকে দৌড়িয়া আসিলেন। চাহিয়া দেখিলেন, চারি দিকে লোক উর্দ্ধবাহু হইয়া, হরির নাম গাহিয়া নাচিতেছে। মাজিষ্ট্রর বারান্দায় দাঁড়াইয়া কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া, নিম্নে সেই গোরাদলের সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট গেলেন। বলিলেন, “বড়ই বিষম গোলযোগ দেখিতেছি,—আমার বোধ হয় নিশ্চয়ই বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। আর গুলি চালাইতে বিলম্ব কি?”

সৈন্যাধ্যক্ষ। বিদ্রোহীদের হস্তে কোনরূপ অস্ত্র শস্ত্র ত দেখিতেছি না। কেবল উহারা হাত পা নাড়িতেছে,—আর, মুখে কি একটা 'হর-হর-হর' শব্দ করিতেছে।

মাজিষ্টর। আমার বোধ হয়, উহা নিশ্চয়ই যুদ্ধ-ঘোষণার শব্দ। এসিয়াবাসী জাতিগণ সাধারণত বন্দুক তরবারি দ্বারা যুদ্ধ করে না,—লাঠিই তাহাদের একমাত্র প্রধান প্রহরণ। ঐ দেখুন, অনেকের হস্তে সুস্পষ্টভাবে লাঠি বিরাজ করিতেছে। আপনি, এই বেলা সাবধান হউন, নচেৎ বিদ্রোহীদল এখনি মথুরাভূমির সর্ব্বনাশ সাধন করিবে।

সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশমত তৎক্ষণাৎ একজন হিন্দুস্থানী হাবিলদার আহূত হইলেন। তিনি এই তুমুল কলরবকাণ্ডের কারণ জিজ্ঞাসিত হওয়ায় হাসিয়া বলিলেন, "ঐ শব্দে আশঙ্কার কোনও কারণ নাই—উহা বিদ্রোহসূচক গীত নহে,—উহা হরিধ্বনি হইতেছে, অর্থাৎ ভগবানের নাম হইতেছে

মাজিষ্টর। সে যাহাই হউক, আপনি এখনি গিয়া, ঐরূপ শব্দ করিতে সকলকে নিষেধ করুন।

হাবিলদার। (হাসিয়া) এখন সকলেই হরিনামে, হরিগানে, উন্মত্ত-প্রায়,—নিষেধ শুনিবে কে?

মাজিষ্টর। এই ইংরেজ-রাজত্বে ভারতবর্ষে এমন কোন্ ব্যক্তি আছে, যে ইংরেজ-রাজের নিষেধ না মানিয়া একমুহূর্ত্তকাল তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে? নিষেধের পরও যে ব্যক্তি ঐরূপ গোলযোগ করিবে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ গ্রেফ্তার কর।

হাবিলদার। ধর্ম্মাবতার! আজ প্রায় বিশহাজার লোক একত্র; প্রায় প্রত্যেকেই মধুর হরিনামগানে মোহিত,—বিংশতি সহস্র লোক ধরা সহজ ব্যাপার হইবে না!—আর, ধরিয়াই বা তাহাদিগকে রাখিবেন কোথায়? বিশেষ, উহাদের ত কোন দোষ দেখি না,—একটু ক্ষান্ত হউন, সকলে আপনা-আপনি এখনি নীরব হইবে।

হাবিলদারের কথাই ঠিক হইল। অল্পক্ষণ মধ্যে সেই ব্রাহ্মণ-প্রমুখ বন্দিগণ মাজিষ্টরের আদালতে প্রবেশ করিলে, দর্শকবৃন্দ একেবারে নীরব নিশ্চল হইল। সকলেই নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল।

বিদ্রোহীদের যুদ্ধ-ঘোষণা নিবৃত্তি পাইল দেখিয়া, মাজিষ্টর মহোদয় নির্ভয়ে, সানন্দ হৃদয়ে, উচ্চ বিচারাসনে বসিয়া, বন্দী ব্রাহ্মণের বিচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সেই রণজয়ী অধ্যক্ষ-সাহেব, বিচারক মাজিষ্টরের বামে আসিয়া বসিলেন। পরস্পর কাণে কাণে কি কথা হইল—হাসি-তামাসা হইল। মাজিষ্টর তখন বন্দিগণের পানে আঙ্গুল হেলাইয়া অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসিলেন,—"ইহারাই কি ডাকাত?" অধ্যক্ষ বলিলেন,—"হাঁ।"

রামপ্রসাদের যত্নে ব্রাহ্মণের পক্ষ-সমর্থনার্থ এলাহাবাদ হইতে একজন প্রবীণ ইংরেজ-বারিষ্টার আসিয়াছেন। তাঁহার সাহায্যকারী স্থানীয় উকীলও প্রায় আট দশ জন আছেন। বারিষ্টার দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, "এ মোকদ্দমায় আমার নানারূপ বাধাঘটিত আপত্তি আছে। সত্যের শ্বেতচিহ্ন ঘোর অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছে। আপনি আজ স্বয়ং ধর্ম্মের প্রতিনিধিস্বরূপ—এই উচ্চ-আসনে সমাসীন; তুলাদণ্ডে অতি সূক্ষ্মরূপে আপনি ন্যায় অন্যায়, সত্য মিথ্যা, ওজন করিয়া দেখিবেন; সহস্র সহস্র লোক আপনার সুবিচার দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে, আপনার আজ পদগৌরব যেরূপ সুমহান্‌, দায়িত্বও সেইরূপ গভীর! বিনীতভাবে আমার প্রার্থনা এই, আপনি আমার কথা অনুগ্রহপূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া, বুঝিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিবেন। আমার একান্ত আশা আছে, আপনার ন্যায় সুবিচারকের নিকট নিশ্চয়ই সুবিচার প্রাপ্ত হইব।"

বারিষ্টারের কথা শুনিয়া মাজিষ্টর যেন একটু আহ্লাদিত হইয়া, হাসি হাসি মুখে বলিলেন, "আচ্ছা, আপনার যাহা বক্তব্য থাকে বলুন,—আমি তৎসমস্তই শুনিতে রাজি আছি।"

বারিষ্টার। আমার প্রথম কথা এই, আপনার আদালত হইতে আমি এ মোকদ্দমা উঠাইয়া লইব। আপনার নিকট এ মোকদ্দমার বিচার হইতে পারে না।

মাজিষ্টর। (চমকিয়া) সে কি কথা! এরূপ কার্য্য কখনই হইতে পারে না। আমি এই মোকদ্দমার বিচার করিব বলিয়া প্রথম হইতে অভিলাষ করিয়াছি। বিশেষ, এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে আমি সব কথা জানিয়াছি, সব কথা শুনিয়াছি, সুতরাং বর্ত্তমান বিষয়ে আমি যেরূপ সুবিচার করিব, অন্য কেহ তেমন পারিবেন না।

বারিষ্টার। (ধীরভাবে) আপনি এই শাল-চুরি বিষয়ে সমস্ত বৃত্তান্তই অবগত আছেন কি?

মাজিষ্টর। (সদম্ভে) হাঁ, আছি।

বারিষ্টার। (হাসিয়া) সেই জন্যই আমি আরও জেদ করিয়া বলিতেছি, আপনি এ মোকদ্দমার বিচারে সম্পূর্ণ অক্ষম। বিশেষ, এই সম্ভ্রান্ত জমাদার শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ এই দরখাস্ত দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন যে, "এই অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ যে ডাকাত—এ ধারণা আপনার পূর্ব্বেই হইয়াছে।" সুতরাং এরূপ স্থলে আপনি বিচারক নহেন, একজন সাক্ষী মাত্র।

মাজিষ্টর। (ক্রোধে) আপনার কোন কথাই সংলগ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে না। আমি মাজিষ্টর,—আমি এ জেলার প্রধান বিচারক,—আমি বিচার করিতে পাইব না,—অন্য একজন বিচার করিবে,—এমন কথা কখনই হইতেই পারে না।

বারিষ্টার। (ধীর গম্ভীরস্বরে) আশা করি, আপনি আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন। আপনি বিচারক, ধর্ম্মের অবতার স্বরূপ,—আপনি দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা,—ভয়-ত্রাতা,—দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালনই আপনার একমাত্র ব্রত। সুতরাং আপনার মুখে এরূপ কথা সাজে কি? এদেশের আপনি সুখশান্তির রক্ষক, দস্যু-দুরাচারের বিনাশক বটে,—আপনার আজ্ঞায় এখনি শত শত ব্যক্তি জেলে যাইতে পারে বটে, শত শত ব্যক্তি জেল হইতে খালাস পাইতে পারে বটে,—এরূপ অনন্ত, অপরিসীম, অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী হইলেও, আইনের দ্বারা আপনারও হস্তপদ বদ্ধ,—আইনের দ্বারা আপনারও কণ্ঠস্বর রুদ্ধ, লেখনী অচল। আইনকে অতিক্রম করিয়া চলিতে আপনি কখনই সক্ষম নহেন; কারণ আইন অনতিক্রম্য।

মাজিষ্টর। (রক্তবর্ণ-চক্ষে) আপনার আমি প্রলাপবাক্য শুনিতে চাহি না। আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি,—এ মোকদ্দমার বিচার আমিই করিব। আপনি আর বাজে কথা কহিয়া আদালতের সময় নষ্ট করিবেন না।

সেই বামপার্শ্বস্থিত অধ্যক্ষ-সাহেব, মাজিষ্টরের কাণে কাণে ফুস ফুস্ শব্দে কি কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

বারিষ্টার। শ্রীযুক্তের নিকট আমার এক্ষণে আর এক নিবেদন এই,—প্রকাশ্য আদালতে, বিচারকালে কোন পার্শ্বচর ব্যক্তির সহিত কাণে কাণে কথা কওয়া, ম্যাজিষ্ট্রেরের পক্ষে উচিত নহে। বিশেষ, অধ্যক্ষই অদ্যকার প্রকৃত অভিযোক্তা। যদি অধ্যক্ষের বা আপনার, পরস্পর মধ্যে কোন কথা বলিবার থাকে, তবে তাহা সর্ব্বজনসমক্ষে উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করিয়া বলাই বিধেয়।

ম্যাজিষ্টর। (মহাক্রোধে) দেখিতেছি, ক্রমশ আপনি আদালতের অবমাননা করিতে আরম্ভ করিলেন। এরূপ উপদ্রব কখনই সহনীয় নহে। কেবল আপনার চুল পরিপক্ব বলিয়া এবার আপনার মর্য্যাদা রক্ষা করিলাম,—নচেৎ—

বারিষ্টার। আপনার কাছে আমি পাকা-চুলের মর্য্যাদা রাখিতে আসি নাই। পাকা-চুলের সার্টিফিকিটে আপনার নিকট আমি অনুগ্রহ-ভিখারীও নহি। চুল আমার সাদাই হউক, কালোই হউক, আর কটাই হউক,—আদালতের দৃষ্টি সেদিকে নিক্ষিপ্ত হইবার কোন কারণ নাই। আদালত কেবল সূক্ষ্ম নয়নযুগলের সাহায্যে আইনের প্রতি-অক্ষর পর্য্যালোচনা করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিবেন।

এমন সময় গৃহদ্বারে এক বিষম গোল উঠিল। লোক সকল ঠেশাঠেশিতে পিষিয়া ছেঁচিয়া যাইতে লাগিল। যাহারা আঘাত প্রাপ্ত হইল, তাহারা "গেলাম," "মরিলাম" রবে গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। বিচারক, বারিষ্টার প্রভৃতি সকলেরই চক্ষু সেই দিকে গেল।

আদালত-গৃহ লোকে লোকারণ্য; তিলধারণের স্থান নাই। দৃষ্ট হইল, আট দশ জন লোক সজোরে ভিড় ঠেলিয়া গৃহ-প্রবেশে উদ্যত হইয়াছে। একে পথ নাই, স্থান নাই, লোকের জমাট,—তাহার উপর আট দশ জন লোকের প্রবেশ—কাজেই লোক-সাগরে ভয়ঙ্কর ঢেউ উঠিয়াছে,—ক্রমশ সেই তরঙ্গ-বেগ আসিয়া ম্যাজিষ্ট্রেরের চেয়ারে পর্য্যন্ত লাগিল। তখন সেই রণজয়ী অধ্যক্ষ-সাহেব উঠিয়া, দৌড়িয়া সেই দিকে গমন করিলেন। খানিক গিয়াই ফিরিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "উহা কিছুই নহে; এ মোকদ্দমায় এই ডাকাইত-দলের বিরুদ্ধে যিনি প্রধান সাক্ষী, তিনিই আগমন করিতেছেন;—পুলিস-প্রহরিগণ জনতার মধ্যে পথ করিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিতেছে। তাই এই ঠেলাঠেলি আরম্ভ হইয়াছে।"

অবশেষে, বহুলোক অবমানিত, লাঞ্ছিত, প্রহারিত, আঘাতিত হইবার পর, সেই প্রধান সাক্ষী আসরে অবতীর্ণ হইলেন। রঙ্গভূমে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইল। সেই সাক্ষা,—জটাজুট-বিভূষিত, করকমলে কমণ্ডলু-সুশোভিত, সর্ব্বাঙ্গে ক্ষার-ভস্ম-বিলেপিত, গলদেশে রুদ্রমালা-বিলম্বিত, কটীতটে বাঘছাল-আচ্ছাদিত—এক চৌদ্দ-আনা-উলঙ্গ যুবাপুরুষ। সেই বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া,—সাক্ষীর সেই রসরঙ্গ-ভঙ্গময়ী চঞ্চলা চাহনি দেখিয়া, সর্ব্বলোক একবারে স্তব্ধ, মুগ্ধ হইয়া গেলেন। অনেকে ভাবিতে লাগিলেন, "এ কি রকম সাক্ষী? এ সাক্ষী, না সঙ?" যিনি সংসার-রস-তত্ত্বজ্ঞ, ভাবুক পুরুষ, তিনি অনিমিষ-লোচনে সাক্ষীর প্রতি চাহিয়া চাহিয়া, কত কি চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"কে এটী? চেহারা দেখিয়া বোধ হইতেছে বাঙ্গালী। বয়স কাঁচা; গোঁফ-যুগল নবীন-নধর বটে! ঐ যে, ভাল কারয়া চাহিয়া দেখ দেখি,—মাথায় চেরা-সিঁতির ঈষৎ ঈষৎ চিহ্ন দেখা যাইতেছে নয়? জটাগুলা তবে কি পরচুলা? সন্ন্যাসীর গায়ে ত ভস্মমাখা,—হঠাৎ পমেটম ল্যাবেণ্ডারের গন্ধ কোথা হইতে আসিল? উহার অধর এত লাল কেন?—আলতা লাগান নয়ত? চোখ, মুখ, নাক যেন প্রেমরসে ভরা! তবে কি এটী প্রেমসন্ন্যাসী?"

সভামাঝে সন্ন্যাসী আসিয়া দাঁড়াইলেন। রণজয়ী অধ্যক্ষ-সাহেব, তাঁহার বসিবার জন্য এক চেয়ার আনাইয়া দিলেন। সন্ন্যাসী একটু ইতস্তত করিয়া, বেতের উপর একটা ক্ষুদ্র বাঘছাল বিছাইয়া, চেয়ারে উপবেশন করিলেন।

তখন অধ্যক্ষ-সাহেব দাঁড়াইয়া প্রকাশ্যে বলিলেন, "এই সন্ন্যাসীই অদ্যকার মোকদ্দমার প্রধান সাক্ষী। ইনি চুরি সম্বন্ধে এবং ডাকাতদলের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে সর্ব্ববিষয় অবগত আছেন। ইনি একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ সুশিক্ষিত পুরুষ। ইনি ইতিপূর্ব্বে শাল চুরি যাইবার সময়ে, বিহার অঞ্চলে সেই মহারাজ শ্রী——সিংহের প্রধান অমাত্য ছিলেন। মহারাজের ইনি দক্ষিণ-হস্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইঁহার সাক্ষ্য যেরূপ সমাদরে গৃহীত হইবে, অন্য কাহারও সাক্ষ্য সেরূপ ভাবে গৃহীত হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ ইনি শিক্ষিত এবং সুপাত্র। কোন গূঢ় কারণ বশত ইনি আজ কয়েক মাস হইল, সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ।"

মাজিষ্টর। এমন লোকের সাক্ষ্য সত্বর গ্রহণ করা উচিত। (সন্ন্যাসীর উদ্দেশে) আসুন, আপনি এই দিকে আসুন,—

বারিষ্টার দণ্ডায়মান হইলেন। নীচে বামপদ রাখিয়া, নিজ চেয়ারের উপর দক্ষিণ পদ তুলিয়া, কোটের দুই পকেটে দুই হাত ভরিয়া, বুক ফুলাইয়া বাঁকা হইয়া দাঁড়াইয়া, চক্ষু ঘুরাইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"আদালতের নিকট আমি বহুসম্মানপূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি, কোনরূপেই অদ্য এ মোকদ্দমা চলিতে পারে না,—কিছুতেই অদ্য এ মোকদ্দমার বিচার-কার্য্য আরম্ভ হইতে পারে না—যে আদালত আমার মক্কেলগণের উপর স্পষ্টত বিপক্ষতাচরণ করেন, সে আদলত দ্বারা আমার মক্কেলগণের বিচারকার্য্য চলিতে পারে না :—আমি এ কথা মুক্তকণ্ঠে শত শত বার বলিতে পারি,—

মাজিষ্টর। (ক্রোধে) আপনাকর্ত্তৃক বারংবার আদালতের এরূপ অবমাননা আর সহ্য হয় না,—

বারিষ্টর। (তীব্রস্বরে) আমি আদালতের অবমাননা কিছুই করি নাই।, আপনিই নতান্ত ক্রোধের বশীভূত হইয়া আইন আদালতের অবমাননা করিতেছেন। যে আদালতে আইন-কানুন এরূপ ভাবে পদতলে বিমর্দ্দিত হয়, সে আদালত, আদালত মধ্যেই গণ্য নহে। ইহা কলহ প্রিয়া ধীবর-রমণীদের মৎস্য-বিক্রয়ের হাট মাত্র।

মাজিষ্টর। (দাঁড়াইয়া উঠিয়া) আমি আপনার দুইশত টাকা জরিমানা করিলাম,—

বারিষ্টার পকেট হইতে একশত টাকা করিয়া দুইখানি নোট বাহির করিয়া মাজিষ্টরের সম্মুখে ধরিয়া দিলেন।

মাজিষ্টর সম্মুখে নোট দেখিয়া একটু যেন অপ্রতিভ হইলেন; বলিলেন, "আচ্ছা, এবার আপনাকে মাপ করিলাম,—আপনি নোট ফিরিয়া লউন,—আর কখন যেন আদালতকে অবমাননা না করেন।"

বারিষ্টার।, আমি বারিষ্টারি কার্য্যে বুড়া হইয়াছি,—আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর এই কার্য্যে ব্রতী আছি ; আদালতকে আমরা পরম পবিত্র ধাম বলিয়া জানি ;—পূর্ব্বে কখনও আদালতকে অবমাননা করি নাই, পরেও করিব না,—এবং এখনও করি নাই। আর আমি আপনার ক্ষমা বা অনুগ্রহপ্রার্থী নহি,—হাইকোর্টের বিচারে আমার দোষ সাব্যস্ত হয়, অক্ষুব্ধচিত্তে জরিমানার টাকা দিব,—আর তথায় যদি নির্দ্দোষ বলিয়া প্রমাণ হই,

তবে এই টাকা জোর করিয়া উঠাইয়া লইব,—তখন আপনার মত শত ম্যাজিষ্টর একত্র হইলেও, এ টাকা আটকাইয়া রাখিতে পারিবে না।

ম্যাজিষ্টার নীরব।

বারিষ্টার আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আপনি আমার জরিমানাই করুন, অথবা আমাকে জেলে দিবার উদ্যোগই করুন, সেজন্য আমি তিলার্দ্ধ চিন্তিত নহি,—আমার এখন চিন্তা, কেবল মক্কেলগণের জন্য। এই প্রায় এক শত জন বন্দী,—ছেলে মেয়ে পুরুষ—আমার মুখপানে চাহিয়া আছে। ইহাদের সকলেরই যাহাতে সুবিচার হয়, তৎপক্ষে আমি প্রাণপণ যত্ন করিব। আমি কাহারও বিভীষিকায় ভুলিবার পাত্র নহি—"

ম্যাজিষ্টার। আপনি কি এই সমস্ত বন্দীরই পক্ষে নিযুক্ত হইয়াছেন?—না কেবল দলপতির?—

বারিষ্টার। অদ্য আমি প্রত্যেক বন্দীরই পক্ষসমর্থনকারী।

ম্যাজিষ্টর। আপনার ওকালতনামায় কি তবে সমস্ত বন্দীর নাম লেখা আছে?

বারিষ্টার। কাউন্সিলের আবার ওকালতনামা কি!—ইহা ত বড়ই আশ্চর্য্য কথা!!

ম্যাজিষ্টর। (হাসিয়া) ও হো!—আপনি ওকালতনামা না দিয়া এতক্ষণ বৃথা তর্ক করিতেছিলেন!—যতক্ষণ পর্য্যন্ত আপনি ওকালতনামা না দিবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি আপনার কোন কথা শুনিতে বাধ্য নহি।

বারিষ্টার। অদ্য ইহজীবনে এক নূতন রসাত্মক কথা শুনিলাম। কাউন্সিলের আবার ওকালতনামা কি? 'আমি অমুক পক্ষে নিযুক্ত হইলাম' বলিলেই যথেষ্ট হইল।

ম্যাজিষ্টর। আমার আদালতের সেরূপ দস্তর নহে,—ওকালতনামা ব্যতীত আমি কাহাকেও কথা কহিতে দিই না।

বারিষ্টার। তবে আমি নাচার!—আমি চলিলাম। আমার শেষ বক্তব্য এই,—এই মোকদ্দমা তিন দিন মাত্র মুলতুবি রাখিতে আপনার কোন আপত্তি আছে কি?

ম্যাজিষ্টর হা হা রবে হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, "এ গুরুতর মোকদ্দমার বিচারে আমি কখনই কালবিলম্ব করিতে পারি না!—আমি অদ্যই ইহার চূড়ান্ত বিচার করিব।"

বৃদ্ধ বারিষ্টার গম্ভীর মূর্ত্তিতে সতেজে উঠিয়া চলিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নবীন-সন্ন্যাসী নগেন্দ্রনাথ এই ভাবে সাক্ষ্য দিলেন, "আমি সত্য ভিন্ন মিথ্যা কখন জানি না; মিথ্যা কথার যে কেমন কলঙ্কিনী মূর্ত্তি, তাহা কখনও কল্পনাতেও অঙ্কিত করিতে পারি নাই। ইহজীবনে আমি সত্যব্রত অবলম্বন করিয়াছি। আমি মহারাজ শ্রী——সিংহের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলাম। এক্ষণে সংসার-সন্ন্যাসী। শালখানি রাজার, তাহা আমি জানি। আমার দৃঢ়, ধ্রুব, স্থির বিশ্বাস, নিশ্চয় ধারণা,—অথবা বিশ্বাস, ধারণা কেন বলি,—আমি ঠিক্ জানি,—অথবা জানিই বা কেন বলি,—আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, ঐ অসভ্য বামুনটা এই শাল-গ্রহণ, বা আদালতের ভাষায় চুরি করিয়াছে।"

ব্রাহ্মণ নগেন্দ্রের পানে ফ্যাল ফ্যাল চাহিয়া রহিলেন। নগেন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া তিনি হতবুদ্ধি হইলেন। তাঁহার মনে কেমন একটা ধাক্কা আসিয়া লাগিল। ব্রাহ্মণের হৃদয়ে এতক্ষণে বিকার উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ, মানুষ মাত্র।

নগেন্দ্র আরও বলিলেন, "বামুনটা ভারি বদমাইস,—পাকা ওস্তাদ ডাকাত;—পরস্বাপহরণ উহার বৃত্তি। সেদিন রেল-গাড়ীতে কৈলাস নামক একটী বালককে বামুনটা অর্দ্ধখুন করিয়াছিল,—আমি না থাকিলে তাহাকে মারিয়াই ফেলিত। দেশের মঙ্গলের নিমিত্ত উহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত করা একান্ত আবশ্যক। উহাকে এখনি ফাঁসি দিতেও আমি আপত্তি করি না।"

নগেন্দ্রের সাক্ষ্য-গ্রহণ শেষ হইলে, সেই শাল-চোর গোবর্দ্ধন বলিল, "আমি মথুরায় দালালি করি। বামুনকে ডাকাত বলিয়া পূর্ব্বে আমি চিনিতাম না। সে আমাকে প্রত্যহই বলিত, 'ভাই! এই শালখানি আমাকে বেচে দাও না!—যত টাকায় বিক্রয় হইবে, তাহার অর্দ্ধেক টাকা তোমাকে দালালি স্বরূপ দিব।' এইরূপ প্রত্যহ বলায় আমার সন্দেহ জন্মিল। আমি শাল লইয়া, চোরাই মাল বিবেচনা করিয়া তাহা পুলিসের হাতে অর্পণ করিলাম। যখন শাল, পুলিসের হস্তগত হইয়াছে, তখন বামুনটা আমাকে কাঁদিয়া বলিল, 'ভাই! এটী রাজবাড়ীতে চোরাই-শাল—তুমি পুলিসের হাতে দিয়া

আমার সর্ব্বনাশ সাধিলে কেন?—না হয়, তোমাকে শালের বার আনা ভাগ দিয়া আমি সিকি লইতাম।' আমি জিহ্বা কাটিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া বলিলাম, "বাপরে! আমরা শ্রীকৃষ্ণের দাস! আমরা কি চোরাই জিনিসের অংশ লইতে পারি? ঠাকুরজী! ধর্ম্মপথে থাকলে অর্দ্ধেক রাত্রে অন্ন মিলবে!—"

তৃতীয় ও চতুর্থ সাক্ষী এক বাক্যে এইরূপ সাক্ষ্য দিল,—"আমরা বৈদ্যনাথ-বাসী। বৈদ্যনাথ-ষ্টেসনে রাজার গাড়ী হইতে ব্রাহ্মণকে আমরা শাল চুরি করিতে দেখিয়াছি। বামুনের সঙ্গে প্রায় একশত ডাকাত ছিল। ঘোর অন্ধকার রাত্রে বামুন যে শাল লইয়া কোথায় পলাইল, তাহা কেহ দেখিতে পাইল না। অন্ধকারে নিবিড় জঙ্গলের মধ্য দিয়া ব্রাহ্মণকে শাল হাতে লইয়া পলাইতে দেখিয়াছি।"

পঞ্চম ও ষষ্ঠ সাক্ষী—সেই দোকানদার-দ্বয়। তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে মাজিষ্টরকে বলিল,—"হুজুর! আপনি মা বাপ,—আমাদিগকে রক্ষা করুন! দোহাই হুজুর। আমরা মারা গেলাম,—হাজতে থাকিয়া আমরা আধখুন হইয়াছি। আপনার শরণ লইলাম,—আপনি মারিতে হয়, মারুন, রাখিতে হয়, রাখুন,—আর বাঁচি না।—"

মাজিষ্টর। প্রশ্নের জবাব দেও,—ও সব কথা আদালত শুনিবেন না। তোমরা যাহা জান, তাহাই জবাব করিবে;—

দোকানদার। হুজুর! পুলিস আমাকে মহারাণীর সাক্ষী হইতে বলিয়াছেন—

রণজয়ী অধ্যক্ষ। এ কথা কখনই সম্ভবপর নহে,—কারণ চুরির মোকদ্দমায় মহারাণীর সাক্ষী হওয়া হয় না। যে কার্য্য একান্ত অসম্ভব, তাহা কেহ অন্য লোককে করিতে অনুরোধ করে না। এ সাক্ষী স্পষ্টত মিথ্যা কথা বলিতেছে!—মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অভিযোগে এখনি ইহাকে অভিযুক্ত করা উচিত।

মাজিষ্টর। হাঁ, নিশ্চয়ই উচিত! এখনি অভিযুক্ত হউক।

দোকানদারদ্বয় এইরূপে অভিযুক্ত হইয়া হাজত-গৃহে পুনঃপ্রবেশ করিল।

হিন্দুস্থানী সরকারী উকীল এইরূপ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ-সমর্থন করিলেন,—"অদ্য বড় সমারোহের দিন। অনেকেই এ মোকদ্দমার ফলাফল জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন। কিন্তু আমার এক অনুরোধ,—বাহ্যদৃশ্য দেখিয়া কেহ যেন বিচার না করেন। হঠাৎ বাহ্যদৃশ্য দেখিয়া মনে হয়, চন্দ্র কেবলই সুধাকর,—কিন্তু যাঁহার অন্তর্দৃষ্টিতে অধিকার

আছে, তিনি বলিবেন, চন্দ্র কেবল কলঙ্কাকর! ময়ূর বাহ্যদৃষ্টে দেখিতে ভাল, কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনিলেই উহার উপর ঘৃণা জন্মে। অনেক দেশে, অনেক সময়, অনেক ব্যক্তি, হলাহলকে সুধা বোধে পান করিয়াছেন। ইহার অনেক নজীর আমি দেখাইতে পারি। কিন্তু সময়-নষ্টভয়ে, আদালতের ধৈর্য্যভঙ্গভয়ে, তাহা আর দেখাইলাম না। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই,—ডাকাতদলের সর্দ্দার, এই ব্রাহ্মণ দৃষ্টত নিরীহ লোক হইলেও, অন্তরটা উহার কালকূটে ভরা। একটা গল্প বলি,—আমাদের গ্রামে এক জন হরিভক্ত লোক আসিল, লম্বা টীকি, লম্বা তিলক;—সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ! হরিনামের ঝুলিটা অতি বৃহৎ, যেন একটা পোর্টমেণ্টে ব্যাগ!—সে সমস্ত দিন 'হরি হরি, রাধে রাধে' করিয়া বেড়াইল। অনেকে বলিল, ঠাকুরটী বড়ই ভক্ত। শেষে, সন্ধ্যার পরই, সেই লোকটা একজনের বাড়ী সিঁধ দিয়াছে! যখন ধরা পড়িল, তখন দেখা গেল, হরিনামের ঝুলির ভিতর একটা মড়ার মাথা!!—অদ্য এখানেও প্রায় ঠিক সেই ধরণের ব্যাপার উপস্থিত। এই ব্রাহ্মণ দেখিতে ভালমানুষের মত বটে, কিন্তু ইহার পেটের ভিতর কেবল পেঁচাও বুদ্ধি—অনন্ত জিলিপির পাক্! এই ব্রাহ্মণ মুখে হরি হরি বলে বটে, কিন্তু অন্তরে অহর্নিশি 'কাকে খুন করি, কোথা চুরি করি, কার মাথা খাই'—এই কথাই বলিতেছে। ব্রাহ্মণের মুখে মধু, অন্তরে বিষ। সাধু নগরবাসী,—সাবধান! সাবধান!—আমি অদ্য দেখিতেছি, অনেকে মোহমায়ায় মুগ্ধ হইয়া, ব্রাহ্মণের কৌশল-জালে জড়িত হইয়া, কুহকে ভুলিয়া ব্রাহ্মণের সহিত, সহানুভূতি প্রকাশে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু প্রমাণের অমোঘ-অস্ত্রে, আমি এই কৌশলজাল কুহক—মায়া বিচূর্ণিত করিয়া ফেলিব। তখন ঘোর অন্ধকার দূরীভূত হইবে—সত্যের শ্বেত-কুসুম প্রস্ফুটিত হইবে,—নরকের লোমহর্ষণ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সাধারণ্যে দেখা দিবে। প্রথম দেখুন, নগেন্দ্রনাথ কি বলিলেন?—বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ, এম্ এ পাস,—সুশিক্ষিত নগেন্দ্রনাথ কি বলিলেন?—সেই মহারাজ শ্রী——সিংহের প্রধান অমাত্য, সেই সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় নগেন্দ্রনাথ কি বলিলেন?—তিনি বলিলেন, 'আমি ঘোর অন্ধকারে শাল চুরি করিতে দেখিয়াছি।' বস্!—আর কিছুই চাই না। একদিকে অপর এক সহস্র সাক্ষীতে যে কাজ না হয়, একা নগেন্দ্রনাথের সাক্ষীতে সে কাজ হয়। যদি আমার পক্ষে একা নগেন্দ্র ব্যতীত অপর কোনও সাক্ষী না থাকিত, তাহা হইলেও আমি আদালতকে জেদ করিয়া বলিতাম,

একমাত্র নগেন্দ্রনাথের সাক্ষ্যবাক্যেই আসামীগণের দণ্ড দেওয়া উচিত। বিশেষ, নগেন্দ্রনাথ এক্ষণে সংসার-বিরাগী পুরুষ!—ধর্ম্মপ্রিয় উদাসীন,—মুমুক্ষু, পরোপকারী।—ইহজগতে স্বার্থ বলিয়া তাঁহার কোন বস্তু নাই,—সুতরাং তিনি যে ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে কোন কথা মিথ্যা করিয়া বলিবেন, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। ইহা ব্যতীত গোবর্দ্ধনের সাক্ষ্যবাক্য একবার পাঠ করুন—তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝিবেন, ব্রাহ্মণ অপরাধী। অবশেষে বৈদ্যনাথের—সেই ঘটনাস্থলের দুইজন সাক্ষীর জবানবন্দী পাঠ করিতে সকলকেই আমি অনুরোধ করি।—এক্ষণে বোধ হয়, সকলেই নিশ্চয়রূপে বুঝিলেন,—ব্রাহ্মণ প্রকৃত শাল-চোর, আর অন্যান্য বন্দিগণ ব্রাহ্মণের সহচর,—সুতরাং সকলেই এক দোষে দোষী। আদালতের সমক্ষে আমার বিনীতভাবে প্রার্থনা,—এই মোকদ্দমার অপরাধীগণকে দণ্ডবিধি আইনের ৩৭৮ ধারা অনুসারে যেন অভিযুক্ত করা হয়। আর, দণ্ডের উর্দ্ধতম যে পরিমাণ আছে, তৎসমস্তই যেন ইহাদিগকে প্রদান করা হয়। দেশের শান্তিরক্ষার জন্য, সুবিচারের জন্য, দুষ্ট ব্যক্তির দমনের জন্য—আমি অদ্য এই কঠোর কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।"

সরকারী উকীল বলিল, "বাদীগণ ৩৭৮ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইলেন।"

তখন মাজিষ্টর সর্ব্বজন-অবোধ্য হিন্দী ভাষায় কি একটা কথা উচ্চারণ করিলেন; পুনরায় সেই কথা মাজিষ্টরের মুখ হইতে নিঃসৃত হইল। একজন আমলা, বন্দিগণের উদ্দেশে, সেই কথা বুঝাইয়া বলিল, "সাহেব জিজ্ঞাসিতেছেন, তোমাদের কিছু বক্তব্য আছে কি?"

ভিখারী বন্দিগণ ঐ কথা শুনিয়া কাঁদিয়াই আকুল; সকলে গোলমাল করিয়া একই সময়ে একই কথা বলিতে আরম্ভ করিল;—"হুজুর! আমরা না খেতে পেয়ে মারা গেলাম। ছেলে পিলে আর বাঁচবে না! তা, হুজুর, আমাদিগকে জেলে দিতে হয় দিন; কিন্তু একমুঠো ক'রে যেন রোজ খেতে পাই!"

আমলা। তোমরা কি দোষ একরার করিলে? ভাল করিয়া বল?

কাঙ্গালীগণ। হুজুর! আমাদিগকে যা বল্‌তে বল্‌বেন,—যা কর্‌তে বল্‌বেন, তাই কর্‌বো!—(পেট চাপড়াইয়া) হুজুর! আমরা এই পেটের জ্বালায় জ্বলে মোলাম! আমাদিগে দুটী দুটা ভাত দিবেন, যে কাজ কর্‌তে বল্‌বেন,—তাই কর্‌বো——

কাঙ্গালীগণের কথা এইরূপ ইংরেজীতে অনুবাদিত হইয়া লিখিত হইল, যথা ;—

"বন্দিগণ সকলেই নিজ দোষ স্বীকার করিয়া জেলে যাইতে চাহে।"

তখন মাজিষ্টর এবং রণজয়ী অধ্যক্ষ—উভয়ে ফুস্‌ফাস্‌ করিয়া পনের মিনিট কাল গম্ভীর পরামর্শ করিলেন।

শেষে মাজিষ্টর মুক্তকণ্ঠে হুকুম দিলেন, "ডাকাতগণ প্রমাণ ও একরার্ অনুসারে সম্পূর্ণরূপে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছে। অতএব অপরাধের দণ্ডের স্বরূপ প্রত্যেকের ত্রিশ ত্রিশ বেতের হুকুম হইল। অদ্য একঘণ্টা পরে অপরাধীগণ আমার সমক্ষে এই দণ্ড গ্রহণ করিবে।"

সর্ব্বলোক ভীত, স্তম্ভিত, চকিত হইল! হায় হায় রবে মথুরা পূর্ণ হইল! রাম-প্রসাদ চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে ত্বরায় সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ব্রাহ্মণ এতক্ষণ অধোবদনে নীরব ছিলেন। বেতের কথা শুনিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিয়া, মাজিষ্টরের পানে চাহিয়া হিন্দীতে বলিলেন, "ভিখারীগণের মধ্যে ছয়টী স্ত্রীলোক আছে, ইহাদেরও কি বেত হইবে? স্ত্রীলোককে উলঙ্গ করিয়া বেত্রাঘাত, কোন আইনে লিখিত আছে?—"

ব্রাহ্মণ আর কথা কহিতে পারিলেন না—চোখের জলে বুক ভাসিয়া গেল!

সরকারী উকিল উঠিয়া মাজিষ্টরকে বলিলেন,—"হাঁ, তা বটে,—স্ত্রীলোকদের জন্য আপনি অন্য দণ্ড আদেশ করুন।"

স্ত্রীলোক ও বালকগণের কঠিন পরিশ্রমের সহিত তিনমাস করিয়া কারাবাস দণ্ডাজ্ঞা হইল। ব্রাহ্মণের মুখে হাসি দেখা দিল।

বেত্রাঘাতোদ্যোগ।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বেত্রাঘাত দণ্ড-দানের নিমিত্ত ব্রাহ্মণকে টীকৃটীকিতে টাঙ্গান হইল। হস্তপদ কাঠে আঁটিয়া বাঁধা হইল। সর্ব্বশরীরকে একরূপ প্রায়-উলঙ্গ করা হইল। ব্রাহ্মণ মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "হা দীনবন্ধু! হা কৃপাসিন্ধু! দয়াময় প্রভু! পূর্ব্বজন্মকর্ম্মফলে আজ এই ভোগ ভুগিতেছি!—হা অনাথ-বান্ধব! আমাকে সুমতি দাও, এ জন্মে তোমার পাদপদ্মে যেন আমার নিয়তই মতিগতি থাকে! ক্ষণকালের নিমিত্ত যেন স্বধর্ম্ম-বিচ্যুত না হই,—যেন মোহ-পাশে আবদ্ধ হইয়া এ জন্মে আর কখন কুকর্ম্মে রত না হই। দোষ কাহারও নাই! দোষ কেবল মন্দভাগ্যের!! হে দরিদ্রের দুঃখভঞ্জন শ্রীহরি! আমার কেবল এই ভিক্ষা,—অন্তিমে যেন তোমার চরণ-তলে স্থান পাই!"

ব্রাহ্মণকে তদবস্থায় বিলম্বিত দেখিয়া বহুলোক গভীর আর্ত্তনাদে সে স্থান হইতে দৌড়িয়া পলাইল। "হা হত হইলাম, হা দগ্ধ হইলাম, আর এ দেশে থাকিব না, আর এ মুখ দেখাইব না"—এই কথা বলিতে বলিতে অনেকে ছুটিয়া যমুনার জলে গিয়া পড়িল। কুলকামিনীগণ ভয়ে নয়ন মুদিয়া ঘরের কবাট বন্দ করিল। বালকগণ বিনা কারণে বৃথা রোদন করিয়া উঠিল! অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল! অকস্মাৎ ঝড় উঠিয়া, মথুরানগরকে ধূলরাশিতে পূর্ণ করিল!

এদিকে বেত্রাঘাতের জন্য সুগোল সুলম্বা চারিগাছি বিষম বেত আসিল। বেতের আকার অবয়ব দেখিয়া পার্শ্বস্থ ভিখারী বন্দিগণ চমকিল। তাহারা ত্রাহি মধুসূদন, ত্রাহি মধুসূদন, ডাক ছাড়িতে লাগিল। কৃষ্ণবর্ণ-পোষাক-পরিহিত একজন মেথর-জাতীয় জল্লাদ একগাছি লম্বা বেত হাতে করিয়া প্রহারের ধারাপ্রণালী আঁচ করিতে লাগিল। কিন্তু খোদ মাজিষ্টর তখনও রঙ্গস্থলে আসিয়া পৌছেন নাই; কাজেই অন্যান্য রাজকর্ম্মচারিগণ কাছারি পানে চাহিয়া মাজিষ্টরের আগমন প্রতীক্ষা করিতে থাকিলেন।

ব্রাহ্মণ আঠে-কাঠে বদ্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "আমার সহধর্ম্মিণী এখন ৺শ্রীবৃন্দাবনেই বাস করিতেছেন। এ সংবাদত তাঁহার অগোচর থাকিবে না। যখন তিনি শুনিবেন, আমি চৌর্য্য-অপরাধে ধৃত হইয়া, বেত্রাঘাতদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছি, তখন তিনি

মর্ম্মে কতই ব্যথা পাইবেন। তিনি একে বালিকাস্বভাবা, দুর্ব্বলা, রুগ্না; তাহার উপর হঠাৎ এরূপ দারুণ শোক পাইলে, তাঁহার ব্যারাম আরও বৃদ্ধি হইতে পারে। অথবা এক মুহূর্ত্ত জন্যও তাঁহার হৃদয়ে যদি এই ভাবের উদয় হয়,—'আমার স্বামী পাপিষ্ঠ, চোর, ডাকাত, দুরাচার,—অতএব সে স্বামীর মুখ দর্শন করা অকর্ত্তব্য'—তাহা হইলে, (মনে মনে এরূপ পতিনিন্দা নিবন্ধনও,) তাঁহার হৃদয়ে পাপ স্পর্শিতে পারে! তিনি নিতান্ত বালিকা,—সংসারের কোন সংবাদই রাখেন না;—কোন ব্যক্তি হঠাৎ যখন তাঁহাকে এ ভীষণ কথা শুনাইবে, না জানি, তিনি কতই ভয়-চকিত হইবেন;—সমবয়স্কাদের নিকট স্বামীর কথা উঠিলে তিনি কতই লজ্জিতা হইবেন। হা ভগবন্! আমি নিজে দুঃখ পাই তজ্জন্য দুঃখ করি না—কিন্তু আমার জন্য যে অপরে দুঃখভোগ করে, ইহাই আমার পরম দুঃখ। হা বিধাতঃ! আমাকে দুঃখের নিমিত্ত-কারণ করিয়া কেন সৃষ্টি করিলে?"

দেখিতে দেখিতে লোকারণ্য ভাঙ্গিয়া গেল। ছোড়ভঙ্গ হইয়া, কে কোথায় সরিয়া পড়িল, তাহার কিছুই ঠিক হইল না। হিন্দুমাত্রেই সে স্থলে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। রহিল কেবল,—কয়েকজন অন্তজ মুসলমান—সৈনিকদল, কনষ্টেবলদল, কর্ম্মচারীদল এবং কয়েকজন বাবু। অদূরে বিল্বদলের অন্তরালে কমলিনীর গৃহচিকিৎসক মহেন্দ্রনাথকে দেখা গেল। আরও দৃষ্ট হইল,—সেই জল্লাদের ঠিক দক্ষিণ-পার্শ্বে, সেই নবীন-সন্ন্যাসী নগেন্দ্রনাথ হেলিয়া দুলিয়া বেড়াইতেছেন।

একি দেখি? ৺কাশীধামের সেই উলঙ্গ-বাবাজী নাকি? তাই বটে; সন্ন্যাসী সম্পূর্ণ দিগম্বর; সদানন্দ ভাব; হাসি হাসি মুখ; অঙ্গের কান্তি কমনীয়,—চক্ষুর জ্যোতি উজ্জ্বল; দেহ দীর্ঘ; বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত; গাত্রে ভস্ম বিলেপিত। কয়েকজন বালক তাঁহাকে পাগল-জ্ঞানে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ হাততালি দিতে দিতে আসিতেছে। কেহবা একমুষ্টি ধূলি লইয়া তদঙ্গে নিক্ষেপ করিতেছে; কেহ বা "ক্ষেপা যায়, ক্ষেপা যায়" বলিয়া আনন্দে, উচ্চচীৎকারে গগন ফাটাইতেছে! সন্ন্যাসীর কিছুতেই দৃক্‌পাত নাই,—প্রফুল্লবদনে, গজেন্দ্রগমনে অগ্রসর হইতেছেন।

ব্রাহ্মণ টীকুটীকির উপর উচ্চে অবস্থিত। সুতরাং তিনি অগ্রেই সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলেন। গুরুদেবকে দেখিয়া, তাঁহার নয়নদ্বয় দিয়া অবিরল অবিশ্রান্ত বাষ্পবারি

বিগলিত হইতে লাগিল। তাঁহার ভাবনা হইল, "গুরুদেব নিকটে আসিলে তাঁহাকে কি বলিয়া সম্ভাষণ করিব? হস্তপদ বাঁধা,—গুরুদেবকে প্রণাম করিবই বা কেমন করিয়া?" তখন অন্তরে বারংবার সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। উলঙ্গ-সন্ন্যাসী নিকটবর্ত্তী হইলে, ব্রাহ্মণ কাতর কণ্ঠে, উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "গুরুদেব! দৈব-দুর্ব্বিপাকে কর্ম্মফলে আমার হস্তপদ আজ বিষম নিবদ্ধ!—আমি হৃদয়ে আপনার চরণ-কমল ধ্যান করিতেছি, আমায় আশীর্ব্বাদ করুন,—আমায় রক্ষা করুন!"

সন্ন্যাসী, সহাস্য-বদনে বলিলেন, "ভয় নাই, ভয় নাই!—এ সংসারে আবার দুঃখ শোক জ্বালা যন্ত্রণা কি?—মন্দভাগ্য! তুমি মিছা শোকে অভিভূত হইতেছ! তোমার হন্তা কে, যে, আমি রক্ষক হইব?—এ সংসারে হন্তা হত, পীড়ক পীড়িত—কেহই নাই! তুমি এই কল্পিত বিপদে পড়িয়া কি আজ সমস্ত উপদেশই ভুলিয়া গেলে?—মনকে দৃঢ় রাখিও, ভগবানের চরণারবিন্দ সদা ধ্যান করিও! সেই ঈশ্বরই একমাত্র গতি! আর দ্বাদশবর্ষকাল, তোমার কৃত-কর্ম্মফলের ভোগ আছে। সাবধান!—"

এমন সময় মাজিষ্টর রঙ্গস্থলে উপনীত হইয়া দেখিলেন,—একটা নেংটা লোক পাগলের ন্যায় হাসিতেছে। বলিলেন, 'রাজপথে একি অশ্লীলতা!—রমণীকুল এ দৃশ্য দেখিলে, এখনি মূর্চ্ছিতা হইতেন। এখনি ইহাকে পাগলাগারদে দেওয়া হউক।"

দশবার জন কনষ্টেবল দ্রুতপদে উলঙ্গ-সন্ন্যাসীকে ধরিতে গেল। নিকটে গিয়া কেহ ঘুষি ওঁচাইল, কেহ লাঠি চালাইল, কেহ বাহুদ্বয় দ্বারা বেষ্টন-উদ্যত হইল, কেহ বা পদাঘাতে সন্ন্যাসীর বক্ষ বিদারণার্থ ধাবিত হইল। তাহারা মুহূর্ত্ত মধ্যে দেখিল, সন্ন্যাসী নিকটে নাই, কেবল তাহারা নিজে নিজেই জড়জড়ি মারামারি করিতেছে। তখন তাহারা নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়া ফিরিয়া আসিল।

সম্মুখে ম্যাজিষ্টর দাঁড়াইয়া জল্লাদকে হুকুম দিলেন, "বেত লাগাও।"

জল্লাদ বেত উঁচাইয়া মারিতে উদ্যত হইল। ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন, একবার,—

"হরি হরি বল।—হরি হরি বল।—

হঠাৎ জল্লাদ, ভূতলে পড়িয়া গেল। হস্তস্থিত বেতগাছটী ঠিকরাইয়া বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হইল। তাহার হাতের গাঁটে এবং কাঁকালে কে অলক্ষ্যে বিষম প্রহার করিয়া, বিদ্যুতের ন্যায় কোথায় লুকাইল। ব্রাহ্মণ ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন,—

নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ! নমস্তে পুরুষোত্তম!
নমস্তে সর্ব্বলোকাত্মন্ নমস্তে তিগ্মচক্রিণে॥
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

ওদিকে নগেন্দ্রের গালে হঠাৎ কে এক দারুণ চড় মারিয়া চলিয়া গেল। তাঁহার মুখ দিয়া ভল্ ভল্ রক্ত বাহির হইতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ চোখের জল ফেলিয়া আবার বলিলেন,—

সংসারকূপমতিঘোরমগাধমূলং
সংপ্রাপ্য দুঃখশতসর্পসমাকুলস্য।
দীনস্য দেব কৃপণাপদমাগতস্য
লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্॥

মাজিষ্টর বিব্রত হইয়া প্রথমত সেই জল্লাদকে তুলিয়া মুখে জল দিতে বলিলেন। তখন অন্য একজন জল্লাদ আসিয়া বেত লইয়া, প্রহারার্থ মাজিষ্টরের অনুমতির প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ জলদগম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "যে যেখানে আছ, আর একবার উচ্চকণ্ঠে সেই মধুময় নাম উচ্চারণ কর—

"হরি হরিবোল!"

বনের পশু, তুইও একবার বল্,—হরি হরিবোল!
গাছের পাখী, তুইও একবার বল্,—হরি হরিবোল!
অনন্ত আকাশে প্রতিধ্বনিত হউক,—হরি হরিবোল!
অনন্তকোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রতিধ্বনিত হউক——হরি হরিবোল।

অদূরে পশ্চাদ্ভাগে এককালে বিংশতি কণ্ঠ উত্তর দিল,—

"হরি হরিবোল!"

ব্রাহ্মণ প্রিয়জনের পরিচিত কণ্ঠস্বর বুঝিয়া, আনন্দ-উল্লাসে উচ্চরবে আবার বলিলেন, "আর একবার বল,—হরি হরিবোল।"

তখন সেই দল বেগে ব্রাহ্মণের নিকট দৌড়িয়া আসিল। ব্রাহ্মণ দেখিলেন,—স্বয়ং মহারাজ শ্রী——সিংহ উপস্থিত। আনন্দ-অশ্রুতে-ব্রাহ্মণের দেহ প্লাবিত হইয়া গেল! কণ্ঠরোধ হইল! ব্রাহ্মণ অবসন্নদেহে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন।

রাজা, মাজিষ্টরকে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন। মাজিষ্টর কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়—'হতভম্ভ' হইয়া, অগত্যা বন্দিগণকে মুক্তি দিতে বাধ্য হইলেন। রণজয়ী অধ্যক্ষ-সাহেব ফ্যাল ফ্যাল নেত্রে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে "ভাইত" "তাইত" করিতে লাগিলেন। নগেন্দ্রনাথ যে কোথায় নিভাও হইয়া দৌড়িলেন, তাহা আর কেহ দেখিতে পাইল না।

মুক্তির কথায় মথুরাপুরী হরিনামময় হইয়া উঠিল! ঘরে ঘরে আনন্দ-উৎসবের বাজনা বাজিল!

উপসংহার।

তৃতীয় ভাগের প্রথমাংশ শেষ হইল। রাজা, ব্রাহ্মণের বিপদবার্ত্তা-তারযোগে জানিয়া, যথাসম্ভব দ্রুতগতি মথুরায় আগমন করেন। আর সেই কৈলাসচন্দ্রেরই লাঠির গুপ্ত আঘাতে জল্লাদ ধরাশায়ী হয়। কৈলাসেরই বামকর-কমল চড়রূপে নগেন্দ্রের গালে গিয়া নিপতিত হয়। কৈলাসের প্রতিজ্ঞা যে, তিনি ইহজন্ম ব্রাহ্মণকে মুখ দেখাইবেন না। তাই গোপনে ছদ্মবেশে ব্রাহ্মণের অগোচরে বেড়াইতেছিলেন।

প্রথমত ব্রাহ্মণ ৺কাশীধামে গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তৎপরে বিহার অঞ্চলে রাজার রাজধানীতে গমন করেন। সেই স্থানেই তাঁহার ভীষণ জ্বররোগের সূত্রপাত হয়!

একটু আরাম হইয়া, ছয় মাস পরে বাটী আসিলেন। বাটীতে রোগ বৃদ্ধি পাইল,—জীবন সঙ্কটাপন্ন হইল! প্রাণ বুঝি যায় যায় হইল! তিন বৎসরকাল ব্রাহ্মণ এইরূপ রোগ ভোগ করেন। চতুর্থ বৎসরে তাঁহার দেহ নীরোগ হইল, দেহে বলের সঞ্চার হইল।

এই সময় পনের দিন মধ্যে দুইখানি উড়ো চিঠি ব্রাহ্মণের হাতে গিয়া পড়িল। তাহাতে লিখিত আছে,—"যদি সম্ভব হয়, আপনার সহধর্ম্মিণীকে কলিকাতা হইতে শীঘ্র বাটী আনিবেন।"

বলা বাহুল্য, রামচন্দ্র এবং অন্নপূর্ণার, ব্রাহ্মণের উপর যত্নের ক্রুটী ছিল না। রোগের সময় অর্থ-সাহায্য, চিকিৎসা-সাহায্য, সকল রকমই সাহায্য তাঁহারা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ মনে মনে তাঁহাদের উপর বড়ই কৃতজ্ঞ ছিলেন।

ব্রাহ্মণ, এইভাবে শ্বশুরকে চিঠি দেন, "ফাল্গুন মাসে আমার সহধর্ম্মিণীকে এখানে পাঠাইয়া দিলে বড়ই উপকৃত হইব। কারণ, ঘরে কেহই নাই।"

চিঠির উত্তর গেল, "আপনার জন্য কলিকাতায় একটী বাটী খরিদের চেষ্টায় আছি। কমলিনীর সহিত আপনি কলিকাতাতেই অবস্থিতি করিবেন। বোধ হয়, ইহাতে আপনার কোন আপত্তি হইতে পারে না।"

ইতিপূর্ব্বে কমলিনীর পিতা মাতা সকলেই শুনিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ আধ-পাগল হইয়াছেন। তাই কলিকাতায় আনিবার জন্য তাঁহাদের এত যত্ন।

ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, "না, তাহা হইবে না,—আমি বৈশাখ মাসে স্বয়ং গিয়া সহধর্ম্মিণীকে লইয়া আসিব।"

ব্রাহ্মণ, স্ত্রীকে লইতে আসিয়া কিরূপ বিপদে পতিত হন, তাহা পাঠক প্রথম ভাগে অবগত আছেন। তৃতীয় ভাগের দ্বিতীয় অংশে ব্রাহ্মণের পরিণাম বর্ণিত হইবে।

মডেল ভগিনী

তৃতীয় ভাগ

দ্বিতীয় অংশ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গভীর রজনী। ঘোর অন্ধকার। গগন চন্দ্রহীন, গৃহ আলোকহীন, হৃদয়ও বুঝি দীপ্তিহীন। অন্তর বাহির, অবনী আকাশ—সর্ব্বত্রই যেন কালামুখী আঁধার-দানবী কালো কালো দাঁত বাহির করিয়া অট্ট অট্ট হাসিতেছে! ভয়ানক-ভাবে প্রাণ চমকিত!

উপরে নন্দনকানন, নিম্নে নরক—কলিকাতাস্থ সেই হরিতালী-রঙের বাসাবাটী পাঠকের স্মরণ আছে ত? সেই দ্বিতলগৃহের সর্ব্বনিম্নতলে, পাইখানার এক-পাঁচীরে, একমাত্র ক্ষুদ্র গবাক্ষযুক্ত অন্ধকারময় গৃহে কমলিনীর স্বামী রাধাশ্যাম ভাগবতভূষণ ভূতলে মাদুরের উপর শায়িত। সহসা উঠিয়া তিনি বালিস বুকে দিয়া বসিলেন। রাত্রি বোধ হয় আড়াই প্রহরে পড়িয়াছে।

কপিল-খানসামা, বকাউল্লা ঘেসেড়া এবং কনষ্টেবলকর্ত্তৃক বিষম প্রহারিত হইয়া, ডেপুটী বাবুর গৃহদ্বারে রাত্রি প্রায় নয়টার সময় ব্রাহ্মণ মূর্চ্ছিত ও ভূপতিত হন। রাত্রি দেড় প্রহর অতীত হইলে, মূর্চ্ছা-ভঙ্গেরর প দেখেন, তিনি সেই ক্ষুদ্র ঘরে অবরুদ্ধ

হইয়াছেন। কেন, কি বৃত্তান্ত,—কোথায় আসিলাম, কোথায় যাইব,—ব্রাহ্মণ প্রথমতঃ এ-সবের কিছুই বিশেষ ঠিক করিতে পারিলেন না। ক্রমশঃ তিনি কতক কতক আন্দাজি বুঝিলেন—বাস্তবিকই তিনি এক্ষণে ভীষণ দুর্গন্ধময় কারাকূপে নিক্ষিপ্ত! নিকটে, ষণ্ডা-ষণ্ডা-চেহারা কতকগুলি অপরিচিত লোক বসিয়া ছিল; দেখিতে দেখিতে হঠাৎ তাহারা উঠিয়া গেল। তার পর, ব্রাহ্মণ গৃহের প্রত্যেকের নাম ধরিয়া কাতরকণ্ঠে, কতই অনুনয় বিনয় করিলেন, কতই কাঁদিলেন,—কিন্তু কেহই সে কথায় কর্ণপাত করিল না। এইরূপ এবং অন্যরূপ নানা ঘটনা-ঘটায় একঘণ্টাকাল অতিবাহিত হইলে, হঠাৎ কপিল-খানসামা আসিয়া, সেই ঘরের প্রদীপটী নিবাইয়া, গৃহদ্বারে ডবল চাবি আঁটিয়া দিয়া চলিয়া গেল। তখন ব্রাহ্মণ নীরব হইলেন। আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। রাত্রি তখন প্রায় দ্বিপ্রহর।

ব্রাহ্মণ সাধারণত অবিচলহৃদয় হইলেও এবার দমিলেন। তাঁহার বুক ভাঙ্গিল, সাহস কমিল, প্রাণটী যেন কেমন ধুক্‌ধুক্ করিতে লাগিল। ইহজীবনে তিনি কখন এমন যন্ত্রণা প্রাপ্ত হন নাই, এমন বিপদজালে তিনি কখন জড়িত হন নাই, এমন অভাবনীয় ঘটনাও তিনি কখন দেখেন নাই। তাঁহার মনে হইল, প্রকৃতই প্রাণ বুঝি এবার যায়! আবার ভাবিলেন, "আমার প্রাণই যদি যাইবে, তবে এ কর্ম্মফল ভোগ করিবে কে? সে সুকৃতিই যদি থাকিবে, তবে আমি এরূপ শত কালসাপ কর্তৃক দংশিত হইয়াও এখনও জীবিত থাকিবই না কেন? বোধ হয় দেহত্যাগ ঘটিবে না—আমাকে এই অনন্ত অগ্নিতে অনন্তকাল দগ্ধ হইতে হইবে!"

ব্রাহ্মণ ধড় ফড় করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ একটু প্রকৃতিস্থ হইলে,—তাঁহার মনে মনে এই চিন্তার উদয় হইল,—"আচ্ছা, এ সব ব্যাপার কি? প্রতিক কি? ইহারা কেন আমাকে এত মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা দিতেছেন? আমার অপরাধ কি? দুরন্ত অপরাধীরও ত এরূপ দণ্ড নহে!

"ইহারা কি স্বভাবতই নিষ্ঠুর, না কেবল আমার প্রতিই নিষ্ঠুর? মানুষ কি এত নির্দ্দয়, নির্ম্মম হইতে পারে? বাঘ, ভালুকেরও ত এত পাষাণবুক নয়? কম হোক, বেশী হোক, স্নেহ-মমতা প্রত্যেক প্রাণীতেই একটু-না-একটু—অন্তত বীজভাবে, নিশ্চয়ই নিহিত আছে! যদি তাহাই থাকিবে, তবে ইহারা অকারণে বিষাক্ত বাক্য দ্বারা অবিরত

খুঁচিয়া খুঁচিয়া আমার বক্ষ বিদারণ করিবেন কেন ? তবে কি ইহাঁরা ঈশ্বরের সৃষ্টি-ছাড়া জীব ?

"মাতৃবৎ পূজনীয়া, স্নেহময়ী শাশুড়ী-ঠাকুরাণীকে কপাটের অন্তরালে দেখিয়া, যোড়-হাতে চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে যখন আমি বলিলাম,—'মা, আমাকে রক্ষা কর,—আমি আর বাঁচিনা ! মা, আমার আর কেউ নাই,—তোমার ছেলেকে আর কষ্ট দিও না মা ?'—কৈ তখন জননী ত রক্ষার কিছুই উপায় করিলেন না ;—স্থিরভাবে পূর্ব্ববৎ দাঁড়াইয়াই রহিলেন। আবার যখন তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম, 'মা, আমি একটুকুও পাগল নই,—আমাকে পাগল বলিয়া আর যন্ত্রণা দিও না মা !—মা, এ অধমকে ঘরে স্থান দিতে যদি কোন আপত্তি থাকে, তবে আমাকে ছেড়ে দাও,'—তখনও জননী কিন্তু একপদও নড়িলেন না ; ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। মায়ের প্রাণ কি কখন এত পাষাণ-প্রায় হইতে পারে ?

"কপিল-খানসামার দুর্ব্বৃত্ততার কথা ধরি না। উহা দ্বারা সর্ব্বকর্ম্মই সম্ভব। কিন্তু ভদ্রলোকের বাড়ী, হিন্দুর গৃহে, এরূপ অহিন্দু ভৃত্যের অবস্থান কিরূপে সঙ্গত, তাহা ত কিছুতেই বুঝি না। কপিলের ব্যবহার দেখিয়া মনে হয়, উহার ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষের মধ্যে আদৌ কেহই হিন্দু ছিল না। এরূপ অসভ্য, অভব্য, অহিন্দু ভৃত্যকে,—এরূপ মদিরাপানোন্মত্ত, সদা মদগন্ধযুক্ত, হাবভাবে লম্পট-সজ্জিত—এই পশুবৎ পুরুষকে—শ্বশুর মহাশয় কেন যে খানসামা-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ; তাহাও বুঝি না। কপিলকে সন্ধ্যাহ্নিকের জন্য গঙ্গাজল আনিতে বলিলাম ; সে, বলিল, 'ভাল পরিষ্কার কলের জল আছে, তাহা দিলে চলিবে কি ?' লোকটা পাগল নাকি ? অথবা ঘোর মাতাল নয় ত ? সে কি সংসারের কোনও সংবাদ রাখে না ? না, সে বদ্‌মাইস ?—বুঝি সে আমার সঙ্গে তামাসা করিল ! আমি কি তার তামাসার যোগ্য ?—আমার সঙ্গে সে হঠাৎ পরিহাস করিবে কেন ?—তবে,—কি ?

"গঙ্গাজল পাইব না বুঝিয়া, যখন আমি স্বয়ং গঙ্গাতীরে যাইবার জন্য পথে বাহির হইয়াছি, তখন একটা মুসলমান চাকর, একটা হিন্দুস্থানি দ্বারবান্‌, একটা কনষ্টেবল,—এই তিন জনে কেবল কপিলের কথায় আমাকে চোরের ন্যায় গ্রেফ্‌তার করিল। ক্রমে নিদারুণ আঘাতে আমাকে ধরাশায়ী করিল,—আমাকে পাগল বলিয়া আমার উপর

অত্যাচারের চরম উৎকর্ষ দেখাইল ;—অবশেষে আমি মূর্চ্ছিত হইলাম !—কিন্তু তথাচ ইহারা ক্ষান্ত হইল না ; মূর্চ্ছাভঙ্গের পর দেখি, ডাকাতবৎ ভয়ঙ্করমূর্ত্তি কয়েকটা লোক আমাকে ঘেরিয়া আছে,—যেন আমাকে গলাটিপিয়া মারিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছিল। আমি চক্ষু চাহিবামাত্র হঠাৎ তাহারা পলাইয়া গেল ; যেন স্বকার্য্যসিদ্ধির বিঘ্ন হইল বুঝিয়া, তাহারা বিষণ্ণমনে বিদায় হইল ! আচ্ছা, আমাকে বধ করিবার জন্য ইহারা ষড়যন্ত্র করিয়াছে নাকি ? যদি তাহাই না হইবে, তবে আমার প্রতি এরূপ ব্যবস্থা করিবে কেন ? বহুদিন পরে জামাতা নবাগত,—আদর, অভ্যর্থনা, স্নেহ মমতা দূরে যাউক, আমার উপর কুক্কুর-শৃগাল অপেক্ষাও অধিক লাঞ্ছনা করে কেন ? চোখের জল ফেলিয়া, জননীর পানে চাহিয়া যখন কাঁদিলাম, তখন মায়ের প্রাণে একটু স্নেহভাবের উদয় হইল না কেন ?

"উঃ, কি বিষম ষড়যন্ত্র ! !—আমাকে পাগল অভিধানে অভিহিত করিয়া, আমাকে এই কারাগারে উহারা অবরুদ্ধ করিল। নিশ্চয়ই ঐ জন্য আমার উপর পাগল অপবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। পাগলের প্রতি শত-লাঞ্ছনা সম্ভবে ! পাগলের পৃষ্ঠে শত-বেত্রাঘাত দূষণীয় হয় না। কেন না—সে পাগল !

"যদি উহাদের বধ করাই উদ্দেশ্য হয়,—তবে আমাকে এরূপ করিয়া পাগল সাজাইবে কেন ? অদ্য আহারীয় দ্রব্যের সহিত বিষ মাখাইয়া রাখিলেই ত উদ্দেশ্য সফল হইত। আমাকে লইয়া এত টানাটানি, ধরাধরি, মারামারি করিবার কি দরকার ছিল ? বিষাক্ত ঘৃতে লুচি ভাজিয়া খাইতে দিলেই ত উহারা ফল সমান পাইত !

"আচ্ছা, হঠাৎ আমাকে আজ পাগল বলে কেন ? প্রায় নয় বৎসর হইল, আমার বিবাহ হইয়াছে ;—এই নয় বৎসর মধ্যে একদিনও আমাকে পাগল বলিল না, পাগল বলিয়া একদিনের জন্যও সন্দেহ করিল না,—হঠাৎ আজ এ অপবাদ দিবে কেন ?—ইতিপূর্ব্বে আমার উপর ত ইহাঁরা বেশ সদ্ব্যবহারই করিয়া আসিয়াছেন ! আমার স্বর্গীয় দাদাশ্বশুর মহাশয় আমাকে পাইলে ত একেবারে আনন্দে গলিয়া যাইতেন ! তখন আমি শ্বশুর-ভবনে গমন করিলে, তথায় যেন আনন্দ উৎসবের লহরী বহিত ! আমার পিতার মৃত্যু হইলে, শ্বশুর মহাশয় শ্রাদ্ধ-সময়ে বহুমূল্যের দ্রব্য সামগ্রী পাঠাইয়া আমার প্রতি কতই স্নেহ মমতা প্রদর্শন করেন। ৺শ্রীবৃন্দাবনে বৃদ্ধা দিদিঠাকুরাণী

আমাকে তাঁহাদের বাসায় একদিন রাখিবার জন্য কতই সাধ্যসাধনা, কতই উপরোধ অনুরোধ করেন। স্নেহের ত কখন কোথাও ত্রুটী দেখি নাই। তার পর যখন আমি সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত হইলাম, তখন শ্বশুর শ্বাশুড়ী পক্ষান্তে আমার সংবাদ লইতেন,—ঔষধ, পথ্য, নগদমুদ্রা,—সমস্তই প্রেরণ করিতেন। আমি ভাবিতাম, আমি বুঝি পিতৃহীন বলিয়াই আমার উপর ইহাঁদের এত অধিক স্নেহ বৃদ্ধি হইয়াছে। অবশেষে সেদিন শ্বশুর মহাশয় যখন আমাকে পত্র লিখিলেন, "বাবাজী, তোমার জন্য কলিকাতায় বাটী খরিদের চেষ্টায় আছি,"—তখন বুঝিলাম, আমার প্রতি তাঁহার পুত্রবৎ স্নেহ না থাকিলে আমার বসতবাটীর জন্য শ্বশুর এত যত্ন-পরায়ণ হইবেন কেন? যখন প্রতিকার্য্যে এত ভালবাসার লক্ষণ দেখিতেছি,—তখন ইহাঁরা হঠাৎ আমাকে এরূপ ভাবে বধোদ্যত হইবেন কেন?—অথবা এমন লাঞ্ছনা অবমাননাই বা করিবেন কেন?

"আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, কিছুই স্থির করিতে সক্ষম হইতেছি না,—চিত্ত, মহাঝটিকায় আন্দোলিত তৃণের ন্যায় প্রবলবেগে চারিদিকে ঘুরিতেছে! আচ্ছা, ইহাও ত হইতে পারে—আমি প্রকৃতই পাগল হইয়াছি। তাই উহাঁরা আমাকে পাগল দেখিয়া আমার প্রতি পাগলের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন। উহাঁদের দোষ নাই,—বুঝি আমিই পাগল হইয়াছি!

"আচ্ছা, যদিই আমি পাগল, তবে ইহাঁরা, আমাকে নীচেকার এই দুর্গন্ধময় গৃহে, অতি জঘন্য শয্যায় আমার শয়নের ব্যবস্থা করিবেন কেন?—উপরিতলে ত অতি সুন্দর সুমনোহর শয্যাসমূহ সুবিস্তৃত,—ইহাঁরা সেখানে আমাকে স্থান দিলেন না কেন? নিতান্ত অন্নদাস, অনাথ ভৃত্যবৎ ভাবিয়া আমাকে এই নিম্নতলের নরকে শুইতে দিলেন কেন?—তাই বলি,—স্বীকার করিলাম, আমি পাগল,—কিন্তু পাগলের প্রতি উহাঁদের যত্ন কৈ? সেবা শুশ্রূষা কৈ?

"কিন্তু পাগল হইলে ত বুদ্ধির বিকৃতি জন্মে,—আমার যদি সেই বুদ্ধি-বিকারই জন্মিয়া থাকে, তবে আমি বস্তুর স্বরূপ অনুভব করিব কেমন করিয়া? হয় ত আমি দ্বিতলগৃহের সুখশয্যায় শায়িত আছি, হয় ত আমাকে দাস দাসী, জননী, সহধর্ম্মিণী সমভাবে যথা-নিয়মেই সেবা করিতেছেন,—কিন্তু আমার বুদ্ধি বিকার-গ্রস্তা বলিয়াই এসব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না!

"পাগল হইলে কি বুদ্ধির এইরূপই বিপর্য্যয় ঘটে ?—সোজা বাঁকা হয়, সুগন্ধ দুর্গন্ধ হয়, সেবাশুশ্রূষা প্রহার-পীড়া বলিয়া মনে হয়, স্বর্গ, নরকে পরিণত হয়। তবে আমিই পাগল; উহাঁদের নিশ্চয় কোন দোষ নাই!"

সেই সাধু-ব্রাহ্মণের হৃদয় সর্ব্বশেষে ঐ ভাবই আন্দোলিত হইতে লাগিল। সাধু ব্যক্তি সহসা অপরকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন না; তিনি প্রথমত নিজেরই দোষ দেখেন। অপরকে অসৎ ভাবিতে সাধুর মনে কষ্ট হয়। তাই ব্রাহ্মণ, নানা চিন্তার পর ঠিক করিলেন,—"দোষ কাহারও নাই, দোষ আমার,—সম্ভবত আমিই প্রকৃত পাগল।"

দেখিতে দেখিতে উপরিতলস্থ ক্লকঘড়ীতে রাত্রি দুইটা বাজিল। ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণের চিন্তা-স্রোত আবার ফিরিল। "আমি কেন পাগল হইব? কিসেইবা পাগল হইব? আমার জ্ঞানবুদ্ধি-স্মরণশক্তি কিঞ্চিন্মাত্রও বিলুপ্ত হয় নাই। আমিত সেই দেখিতেছি, শুনিতেছি, বুঝিতেছি, জানিতেছি,—আমার হৃদয়ে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে,—এই গৃহের পরিজনবর্গ নিশ্চয়ই আমার প্রাণনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। বাড়ীর দারোয়ান, খানসামা, ঘেসেড়া পর্য্যন্ত বিনা কারণে আমাকে ধরিয়া প্রহার করিতেছে,—কৈ তাহাতে ত কেহই বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতেছেন না? এরূপ প্রহার প্রাণ-নাশ-উদ্দেশেই সুসঙ্কল্পিত! অচ্ছা,—আমি না হয় পাগল হইয়াছি,—তা, আমাকে শুধু শুধু এত প্রহার কেন? আমার শ্বশুর মহাশয় আজ ঘরে থাকিলে, তিনি কি করিতেন, বলিতে পারি না; কিন্তু বিপিনচন্দ্র, শ্বশ্রূঠাকুরাণী বা আমার সহধর্ম্মিণী—কেহইত আমাকে রক্ষার জন্য কোনও উপায়বিধান করিলেন না! আমার স্ত্রী এখন বয়ঃস্থা, নব-যৌবনে বিভূষিতা,—আর, বহুদিন পরে তাঁহার স্বামী সমাগত হইয়াছেন। বিশেষতঃ স্বামী রোগশোকে ইতিপূর্ব্বে বহুকষ্ট পাইয়াছেন। সে স্বামীকে দেখিবার জন্য, সে স্বামীর সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য, সহধর্ম্মিণীত একবারও চেষ্টা করিলেন না! সেবা-শুশ্রূষা, বাক্যালাপ দূরে যাউক,—আমার এই মর্ম্মযাতনা দেখিয়া তিনি ত ইহার কোনও প্রতীকারের জন্য যত্নবতী হইলেন না! তবে কি আমার স্ত্রী পতিপ্রাণা, পতি-অনুগামিনী নহেন?"

ব্রাহ্মণের মনে ঐ ভাব উদয় হইবা মাত্র—ব্রাহ্মণ সভয়ে অমনি জিহ্বা কাটিয়া

ফেলিলেন।—"ছি ছি ছি! আমি কি ভাবিতেছি?" "স্ত্রী পতি-অনুগামিনী নহেন"—এরূপ কথা ভাবিলেও আমার পাপ আছে!—বিশেষ, স্ত্রীর অসাক্ষাতে, স্ত্রীর কোন বিষয়ই না দেখিয়া, না জানিয়া আমি তাঁহাকে দুষ্টা ভাবিতেছি,—আমি তাঁহাকে বিষম অপবাদে অভিযুক্ত করিতেছি। আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?—আমার সহধর্ম্মিণী সুশীলা, সরলা অবলা,—সংসারের সুখ দুঃখ কিছুই বুঝেন না, কালচক্রের কুহক-কৌশল কিছুই অবগত নহেন,—সেই স্বধর্ম্ম-নিরতা, স্বামিময়জীবিতা অর্দ্ধাঙ্গীর আমি বৃথা দোষ দিই কেন? কেন আমার মন এমন খারাপ হইল? তবে বুঝি নিশ্চয়ই আমার বুদ্ধির বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে?"

ব্রাহ্মণ আবার অন্যরূপ ভাবিতে লাগিলেন,—"কারণ কি?—কারণ ব্যতীত কার্য্য নাই। কোন কারণে আমাকে ইহাঁরা হনন করিতে উদ্যত হইয়াছেন? কি করিলাম?—কি অপরাধ?—কি পাপ?—যে, ইহাঁরা আজ আমাকে নরবলি দিতে কৃতসঙ্কল্প?—আমি অর্থহীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ;—আমার কাছে কি বহুমূল্য রত্ন আছে, কি অমূল্য নিধি আছে, যাহার লোভে, যাহা কাড়িয়া লইবার জন্য, ইহাঁরা আমাকে এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিতেছেন? কি আছে?—কি আছে?—সকলে বলিয়া দিউন, কি আছে? হা বিপদের কাণ্ডারী মধুসূদন! হা দুঃখ-ভঞ্জন শ্রীনন্দ-নন্দন! হা সর্ব্বভয়-বিনাশন! হা শ্রীহরি! হা প্রভু দয়াময়!—সংসার-সঙ্কটে প্রাণ হারাইলাম!—কিন্তু অপরাধ কি, বুঝিলাম না! হা ভগবন্! এ অন্তিমে কেবল এক ভিক্ষা,—তোমার চরণ-পদ্মে এ অধমের মতিগতি যেন নিয়তই থাকে।"

ব্রাহ্মণ এই নরঘাতক জল্লাদগণের হাত হইতে পরিত্রাণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কোন্ কৌশলে, কোন্ পথ দিয়া, কখন কি ভাবে পলাইব,—মনে মনে তাহারই বিচার আরম্ভ করিলেন। শ্রী——মহারাজ যদি আমার অবস্থার কথা একবার জানিতে পারেন, তাহা হইলে বোধ হয়, আমার প্রাণ-রক্ষার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তাঁহাকে জানাই কেমন করিয়া? এই কথা ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণের মুখে হাসি দেখা দিল। তিনি মনে মনে বলিলেন, "আমি কি নির্ব্বোধ!—আমার ললাট-লিপিতে বধ বা বন্ধন যদি লিখিত থাকে, তবে রাজা আসিয়া কি করিবেন? শত রাজা একত্র হইলেও আমার কর্ম্মফল ঘুচাইতে সক্ষম হইবেন না।' আর

যদি সুকৃতি থাকে, গ্রহগণ সুপ্রসন্ন হন, তবে যে কোন উপায়ে হউক নিশ্চয়ই মুক্তি পাইব!—সুতরাং আমার ভাবনা বৃথা!"

ব্রাহ্মণ কৈলাসকে ভুলেন নাই; এ তিন বৎসর কাল কৈলাসের কথা তাঁহার হৃদয়ে অহরহ জাগরূক আছে। "শাস্ত্রকথা—তত্ত্বকথা—বেদান্তের কথা শুনিয়া, কৈলাস মধুপুর ষ্টেসন হইতে অদৃশ্য হইয়াছেন,—আর তিনি দেখা দিলেন না! কেন?—তিনি জীবিত আছেন, না লুকাইয়াছেন? যদি এ সঙ্কটে আমার মৃত্যুই ঘটে, তবে কৈলাসচন্দ্রকে কি একবার দেখিয়া মরিতে পাইব না? কৈলাসের সঙ্গে আর একবার সাক্ষাৎ করা আমার ইহজীবনের একমাত্র সাধ! আর কি কৈলাসকে দেখিব না?"—জানি না, ব্রাহ্মণ কেন কৈলাসের জন্য এত উচাটন-প্রাণ হইয়াছেন।

দ্বিতল হইতে মধুর সঙ্গীত শ্রুত হইল। হারমোনিয়মের সুরের সঙ্গে নবীনা রমণীর কোকিল-বিনিন্দিত কলকণ্ঠ মিলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব-ধ্বনি উত্থিত হইল। ঘর দ্বার পথ পাড়া পূর্ণ হইল। গভীর নিশীথ, সংসার নিদ্রিত,—এখন কোন্ রমণীর গানে এমন সখ হইল?—

প্রথম গানটী এই;—

বাকি কি রেখেছ দিতে ওহে করুণার আধার।
খুলিয়ে দিয়েছ নাথ সুধার ভাণ্ডার।
দিলে দেহ, দিলে মন, দিলে প্রাণ জ্ঞান ধন,
দিলে হে প্রেমভূষণ, সকল রতন সার।
চির সুখ সাধিবারে, দিলে নাথ আপনারে,
কে আছে হে এ সংসারে, তোমা সম দাতা আর।

বলা বাহুল্য, গীতধ্বনি শ্রবণমাত্র ব্রাহ্মণের কর্ণ সেই দিকে গিয়াছিল। সর্ব্ব ভাবনা ছাড়িয়া, ব্রাহ্মণ তখন সেই গান শুনিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, "এ ঘোর রাত্রে গান গায় কে? কোথা হইতে এ শব্দ আসিতেছে?—এ কি নবযৌবনভূষিতা স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর?—এই বাটীর উপরিতল হইতে সঙ্গীত-শব্দ আসিতেছে নয়? না,—তা কেন হইবে? এ বাড়ীতে এত রাত্রে কোন্ মেয়ে-মানুষ গান ধরিবে? ভদ্রলোকের বাড়ীর

স্ত্রীলোকে কি কখন গান গায়?—বোধ হয়, এ বাটীর পাশে বেশ্যাবাড়ী আছে,—কোন বারাঙ্গনা গান ধরিয়া থাকিবে।—রাত্রিকাল,—পাশাপাশি বাড়ী—কাজেই ও-বাড়ীর গান এ-বাড়ীর গান বলিয়া মনে হইতেছে। আচ্ছা, আমার শ্বশুর এমন বেশ্যালয়ের নিকট বাসা ভাড়া লইলেন কেন? কলিকাতার সকল স্থানেই কি বারবিলাসিনীগণের বাস? তাই—কি? একবার উঠিয়া দাঁড়াই। জানেলার কাছে গিয়া কাণ পাতিয়া শুনি,—কোথা হইতে শব্দ আসিতেছে?"—এই কথা বলিয়া, ব্রাহ্মণ সেই ক্ষুদ্র গবাক্ষের নিকট গিয়া কাণ পাতিয়া রহিলেন। কাণ পাতিয়া পাতিয়া, শুনিয়া শুনিয়া, শেষে বলিলেন,—"না, এই ঘরের দ্বিতলেইত গান আরম্ভ হইয়াছে।"

দেখিতে দেখিতে আর একটী নূতন গান নূতন সুরে আরম্ভ হইল;—

ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে;
তত্ত্ব তার না পাই বেদ পুরাণে।
(তুমি) ভাই কি ভগিনী, পুরুষ কি রমণী,
হৃদয়-বন্ধু কিম্বা দেবকন্যে;
তোমার এ নহে সম্ভব (হে), একি অসম্ভব,
সম্পর্ক নাই তবু পর ভাবি নে (কিসের জন্যে)
(ওহে) সদা শুনতে পাই আছ সর্ব্বঠাঁই
কিন্তু আলাপ নাই আমার সনে;
তুমি হবে কেউ আমার (হে), আপনার হতেও আপনার,
আপনার না হলে মন কি টানে (তোমার পানে)।

ব্রাহ্মণ সেই ছেঁড়া মাদুরে আসিয়া শয়ন করিলেন।

সে গান শেষ হইলে, আবার খুব জোরে আর একটা গান আরম্ভ হইল। এবার নারীকণ্ঠের সহিত নরকণ্ঠ মিশিল। দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল। ব্রাহ্মণ স্পষ্টাক্ষরে সে গান শুনিতে পাইলেন:

আমি রব তোমারই অন্য কা'র হ'ব না।
তব প্রেমে বাঁধা রব, অন্যে ধরা দিব না।

তব দ্বারে ভিক্ষা করে, রব প্রিয়ে প্রাণ ধরে,
কভু প্রেম-ভিক্ষা তরে, পর-দ্বারে যাব না।
কিন্তু তব করে ধরে, বলি প্রিয়ে সকাতরে,
দানে কৃপণতা ক'রে, দীনে ফাঁকি দিওনা।

ব্রাহ্মণের ক্রমশ দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল, নিশ্চয়ই উপরিতলে গান বাজনা হইতেছে। তাই তখন তিনি বিছানা হইতে উঠিয়া বালিস্ বুকে দিয়া যেন ধড়্ ফড়্ করিতে লাগিলেন। ক্রমে এত হাঁপাইতে লাগিলেন যে, দম আটকাইয়া যাইবার যোগাড় হইল। রাত্রি তখন প্রায় আড়াই প্রহর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ব্রাহ্মণের চিন্তার কাল অতীত হইয়াছে। তীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা প্রহারিত হইবার পূর্ব্বেই যত ভয়, ভাবনা চিন্তার উদয় হয়। ছিন্ন দেহ যখন দ্বিখণ্ড হয়, তখন আর ভয় ভাবনা কিছুই থাকে না,—তখন দেহটা কেবল ক্ষণকালের জন্য ধড়্ ফড়্ করিতে থাকে। তাই বলি, ব্রাহ্মণের আর এখন ভাবনা চিন্তার কাল নাই,—কেবল ধড়্‌ফড়ের কাল উপস্থিত।

এইরূপে অর্দ্ধঘণ্টা কাল অতীত হইলে, দেখা গেল, ব্রাহ্মণের বাহ্যযন্ত্রণা দূর হইয়াছে। তাঁহার কলেবর ধীর, স্থির, নিশ্চল, নিথর। দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত্তমধ্যে তিনি ভূপতিত হইলেন। ব্রাহ্মণের আর সংজ্ঞা নাই—মূর্চ্ছিত।

স্বধর্ম্মনিরত সাধু-ব্রাহ্মণের কেন আজ এ দুর্দশা ঘটিল? যিনি ইহজীবনে জ্ঞানত কখন কাহারও মন্দ করেন নাই; যিনি কেবল শাস্ত্রচর্চ্চায় দিন অতিবাহিত করিতেছেন, সৎশিক্ষায়, সদালাপে যিনি অবোধ মানবকে সুপথ দেখাইতেছেন, যিনি অহরহ কেবল হরির চরণযুগল ধ্যান করিতেছেন, অহো! তাঁহার আজ এ ঘোরতর দণ্ড কেন?—সমস্তই অদৃষ্টলিপি,—কপাল, কপাল!—পূর্ব্বজন্মের ফল!

ব্রাহ্মণ মূর্চ্ছিত হইলেন কেন? সুমধুর সঙ্গীত শুনিয়া এমন সংজ্ঞাহীন কেন? ব্রাহ্মণের মনে কি এই ভাবের উদয় হইয়াছিল, "আমার সহধর্ম্মিণী কি বিলাসিনী বার-নারীবৎ,—পরপুরুষের সহিত গভীর-নিশীথে গান করিতেছেন? আমার স্ত্রী আর কুলবতী নাই,—কুলকলঙ্কিনী হইয়াছেন?"

এই ভাব ভাবিতে ভাবিতে বুঝি ব্রাহ্মণের বুক ফাটিয়া গিয়াছে, হৃদয়তন্ত্রী ছিঁড়িয়া গিয়াছে, শরীর-রস শুকাইয়াছে—তাই ব্রাহ্মণ মূর্চ্ছিত, ভূপতিত!

মূর্চ্ছার আর দোষ কি? সমস্ত দিন অনাহার; পথ হাঁটিয়া, শারীরিক শ্রম; তার উপর প্রহার,—এই বাহ্য-অত্যাচারে তখন প্রথম মূর্চ্ছা ঘটে। এখন মানসিক বিপ্লব,—অন্তরে কাটাকাটি, মারামারি, খুনোখুনি,—ব্রাহ্মণ সেই আভ্যন্তরিক অত্যাচার সহিতে না পারিয়া অচেতন হইলেন। দ্বিতীয় বারের এই মূর্চ্ছা বড়ই ভয়ানক!

যিনি অন্তরে এক মুহূর্ত্তের তরে, আপন স্ত্রীকে ঈষৎ বিপথগামিনী ভাবিতেও কাতর হইয়াছিলেন,—তিনি কেমন করিয়া কমলিনীকে পাকা-অসতী ভাবিবেন বলুন দেখি? কমলিনী কখনই অসতী নয়—সতী, সতী, সতী—এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণ এক একবার অত্যুর্দ্ধে উঠিতেছিলেন, আবার তখনি "কমলিনী সতী নয়—অসতী, অসতী, অসতী—" এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণ সেই অত্যুর্দ্ধ হইতে নিম্ন-নরকে নিপতিত হইতেছিলেন। এইরূপ উত্থান-পতনে জর্জ্জরিত-দেহ হইয়া ব্রাহ্মণ অবশেষে মূর্চ্ছিত হইলেন। অত্যুচ্চ হিমালয়-শৈলশিখর হইতে মানুষ কতবার আছাড় খাইতে সক্ষম হয়?

সাধুহৃদয় সরল ব্রাহ্মণ কিসে কমলিনীকে কলঙ্কিনী ঠিক করিয়া, হঠাৎ এরূপ সংজ্ঞা-হীন হইলেন? কোন্ লক্ষণে তাঁহার সন্দেহ জন্মিল? ব্রাহ্মণের মনোমধ্যে বোধ হয়, সেই স্বাক্ষর-হীন, উড়ো-পত্রের কথা উদিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, প্রথমত সেই পত্র পাইয়া ভাল-মানুষ-ব্রাহ্মণের অন্তরে কোনও কুভাব উঠে নাই। স্ত্রী যে দুশ্চরিত্রা,—এ ভাবের দিক্ দিয়াই ব্রাহ্মণ পথ চলেন নাই। কিন্তু অদ্য সেই সঙ্গীত শ্রবণের পর নানা-কথা ভাবিতে ভাবিতে, তাঁহার সেই পত্রের কথা মনে হইল। সেই পত্রে সংক্ষেপে লেখা ছিল, "যদি সম্ভব হয়, তবে আপনার সহধর্ম্মিণীকে শীঘ্র কলিকাতা হইতে লইয়া আসিবেন।" ব্রাহ্মণ ভাবিতে লাগিলেন, "আমার স্ত্রীকে আমি ঘরে লইয়া আসিব, তাহাতে আবার সম্ভব অসম্ভব কি? এখন বুঝিতেছি—যিনি এ পত্র লিখিয়াছিলেন,—

তাঁহার অবশ্যই কোন গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল? বোধ হয়, আমাকে সতর্ক করাই তাঁহার একমাত্র অভিপ্রায় ছিল। আমার স্ত্রীকে কলিকাতা হইতে লইয়া আসা অসম্ভব,—তাই তিনি লেখেন, "যদি সম্ভব হয়;"—এই কথাই ঠিক। এখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, অসম্ভব ত বটেই—অধিকন্তু আমার বধ বা বন্ধন।—আমি আর ভাবিতে পারি না,—আমার মৃত্যু হউক।—"

ব্রাহ্মণ সম্ভবত এইরূপই ভাবিতে ভাবিতে, তখন মূৰ্চ্ছিত হন। তিনটা বাজিল—চারিটা বাজিল—ব্রাহ্মণ তখনও অচেতন। ক্রমশঃ অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কাক ডাকিল,—পৃথিবী প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল—তখনও সেই মূৰ্চ্ছিত ব্রাহ্মণ ভূতলে অৰ্দ্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় শায়িত। তখনও কেহ সেই কারা-কক্ষের দ্বার খুলিল না,—ব্রাহ্মণের চোখে মুখে জল দিয়া মূৰ্চ্ছা অপনোদনের চেষ্টা করিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মিউনিসিপাল মার্কেটে মহাধূম। প্রভাতে সাড়ে পাঁচটার সময়, একটা চের'-সাঁথি-কাটা পুরুষ, হাটের মধ্যে খর্ খর্ করিয়া, এদিক-ওদিক, এধার-ওধার করিতেছে। তাহার পরনে মিহি কালাপেড়ে কাপড়, তায় ধাক্কা; গায়ে আল্পাকার ফতুয়া,—অল্প ছেঁড়া; পায়ে বিলাতী বুট, ঈষৎ পুরানো; মাথায় পমেটম্ ঢালা, পেটো পাড়া;—আঙ্গুলে আঙটী, গিল্‌টিকরা; বাঁ হাতে বাঁধান খাতা—মেমো বুক্;—ডান হাতে পেন্‌সিল—বাড়া।

দোকানদারগণ তাঁহাকে ডাকিতেছে, "কর্ত্তা মোশাই! এদিকে আসুন, এদিকে আসুন!" কোন দোকানদার বলিতেছে,—"কর্ত্তাকে কদিন দেখি নাই, ভাল আছেন ত?" কেহ তাহার কাছে গিয়া কহিতেছে, "সিকি—সিকি!" কেহ বা চেঁচাইয়া তাহার প্রতিবাদ করিল,—"দশ আনা, ছয় আনা। আজ্ঞে কর্‌তা, আসুন এদিকে!"

ঐ লোকটী আর কেহই নন,—কপিল খানসামা বাজারে বাহির হইয়াছেন। তাই দোকানদারগণ, খানসামা-কুলচূড়ামণিকে এত আদর অভ্যর্থনা করিতেছেন।

চারিদিক্ হইতে এইরূপ খানিক আদরবৃষ্টি হইবার পর, শেষে একজন মুসলমান-দোকানদার উঠিয়া আসিয়া, কপিলকে একপাশে লইয়া গিয়া, তাহার সহিত কত কি কাণাকাণি পরামর্শ করিল। কপিল তখন হৃষ্টচিত্তে তাহার আড্ডায় গেল। দোকানদার কপিলকে বর্ম্মা চুরট দুইটী এবং একটী দিয়াশলাই দিল। খান্‌সামা-কুলতিলক বুকে-ঝুলানো কুরিয়ার-ব্যাগ হইতে বাজারের ফর্দ্দ বাহির করিল। ফর্দ্দ এইরূপ;—

১।	নৈশভোজনের জন্য	মুর্গি ...	...	১২ টা
২।	”	হাঁসের ডিম	...	২৫ টা
৩।	”	মো'রগ ডিম	...	৫০ টা
৪।	”	মটন	...	৫ সের
৫।	”	কাঁকুড়া	...	২০ টা
৬।	”	সোডাওয়াটার	...	৩০ টা
৭।	”	লেমনেড্	...	[illegible]০ টা
৮।	”	শ্যাম্পেন	...	১৬ টা
৯।	”	* * *	...	৬ টা
১০।	”	বিয়ার	...	১২ টা
১১।	”	ভিনিগার	...	৬ টা
১২।	”	বরফ	...	২ মণ
১৩।	”	তপ্সে মাছ	...	১০০ টা
১৪।	”	পেঁয়াজ	...	৫ সের
১৫।	”	রসুন	...	২ সের
১৬।	”	ঘৃত	...	১০ সের
১৭।	”	চাউল	...	১৬ সের
১৮।		ডেক্চি	...	৫ টা
১৯।	”	মসলা	...	Q. S.
২০।	”	ফল	...	

দিদিবাবুর খাস দপ্তকার,—

১। লেবাণ্ডার। ২। অভিকলোন্। ৩। আতর। ৪। গোলাপ। ৫। রমণী-বিলাস তৈল। ৬। কেরেপ কাপড়। ৭। কাঁচুলি। ৮। ফুলের তোড়া। ৯। ফুলের মালা। ১০। পাউডার। ১১। রাধাবাজার হইতে * * * ছবি। ১২। রাধাবাজার হইতে * * * ২ টা (যত টাকা লাগে)। ১৩। * * * তাস।

জামাই বাবুর জন্ম বাজার। এগুলি নিতান্ত আবশ্যক। এগুলি যেখানে পাও, খুঁজিয়া আনিতেই হইবে; নচেৎ তাঁহার রোগের চিকিৎসা বন্ধ হইবে।

(১) উইলসনের বাড়ীর পাঁউরুটী, (২) বিফ্ ষ্টীক্, (৩) খানিক আস্ত গোমাংস, (৪) দুটা জিয়ন্ত ধড়্ ফড়ে মুরগী, (৫) ধেনোমদ, (৬) পাঁচুই, (৭) গাঁজা।

দোকানদার ফর্দ দেখিয়া বলিল, "ইহা ত অতি সোজা কথা! আপনি স্থির হয়ে খানিক বসুন,—আমি সমস্তই আনিয়ে দিচ্চি। আপনাকে কষ্ট ক'রে আর রাধাবাজার যেতে হবে না,—পায়ের উপর পা দিয়ে এইখানে বসুন,—আমি এক ঘণ্টার মধ্যে সব সরাবরাহ করে দিব।"

কপিল। (ধীরে) তবে সে বিষয়ে একটা ঠিক্ ব'লে ফেলুন,—আধাআধি করে দিন্!

দোকানদার। ৷৷০ আনা পারিব না, ।৵০ আনা দিব।

কপিল। নাহে না!—তুমি ওটা পুরাপুরিই করে দাও,—আমরা বাঁধা-খদ্দের,—বারমাস কাজ,— বারমাস তোমার কাছেই সওদা করবো।

দোকানদার। তাই হবে,—কিন্তু দেখ্‌বেন, কর্ত্তা,—ভবিষ্যতে আর কোন দোকানে জিনিস কিনতে পাবেন না।

কপিল। তা, আপনার দোকান ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না—

পরস্পরে এইরূপ বন্দোবস্ত হইলে, কপিল দশ টাকার হিসাবে দশখানা নোট দোকানদারের হাতে অগ্রিম দিল। দোকানদারের ভৃত্যগণ টাকা লইয়া চারিদিকে ছুটিল,—আর, স্বয়ং দোকানদার মিউনিসিপাল-মার্কেটে বাজার করিতে লাগিল। কপিল একস্থানে ঠায় বসিয়া চুরট খাইতে থাকিল।

কিছুক্ষণ পরে কপিল মনে মনে বলিতে লাগিল, "ওঃ হো,—বড় ভুলিয়াছি,—

ফর্দ্দে লেখা হয় নাই,—দিদিবাবু শেষে বলে দিলেন,—ভাল বাতি চারি ডজন চাই!—রাধাবাজারে এই লোক গেল,—ওকে বলে দিলেই হতো!—আঃ, আর পারি না,—কে এখন বাতি বাতি করে ঘুরে বেড়ায়?—ঘরে যেয়ে দিদিবাবুকে বলুবো, বাতি ভুলে এসেচি!—পাঁড়েজীকে বাতি আনুতে পাঠলো!—তা, হবে না,—দিদিবাবু তখন আমার চুল ধরে ধীরে ধীরে টেনে বলবেন, 'তুই যা,—বাতি আনগে।'—এতগুলো বাতি নিয়েই বা হবে কি?—সন্ধ্যার পর সভা হবে, বক্তৃতা হবে, গান হবে,—আহা-হা!—পোড়া, সভা, করে কি লাভ হবে? সন্ধ্যার পর দু দণ্ড আমোদ পেমোদ কর,—খা,—দা, চলে যা!—এ মোশাই, তা নয়, রাত্তির তিতীয় পহর অবধি একটা কাণ্ড হবে। আমি এত ভাল বাসি না। রাত্তির নটার পর সব চুকে গেলেই ভাল। আমি আজ যেয়ে দিদিবাবুকে বলুবো,—বাজারে বাতি নেই—নটার মধ্যে সব কাজ শেষ করে ফেলো! হুঁ—হুঁ—নয়টার পর বাতি নিবুলেই বা লাভ কি?—সেই নগেন পোড়ামুখো অন্ধকার হলেও বসে থাকুবে!—তাকে জব্দ করার উপায় কি?—আহা দিদিবাবু আমাকে কতখানি ভাল বাসেন!!—"

পাঠক! ব্যাপার কিছু বুঝিলেন কি? ও-দিকে ব্রাহ্মণ মূর্চ্ছিত অবস্থায় পতিত। এদিকে পরামর্শমত কপিল, ভোরে উঠিয়া বাজারে বহির্গত। সন্ধ্যার পর কমলিনী, বন্ধু-ভোজন করাইবেন,—এবং স্বামীর সুচিকিৎসার্থ বন্ধুগণের সহিত পরামর্শ আঁটিবেন। স্বামীর পথ্যের ব্যবস্থা কমলিনীর স্বহস্তে লিখিত। অধিক আর কি লিখিব,—সকলে মধুসূদন নাম জপ করুন।

বাজার করিতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় অতীত হইল। কপিলচন্দ্র দুই খানি সেকেন ক্লাস ঘোড়গাড়ী করিয়া, সমুদয় জিনিস-পত্র বেলা প্রায় দশটার সময় বাসায় আনিলেন।

দ্বিতলে সেই সুরম্য হলে কপিলের প্রবেশমাত্র, কমলিনী পিচকারী করিয়া, গোলাপ জলে কপিলের অঙ্গ ভাসাইয়া দিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

উনবিংশ শতাব্দী— বন্ধুত্বের কাল ;—প্রীতি, পবিত্রপ্রণয়, ভাব-ভালবাসার যুগ। এ কলিকালে পুরুষের বন্ধু, কাহন-কাহন মেয়ে ; মেয়ের বন্ধু, কাহন-কাহন পুরুষ। কাহারো কথাটী কহিবার যো নাই,—ভবের হাটে বন্ধুত্বের বেঁচা-কেনা একৃসা চলিয়াছে। চলুক। এই চরম সভ্যতার ঢেউ কোথা গিয়া লাগে, দেখা যাক্।

কমলিনী চরম সভ্য। মার্কিন এবং ইউরোপীয় সভ্যতার গূঢ় রস একত্র মিশাইয়া কমলিনী এক নিশ্বাসে পান করিয়াছেন। তাই কমলিনীর অগাধ বন্ধু ; অসংখ্য সুহৃদ ; অপরিমেয় মিত্র। আকাশের তারা, মরুভূমির বালি, বটগাছের পাতা গণিতে পারি,—কিন্তু কমলিনীর বন্ধু গণনা করিয়া শেষ করিতে পারি না।

কমলিনীর নানাজাতীয় নানাশ্রেণীয় বন্ধু! হিন্দু, মুসলমান, ম্লেচ্ছ, বেশ্য—সকলেই তাঁহার বন্ধু-দলভুক্ত। তাঁহার ছোকরা বন্ধু, যুবা বন্ধু, বৃদ্ধ বন্ধু। তাঁহার উকীল বন্ধু, বারিষ্টার বন্ধু, ডাক্তার বন্ধু, শিক্ষক বন্ধু, ডেপুটী বন্ধু, বি এ পাস বন্ধু, কলেজের এল এ ক্লাসের ছাত্র বন্ধু, দেওয়ান বন্ধু, পণ্ডিত বন্ধু, মূর্খ বন্ধু। তাঁহার খানসামা বন্ধু, দোকানদার বন্ধু, দরোয়ান বন্ধু। তাঁহার ঘোষ-বসু-মিত্র বন্ধু, চাটুয্যে-মুখুয্যে-বাঁড়ুয্যে বন্ধু, রায়-সরকার-দে বন্ধু। তাঁহার তেলী-মালী-তামুলী বন্ধু, তাঁতী-জোলা-যুগী বন্ধু, হাড়ী-ডোম-চণ্ডাল বন্ধু, মুচি-মুর্দ্দফরাস-মড়ুইপোড়া বন্ধু। তাঁহার কুকুর-শেয়াল-বিড়াল বন্ধু, ছাগল-ভেড়া-গরু বন্ধু, হাঁস-মুর্গী-বক বন্ধু। তাঁহার হাতি-ঘোড়া-উট বন্ধু, মহিষ-গণ্ডার-হরিণ বন্ধু, বাঘ-ভালুক-সিংহ বন্ধু। তাঁহার কলা-মুলা বেগুন বন্ধু, ফুটী-তরমুজ-শশা বন্ধু, ঝিঙে-উচ্ছে-করলা বন্ধু। তাঁহার ওল-কচু-মান বন্ধু, বাঁশ-বাবলা-শেয়াকুল বন্ধু, অশ্বথ-বট-ঝাউ বন্ধু। তাঁহার পাহাড়-পর্ব্বত-পাথর বন্ধু, ঝোপ-ঝাপ-জঙ্গল বন্ধু, ঘোপ-ঘাপ-গুহা বন্ধু। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার বন্ধুময়। কত আসে কত যায়, কত থাকে—তাহার নির্ণয় করে কে?

একজন প্রত্নতত্ত্ববিৎ গণৎকার গণনা করিয়া দেখিয়াছেন,—এই কলিকাতা সহরমধ্যে কমলিনীর একশত আটজন বারমেসে বাছাই বন্ধু আছেন। তন্মধ্যে আজ বত্রিশ জন মাত্র নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। অতিসূক্ষ্ম জালে ছাঁকিয়া অদ্য এই বাছায়ের বাছাই বন্ধুগুলি মিলিত হইয়াছেন।

কমলিনীর তিন রকম মূর্ত্তি আমরা দেখিলাম। হুগলীতে গঙ্গা-উপকূলে এক মূর্ত্তি, শ্রীবৃন্দাবনে এক মূর্ত্তি, আর অদ্য কলিকাতায় এই অপরূপ মূর্ত্তি। চরম!

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। একে একে বন্ধুদল কমলিনীর কুঞ্জে সংমিলিত হইতে লাগিলেন। বন্ধু-তারাগণ মধ্যে প্রধান নগেন্দ্রনাথ—চন্দ্র। তিনি বেলা চারিটার সময় আসিয়া গৃহের কর্ম্মকর্ত্তা,—অধ্যক্ষ-স্বরূপে সকল কার্য্য দেখিতেছেন, সকল কথা শুনিতেছেন, সকল লোককে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইতেছেন।

ব্রত-উদ্‌যাপন হইলে, নগেন্দ্রনাথ কমলিনীর কথায় বৃন্দাবনেই সন্ন্যাসিবেশ ত্যাগ করেন। কমলিনীর কথায় কমলিনীর সঙ্গে তিনি কলিকাতা আসেন। এখন কমলিনীর কথায় তিনি কলিকাতায় বারমাস বাস করিতেছেন।

নগেন্দ্র কলিকাতায় থাকিবার জন্য ওকালতী ছাড়িয়া কলেজের অধ্যাপক হন। কমলিনী কলিকাতায় থাকিবার জন্য চির-রোগিণী হন। বৃন্দাবন পরিত্যাগের পর নগেন্দ্র-কমলিনীর এইরূপে তিন বৎসরকাল স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে অতিবাহিত হইল।

কিন্তু আজ হঠাৎ বিপৎপাত হইল। ক্ষীরোদ-সমুদ্রে হঠাৎ কাকবিষ্ঠা পড়িল। তাই গত কল্য কমলিনী অমিত্রাক্ষরে পদ্য লিখিয়াছিলেন,

"মরি কিংবা বাঁচি—প্রশ্ন ইহাই এখন।—"

ব্রাহ্মণ শ্রীবৃন্দাবনে বেত্রাঘাত-দণ্ডাজ্ঞা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, গৃহে আসিয়া তিন বৎসরের অধিককাল, জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া, একরকম শয্যাগত থাকেন। এখন সুস্থ সবল হইয়া, প্রথমবার স্ত্রীকে স্বয়ং লইতে আসিয়াছেন। যদি ব্রাহ্মণের সেই জ্বর কখন না ছাড়িত, চিরদিন ব্রাহ্মণকে যদি শয্যাগত থাকিতে হইত,—অথবা ব্রাহ্মণ যদি একেবারেই মরিত, তাহা হইলে আজ কি সুখই না হইত! !—চারিদিকে সুখের ফোয়ারা ফুটিয়া উঠিত। কমলিনী নিষ্কণ্টকে ধরাধাম ভোগ করিতেন, ব্রাহ্মণের হাড়ে বাতাস ঢুকিত,—আর এই অধম গ্রন্থকার, এই কাঁচানরক ঘাঁটিতে নিষ্কৃতি পাইত! কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল,—তাই ব্রাহ্মণ মরিলেন না।

বন্ধুবর্গ সমুপস্থিত হইলে ৮টা বাজিল। কমলিনী বলিলেন, "নগেন্দ্রনাথ! আপনি দেখুন,—সকলে উপস্থিত হইয়াছেন কি না!—ফর্দ্দের সহিত নাম মিলাইয়া লউন!" নগেন্দ্র ফর্দ্দ খুলিয়া নাম পড়িতে লাগিলেন,—

১ম—নগেন্দ্র, মহেন্দ্র, দেবেন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্র, গুণেন্দ্র, শৈলেন্দ্র, নরেন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র।

২য়—কৃষ্ণদাস, শ্যামদাস, চন্দ্রদাস, অক্ষয়দাস, বঙ্কিমদাস, হরিদাস, রুইদাস, নিতাইদাস।

৩—দীননাথ, রজনীনাথ, প্রিয়নাথ, অনাথনাথ, কালীনাথ, পশুনাথ, বসন্তনাথ, রতিনাথ।

৪র্থ—নরেশ, গবেশ গণেশ, মহেশ, ধনেশ, পরেশ, প্রাণেশ, দীনেশ।

নামে নামে মানুষ মিলিল দেখিয়া, কমলিনী সভার মধ্যস্থলে আসিয়া চেয়ারে উপবেশন করিলেন। চেয়ারের দক্ষিণ পার্শ্বে নগেন্দ্রনাথ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অদ্য কমলিনীর ঘোরকৃষ্ণবর্ণ চিকৃচিকে রেশমের পোষাক! শোকচিহ্নস্বরূপ—সর্ব্বাঙ্গ কালোকাপড়ে ঢাকা। হস্তাঙ্গুলিতে কালো রঙের দস্তানা; কেবল পাউডার-বিলেপিত মুখটী সাদা ধপ্‌ধপ্‌ করিতেছে! কমলিনী যদি মুখটীতে কালী মাখিয়া ভ্রমরবৎ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে অদ্য শোক-সাগরের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইত। যাহা হউক, চাঁদে কলঙ্ক, কুসুমে কীট, গোলাপে কণ্টক আছে,—তাই কমলিনী আজ মুখে কালি মাখেন নাই।

এ শোক-চিহ্ন-ধারণ কিসের জন্য?—কমলিনীর পতির রোগ হেতু। ওহো, এতক্ষণে বুঝিয়াছি, পতি রোগগ্রস্ত,—অর্থাৎ এখনও জীবিত,—তাই কমল সর্ব্বাঙ্গ কালো-কাপড়ে আবৃত করিয়াও মুখটী সাদা রাখিয়াছেন,—বুঝি পতি মরিলেই তিনি মুখটীতে কালি মাখিবেন।

কমলিনী চেয়ার হইতে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কান্নার সুরে, মাঝে মাঝে চোকে রুমাল দিয়া, এক প্রবন্ধ পাঠ আরম্ভ করিলেন;—"ভ্রাতেশ্বর এবং ভ্রাতৃবৃন্দ! আমি জনমদুঃখিনী! (দর্শক মণ্ডলীমাঝে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস)। এ সংসারে আসিয়া অবধি আমি একটী দিনও সুখ পাই নাই। (সভা মধ্যে শোকধ্বনি)। কিন্তু কাহার মুখ চাহিয়া আমি এতদিন বাঁচিয়া আছি?—সে কেবল পতির মুখ চাহিয়া। কিন্তু অহো, সে পতি আমার আজ নাই,—সে পতি জীবন্মৃত, বাতুল, উন্মত্ত! (চারিদিকে করতালি)। পতির যন্ত্রণা আমি আর চক্ষে দেখিতে পারি না;—সে সদাই আই ঢাই, ছট্‌ ফট্‌, মাগো মরিগো করিতেছে! তাহার দুঃখ দেখিয়া আমার বুক বিদীর্ণ হইতেছে। আমার ইচ্ছা

হয়, তাহাকে এই দণ্ডে গুলি করিয়া মারিয়া তাহার এই নিদারুণ যন্ত্রণা দূর করি। (ঘন ঘন করতালি)। আর যদি ইংরেজ-গবর্ণমেণ্ট আইন-দ্বারা নিষেধ না করিত, তাহা হইলে আমি পতির সঙ্গে অদ্যই সহমৃতা হইতাম। (সভা মাঝে না, না, না শব্দ)। অদ্য পতির উন্মত্ত ভৈরব মূর্ত্তি দেখিয়া আমার হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। তাহার করাল বদন, লোহিত চক্ষু, কুঞ্চিত ভ্রূ, ক্ষুরধার দন্ত অবলোকনে আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গিয়াছে। পতিটী অদ্য সকলকে কামড়াইতে আসিতেছে। (সভা মাঝে ছি ছি ছি শব্দ)। সে, মনুষ্যকুলকে হাঁ করিয়া গিলিতে উদ্যত হইয়াছে। আমি যাই কোথা? করি কি? থাকি কোথা? হে ভ্রাতৃবৃন্দ! আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন!—আর বাঁচি না! আমি মরিলাম! (সকলে তা হবে না, তা হবে না)। আমি অবলা, সরলা, বঙ্গীয় বালা,—আপনাদের শরণাপন্ন হইলাম, রক্ষা করুন! আমি উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া বলিতেছি,—রমণীর আজ রক্ষক কে হইবেন?—আশ্রয়দাতা কে হইবেন? (সকলে আমি, আমি)। পতিশোকে আমার দেহ জর্জ্জরিত হইয়াছে,—দেহে বল নাই, চক্ষে দীপ্তি নাই, নাসিকায় নিশ্বাস নাই, (সকলে হায় হায়)! পতির কথা ভাবিয়া ভাবিয়া আমার মাথা ঘুরিতেছে, অন্তর ঘুরিতেছে, প্রাণের প্রাণ ঘুরিতেছে। আমি আর দাঁড়াইতে পারি না,—আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।"

বক্তৃতা-অন্তে কমলিনীর সভা মাঝে পতন ও মূর্চ্ছা। তখন বন্ধুবর্গমধ্যে হায় হায় ধ্বনি উঠিল। সকলে ধরাধরি করিয়া কমলিনীকে পাশের ঘরে লইয়া গিয়া শোয়াইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আড়াই মিনিট পরে, ভ্রাতৃবৃন্দের বহু কাতরোক্তিতে কমলিনীর মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। সোফায় শুইয়া বন্ধু-পরিবেষ্টিত কমলিনী মিহিসুরে বলিতে লাগিলেন, "ভ্রাতৃগণ! অদ্য আমাকে ক্ষমা করুন। আমি স্বয়ং উঠিয়া আপনাদের আহারের তত্ত্বাবধান করিতে সক্ষম হইব না বলিয়া বোধ হইতেছে,—এ দুঃখ আমার হৃদয়ে অনন্তকাল থাকিবে।"

মহেন্দ্র। সে জন্য আপনি কোন দুঃখ করিবেন না,—আমি আপনার প্রতিনিধিস্বরূপ সর্ব্বকার্য্য স্বচক্ষে দেখিব, সর্ব্বকর্ম্ম স্বহস্তে করিব।

কমলিনী। মহেন্দ্র বাবু,—আমার বড় সাধ হইয়াছে, পতির এই অন্তিম কালে আমি তাঁহার স্বহস্তে সেবা করিব। আপনি যদি এরূপ কার্য্যে অনুমতি দেন,—অর্থাৎ পতি-সেবা-শুশ্রূষায় আমার সেই আভ্যন্তরীণ ব্যারামটা বৃদ্ধি হইবে না,—এরূপ ঠিক করিয়া বলিতে পারেন,—তাহা হইলে এ কার্য্যে অগ্রগামিনী হই।

মহেন্দ্র। আপনার যদি প্রকৃত ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আপনি করিতে পারেন। কারণ, রমণীর স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা-দেওয়া পাশ্চত্য নীতি-বিরুদ্ধ।

নগেন্দ্র। কমলে! আপনি আদর্শরমণী! আপনা দ্বারা কোন্ কাজ না হইতে পারে? ভারতবাসী আজ জাগিয়া উঠুক,—নয়ন মেলিয়া আজ দেখুক,—কমলিনী অদ্য কি অনির্ব্বচনীয় উচ্চব্রত-সাধনে উদ্যোগী হইয়াছেন। তাঁহার নিজের শারীরিক অসুখ, মানসিক ব্যথা, আধ্যাত্মিক উৎকণ্ঠা,—কিছুতেই তিনি দৃক্‌পাত না করিয়া, স্বয়ং স্বশরীরে স্বামী-সেবায় নিরতা হইতেছেন;—এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতে যে এমন রমণী জন্মিবে, তাহা আমি কখন ভাবি নাই,—কল্পনায়ও আনিতে পারি নাই!

কমলিনী। (কর্ণে অঙ্গুল দিয়া) নগেন্দ্রনাথ। নীরব হউন!—আমি আত্ম-প্রশংসা শুনিতে অভিলাষিণী নহি। স্বামী-সেবা কর্ত্তব্যকর্ম্ম মধ্যে গণ্য; ইহা শেলি এবং বায়রণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আমি পতির সেবা করিয়া, নিজ কর্ত্তব্যই পালন করিতেছি,—ইহাতে আমার কোন গুণ-গৌরব নাই। অতএব নিবেদন,—আমার প্রশংসাগীতি গাহিতে এক্ষণে ক্ষান্ত হউন, আমি কর্ণ-পটহ হইতে অঙ্গুলীর অগ্রভাগ বহিষ্কৃত করি!

সভা মধ্য হইতে ধন্য ধন্য ধ্বনি উঠিল। কেহ বলিলেন—"ইংরেজী ইতিহাসে জ্বলন্ত সুবর্ণ অক্ষরে কমলিনীর এ কথাটা লিখিত হউক।" কেহ প্রস্তাব করিলেন, "বিলাতে টাইমস্ পত্রিকায় তার যোগে একথা এখনি প্রেরিত হউক।" কেহ বলিলেন, "পৌত্তলিকতা নিন্দনীয় হইলেও, এমন রমণীর চরণযুগল প্রত্যহ ফুল-চন্দন দিয়া পূজা করিতে পারা যায়।" কেহ বলিলেন, "ফরাসী রমণী শ্রীমতী রোলান্দকেই আমি সর্ব্বগুণ-সম্পন্না বলিয়া জানিতাম, কিন্তু অদ্য সে ভ্রম দূর হইল।"

নগেন্দ্র দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'ভগিনী কমলিনী পতি-সেবা করুন, তাহাতে আমার তত আপত্তি নাই, কিন্তু একটা বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে হইবে। কমলিনী এক্ষণে পীড়িতা, ডাক্তার দ্বারা সদা চিকিৎসিতা,—এ অবস্থায় তিনি যে, এ রাত্রে পতিসেবারূপ কঠোর গুরুকার্য্যে নিযুক্ত হইবেন, প্রাণ থাকিতে তাহা কখনই আমি অনুমোদন করিতে পারি না। বিশেষ, ভগিনীর এক্ষণে আহারের সময় প্রায় উপস্থিত হইয়া আসিয়াছে। আমি জানি, আহার করিতে ভগিনীর যদি পাঁচ মিনিটও বিলম্ব ঘটে, তবে তৎক্ষণাৎ মাথা ধরিবে। মাথা ধরিলে তখন তিনি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিবেন,—অঃ উঃ করিতে থাকিবেন; সভার রস-ভঙ্গ হইবে;—ভগিনীর বাক্য-সুধাপানে তখন আর ভ্রাতৃবৃন্দের তাপিত হৃদয় শীতল হইবে না। আমার প্রস্তাব এই, কমলিনী এখনি সর্ব্বসমক্ষে সর্ব্বাগ্রে ভোজন করুন,—আমারা সকলে মিলিয়া পরিবেশন করি আসুন; আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া ভগিনী স্বামীর কাছে গমন করুন, তাহাতে তত আপত্তি করি না।"

কমলিনা। (কম্পিতস্বরে) না, না, না,—তা, হবে না। স্বামিসেবার পূর্ব্বে আমি কি কখন আহার করিতে পারি?—স্বামী পরম গুরু; অগ্রে তাঁহার ক্ষুৎপিপাসা স্বহস্তে দূর করিয়া, তৎপরে আমি জলগ্রহণ করিব। এরূপ কঠোর ব্রত অবলম্বন করিতে যদি আমার প্রাণ যায়,—তাহাও স্বীকার, তথাচ এ নারী-জন্মে পতি-সেবার কখন ত্রুটী করিব না।

নগেন্দ্র। আহা! পতিব্রতা রমণীর এমনি ধর্ম্ম বটে,—শিক্ষিতা রমণীর এমনি কর্ম্মই বটে,—কিন্তু আমার মন বুঝে না, তাই বলিয়াছিলাম,—কমলিনী অগ্রে আহার করিয়া পরে স্বামী-সেবায় প্রবৃত্ত হুউন। কারণ,—

শরীমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।

সে যাহা হউক, উঁহার যাহা অভিপ্রায় তাহাই করিতে পারেন;—কাহারও স্বাধীন ইচ্ছায় আমি কখন বাধা দিই না।

তখন ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"আমি ডাক্তার, চিকিৎসক, বৈদ্য; —গবর্ণমেণ্ট-প্রতিষ্ঠিত মেডিকাল-কলেজে আমি দ্বাদশ-বর্ষকাল অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসাবিদ্যায় সুনিপুণ হইয়াছি। প্রায় দশ বৎসর কাল নানা স্থানে চিকিৎসা

ব্যবসা চালাইয়াছি এবং কমলিনীর স্বচিকিৎসাতেই প্রায় পাঁচ বৎসর নিযুক্ত আছি ;—ভগিনীর নাড়ী আমি যেরূপ অবগত আছি, তেমন আর কেহই নহেন। আমি এই সব জানি বলিয়াই, ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বলিতেছি,—স্বামী-সেবা করিতে যাইবার পূর্ব্বে, দুর্ব্বলা কমলিনী একটা সতেজ ঔষধ সেবন করুন। সেই ঔষধের গুণে তিনি বহুক্ষণ পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিতে সক্ষম হইবেন—এবং তাঁহার মূর্চ্ছা বা মাথাধরা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। ঔষধ অন্য কিছুই নহে ;—লেমনেড বরফ দিয়া, তাহাতে ছয় আউন্স পরিমাণ কোন এক বিলাতী লাল ঔষধ ঢালিয়া,—তাহাই তিনি দশ মিনিট অন্তর তিনবার পান করুন,—সহজেই তাঁহার শরীর সুস্থ সবল হইয়া উঠিবে। আমার আশা, সকলেই আমার এ প্রস্তাবের অনুমোদক হইবেন।"

তখন সমাগত সভ্যমণ্ডলী সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আমরা সকলেই ইহার অনুমোদক,—কমলিনীর কোমলকণ্ঠে এখনি সেই ভবৌষধ নিপতিত হউক।"

কমলিনী। (মিহিসুরে) ভ্রাতেশ্বর এবং ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনাদের কথা কখন আমি লঙ্ঘন করিতে পারি না,—আপনারা যাহা আদেশ করিলেন, তাহাই হউক।

তখন ইঙ্গিত-মত, কপিল খানসামা দ্রুতগতি পার্শ্বের গৃহ হইতে লেমেনেড, বরফ এবং লাল জল লইয়া আনিল। ডাক্তার মহেন্দ্র স্বয়ং তাহা সুমিশ্রিত করিলেন। অধ্যাপক নগেন্দ্র স্বয়ং তাহা কমলিনীর মুখের নিকট ধরিলেন। আর, স্বয়ং কমলিনী সেই সমগ্র ঔষধ একবারেই উদরস্থ করিয়া বলিলেন, "যদিও ডাক্তার বাবুর আদেশমত, দশ মিনিট অন্তর, ইহা তিনবার খাওয়া আমার উচিত ছিল,—কিন্তু কর্ত্তব্য-কর্ম্মের অনুরোধে, কালবিলম্বে স্বামীর সেবা-ভঙ্গের ভয়ে, আমি একবারেই সমস্ত ঔষধ খাইতে বাধ্য হইয়াছি। আশা আছে,—ডাক্তার বাবু আমার এ অপরাধ ক্ষমা করিবেন।"

মহেন্দ্র। কমলিনি! ইহাত আপনার অপরাধ নয়,—ইহা যে আপনার গুণের মধ্যে পরিগণিত! একেবারে আপনি সমস্ত ঔষধ উদরস্থ করিতে সক্ষম হইবেন না বলিয়াই আমি ক্রমে ক্রমে তিনবারে খাইবার কথা বলিয়াছিলাম। কিন্তু আপনি ইহা একেবারে সবটুকু সেবন করায় আপনার পক্ষে এ ঔষধ ঝটিতি বিশেষ মঙ্গলদায়ক হইবে।

নগেন্দ্র। কমলে! আমি বলিতেছি, আপনার কোন অপরাধ হয় নাই! আপনি চিন্তিত হইবেন না! আর যদিই অপরাধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা আপনার

কোটী অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু বিশেষ কথা এই,—আপনা দ্বারা কোন অপরাধ করা সম্ভবে না।

সভাস্থ সকলেই বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক্ কথা, ঠিক্ কথা।"

মহেন্দ্র। সে কথা যাউক। এক্ষণে আমার এক প্রস্তাব এই, সভাস্থ যে কেহ দুর্ব্বল পুরুষ আছেন, তিনি স্বচ্ছন্দে মৎপ্রকাশিত উক্ত ঔষধ এখনি সেবন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে সবল হইতে পারেন।

সভাস্থ সকলেই বলিয়া উঠিলেন, "আমি দুর্ব্বল, আমি দুর্ব্বল!"—কেহ বা বলিলেন, "আমি এত দুর্ব্বল হইয়াছি যে, চেয়ারে সোজা হইয়া আর বসিয়া থাকিতে পারিতেছি না।" কেহ তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "তুমিত ভাই পদে আছ,—আমি এতই দুর্ব্বল হইয়াছি যে, শুইয়া থাকতে কষ্টবোধ হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে।" তৃতীয় সভ্য উত্তর করিলেন, "সে কি হে ভাই! তুমি ত বরং আছ ভাল,—আমার এতই দৌর্ব্বল্য যে, আমার মনে হইতেছে, মৃত্যু হইলেও বোধ হয় আমার দেহের কষ্ট যাইবে না।"

যখন সকলে একবাক্যে ডাক্তার মহেন্দ্রনাথের প্রস্তাবে অনুমোদন, করিলেন, তখন কপিল খানসামা সকলকে যথানিয়মে ঔষধ যোগাইতে লাগিল।

ঔষধ সেবনান্তে সকলে তৈয়ারি হইয়া উঠিলে, কমলিনী প্রস্তাব করিলেন, "তবে এখন আমি স্বামী-সেবায় গমন করিতে পারি কি?—আপনারা অনুমতি দেনত,—এখনি যাই,—এই মুহূর্ত্তে গমনোদ্যোগ করি। স্বামী-সেবা শেষ করিয়া আসিয়া, আমি আপনাদিগকে চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য পেয়-রূপে ভোজন করাইব,—এইরূপ অভিলাষ করিয়াছি।"

নগেন্দ্র। আমাদের আহারের জন্য আমি তত ভাবি না,—সে যখন হয় হইবে; কিন্তু আপনি যে কিরূপে স্বামী-সেবারূপ গুরুকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহাই কেবল ভাবিতেছি। আপনার নবনীতবৎ কোমল দেহ,—কুসুম-সুকুমার-করাঙ্গুলি;—চম্পক-কলি-সদৃশ বর্ণ;—এইরূপ উৎকৃষ্ট উপকরণ লইয়া আপনি কেমন করিয়া সেই অর্দ্ধ-বৃদ্ধ, অর্দ্ধ-মৃত উন্মত্তের শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইবেন?

কমলিনী। নগেন্দ্রনাথ! আমি যোড়হাতে বলিতেছি,—আমাকে আর বাধা দিবেন না;—এ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে, এ সাধুসঙ্কল্পে আর বিফল-মনোরথ করিবেন না।

নগেন্দ্র। (দুঃখের হাসি হাসিয়া) অয়ি কমলিনি! আমি কি বাধা দিতেছি?—আমার অন্তর-আত্মা বাধা দিতেছে। এস্থলে, আমি কি করিব? আমার ইচ্ছা হইতেছে, এই দণ্ডে আপনার প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া, আপনার স্বামী-সমীপে আমি স্বয়ং গিয়া তাঁহার সেবা করি। এঁ—সে কাজে কি কোন দোষ আছে?

কমলিনী। তাহা হইতে পারে না;—স্বামী-সেবা পুণ্য-কর্ম্ম; আমি যে এ গুরু পুণ্যকার্য্যে বঞ্চিত থাকিব, তাহা কখনই হইতে পারে না।

নগেন্দ্র। তবে এমত হইতে পারে,—আমরা উভয়ে একসঙ্গে গিয়া উভয়েই একত্র এক সময়ে একপ্রাণে স্বামী-সেবায় নিযুক্ত হই। ইহাতে কোন ক্ষতি আছে কি?

কমলিনী। তাহাতে আমার আপত্তি নাই। আপনি আমার বন্ধু; আপনি আমার স্বামী-সদনে গমন করিবেন,—ইহাতে আমি বাধা দিব কেন?

মহেন্দ্র। তবে আর বিলম্ব করিবেন না,—উভয়েই আমার সঙ্গে আসুন;—রাত্রি প্রায় নয়টা বাজিতে চলিল।

নগেন্দ্র এবং মহেন্দ্র, থামের আড়ালে গিয়া, কপিলকে ফুস্ ফাস্ করিয়া, কত কি বলিয়া দিল। খান্‌সামা-প্রবর অমনি লাফাইতে লাফাইতে দুড় দুড় শব্দে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া চলিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অদ্য দ্বিতীয় দিন। ব্রাহ্মণের সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে। গৃহদ্বার রুদ্ধ; সেই ক্ষুদ্র গবাক্ষটিও অদ্য রুদ্ধ। ঘরময় মশা, ডাঁশ, ওয়ানি নানাসুরে নানারঙে গানধরিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দুই চারিটা আরসুলা খানিক উড়িয়া, উর্দ্ধে উঠিয়া ভূতলে পড়িয়া যাইতেছে। দারুণ গুমট-গ্রীষ্মে মনে হইতেছে, সেই ঘরের বায়ু পর্য্যন্ত আজ বুঝি পচিয়া উঠিবে।

ব্রাহ্মণ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া হেঁটমুণ্ডে ভূতলে বসিয়া আছেন। গ্রীষ্ম, মশা, ডাঁশ, আরসুলা, ছারপোকা কিছুরই প্রতি দৃক্‌পাত নাই। তিনি যেন অচেতন পদার্থ—

পাথরবৎ নিশ্চল। প্রকৃতই মনে হইতেছে যে, তাঁহাতে বুঝি আর প্রাণবায়ু নাই,— বুঝি-রক্ত-চলাচল বন্ধ হইয়াছে, শরীর বুঝি পাষাণ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ কোন্ ধ্যানে নিমগ্ন, তাহ কেমন করিয়া বুঝিব ?

এমন সময় বাহির হইতে সেই ক্ষুদ্র গবাক্ষে কে যেন ঈষৎ ধাক্কা দিল। ক্রমে সহাইয়া সহাইয়া অল্প অল্প জোরে সেই ব্যক্তি ধাক্কা মারিতে লাগিল। তথাচ জানেলার কপাট খুলিল না,—ব্রাহ্মণ কিন্তু নড়িলেন না ;—বুঝি ধাক্কার শব্দ তাঁহার কর্ণে যায় নাই।

বহিঃস্থ ব্যক্তি ক্রমশ বুঝিল, গবাক্ষটী, ভিতর দিক্ হইতে বন্ধ করা আছে। জানেলাটী পুরাণো,—খিল আল্‌গা ; কপাটের দুই মুখে ফাঁক। তখন বাহিরের সেই ব্যক্তি বহু কষ্টে, বহু কৌশলে বাহির দিক্ হইতে জানেলায় হাত ঢুকাইয়া দিল। খিল খুলিবার জন্য আঁচ-পাঁচ করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই খিল খোলা গেল না। ব্রাহ্মণও নড়িলেন না,—যেন সংজ্ঞা নাই।

তখন সেই ব্যক্তি আবার ধীরে ধীরে ঠুক্‌ঠুক্ শব্দে গবাক্ষে ধাক্কা দিল ;—ব্রাহ্মণকে জাগ্রত করাই বুঝি তাহার উদ্দেশ্য ছিল। আর একটু অধিক জোরে ধাক্কা দিলেই বোধ হয় ব্রাহ্মণের ধ্যান-ভঙ্গ হয়, কিন্তু সে ব্যক্তি বুঝি সেরূপ শব্দ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিল। তখন সে লাফাইয়া উঠিয়া, জানেলার গরাদে ধরিয়া, উঁকি মারিয়া দেখিল,—ব্রাহ্মণ কোথায় ? কি করিতেছেন ?

তাহার যে মুখটী দৃষ্ট হইল, তাহা অপূর্ব্ব। বদনমণ্ডল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ,—যেন কালিমাখা! দাড়ী আনাভি বিলম্বিত—যেন ছোবানো শণের রাশি। মাথার এক প্রকাণ্ড পাগড়ী—যেন মৈনাক পাহাড়।

সেই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ একখানি পত্র ছুঁড়িয়া ব্রাহ্মণের দিকে ফেলিল। সেই পত্রের সঙ্গে একখণ্ড পাথর-কুঁচি জড়ান ছিল। পত্র আসিয়া ব্রাহ্মণের দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠোপরি নিপতিত হইল। কিন্তু তথাচ ব্রাহ্মণের যোগভঙ্গ হইল না।

সেই কালো লোকটী তখন আর একটী ঢিল ব্রাহ্মণের বাম চরণে নিক্ষেপ করিল। তথাচ তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই।

কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি বড়ই বিরক্ত হইল। কেমন করিয়া ব্রাহ্মণকে জাগাই,—এই নিমিত্ত সে যেন বিকল-কলেবর হইল। কিছুতেই যে ব্রাহ্মণের বাহ্যজ্ঞান হয় না,—করি কি ?

সেই কালো-মানুষ জানেলার গরাদে ছাড়িয়া নীচে নামিয়া পড়িল। আবার উঠিল। তাহার দক্ষিণ হস্তে ঘটী। সে জানেলার ফাঁক দিয়া সেই ঘটীর জল এমন সজোরে গৃহ মধ্যে ফেলিল যে, তাহা ব্রাহ্মণের মাথায় আসিয়া পড়িল। এবার ব্রাহ্মণ চমকিয়া চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন; কিন্তু কোথাও কিছুই দেখিতে পাইলেন না। কালো-মানুষ, নামিয়া পড়িয়া আবার জানেলায় অল্প ধাক্কা দিল। ব্রাহ্মণ কাণ পাতিয়া তাহা শুনিলেন। আবার তিনি এদিক ওদিক চাহিলেন;—কোথায় শব্দ হইতেছে, ভাল বুঝিতে পারিলেন না। মনে মনে বলিলেন, "আমাকে অলক্ষ্যে যন্ত্রণা দিবার জন্য বোধ হয় কোন নূতন কৌশল উদ্ভাবিত হইতেছে। (হাসিয়া) আমাকে আর যন্ত্রণা দিবার চেষ্টা বৃথা!—সে ভাবনা, সে যন্ত্রণা দূর হইয়াছে। আমি সেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্রীহরির চরণকমল সতত ধ্যান করিতেছি,—আমার আর অন্য বাহ্য যন্ত্রণা কি আছে?—আমাকে যন্ত্রণা দেওয়া কেবল উহাদের যন্ত্রণা-ভোগমাত্র সার।"

ব্রাহ্মণ হঠাৎ সম্মুখে এক খণ্ড কাগজ দেখিতে পাইলেন। মনে মনে জিজ্ঞাসিলেন, "এ,—এখানে ত কিছুই ছিল না, কাগজ কোথা হইতে আসিল।" কাগজ কুড়াইয়া তাহা খুলিয়া পড়িয়া দেখিলেন, তাহাতে লিখিত আছে, "জানেলা খুলুন, গঙ্গাজল আনিয়াছি, ৺ মদনমোহনের প্রসাদ আছে।"

ব্রাহ্মণ সেই পত্র পড়িয়া বিষম বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। মনে মনে বলিলেন, "এ অধম পাতকীর আবার কেহ সহায় রক্ষক আছে নাকি?—তাও কি কখন সম্ভব হয়?—অথবা ইহা সাহায্যও নহে, রক্ষাও নহে, বঞ্চনা মাত্র। মায়াবিগণ মায়াজালে আমাকে কেবল মুগ্ধ করিতেছে।"

জানেলায় আবার ধাক্কা হইল। ব্রাহ্মণ সভয়ে, উঠিয়া জানেলার খিল খুলিয়া দিলেন। তাঁহার অন্তরে এই ভাব উদয় হইল, "খিল খুলিয়াই বা কি হয়, একবার দেখি না কেন?" খিল খুলিবা মাত্র, সেই কালো পুরুষ, অমনি ব্যস্ত হইয়া, জানেলার উপর হাত বাড়াইয়া এক ভাঁড় গঙ্গাজল, নারিকেল মালায় ৺ মদনমোহনের প্রসাদী সন্দেস এবং একখানি পত্র রাখিয়া চলিয়া গেল। আর সে দৃষ্টিগোচর হইল না। সেই পত্রের খামের উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে, "শীঘ্র পত্র পড়ুন।" ব্রাহ্মণ পত্র খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন;—

শ্রীশ্রী হরিঃ

শরণং

শ্রীচরণেষু—

পত্র সংক্ষেপে, ইঙ্গিতে লিখিলাম, বুঝিয়া লইবেন।

২। আমি কে, তাহা জানিবার আবশ্যক নাই! তবে আমি শত্রু নহি মিত্র ;—এই কথা বুঝাইবার জন্য ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমিই আপনার নদীয়া জেলার বাটীতে আপনার সহধর্ম্মিণীকে কলিকাতা হইতে লইয়া আসিবার জন্য আপনাকে উড়োচিঠি লিখিয়াছিলাম। তাহাতে লিখিত ছিল "যদি সম্ভব হয়, তবে শীঘ্র আপনার সহধর্ম্মিণীকে কলিকাতা হইতে ঘরে আনিবেন।"

৩। আপনাকে উপদেশ দিবার, বুঝাইবার বা শিক্ষা দিবার শক্তি আমার নাই।

৪। বিপদ কি, তাহা বুঝিয়া থাকিবেন। এই কুটিল সংসারে আপনি বড়ই সরল। তাই সন্দেহ হয়,—যদি বিপদ না বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে সম্ভবত প্রাণে মরিবেন।

৫। সহধর্ম্মিণী কুলকলঙ্কিনী। ঘোরতর ষড়যন্ত্র।

৬। অদ্যরাত্রে জাতিনাশ করিবে; টিকি কাটিবে।

৭। কল্য প্রহার এবং বন্ধন।

৮। পরশ্ব ভয়ঙ্কর অভিযোগ। সে কথা ভাবিতে কষ্ট হয়।

৯। তাহার এক সপ্তাহ পরে পাগলা-গারদে বাস। তথায় যাবজ্জীবন অবস্থিতি।

১০। অতি গোপনে তাহারা এইরূপ পরামর্শ ঠিক করিয়াছে।

১১। আমি ক্ষুদ্রব্যক্তি। আমার দ্বারা সাহায্যের সম্ভাবনা খুব অল্প।

১২। হঠাৎ একথা কলিকাতা সহরময় রাষ্ট্র করিয়া ফেলিলে, কোন ফল হইবে না। বরং তাহাতে বিপরীত ফল ফলিবে এবং ষড়যন্ত্রকারিগণ সাবধান হইবে।

১৩। দুর্ভাগ্যের বিষয়,—আপনার প্রধান সহায় সেই রাজা এখন রাজ্যে নাই। তিনি ভ্রমণার্থ সেতুবন্ধ রামেশ্বর গিয়াছেন।

১৪। উপায় চিন্তা করুন,—আমিও চিন্তা করি, এখনও সময় আছে।

১৫। আপনার সমস্ত দিন আহার হয় নাই। এই পশু ম্লেচ্ছের গৃহে আপনি জল গ্রহণ করেন নাই। আমি আপনার ভক্তসেবক ব্রাহ্মণ; গঙ্গাজল আনিয়াছি;

৺ মদনমোহন জীউর কিঞ্চিৎ প্রসাদ আছে। সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া জলগ্রহণ করুন।

১৬। পাঠান্তে পত্রখানি পুড়াইবেন। ভস্মাবশেষগুলি বাহিরে উড়াইয়া দিবেন। গঙ্গাজলের ভাঁড় প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া বাহিরে ফেলিবেন। ঘরের ভিতর এ সকলের কিছুমাত্র চিহ্নও যেন না থাকে।

১৭। আমি রাত্রি সাড়ে তিনটার সময় আবার প্রাতঃসন্ধ্যার জন্য গঙ্গাজল লইয়া আসিব।

ব্রাহ্মণ পত্র পড়িয়া একবার ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিলেন। যেন বৈকুণ্ঠবিহারী শ্রীহরির পাদপদ্ম একবার দেখিয়া লইলেন। আবার তিনি নিম্নে নয়ন নত করিয়া, পত্র লইয়া দীপশিখায় ধরিলেন। কাগজ দগ্ধ হইলে, গবাক্ষ দিয়া তাহা বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন।

গঙ্গাজল গ্রহণ করিয়া, প্রথমত শিরে একটু ঢালিয়া, সলিলকে বার বার প্রণাম করিতে লাগিলেন। জল-ই জীবন. তাহার পর. কয়েকগাছী ভগ্নমাদুর-কাঠি লইয়া একস্থানে রাখিয়া তাহারই উপর উপবেশন করিলেন।

ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা সমাপন করিয়া, প্রসাদ খাইয়া গঙ্গাজল পান করিলেন।

আজ প্রায় দুইদিন পরে ব্রাহ্মণের এই প্রথম আহার হইল। যিনি শ্রীবৃন্দাবনে হাজতগৃহে তিন দিন কাল অনাহারে থাকিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে দুই দিন অনাহার বিশেষ কষ্টদায়ক নহে।

ব্রাহ্মণ গঙ্গাজল পান করিতে করিতে আপনা-আপনি অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিলেন,— "মাতর্গঙ্গে! তোমার জলে কবে এ জীবন জুড়াইব? কর্ম্ম-ফল-ভোগের অবসান কবে হইবে? জননি! বলিয়া দাও, পাপগ্রহ কবে বিদূরিত হইবে?"

ব্রাহ্মণ সেই পত্রানুযায়ী ভাঁড় ও নারিকেল মালা ভাঙ্গিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

ব্রাহ্মণের প্রথম চিন্তা,—লোকটী কে? এ দুঃসময়ে কোন্ সদাশয় ব্যক্তি আমার প্রতি এরূপ সদয় হইলেন?—আমাকে রক্ষা করিবার তাঁহার স্বার্থ কি? প্রয়োজন কি?—তিনি তাঁহার নাম বলিলেন না কেন?—ইহারই বা অর্থ কি?

দ্বিতীয় চিন্তা;—অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা ঘটিয়াছে।। যাহা আছে, তাহাও ঘটিবে। —ভাবিয়া কি করিব? হরির চরণ স্মরণ ব্যতীত আর আমার অবলম্বন কি আছে?

প্রভো! জলে স্থলে অনলে শৈলে তুমি প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছ, শ্বাপদ-সঙ্কুল গহনবনে পঞ্চমবর্ষীয় ধ্রুবকে রক্ষা করিয়াছ;—জ্বলন্ত তপ্ত তৈলে সুধন্বাকে রক্ষা করিয়াছ;—আমি অধম, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, কীটাণু কীট,—আমার এমন পুণ্যফল কি আছে, সঞ্চিত সুকৃতি কি আছে যে, তুমি আমাকে রক্ষা করিবে?—কেবল ঐ দয়াময় নাম আমার একমাত্র ভরসা।—হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

ব্রাহ্মণ হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমার কপালে এমন দুর্ভোগ ছিল,—তাহা কখন ভাবি নাই।" দুর্ভর দুঃখে মানুষ হাসে।

তখন চিন্তা চাপা দিয়া ব্রাহ্মণ কেবল হরির চরণ ধ্যান করিতে লাগিলেন,—সেই শ্রীবৎস-লাঞ্ছন, বংশীধর, বাঁকা মদন মোহন মূর্ত্তি,—ব্রাহ্মণের যেন সমীপবর্ত্তী হইল। ব্রাহ্মণ সে রূপ-মাধুরীতে মোহিত হইয়া চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে শ্রীনিবাসকে শত শত বার প্রণাম করিতে লাগিলেন; কণ্ঠ হইতে স্তোত্র-গীতি উত্থিত হইল :—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
ভূতাদিরাদিপ্রকৃতির্যস্য রূপং নতোঽস্মি তম্॥
শুদ্ধঃ সূক্ষ্মোঽখিলব্যাপী প্রধানাৎ পরতঃ পুমান্।
যস্য রূপং নমস্তস্মৈ পুরুষায় গুণাশিনে॥
ভূরাদীনাং সমস্তানাং গন্ধাদীনাঞ্চ শাশ্বতঃ।
বুদ্ধ্যাদীনাং প্রধানস্য পুরুষস্য চ যঃ পরঃ॥
তং ব্রহ্মভূতমাত্মানমশেষজগতঃ পরম্।
প্রপদ্য শরণং শুদ্ধং ত্বদ্রূপং পরমেশ্বরম্॥
বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ যদ্রূপং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্।
তস্মৈ নমস্তে সর্ব্বাত্মন্ যোগচিন্ত্যাবিকারবৎ॥
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সর্ব্বব্যাপী ভুবঃ স্পর্শাদত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্॥
যদ্ভূতং যচ্চ বৈ ভাব্যং পুরুষোত্তম তদ্ ভবান।
ত্বত্তো বিরাট্ স্বরাট্ সম্রাট্ ত্বত্তশ্চাপ্যধিপুরুষঃ।
অত্যরিচ্যত সোঽধশ্চ তির্য্যক্ চোর্দ্ধঞ্চ বৈ ভুবঃ॥

ত্বত্তো বিশ্বমিদং জাতং ত্বত্তো ভূতভবিষ্যতী।
ত্বদ্রূপধারিণশ্চান্তর্ভূতং সর্ব্বমিদং জগৎ॥
ত্বত্তো যজ্ঞঃ সর্ব্বহুতঃ পৃষদাজ্যং পশুর্দ্বিধা।
ত্বত্তো ঋচোঽথ সামানি ত্বত্তশ্ছন্দাংসি জজ্ঞিরে॥
ত্বত্তো যজূংষ্যজায়ন্ত ত্বত্তোঽশ্বাশ্চৈকতোদতঃ।
গাবস্ত্বত্তঃ সমুদ্ভূতাস্ত্বত্তোঽজা অবয়ো মৃগাঃ॥
ত্বন্মুখাদ্ ব্রাহ্মণাস্ত্বত্তো বাহ্বোঃ ক্ষত্রমজায়ত।
বৈশ্যাস্তবোরুজাঃ শূদ্রাস্তব পদ্ভ্যাং সমুদ্গতাঃ॥
অক্ষ্ণোঃ সূর্য্যোঽনিলঃ শ্রোত্রাচ্চন্দ্রমা মনসস্তব।
প্রাণোঽনঃশুষিরাজ্জাতো মুখাদগ্নিরজায়ত॥
নাভিতো গগনং দ্যৌশ্চ শিরসঃ সমবর্ত্তত।
দিশঃ শ্রোত্রাৎ ক্ষিতিঃ পদ্ভ্যাং ত্বত্তঃ সর্ব্বমভূদিদম্॥
ন্যগ্রোধঃ সুমহানল্পে যথা বীজে ব্যবস্থিতঃ।
সংযমে বিশ্বমখিলং বীজভূতে তথা ত্বয়ি॥
বীজাদঙ্কুরসংভূতো ন্যগ্রোধঃ সুসমুত্থিতঃ।
বিস্তারঞ্চ যথা যাতি ত্বত্তঃ সৃষ্টৌ তথা জগৎ॥
যথা হি কদলী নান্যা ত্বক্পত্রাদ্ নাথ দৃশ্যতে।
এবং বিশ্বস্য নান্যত্বং ত্বৎস্থায়ীশ্বর দৃশ্যতে॥
হ্লাদিনী সান্ধনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥
পৃথগ্‌ভূতৈকভূতায় ভূতভূতায় তে নমঃ।
প্রভূতভূতভূতায় তুভ্যং ভূতাত্মনে নমঃ॥
ব্যক্তপ্রধানপুরুষ বিরাট্ সম্রাট্ স্বরাট্ তথা।
বিভাব্যতেঽন্তঃকরণৈঃ পুরুষেষ্বক্ষয়ো ভবান্॥
সর্ব্বস্মিন্ সর্ব্বভূতস্ত্বং সর্ব্বঃ সর্ব্বস্বরূপধৃক্।
সর্ব্বং ত্বত্তস্ততশ্চ ত্বং নমঃ সর্ব্বাত্মনেঽস্তু তে॥

সর্ব্বাত্মকোঽসি সর্ব্বেশ সর্ব্বভূতস্থিতো যতঃ।
কথয়ামি ততঃ কিং তে সর্ব্বং বেৎসি হৃদি স্থিতম্॥
সর্ব্বাত্মন্ সর্ব্বভূতেশ সর্ব্বসত্ত্বসমুদ্ভব।
সর্ব্বভূতো ভবান্ বেত্তি সর্ব্বভূতমনোরথম্॥
যো মে মনোরথো নাথ সফলঃ স ত্বয়া কৃতঃ।
তপশ্চ তপ্তং সফলং যদ্ দৃষ্টোঽসি জগৎপতে॥

ব্রাহ্মণের দুনয়নে ঝর্ ঝর্ জল পড়িতে লাগিল। বিরাম নাই,—নয়নজলে বুক ভাসিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে ব্রাহ্মণ একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতে লাগিলেন, "হে দীনবন্ধু হরি! তুমিই সর্ব্বস্ব; তুমিই হর, তুমিই ব্রহ্মা,—ভেদ নাই, ভেদ নাই!" ব্রাহ্মণ আবার স্তব আরম্ভিলেন;—

মহিম্নঃ পারং তে পরমবিদুষো যদ্যসদৃশী
স্তুতির্ব্রহ্মাদীনামপি তদবসন্নাস্ত্বয়ি গিরঃ।
অথাবাচ্যঃ সর্ব্বঃ স্বমতিপরিণামাবধি গৃণন্
মমাপ্যেষ স্তোত্রে হর নিরপবাদঃ পরিকরঃ॥
অতীতঃ পন্থানং তব চ মহিমা বাঙ্মনসয়ো-
রতদ্ব্যাবৃত্ত্যা যং চকিতমভিধত্তে শ্রুতিরপি।
স কস্য স্তোতব্যঃ কতিবিধগুণঃ কস্য বিষয়ঃ
পদে ত্বর্ব্বাচীনে পততি ন মনঃ কস্য ন বচঃ॥
মধুস্ফীতা বাচঃ পরমমমৃতং নির্ম্মিতবত-
স্তব ব্রহ্মন্ কিং বাগপি সুরগুরোর্বিস্ময়পদম্।
মম ত্বেতাং বাণীং গুণকথনপুণ্যেন ভবতঃ
পুনামীত্যর্থেঽস্মিন্ পুরমথন বুদ্ধির্ব্যবসিতা॥
তবৈশ্বর্য্যং যৎ তজ্জগদুদয়-রক্ষা-প্রলয়কৃৎ
ত্রয়ীবস্তু ব্যস্তং তিসৃষু গুণভিন্নাসু তনুষু।
অভব্যানামস্মিন্ বরদ রমণীয়ামরমণীং
বিহন্তুং ব্যাক্রোশীং বিদধত ইহৈকে জড়ধিয়ঃ॥

কিমীহঃ কিংকায়ঃ স খলু কিমুপায়স্ত্রিভুবনং
কিমাধারো ধাতা স্বজতি কিমুপাদান ইতি চ।
অতর্ক্যৈশ্বর্য্যে ত্বয্যনবসরদুঃস্থো হতধিয়ঃ
কুতর্কোঽয়ং কাংশ্চিন্মুখরয়তি মোহায় জগতঃ॥
অজন্মানো লোকাঃ কিমবয়ববন্তোঽপি জগতা-
মধিষ্ঠাতারং কিং ভববিধিরনাদৃত্য ভবতি।
অনীশো বা কুর্য্যাদ্ভুবনজননে কঃ পরিকরং
যতো মন্দাস্ত্বাং প্রত্যমরবর সংশেরত ইমে॥
ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥
মহোক্ষঃ খট্টাঙ্গং পরশুরজিনং ভস্ম ফণিনঃ
কপালঞ্চেতীয়ৎ তব বরদ তন্ত্রোপকরণম্।
সুরাস্তাং তামৃদ্ধিং দধতি চ ভবদ্ভ্রূপ্রণিহিতাং
ন হি স্বাত্মারামং বিষয়মৃগতৃষ্ণা ভ্রময়তি॥
ধ্রুবং কশ্চিৎ সর্ব্বং সকলমপরস্ত্বধ্রুবমিদং
পরো ধ্রৌব্যাধ্রৌব্যে জগতি গদতি ব্যস্তবিষয়ে।
সমস্তেঽপ্যেতস্মিন্ পুরমথন তৈর্বিস্মিত ইব
স্তুবন্ জিহ্রেমি ত্বাং ন খলু ননু ধৃষ্টা মুখরতা॥
তবৈশ্বর্য্যং যত্নাদ্ যদুপরি বিরিঞ্চির্হরিরধঃ
পরিচ্ছেত্তুং যাতাবনলমনিলস্কন্ধবপুষঃ।
ততো ভক্তিশ্রদ্ধাভরগুরুগৃণদ্ভ্যাং গিরিশ যৎ
স্বয়ং তস্থে তাভ্যাং তব কিমনুবৃত্তির্ন ফলতি॥
অযত্নাদাসাদ্য ত্রিভুবনমবৈরব্যতিকরং
দশাস্যো যদ্বাহূনভৃত রণকণ্ডুপরবশান্।

শিরঃপদ্মশ্রেণীরচিতচরণাম্ভোরুহবলেঃ
স্থিরায়াস্ত্বদ্ভক্তেস্ত্রিপুরহর বিস্ফূর্জিতমিদম্॥
অমুষ্য ত্বৎসেবাসমধিগতসারং ভুজবনং
বলাৎ কৈলাসেঽপি ত্বদধিবসতৌ বিক্রময়তঃ।
অলভ্যা পাতালেঽপ্যলসচলিতাঙ্গুষ্ঠশিরসি
প্রতিষ্ঠা ত্বয্যাসীদ্ ধ্রুবমুপচিতো মুহ্যতি খলঃ॥
যদৃদ্ধিং সুত্রাম্ণো বরদ পরমোচ্চৈরপি সতী-
মধশ্চক্রে বাণঃ পরিজনবিধেয়ত্রিভুবনঃ।
ন তচ্চিত্রং তস্মিন্ বরিবসিতরি ত্বচ্চরণয়ো-
র্ন কস্যা উন্নত্যৈ ভবতি শিরসস্ত্বয্যবনতিঃ॥
অকাণ্ডব্রহ্মাণ্ডক্ষয়চকিতদেবাসুরকৃপা-
বিধেয়স্যাসীদ্যস্ত্রিনয়ন বিষং সংহৃতবতঃ।
স কল্মাষঃ কণ্ঠে তব ন কুরুতে ন শ্রিয়মহো
বিকারোঽপি শ্লাঘ্যো ভুবনভয়ভঙ্গব্যসনিনঃ॥
অসিদ্ধার্থা নৈব ক্বচিদপি সদেবাসুরনরে
নিবর্ত্তন্তে নিত্যং জগতি জয়িনো যস্য বিশিখাঃ।
স পশ্যন্নীশ ত্বামিতরসুরসাধারণমভূৎ
স্মরঃ স্মর্ত্তব্যাত্মা ন হি বশিষু পথ্যঃ পরিভবঃ॥
মহী পাদাঘাতাদ্ ব্রজতি সহসা সংশয়পদং
পদং বিষ্ণোর্ভ্রাম্যদ্ভুজপরিঘরুগ্নগ্রহগণম্।
মুহুর্দ্যৌর্দৌস্থ্যং যাত্যনিভৃতজটাতাড়িততটা
জগদ্রক্ষায়ৈ ত্বং নটসি ননু বামৈব বিভুতা॥
বিয়দ্ব্যাপী তারাগণগুণিতফেনোদ্গমরুচিঃ
প্রবাহো বারাং যঃ পৃষতলঘু দৃষ্টঃ শিরসি তে।
জগদ্দ্বীপাকারং জলধিবলয়ং তেন কৃতমি-
ত্যনেনৈবোন্নেয়ং ধৃতমহিম দিব্যং তব বপুঃ॥

রথঃ ক্ষৌণী যন্তা শতধৃতিরগেন্দ্রো ধনুরথো
রথাঙ্গে চন্দ্রার্কৌ রথচরণপাণিঃ শর ইতি।
দিধক্ষোস্তে কোঽয়ং ত্রিপুরতৃণমাড়ম্বরবিধি-
র্বিধেয়ৈঃ ক্রীড়ন্ত্যো ন খলু পরতন্ত্রাঃ প্রভুধিয়ঃ ॥
হরিস্তে সাহস্রং কমলবলিমাধায় পদয়ো-
র্যদেকোনে তস্মিন্ নিজমুদহরন্নেত্রকমলম্।
গতো ভক্ত্যুদ্রেকঃ পরিণতিমসৌ চক্রবপুষা
ত্রয়াণাং রক্ষায়ৈ ত্রিপুরহর জাগর্ত্তি জগতাম্ ॥
ক্রতৌ সুপ্তে জাগ্রৎ ত্বমসি ফলযোগে ক্রতুমতাং
ক্ব কর্ম্ম প্রধ্বস্তং ফলতি পুরুষারাধনমৃতে।
অতস্ত্বাং সংপ্রেক্ষ্য ক্রতুষু ফলদানপ্রতিভুবং
শ্রুতৌ শ্রদ্ধাং বদ্ধা দৃঢ়পরিকরঃ কর্ম্মসু জনঃ ॥
ক্রিয়াদক্ষো দক্ষঃ ক্রতুপতিরধীশস্তনুভৃতা-
মৃষীণামার্ত্বিজ্যং শরণদ সদস্যাঃ সুরগণাঃ।
ক্রতুভ্রংশস্ত্বত্তঃ ক্রতুফলবিধানব্যসনিনো
ধ্রুবং কর্ত্তুঃ শ্রদ্ধাবিধুরমভিচারায় হি মখাঃ ॥
প্রজানাথং নাথ প্রসভমভিকং স্বাং দুহিতরং
গতং রোহিদ্ভূতাং রিরময়িষুমৃষ্যস্য বপুষা।
ধনুষ্পাণের্যাতং দিবমপি সপত্রাকৃতমমুং
ত্রসন্তং তেঽদ্যাপি ত্যজতি ন মৃগব্যাধরভসঃ ॥
স্বলাবণ্যাশংসাধৃতধনুষমহ্নায় তৃণবৎ
পুরঃ প্লুষ্টং দৃষ্ট্বা পুরমথন পুষ্পায়ুধমপি।
যদি স্ত্রৈণং দেবী যমনিরত দেহার্দ্ধঘটনা-
দবৈতি ত্বামদ্ধা বত বরদ মুগ্ধা যুবতয়ঃ ॥
শ্মশানেষ্বাক্রীড়াঃ স্মরহর পিশাচাঃ সহচরা-
শ্চিতাভস্মালেপঃ স্রগপি নৃকরোটীপরিকরঃ।

অমঙ্গল্যং শীলং তব ভবতু নামৈবমখিলং
তথাপি স্মর্তৃণাং বরদ পরমং মঙ্গলমসি ॥
মনঃ প্রত্যক্‌চিত্তে সবিধমবধায়াত্তমরুতঃ
প্রহৃষ্যদ্রোমাণঃ প্রমদসলিলোৎসঙ্গিতদৃশঃ-
যদালোক্যাহ্লাদং হ্রদ ইব নিমজ্যামৃতময়ে
দধত্যন্তস্তত্ত্বং কিমপি যমিনস্তৎকিল ভবান্ ॥
ত্বমর্কস্ত্বং সোমস্ত্বমসি পবনস্ত্বং হুতবহ-
স্ত্বমাপস্ত্বং ব্যোম ত্বমু ধরণিরাত্মা ত্বমিতি চ
পরিচ্ছিন্নামেবং ত্বয়ি পরিণতা বিভ্রতি গিরং
ন বিদ্মস্তত্তত্ত্বং বয়মিহ হি যত্ত্বং ন ভবসি ॥
ত্রয়ীং তিস্রো বৃত্তীস্ত্রিভুবনমথো ত্রীনপি সুরা-
নকারাদ্যৈর্বর্ণৈস্ত্রিভিরভিদধৎ তীর্ণবিকৃতি।
তুরীয়ং তে ধাম ধ্বনিভিবরুন্ধানমণুভিঃ
সমস্তং ব্যস্তং ত্বাং শরণদ গৃণাত্যোমিতি পদম্ ॥
ভবঃ সর্ব্বো রুদ্রঃ পশুপতিরথোগ্রঃ সহমহা-
স্তথা ভীমেশানাবিতি যদভিধানাষ্টকমিদম্।
অমুষ্মিন্ প্রত্যেকং প্রবিচরতি দেবঃ শ্রুতিরপি
প্রিয়ায়াস্মৈ নাম্নে প্রণিহিতনমস্যোঽস্মি ভবতে ॥
নমো নেদিষ্ঠায় প্রিয়দবদবিষ্ঠায় চ নমো
নমঃ ক্ষোদিষ্ঠায় স্মরহর মহিষ্ঠায় চ নমঃ।
নমো বর্ষিষ্ঠায় ত্রিনয়ন যবিষ্ঠায় চ নমো
নমঃ সর্ব্বস্মৈ তে তদিদমিতি সর্ব্বায় চ নমঃ ॥
বহুলরজসে বিশ্বোৎপত্তৌ ভবায় নমো নমঃ
প্রবলতমসে তৎসংহারে হরায় নমো নমঃ।
জনসুখকৃতে সত্ত্বোদ্রিক্তৌ মৃড়ায় নমো নমঃ
প্রমহসি পদে নিস্ত্রৈগুণ্যে শিবায় নমো নমঃ

কৃশপরিণতি চেতঃ ক্লেশবশ্যং ক চেদং
ক চ তব গুণসীমোল্লঙ্ঘিনী শশ্বদৃদ্ধিঃ।
ইতি চকিতমমন্দীকৃত্য মাং ভক্তিরাধা-
দ্বরদ চরণয়োস্তে বাক্যপুষ্পোপহারম্‌॥
অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রং
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্ব্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্ব্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি॥
অসুর সুরমুনীন্দ্রৈরাচ্চতস্যেন্দুমৌলে-
গ্র'থিতগুণমহিম্নো নির্গুণস্যেশ্বরস্য।
সকল গুণবরিষ্ঠঃ পুষ্পদন্তাভিধানো
রুচিরমলঘুবৃত্তৈঃ স্তোত্রমেতচ্চকার॥
অহরহরনবদ্যং ধূর্জ্জটেঃ স্তোত্রমেতৎ
পঠতি পরমভক্ত্যা শুদ্ধচিত্তঃ পুমান্‌ যঃ।
স ভবতি শিবলোকে রুদ্রতুল্যস্তথাত্র
প্রচুরতরধনায়ুঃপুত্রবান্‌ কীর্ত্তিমাং‌শ্চ॥
মহেশান্না পরো দেবো মহিম্নো না পরা স্তুতিঃ
অঘোরান্না পরো মন্ত্রো নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরম্‌॥
দীক্ষাদানাং তপস্তীর্থং জ্ঞানং যাগাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
মহিম্নঃ স্তবপাঠস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্‌॥
কুসুমদশননামা সর্ব্বগন্ধর্ব্বরাজঃ
শিশুশশধরমৌলের্দেবদেবস্য দাসঃ।
স খলু নিজ মহিম্নো ভ্রষ্ট এবাস্য রোষাৎ
স্তবনমিদমকার্ষীদ্দিব্যদিব্যং মহিম্নঃ॥
সুরবরমুনিপূজ্যং স্বর্গমোক্ষৈকহেতুং
পঠতি যদি মনুষ্যঃ প্রাঞ্জলির্নান্যচেতাঃ

ব্রজতি শিবসমীপং কিন্নরৈঃ স্তূয়মানঃ
স্তবনমিদমমোঘং পুষ্পদন্তপ্রণীতম্‌ ॥
শ্রীপুষ্পদন্তমুখপঙ্কজনির্গতেন
স্তোত্রেণ কিল্বিষহরেণ হরপ্রিয়েণ।
কণ্ঠস্থিতেন পঠিতেন সমাহিতেন
সুপ্রীণিতো ভবতি ভূতপতির্মহেশঃ ॥
ইত্যেষা বাঙ্ময়ী পূজা শ্রীমচ্ছঙ্করপাদয়োঃ।
অর্পিতা তেন মে দেবঃ প্রীয়তাঞ্চ সদা শিবঃ ॥

ঐ স্তোত্র একবার আবৃত্তি করিয়া তাঁহার মন যেন তৃপ্তি মানিল না; ব্রাহ্মণ একান্ত-মনে আবার স্তব আরম্ভ করিলেন। স্তব-গীতি শেষ না হইতে-ইহতেই সেই গৃহের ঝনাৎ করিয়া কে শিকল খুলিল। দ্বার মুক্ত হইল। ব্রাহ্মণ অনিমিষ-লোচনে সে ব্যাপার হেরিতে লাগিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহা অপূর্ব্ব!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বামে মহেন্দ্র, দক্ষিণে নগেন্দ্র, মধ্যস্থলে কমলিনী। পৃষ্ঠদেশে কপিল; সম্মুখে চারি জন যণ্ডা।—এই ভাবে পত্নী-কমলিনী পতি-ব্রাহ্মণের সেবার জন্য সেই নিম্নতলস্থ ক্ষুদ্র গৃহে প্রবেশ করিলেন।

কমলিনী-বিবি গাউন-পরা; নবঘন দর্শনে ময়ূর-বৎ পেকম-ধরা; কাপড়-কসনে কঠিন কুচ-গিরি যেন উর্দ্ধে উড়িবার উপক্রম করিতেছে; বিলাতী কোমরবন্ধের সাহায্যে কটীতট ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর দেখাইতেছে; পায়ে জুতা; মুখে জাল।

ব্রাহ্মণ সেই অপরূপ রূপ দেখিয়া, ভীত, স্তম্ভিত, কম্পিত। ম্লেচ্ছরমণীবৎ এই মায়াবিনী কাম-কামিনী কে? ইনি কি নাগিনী, না, গন্ধর্ব্ব-মনোমোহিনী? অথবা বুঝি হূণ-অঙ্গ-পুলিন-কিরাত—এইরূপ কোন না কোন জাতীয়া হইবেন? কোন ফিরিঙ্গিণী

নহেন ত? জানি না, আজ অদৃষ্টে কি আছে? জানি না, এই কালরাত্রে এই নবীনা নিশাচরী, কি উদ্দেশে আমার নিকট আগমন করিতেছেন?

সেই চাক্‌চিক্যশালিনী, অগ্নিময়ী মূর্ত্তির পানে ব্রাহ্মণ আর চাহিয়া থাকিতে পারিলেন না;—নয়নদ্বয় ফিরাইয়া লইলেন। নয়ন প্রত্যাবর্ত্তনমাত্র নগেন্দ্রনাথ তাঁহার চক্ষুর গোচরীভূত হইল। ব্রাহ্মণ শিহরিলেন; সর্ব্ব শরীর প্রকৃতই কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ ভাবিতে লাগিলেন,—"উঃ—সেই নগেন্দ্র! সেই রেলগাড়ীতে মূর্চ্ছাগ্রস্ত, রাজবাটী হইতে পলায়িত, শ্রীবৃন্দাবনে সন্ন্যাসীবেশে ভস্মাচ্ছাদিত—সেই নগেন্দ্রনাথ আজ এখানে কেন?"

সরল ব্রাহ্মণের মনে সহজে কুভাব উদিত হইল না। "নগেন্দ্র এখানে কেন?"—এই ভাবনাতেই তাঁহার চিত্ত দোলায়মান হইল। এক একবার তাঁহার এমনও মনে হইতে লাগিল, পূর্ব্বপরিচিত নগেন্দ্রনাথকে বুঝাইয়া বলিলে, তিনি কি আমার উদ্ধারের কোন উপায় করিয়া দিতে পারিবেন না?" ব্রাহ্মণ বড়ই বোকা।

যাহা হউক, ব্রাহ্মণকে বড় অধিকক্ষণ আর ভাবিতে হইল না। কমলিনী বামহস্ত দ্বারা নগেন্দ্রের দক্ষিণহস্ত জড়াইয়া ধরিয়া, তৎপরে স্বীকায় ডানহাতের তর্জ্জনী উর্দ্ধে তুলিয়া ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ করিয়া, নগেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসিলেন, "এই কি সেই ব্যক্তি?—ছি!—"

নগেন্দ্র। ভগিনীশ্বরি! আপনার পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছি;—যখন আপনি অতি শিশু, ধীশক্তি, চিন্তাশক্তি, বিচারশক্তি, নির্ব্বাচনশক্তি, গবেষণাশক্তি, সমালোচনশক্তি, কামনাশক্তি যখন আপনাতে কিঞ্চিন্মাত্রও জন্মে নাই;—যখন আপনি ন্যায়-নীতির মার্গ দিয়া কেমন করিয়া চলিতে বা চালাইতে হয়, তাহার কিছুই শিখেন নাই,—যখন দুগ্ধই আপনার একমাত্র আহার ছিল,—তখন আপনার অতি বৃদ্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন পিতামহ, আপনাকে এই ব্যক্তির সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিয়া উহাকে আপনার স্বামী করিয়া দেয়।

ঐ কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের নয়নযুগল যেন কপালে ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, "এই স্ত্রীলোকের সঙ্গেই আমার বিবাহ হইয়াছিল।" ব্রাহ্মণ মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন; ঘাড় তুলিয়া সংসার চাহিয়া দেখিবার তাঁহার শক্তি রহিল না।

নগেন্দ্র, কমলিনী ও মহেন্দ্র

মুখে কথা সরিল না; বুঝি কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। সর্ব্বশরীর স্থির হইল; বুঝি প্রাণবায়ু উড়িয়া পলাইল।

কমলিনী। বাল্য-বিবাহ বড়ই গর্হিত! ইহা বিজ্ঞানসম্মত নহে! পদার্থ-বিজ্ঞান, শারীর-বিজ্ঞান বা মনো-বিজ্ঞানের ইহা অনুমোদিত নহে। পণ্ডিতপ্রবর শেলি একস্থানে ইহা অতি-সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। (নাকে রুমাল দিয়া) উঃ, পতি-গাত্র হইতে বড়ই দুর্গন্ধ উঠিতেছে! এ নারকীয় গন্ধে বুঝি বা আমার নাড়ী উঠিয়া পড়ে! আমি আর দাঁড়াইতে পারি না!—মাথা ঘুরিতেছে!

নগেন্দ্র। (বিব্রত হইয়া) বলেন কি?—বলেন কি?—শীঘ্র এ ঘর পরিত্যাগ করুন—চলুন, চলুন—আর এখানে থাকিয়া কাজ নাই।

(নগেন্দ্রকর্ত্তৃক পতনোন্মুখা কমলিনীর পৃষ্ঠদেশ ধারণ।)

কমলিনী। (ঝিমু আওয়াজে) আর ধরিতে হইবে না,—একটু সামলাইয়াছি—

নগেন্দ্র। তবে আসুন, আমার সঙ্গে—আমার হাত ধরিয়া অথবা আমার স্কন্ধদেশে ভর রাখিয়া চলুন—

কমলিনী। না—না—না—তাহা হইবে না; পতিসেবা সমাপন না করিয়া আমি কোথাও যাইব না। পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, আমার প্রাণ যায়, তাও স্বীকার, তবু পতিসেবায় কখন বিমুখ হইব না—

নগেন্দ্র। ইহা বড়ই পুণ্যাত্মিকা কথা! আদর্শ-রমণীর মুখে উপযুক্ত কথাই হইয়াছে।

কমলিনী। নগেন্দ্রনাথ! সাবধান!—যেন আমাকে আর আত্মপ্রশংসা না শুনিতে হয়!—

ইঙ্গিতমাত্র ইত্যবসরে কপিল-খানসামা দুখানি চেয়ার আনিয়া দিল। তাহাতে নগেন্দ্র-কমলিনী উপবেশন করিলেন। মহেন্দ্রের জন্য একটী মোড়া আসিল।

তারপর, কপিল, ঘরে লাবেণ্ডার ছড়াইতে লাগিল। চারিশিশা লাবেণ্ডার গৃহের চারি পাশে ঢালা হইল, তথাচ কমলিনী নাকের রুমাল খুলিলেন না। তখন কপিল এক শিশা আতর ঘরের মধ্যস্থলে ভাঙ্গিয়া ফেলিল, তথাচ কমলিনী নাকের রুমাল

ঘোড়ায় উপবিষ্ট ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "যেখানে রোগের উৎপত্তি, সেখানে আপনাদের চিকিৎসা নাই—চিকিৎসা হইতেছে রোগ-ভূমির বহির্দ্দেশে! যে দ্রব্যটা দুর্গন্ধের অনন্ত খনি, সেখানে একফোটা লাবেণ্ডার বা আতর পড়িল না; অথচ ঘরের সর্ব্বস্থানে লাবেণ্ডার আতর ঢালিয়া আপনারা উহা নষ্ট করিলেন। গন্ধ ব্রাহ্মণের গাত্রে—কিন্তু লাবেণ্ডার পড়িল, ঘরের মেজেতে;—রোগ কাটিবে কেন?"

কপিল। বাপ্‌রে! আমি ওঁর কাছে যেয়ে ওঁর গায়ে লাবেণ্ডার আতর দিতে পারবো না!—উনি আমাকে কড় মড় করে চিবিয়ে গিলে ফেল্‌বেন।

কমলিনী। কপিলচন্দ্র! ভয় কি?—এই চারিজন বলবান্ পুরুষ তোমার সহায় হইবেন;—তুমি আর বিলম্ব করিওনা। আহা! পতির গাত্র হইতে দুর্গন্ধ উঠিয়া পতিনীর কতই না কষ্ট হইতেছে?—

তখন সেই চারিজন ষণ্ডাপুরুষের মধ্যস্থলে থাকিয়া, কপিলচন্দ্র অবিরল অবিশ্রান্ত ভাবে ব্রাহ্মণের গাত্রে লবেণ্ডার জলের তড়তড়া দিতে লাগিল। একশিশা ফুরাইল; দ্বিতীয় শিশা আবার আরম্ভ হইল।

ব্রাহ্মণ প্রথম ভাবিলেন, "সমুদ্রে পড়িয়া আর শিশিরের কান্না কাঁদিয়া কি করিব?—যাহা করিবার থাকে উঁহারা করুন,—আমি সমস্তই নীরবে সহ্য করিব।"

দেখিতে দেখিতে দ্বিতীয় শিশাও শেষ হইল; কপিল তৃতীয়বার শিশা লইয়া সজোরে ব্রাহ্মণের অঙ্গে সেই বিলাতী জল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণের মাথা, মুখ, বুক ভাসিল; কাপড় ভিজিল; মেজে সপ সপ করিতে লাগিল। এবার ল্যাবেণ্ডার জলের সঙ্গে মদগন্ধবৎ কি একটা দারুণ দুর্গন্ধ বাহির হইল। ব্রাহ্মণ বড়ই বিব্রত হইলেন। তিনি অতি কাতর হইয়া, ধীরভাবে দুই হস্ত কপিলের দিকে প্রসারণপূর্ব্বক মৃদুমধুর স্বরে বলিলেন, "কপিলচন্দ্র! আর কেন, যথেষ্ট হইয়াছে!"

কপিল এক বিতিকিচ্ছি বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল,—"ওগো বাবা গো!—মা গো! আমাকে পাগ্‌লা বামুন মেরেফেল্লে গো! ঐ হাত বাড়িয়ে ধরতে আসচে গো"—এই কথা উচ্চারণ করিতে করিতে শিকারী বাঘবৎ লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া কপিলচন্দ্র একবারে কমলিনীর চরণপ্রান্তে দড়াম্ করিয়া পড়িয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল।

কমলিনী। (সভয়ে) কি হইয়াছে ?—কি হইয়াছে ?—

নগেন্দ্র। আপনার কোন ভয় নাই, আমার হাতে বারুদ-গাদা পিস্তল আছে।

মহেন্দ্র। চিন্তা নাই, আমার হাতে নেপালী ছোরা আছে!—পাগলকে এখনি শীঘ্র বাঁধিয়া ফেলা হউক ;—

নগেন্দ্র। কিছুতেই যেন বিলম্ব না ঘটে—

তখন সেই চারিজন ষণ্ডাপুরুষ, লাকলাইন দড়ি দ্বারা ব্রাহ্মণকে কসিয়া কসিয়া বাঁধিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ কোনও কথা কহিলেন না—নীরবে সমস্তই সহ্য করিতে লাগিলেন। কথা কহিবেন কি ?—কথা কহিলে যে আরও বিপরীত ফল ফলিবে।

ওদিকে ব্রাহ্মণের বন্ধন-কার্য্য চলিতে লাগিল, এদিকে নগেন্দ্র, কমলিনীর হাত ধরিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"ভগিনি! দেখুন দেখুন!—কেমন অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখুন!—আপনার ঐ বাল্য-বিবাহের পতিটী বিষমরূপে বদ্ধ হইতে থাকিলেও, বেদনা-জনিত কোনরূপ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতেছে না।—বোধ হয়, বিষম বন্ধনে ঐ ব্যক্তির সুখ অনুভব হইতেছে!"

ফুলের তোড়া নাকের নিকট ধরিয়া কমলিনী উত্তর দিলেন, "কড়াকড় বন্ধনে যদি শারীরিক সুখ হয়—এমন আপনি নিশ্চয় বুঝিয়া থাকেন, তবে, ও-কার্য্য সমস্ত রাত্রিই চলুক না কেন ?—(ঈষৎ চিন্তা করিয়া) কিন্তু তাই কি কখন সম্ভবপর হয় ?—বন্ধনে সুখ হইবে কিসে ?—আমাকে বন্ধন করিলে ত আমার নিদারুণ যন্ত্রণাই উপস্থিত হইবে! আমি অবলা মহিলা,—আর আপনি শিক্ষা-গুরু, তাই একথা আপনাকে জিজ্ঞাসিতেছি!"

নগেন্দ্র। (হাসিয়া) ভগিনীশ্বরি! কাঁহার সহিত কিসের তুলনা করিলেন বলুন দেখি ? আপনার সহিত কি ঐ পতিত, দুর্গন্ধযুক্ত ব্যক্তি তুলনীয় ? প্রফুল্ল-পঙ্কজোপরি আস্থিত, মুর্ত্তিমতী পবিত্রতা-দেবীর সহিত কখন কি পচা নরকস্থ কৃমিকীটের তুলনা হইতে পারে ?—শরচ্চন্দ্রের সুবিমল সুধার সহিত কখন কি কৃষ্ণবর্ণ কালী-ঝুলের তুলনা হইতে পারে ? আপনার ঐ মাখমে গড়া, মাঝে মাঝে মিছরীর বুকুনি দেওয়া—ঐমনোহর অঙ্গ কুসুমাঘাতেই ব্যথা প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু ঐ অসভ্য চুয়াড়ের শরীর লৌহ অপেক্ষা কঠিন ; তরবারির চোট মারিলেও উহার গাত্রে দাগ বসিবে না।

কমলিনা। ভ্রাতেশ্বর! আপনার বাক্যসুধা পান ক'রে আমার মন-চকোর বড়ই পরিতৃপ্ত হইয়া উঠিল।

নগেন্দ্র। ভগিনীশ্বরি! সে কেবল আমার পূর্ব্বজন্মের পুণ্য-ফল। আপনার কোকিল-বিনিন্দিত কণ্ঠ হইতে কমনীয়া কথা কূজিতা হইলে মনে হয় যে, প্রকৃতই ছয় রাগ এবং ছত্রিশ রাগিণী সমস্বরে বাজিতেছে!

ডাক্তার মহেন্দ্র মোড়া হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বাললেন, "আপনাদের কথায় আমি প্রতিবাদ করি না;—কিন্তু একটা কথা এই বলি যে, ঐ ব্যক্তি প্রকৃত পাগল বলিয়াই প্রহার সহ্য করিতে সক্ষম। পাগল না হইলে এতক্ষণ গভীর আর্ত্তনাদে দেশ ফাটাইত। চিকিৎসাগ্রন্থে লিখিত আছে, পাগলের প্রহারেই সুখ, প্রহার-বিনা পাগলের কষ্ট। ঐ লোকটা বদ্ধ পাগল,—তাই এখন নীরব।"

কমলিনী। ডাক্তার বাবু! পাগলের কি ঔষধ নাই? আপনি আমাকে প্রায় ছয় বৎসর চিকিৎসা করিতেছেন,—ইহাতে আমি আপনার প্রতি যতদূর না কৃতজ্ঞ আছি, আমার ঐ পতিটির চিকিৎসা আরম্ভ করিলে আমি তদপেক্ষা অধিক কৃতজ্ঞ হইব। কারণ পতির যন্ত্রণা আমি আর চক্ষে দেখিতে পারি না। পতির জন্য আমার দেহের মর্ম্মস্থানে আঘাত লাগিয়াছে।

মহেন্দ্র। এলোপ্যাথিক মতে পাগলের অতি চমৎকার ঔষধ আছে। প্রথমত, মাথাটা নেড়ো করিতে হইবে,—অনন্তর অগ্রে টীকিটী কাটিয়া ফেলিতে হইবে। তৎপরে পেঁয়াজ ও রসুনের রসের সহিত মোরগ এবং গোমাংস সিদ্ধ করিয়া এক ঘণ্টা অন্তর উহাকে এক পোওয়া করিয়া খাওয়াইতে হইবে। আপাতত সিকি বোতল ব্রাণ্ডি উহাকে খাওয়ান হউক,—কারণ, ও বড় দুর্ব্বল হইয়াছে।

নগেন্দ্র। না না; পণ্ডতটী পাড়াগেঁয়ে লোক, হঠাৎ ব্রাণ্ডি সহজে হজম হবে না; অগ্রে ধেনো মদ দিয়া উহাকে সহনক্ষম করা হউক।

কমলিনী যাহা করিবার হয়, তাহা আপনারা উভয়ে পরামর্শ করিয়া শীঘ্র সমাধা করুন। কারণ, পতির কষ্ট এবং দৌর্ব্বল্য দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে।

মহেন্দ্র। কপিল! শীঘ্র আমার ডাক্তারখানা হইতে মুর্গি এবং গোমাংসের ঝোল ও ধেনো মদ লইয়া আইস।

কপিল দৌড়িল।

মহেন্দ্র। (চারিজন ষণ্ডার প্রতি) ওহে, তোমরা শীঘ্র শীঘ্র বন্ধনকার্য্য সমাপন কর—

ষণ্ডাগণ। অতি সুন্দররূপ বন্ধন হইয়াছে।

মহেন্দ্র। কমলে! আমি পাগলের একবার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিব।

কমলিনী। অগ্রে মাথা নেড়া করিবেন না?

মহেন্দ্র। সেই জন্য ত নাড়ী পরীক্ষা করিব—বলিতেছি। যদি টীকি কাটিলেই চলে, তবে আর মাথা নেড়া করিব না—

কমলিনী। আমি স্বয়ং স্বহস্তে, বিনা সাহায্যে পতিটীর টীকি কাটিব:—পতির সেবা-শুশ্রূষা-পুণ্যের ভাগ কাহাকেও দিব না। পতি-সেবাই নারীধর্ম্ম।

মহেন্দ্র। তবে কাঁচি লইয়া চলুন—

কমলিনী। নগেন্দ্রের হাত ধরিয়া, মহেন্দ্রের সঙ্গে পতির টীকি কাটিতে চলিলেন।

বিষম বন্ধনে ব্রাহ্মণ মুদ্রিত নয়নে শায়িত। কেবল ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে।

ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ তাঁহার বেতের ছড়িটী ব্রাহ্মণের গালে রাখিয়া ঠুকিতে ঠুকিতে বলিতে লাগিলেন, "ইউ, ইউ—চক্ষু চাহ—জিহ্বা বাহির কর,—আমি ডাক্তার; একবার উহা দেখিয়া চিকিৎসা করিব। অধিক কি,—তোমার সেই বাল্যবিবাহের স্ত্রীটী সমুপস্থিত হইয়াছেন,—বহুদিন পরে তিনি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন,—একবার উঠিয়া তাঁহার সহিত প্রীতি-সম্ভাষণ কর।"

সচেতন, সজীব, সজ্ঞান, ব্রাহ্মণের প্রাণ বিকল হইল। কথা কহিব, কি নীরবে থাকিব,—তিনি ইহার কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। যে কোন কথা কহি না কেন,—উঁহারা বলিবেন,—ইহা পাগলের উক্তি। চুপ করিয়া থাকিলেও বলিবেন,—এ লোকটা পাগল, তাই চুপ করিয়া আছে। নহিলে, এত ঠেলাঠেলিতেও সাড়া দেয় না কেন?—কিন্তু আর ত যন্ত্রণা সহ্য হয় না!—মরিলাম! মরিলাম!

ব্রাহ্মণ তখন বিকল হৃদয়ে বলিয়া উঠিলেন, "আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে শীঘ্র মারিয়া ফেলুন!"

কমলিনী কাঁচি হস্তে করিয়া অগ্রগামিনী হইয়া ঢুলু-ঢুলু ভাবে বলিলেন, "হে

পতিকুল-মনোমোহন! হে হৃদয়াকাশের ধ্রুব একমাত্র তারা! হে হৃদয়-সলিলের একমাত্র রোহিতমৎস্য! হে হৃদয়-অরণ্যের একমাত্র গজ-গণ্ডার! হে যদিদং হৃদয়ং তব, তদিদং হৃদয়ং মম!

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্॥—"

নগেন্দ্র। বাঃ! বাঃ! কি অনির্ব্বচনীয় সাহিত্য-শিক্ষা! বা! কিবা ভাব! কিবা উচ্চারণ! কিবা কণ্ঠস্বর! কিবা গ্রীবাভঙ্গি! কটীদেশের কিবা হেলন-দোলন! চঞ্চলচরণের খেমটা-তালে কিবা মরালগঞ্জন গ'ত! ভগিনীশ্বরি! সেই নিরাকার ঈশ্বরের নিকট আমার কেবল এই মাত্র প্রার্থনা যে আপনি আর কিছুদিন এই ভাবে জীবিত থাকিয়া স্বদেশের মঙ্গল সাধন করুন।

কমলিনী। ভ্রাতেশ্বর নগেন্দ্র! ক্ষান্ত হউন! আমি এখন পতি-সেবায় নিযুক্তা রহিয়াছি। এ সময় পতি-সেবাবিষয়িণী কথা ব্যতীত অন্য কোন কথা আমার কর্ণকুহরে শেলবৎ বিদ্ধ হয়।

নগেন্দ্র। ঠিক্ ঠিক্! যথার্থ! অতি উত্তম! অতি সুন্দর! আহা! ভগিনীর সুধামাখা অধর হইতে বিনির্গত ঐ কথাটীই বা কি সুমিষ্ট! আমার প্রত্যেক অঙ্গে কে যেন অনির্ব্বচনীয় কি ছড়াইয়া দিল।

কমলিনী। (ব্রাহ্মণের প্রতি)—

পতি হে বঁধু হে প্রিয় হে সখা হে।
অঙ্গঝাড়া দিয়া উঠ হে উঠ হে॥
অধরে মধুর হেসে বাঁশীটী বাজাও হে।
শুনিয়া রমণী-প্রাণ যেনগো জুড়ায় হে॥

নগেন্দ্র। আজ শেলি-পাঠ সার্থক হইল। আর আমার অধ্যাপনাও সার্থক হইল।

কমলিনী। আহা! আমার পাগল-পতিটী কি মূর্চ্ছাগত হইয়াছেন? আহা! আমার সঙ্গে কি আর উনি এসংসারে, ইহজীবনে বাক্যালাপ করিবেন না? উঁহার বাক্-সুধায় আর কি আমার তাপিত প্রাণ শীতল হইবে না?—উনি কি চক্ষু মেলিয়া আর

আমার পানে চাহিয়া দেখিবেন না?—আমি এত ডাকিলাম, এত বলিলাম, এত করিলাম,—কিন্তু কিছুতেই ত পতি আমার উত্তর দিলেন না?—তবে কি পতিটী আমার নাই?—(চক্ষে রুমাল দিয়া কমলিনীর দীর্ঘ-নিশ্বাস এবং ক্রন্দন।)

মহেন্দ্রনাথ তখন গম্ভীরভাবে ব্রাহ্মণের নাড়ী দেখিয়া বলিলেন, "ভগিনি! শীঘ্র আপনি টীকিটী কাটিয়া ফেলুন!—নচেৎ ইহার সচেতন হইবার সম্ভাবনা নাই।"

কমলিনী। তথাস্তু!—আজ নির্জ্জনে, নীরবে পতি-সেবার পরাকাষ্ঠা দেখাইব।

কমলিনী, নগেন্দ্র ও মহেন্দ্রের উপর ভর রাখিয়া, দক্ষিণ হস্তে কাঁচি ধরিয়া ব্রাহ্মণের বিলম্বিত টীকি কাটিয়া দিলেন। অমনি তৎক্ষণাৎ তিনি সাবান দিয়া হাত ধুইয়া ফেলিলেন। সেই বিধৌত কর-কমল বিলাতী-গন্ধরস দ্বারা তৎক্ষণাৎ সিক্ত হইল। এইরূপ বহুপরিশ্রমের পর কমলিনী ক্লান্ত হইয়া, চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

এমন সময় কপিলচন্দ্র, ডাক্তার বাবুর ডিসপেন্সরি হইতে ব্রাহ্মণের জন্য পাগলের মহৌষধ লইয়া আসিল। ডাক্তার বাবু, ব্রাহ্মণের নিকট গিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "দেখ, তোমার জন্য ঔষধ আসিয়াছে; ইহা আর কিছুই নহে,—মুর্গি এবং গোমাংসের কাথ।—যথানিয়মে এই ঔষধ সেবন করিলেই, তোমার রোগ সারিবে।"

ব্রাহ্মণ তখনও নীরব, কেবল চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ জল পড়িতে লাগিল।

মহেন্দ্র। শীঘ্র হাঁ কর, আমি তোমার মুখে ধীরে ধীরে চামচে করিয়া ঔষধ ঢালিতে থাকিব। ইহা আর কিছুই নহে—কেবল একটা কচি বাছুরের মাথার ঘি মাত্র।

ব্রাহ্মণ চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "মহেন্দ্র বাবু! আমার হাত পা বদ্ধ, আপনাকে যোড়হাত করিবার ক্ষমতা নাই, আপনার পায়ে ধরিবার শক্তি নাই,—কি আর বলিব? আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমাকে ক্ষমা করুন। কেবল এই ভিক্ষা, আমার শত অপরাধ ক্ষমা করুন।"

বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণ বালকের ন্যায় হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

মহেন্দ্র। (সক্রোধে)—ইহা পাগলামো করিবার স্থান নহে। আমি ডাক্তার;—তোমার চিকিৎসার জন্য আমি আহূত হইয়াছি। আমি সময় নষ্ট করিতে পারি না। তুমি আমার সময়ের মূল্য কি বুঝিবে? আমার ৩২৲ টাকা ভিজিট। শীঘ্র হাঁ কর—

নগেন্দ্র। মহেন্দ্র বাবু! পাগলের সঙ্গে বৃথা বকিয়া আপনি কাল বিলম্ব করিবেন

মা। পাগলের মন, কখন্ কি আবল-তাবল বকিতেছে, তাহার কিছু ঠিক আছে কি? পাগলে কখনো কাঁদে, কখনো হাসে;—পাগলের লীলা বুঝা ভার।

কমলিনী। পতির ক্রন্দন যে আমি সহ্য করিতে পারি না। নগেন্দ্রনাথ!—উহাকে একবার হাসিতে বল,—অন্তত আমার খাতিরে হাসিতে বল।

নগেন্দ্র। হে পতি! কমলিনী আজ্ঞা করিতেছেন,—একবার হাসো,—একবার প্রাণ খুলিয়া হাসো—

মহেন্দ্রের ইঙ্গিত মত কপিলখানসামা সেই পূর্ব্ব-প্রকাশিত লাল ঔষধ লইয়া আসিল। কমলিনী, নগেন্দ্র এবং মহেন্দ্র—যথাক্রমে সেই ঔষধ পুনঃপুনঃ সেবন করিলেন।

তদনন্তর মহেন্দ্র বাবু সতেজে বলিলেন, "রে পাগল! আর বিলম্ব সহ্য হয় না। হাঁ, কি না—জবাব দেও।"

নগেন্দ্র। পতি হাঁ কি, না, জবাব দেও।

কমলিনী। পতি হাঁ কি, না, জবাব দেও।

কপিল। পতি হাঁ কি, না, জবাব দেও।

দেখিয়া শুনিয়া ব্রাহ্মণের চক্ষুস্থির হইল।

সকলে সমস্বরে—"হাঁ কি না—জবাব দেও।"

ব্রাহ্মণ মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "হা বিপদের কাণ্ডারী মধুসূদন! আমার ললাট-লিপিতে কি এই লেখা লিখিয়াছিলে? হা ভগবন্! রক্ষা কর,—ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্ব নষ্ট হয়! (প্রকাশ্যে) মহেন্দ্রনাথ! নগেন্দ্রনাথ! কপিলচন্দ্র! এই হত ভাগ্যকে এরূপ ভাবে যন্ত্রণা দিয়া আপনাদের কি লাভ আছে? যদি আমি আপনাদের সুখের কণ্টক স্বরূপ হইয়া থাকি, তবে আমি মিনতি করিয়া বলিতেছি,—অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আপনারা আমাকে এই মুহূর্ত্তে বধ করুন। আর যন্ত্রণা দিবেন না,—ব্রাহ্মণের অস্পর্শীয় সামগ্রী বলপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে খাওয়াইবেন না—"

মহেন্দ্র। (কম্পিত-কলেবরে) কি বলিলি দুর্ব্বৃত্ত! দুরাচার! পাগল!—তুই ঔষধ খাইবি না?—তোর ঘাড়ে এই নেপালী-ছোরা বিঁধিয়া, বুকে বাঁশ দিয়া, এই মুহূর্ত্তে ঔষধ খাওয়াইব,—তুই জানিস্!—

নগেন্দ্র। রে পাপিষ্ঠ পাগল-পতি!—তুই যদি ঔষধ না খাস্, তবে এখনি এই পিস্তল দ্বারা তোর জিহ্বায় গুলি করিব!

মহেন্দ্র। এখনও বলিতেছি,—তুই শীঘ্র হাঁ কর্! হাঁ কর্, হাঁ কর্—

ব্রাহ্মণ। (কাতর স্বরে) আমায় ক্ষমা করুন,—অথবা আমাকে বধ করুন।

মহেন্দ্র। (ধীর ভাবে) আমি রোগের চিকিৎসা করিতে আসিয়াছি,—তোমাকে বাঁচাইতে আসিয়াছি. বধ করিতে আসি নাই! অতএব যেমন করিয়া পারি, ঔষধ খাওয়াইয়া তোমাকে অদ্য রক্ষা করিব।

ব্রাহ্মণ। মহেন্দ্র বাবু! একটু দয়া করুন,—অধমের জাতি নাশ করিবেন না।

মহেন্দ্র। (হাসিয়া) আমরা ডাক্তার,—চারি বৎসর কাল মানবদেহ কাটিয়া চিরিয়া আমরা অ্যানাটমি শিখিয়াছি;—আমাদের দয়া, লজ্জা, ঘৃণা, পিত্তি কিছুই নাই। অথচ এখনও সহজ কথায় বলিতেছি,—তুমি এই মুহূর্ত্তে হাঁ কর,—তোমার মুখে আমি ঔষধ ঢালিব।

ব্রাহ্মণ নীরব। দুই চক্ষে জলধারা। বক্ষঃস্থল ধুকুধুকু করিতে লাগিল।

মহেন্দ্র। (ক্রোধে) কে আছিস্ রে!—লোহার কল মুখে দিয়া হাঁ করাও—

তখন সেই চারিজন ষণ্ডা উঠিয়া, লোহার কল লইয়া, ব্রাহ্মণের মুখ হাঁ করাইতে গমন-উদ্যোগ করিল।

ব্রাহ্মণ গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, "ত্রাহি মে পুণ্ডরীকাক্ষ!—মহেন্দ্রনাথ! আমার প্রাণ যায়,—তাও স্বীকার, তথাচ আমি হাঁ করিয়া থাকিতে পারিব না! আমি এই দন্তে দন্তে সংলগ্ন করিয়া রহিলাম;—কাহার সাধ্য,—আমার প্রাণ যাইবার পূর্ব্বে,—আমাকে উহা পান করায়?"

ষণ্ডাগণ লোহের সেই কলযন্ত্র লইয়া ব্রাহ্মণের মুখে দিল! একজন গলা টিপিয়া ধরিল। অন্য জন তাঁহার পায়ে ক্ষুরধার ছুঁচ বিঁধিতে লাগিল। চতুর্থ ব্যক্তি তাঁহার চুল ধরিয়া সজোরে টানিতে আরম্ভ করিল। আর স্বয়ং মহেন্দ্র এক-চামচে সেই ঔষধ লইয়া, ব্রাহ্মণের মুখব্যাদান প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণ পূর্ব্ববৎ স্থিরভাবে শায়িত। তবে তাঁহার রক্তবর্ণ চক্ষু দুইটা যেন কপালে ঠেলিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে; বুক ফুলিয়া, উঁচু হইয়াছে; দীর্ঘ দীর্ঘ নিশ্বাস ঘন ঘন পড়িতেছে।

ব্রাহ্মণের ঔষধ সেবন
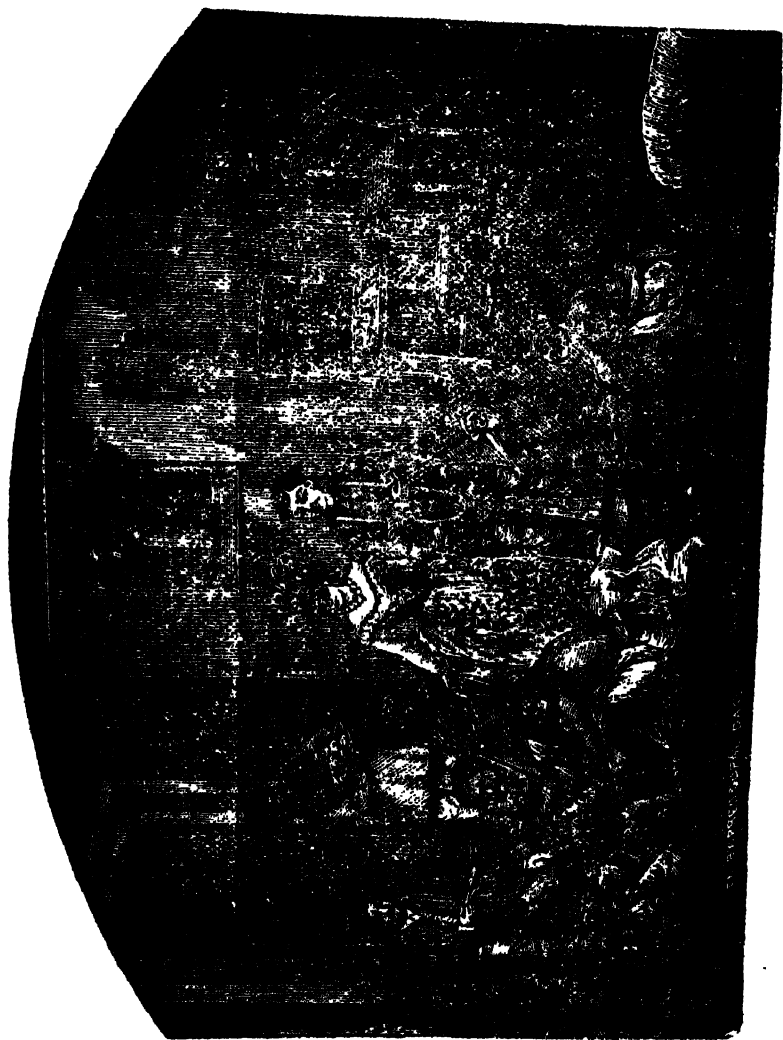
কমলিনী। মহেন্দ্র বাবু!—সাবধানে ঔষধ খাওয়াইবেন,—যেন পতি-অঙ্গে কোনরূপে কিঞ্চিন্মাত্র আঘাত না লাগে! কারণ, পতির যন্ত্রণায় স্ত্রীর যন্ত্রণা।

মহেন্দ্র। অয়ি সুচারুহাসিনি! সে কথা আমাকে আর বলিতে হইবে না।

দেখিতে দেখিতে ব্রাহ্মণের দাঁত ভাঙ্গিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল! দুই গণ্ড দিয়া শোণিতের প্রবাহ বহিল। মুখ, বুক, মাদুর রক্তে ভাসিল। মুখ হাঁ হইল। ডাক্তার মহেন্দ্র চামচপূর্ণ ঔষধ সেই মুখে প্রদান করিলেন। কিন্তু সে ঔষধ উদরস্থ হইল না—চুয়াল বাহিয়া পড়িল।

ব্রাহ্মণ আর নাই।

মহেন্দ্র। পাগল বামুনটা মৃত্যুর ভাণ করিতেছে। আচ্ছা বরুক!—কিন্তু এই মহেন্দ্রনাথ যদি প্রকৃত-পাস-করা ডাক্তার হয়, ডাক্তারি-বিদ্যায় যদি তাহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে, তোমাকে নিশ্চয় ঔষধ খাওয়াইবে,—অন্তত পিচকারিযন্ত্রের সাহায্যে তোমার উদরে ঔষধ প্রবেশ করাইবে,—ইহাই অদ্য মহেন্দ্রনাথের প্রতিজ্ঞা।

তখন কমলিনী-নগেন্দ্র হাত ধরাধরি করিয়া ব্রাহ্মণের নিকটবর্ত্তী হইলেন। কমলিনী, নগেন্দ্রনাথের কাণে কাণে কি একটা কথা বলিলেন। মহেন্দ্রনাথের সহিত নগেন্দ্রের কি পরামর্শ হইল।

সেই ষণ্ডা চারিজন, তৎক্ষণাৎ নগদ ৫০৲ টাকা পাইয়া বিদায় হইল।

মহেন্দ্র, ব্রাহ্মণের নাড়ী দেখিয়া বলিলেন, "মৃত্যু ত বোধ হইতেছে না,—লোকটা অচেতন হইয়াছে।"

নগেন্দ্র। না,—মৃত্যুই বটে!

কমলিনী। আমার আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না;—ডাক্তার বাবু! শীঘ্র বলুন, পতির মৃত্যু ঘটিয়াছে কি না? পতি যদি সত্য সত্যই মরিয়া থাকে, তবে আমাকে গোপন করিবেন না,—এখনি প্রকাশ করিয়া বলুন; কারণ এই মুহূর্ত্তে আমি শোকোচ্ছ্বাসপূর্ণা, পতি-মৃত্যুবিষয়িণী কবিতা লিখিতে বসিব। কবিতা রচনার পক্ষে ইহাই উপযুক্ত মাহেন্দ্রক্ষণ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আর না। বিদায় দিউন। নরকে নামিবার আর শক্তি নাই।

এ নরক অনন্ত—দিক্‌শূন্য; সীমাশূন্য। গ্রন্থকারই দুর্গন্ধে দিশাহারা,—পাঠক তাঁহার সঙ্গে যাইবেন কেমন করিয়া?

সকলে একবার গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া বলুন,—

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥

আর, যোড়হাতে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করুন,—হিন্দু-সমাজ যেন চিরদিন হিন্দু-সমাজই থাকে;—ম্লেচ্ছ-স্রোত যেন ফিরিয়া যায়,—এবং সেই সঙ্গে যেন অধমের এই অধম গ্রন্থ লোপ পায়।

বিষয় অনন্ত। ব্যাপার অপরিসীম। খড়, দড়ি, কাদা, রঙ, রাঙের অভাব নাই;—কিন্তু নূতন প্রতিমা গড়িয়া আর লাভ কি? যেটুকু দরকার, সেটুকু মিলিয়াছে;—বৃথা বাহ্যাড়ম্বরে আবশ্যক কি? অদৃষ্টদোষে বৃথা সঙ্‌ নাচাইতে শিখি নাই।

সমস্তই যুগধর্ম্মের ফল। শোক বৃথা। যাঁহার পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি আছে, তিনিই কালকে অবহেলা করিয়া, গন্তব্যপথে যাইতে সক্ষম হইবেন। কলির কালচক্রে মনুষ্যমাত্রেই ন্যূনাধিক নিপীড়িত।

কলিযুগের এই লঙ্কাকাণ্ডে রাবণ মরিল না,—রামচন্দ্রই নিহত হইলেন। রাম নিষ্প্রভ, নতশির; রাবণ দ্বাদশ সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান, স্ফীত-বক্ষ। গৃহলক্ষ্মী সীতা বহিষ্কৃতা; শূন্য সিংহাসনে অলক্ষ্মী অসতী সমাদৃতা। গঙ্গাজল উপেক্ষিত, কূপজল সম্মানিত। জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, বিদ্যা বিদূরিত; বিলাসিতা, বাহ্যাড়ম্বর মূর্খতার একাধিপত্য। শাস্ত্র পদদলিত, অশাস্ত্রে শিরোদেশ সুশোভিত।

এসব ভাবিলে অন্তরে কেবল আঁধার দেখিতে হয়! চিন্তাশীলের চক্ষু জলভারে পূর্ণ হয়! হৃদয়বানের বুক ফাটিয়া যায়!

নবম পরিচ্ছেদ।

উত্তর-কাণ্ডের কথা বড়ই মনোহর। এ কাণ্ড না লিখিলে পরিতৃপ্তি নাই। না পড়িলে পাঠকেরও স্বস্তি নাই।

এ ঘটনার দশ বৎসর পরে ঝুসির আশ্রমে দুইজন সন্ন্যাসী বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। ঝুসি, প্রয়াগতীর্থের পরপারে। যেখানে গঙ্গাযমুনা সংমিলিত হইয়াছেন, ঠিক সেই স্থলের তট-দেশে ঝুসির উচ্চ প্রান্তর বিস্তৃত।

তপোবন পরিপাটী,—পবিত্রতা মাখানো—নির্জ্জন। ফাল্গুন মাস। সুমিষ্ট সুশীতল বায়ু বহিতেছে। প্রাতঃকাল। প্রথম সন্ন্যাসী, দ্বিতীয়কে বলিতেছেন, "পণ্ডিতজি! ভাবি নাই, এ জীবনে আর আপনার সাক্ষাৎ পাইব। (হাসিয়া) সেই এক দিন, আর এই এক দিন! (হাসিয়া) সে আজ প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসরের কথা!"

দ্বিতীয় সন্ন্যাসী। মহারাজ!—আপনি—

দ্বিতীয় সন্ন্যাসীর কথা শেষ হইতে না হইতেই প্রথম সন্ন্যাসী হো হো হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, "পণ্ডিতজি! আজ ত বেশ "মহারাজ" দেখিয়াছেন!—মহারাজের রাজ্য নাই, গজবাজী নাই, অমাত্য ভৃত্য নাই,—আছে কেবল বাঘছাল, ভস্ম, চিমটা, কমণ্ডলু,—"

২য় সন্ন্যাসী। (হাসিয়া) তাহাও ত আছে,—অঙ্কুর হইতেই মহান্ বটবৃক্ষ জন্মে।

১ সন্ন্যাসী। পণ্ডিতজি! ঠকিলাম।

উভয় সন্ন্যাসীই হাসিতে লাগিলেন।

বলা বাহুল্য, প্রথম সন্ন্যাসী, বিহার অঞ্চলের সেই রাজা; আর দ্বিতীয় সন্ন্যাসী, সেই ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ। আপনাকে মহারাজ বলিলে, আপনার কুণ্ঠিত, লজ্জিত বা অপ্রতিভ হইবার আবশ্যক নাই। আপনি যে অভিধানে অভিহিত হউন না কেন, আপনি যা আছেন তাহাই থাকিবেন। অভ্যাসবশত আমি মহারাজই বলিব—

রাজা হাসিয়া বলিলেন, "পণ্ডিতজি! তাহাই হউক।"

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! কে আপনার সুমতি দিলেন?

রাজা। পণ্ডিতজি! সে অনেক কথা। কিন্তু আপনিই আমার প্রথম পথদর্শক। তৎপরে সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিলাম;—উপযুক্ত গুরু খুঁজিলাম, সৌভাগ্যবলে গুরু মিলিল। তাঁহারই উপদেশে সমস্ত ছাড়িলাম। (হাসিয়া) আছে কি যে, ছাড়িব? আমার গুরুদেব, সাধনার জন্য এই স্থান নির্দেশ করিয়া দেন। প্রতি তিন বৎসর অন্তর তিনি একবার করিয়া আসিয়া সাক্ষাৎ হন। পণ্ডিতজি! আমার অন্তরের স্ফূর্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে,—দিন দিন শক্তি সঞ্চয় হইতেছে। নরকে ডুবিতেছিলাম, —এখন স্বর্গের পথ পাইয়াছি,—যাক্ সে কথা!—আপনার সংবাদ কি বলুন।—

ব্রাহ্মণ উচ্চহাসি হাসিয়া বলিলেন, "মহারাজ! সে কথা আর শুনিয়া কাজ নাই। আমি বেশভূষায় সন্ন্যাসি বটি, কিন্তু হৃদয়ে এখনও সংসারী। এখনও মন টানে, মন কাঁদে। জানি না, দেহের ভোগ আর কতদিন আছে? এখনও কৌতুহল, ঔৎসুক্য ঘুচে নাই।"

রাজা। আমি কতক কতক আপনার বিষয় শুনিয়াছি। কৈলাসচন্দ্রের আমি দুইখানি পত্রই পাইয়াছিলাম; কিন্তু সেই ঘটনা ঘটিবার ছয়মাস পরে, সেই পত্রদ্বয় আমার হস্তগত হয়। তার পর অনুসন্ধানে শুনিলাম, আপনি পাগল হইয়া উন্মাদ-অবস্থায় কোথায় যে পলাইয়াছেন, তাহার সংবাদ কেহই জানে না। বলা বাহুল্য, প্রকৃত ঘটনা, আমি তখনি কতকটা বুঝিয়াছিলাম। তার পর কি ঘটনা ঘটিল বলুন, কিরূপে আপনি রক্ষা পাইলেন, বলুন।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! বিধিলিপি কেহ ঘুচাইতে সক্ষম নহেন। অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা ঘটিয়াছে; যাহা আছে, তাহাও ঘটিবে। তাহার জন্য কষ্টই বা কি, শোকই বা কি? সে যাহা হউক,—ঘটনা এইরূপ ঘটে:—* * * আমি মৃতপ্রায় মূর্চ্ছিত হইলাম। বহুক্ষণ পরে মূর্চ্ছাবসানে দেখি আমাকে স্নান করাইয়া দিয়াছে; মাথায় বরফ লেপিতেছে। আমি যেন মূর্চ্ছিতই হইয়া রহিলাম, কোন কথা কহিলাম না। রাত্রি প্রায় বারটার সময় আমাকে তাঁহারা এই অবস্থায় রাখিয়া চলিয়া গেলেন।

রাজা। উঃ, বড়ই বিষম কথা!

ব্রাহ্মণ। তারপর সেই ছদ্মবেশী ব্যক্তি গঙ্গাজল লইয়া আসিলেন। শরীর তখন

অবসন্ন-প্রায় হইলেও বহুকষ্টে উঠিয়া জানেলার কাছে গিয়া, তাঁহাকে বলিলাম,—"যদি আমাকে উদ্ধার করিতে হয়, তবে অদ্যই করুন। নচেৎ আমি এখানে আর কিছুক্ষণ থাকিলে সম্ভবত প্রাণে মরিব।" ছদ্মবেশী ব্যক্তি বলিলেন, 'আমি অদ্য সমস্তই দেখিয়াছি,—লোকজন সঙ্গে আনিয়াছি; অদ্যই আপনাকে উদ্ধার করিব।' সেই গভীর নিশীথে রাস্তার ধারের জানেলা কাটিয়া সুকৌশলে আমাকে তিনি বাহির করিলেন। ঘোড়গাড়ী চাপিয়া গঙ্গাতীরে পৌঁছিলাম।" নৌকায় উঠিয়া চন্দননগর আসিলাম। সেখানে প্রায় চারিমাস কাল চিকিৎসিত হইয়া আরোগ্য লাভ করি। কিন্তু ঘোড়গাড়ীতে উঠার পর হইতে সেই ছদ্মবেশী ব্যক্তিকে আর দেখিলাম না।

রাজা। আশ্চর্য্য ঘটনা!'

ব্রাহ্মণ। (হাসিয়া) তখনও কিন্তু আমার নিষ্কৃতি নাই। আমার শ্বশুরের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে প্রকাশ হইল,—"মদীয় জামাতা শ্রীযুক্ত রাধাশ্যাম ভাগবতভূষণ উন্মাদ-পাগল হইয়া গৃহ হইতে পালাইয়াছেন। যিনি তাঁহার অনুসন্ধান বলিয়া দিবেন, তিনি হাজার টাকা পুরস্কার পাইবেন।" বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর-পশ্চিমের প্রত্যেক পুলিস-থানায় এ সংবাদ প্রচারিত হইল। আমি ভাবিলাম, এখনও বুঝি ভোগ ঘুচে নাই,—অদৃষ্টে আমার বুঝি কর্ম্মভোগ আছে। সেই ছদ্মবেশী পুরুষের আদেশে চন্দননগর ছাড়িলাম,—আমি সন্ন্যাসী সাজিয়া নানা স্থান ভ্রমণ করিলাম। করিলাম। নানা তীর্থ দেখিলাম; নানা নদনদী, গিরি উপত্যকা, বন প্রস্রবণ নয়ন-গোচর হইল। কত কত যোগী, সাধু, মুনি, ঋষি দেখিয়া ভক্তিভরে তাঁহাদের চরণযুগল পূজা করিলাম। সেই ছদ্মবেশী পুরুষের আদেশ-অনুসারে ছয় মাস অন্তর তাঁহাকে আমার কুশলসংবাদ চন্দননগরে লিখিতাম; সেই জন্য বৎসরে দুইবার করিয়া আমাকে লোকালয়ে আসিতে হইত। আমার পত্র চন্দননগর পৌঁছিয়া তাহার উত্তর আসিলে পর, আবার বিজন অরণ্য, পর্ব্বত, গিরিগুহার উদ্দেশে বাহির হইতাম। একাকী অরণ্যে বসিয়া কেবল "হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল" নাম উচ্চারণ করিতাম। মধুমাখা হরির নামে, ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রম দূর হইত। এক একবার মনে মনে এই ভাব উঠিত যে, লোকালয়ে আর যাইব না,—অরণ্যময় নির্জ্জন অভ্রভেদী, পর্ব্বতশিখরে বসিয়া ঈশ্বর-আরাধনায় দেহত্যাগ করিব।

রাজা। তাহা করিলেই ত ভাল হইত।

ব্রাহ্মণ। (হাসিয়া) মহারাজ! ভুলিতেছেন। কর্ম্মসূত্র টানিলে, কে তাহা আটকাইতে পারে? তদ্‌গতি-প্রতিরোধার্থ সময়ে সৎচেষ্টা একান্ত প্রার্থনীয় বটে, সুচিকিৎসারও কিছু কিছু ফল আছে বটে, কিন্তু সূত্রকর্ত্তৃক নিদারুণ ভাবে আকর্ষিত হইলে, সংসারে এমন কে আছেন, যিনি তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন?

রাজা। ঠিক কথা!

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! দেখুন,—লোক-সমাজে বাসের আমার কোনও আবশ্যকতা নাই; পিতা মাতা নাই—কি আর বলিব,—কেহই নাই, কোন সম্বন্ধই নাই,—তথাচ ছয় ছয়মাস অন্তর আসিয়া প্রায় এক এক মাস কাল লোকালয়ে বাস করিতে হইত। মহারাজ! এ বিড়ম্বনা কি সহজ?

রাজা। এ সংসারে আপনার যদি কেহই নাই, তবে লোকালয়ে আসিতেন কাহার জন্য?

ব্রাহ্মণ। কেবল সেই ছদ্মবেশী পুরুষের খাতিরে। তিনিই আমার রক্ষার অবলম্বন-স্বরূপ। বিশেষ, আমার উপর তাঁহার অনির্ব্বচনীয় ভক্তি। আমার নিমিত্ত তিনি প্রাণ দিতেও কাতর নহেন। মহারাজ! ছয় মাস অন্তর তখন পত্র লিখিবার কথা ছিল, যদি কদাচিৎ দর্শনের দিন বিলম্ব ঘটিত, তবে সেই ছদ্মবেশী বড়ই কাতর হইতেন। পত্রোত্তরে তিনি কতই দুঃখ শোক প্রকাশ করিতেন।

রাজা। সেই ছদ্মবেশী পুরুষটী কে?

ব্রাহ্মণ। (হাসিয়া) তখন জানিতাম না,—জানিবার জন্য চিন্তা বা চেষ্টাও করি নাই। কিন্তু এখন সমস্তই বুঝিলাম। কত হাসিলাম, কত কাঁদিলাম।

রাজা। সেই সাধু ব্যক্তিকে কি আমি চিনি না?

ব্রাহ্মণ হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, "মহারাজ! আপনি চেনেন বৈ কি?—ইনিই সেই কৈলাসচন্দ্র! সেই রেলগাড়ী হইতে পলায়িত কৈলাসচন্দ্র।"

রাজা। (সবিস্ময়ে) বলেন কি?—কেন?—কৈলাস এমন ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন?

ব্রাহ্মণ। শেষপত্রে কৈলাসচন্দ্র এবিষয়ের সমস্তই লিখিয়াছেন,—কৈলাসচন্দ্রের

এখন অন্তিমকাল উপস্থিত। বোধ হয় তিনি আর অধিক দিন বাঁচিবেন না ;—শীঘ্রই তাঁহার এই ভোগদেহের অবসান হইবে। অন্তিমে আমার সঙ্গে একবার তিনি শেষ-সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছেন। এই চতুর্দ্দশ বৎসর কৈলাসচন্দ্রকে দেখিবার জন্য আমিও ব্যগ্র হইয়া আছি। কল্য কলিকাতা যাত্রা করিব।

রাজা। আপনাকে ধরিবার জন্য আপনার শ্বশুর যে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন,—তাহার কি হইল ? কলিকাতা গেলে'ত আপনার পুনরায় সেই বিপদ্ ঘটিতে পারে ?

ব্রাহ্মণ। (হাসিয়া) মহারাজ! কাল কাহারও হাত ধরা নহে। কালে অবস্থা সমস্তই পরিবর্ত্তিত হয়। চিরদিন কখন সমান যায় না। বিলাসের সেই স্বর্গরাজ্য এখন নরক অপেক্ষাও ঘৃণ্য হইয়াছে, আমার অজ্ঞাতবাসের দ্বিতীয় বৎসরে শ্বশুরের মৃত্যু হয়। সেই বৎসরই শাশুড়ীঠাকুরাণী পরলোক গমন করেন। তখন সেই বিপথ-গামিনীর বিলাসবাসনা আরও বৃদ্ধি পাইল। তিনি, পিতার বহুধনসম্পত্তি নানা প্রকারে নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। শেষে বিপিনচন্দ্রের অসহ্য হইল। ভ্রাতার সহিত ভগিনীর আর সদ্ভাব রহিল না। প্রায় আঠার হাজার টাকা নগদ লুকাইয়া লইয়া, সেই বিপথ-গামিনী গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। বিপিনচন্দ্র বালক হইলেও বুদ্ধিমান্। তিনি বেগতিক দেখিয়া, কলিকাতার বাসা উঠাইয়া দিয়া, আপন জন্মভূমি সেই পল্লীগ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। বিপথগামিনী চৌরঙ্গীতে বাসাভাড়া লইলেন। সেই আঠার হাজার টাকা ব্যয় হইতে এক বৎসরও লাগিল না। পয়সা কমিল, শরীর রোগগ্রস্ত হইল, বয়স বৃদ্ধি হইল ;—সুতরাং সহজেই স্বর্গরাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। বিপথগামিনী শেষে পথের ভিখারিণী হইলেন।—পূর্ব্বভাব সবই লুপ্ত হইয়াছে,—সেইদিন অতীত হইয়াছে,—সে নন্দনকাননও নাই—সেই পারিজাত-পুষ্পও নাই,—সুতরাং এখন আমার আর কলিকাতা যাইতে ভয় কি ?

রাজা। পণ্ডিতজি! সবই কর্ম্মফল। আচ্ছা,—আপনি সেই বিপথ-গামিনীর কাহিনী, আপনার কলিকাতাস্থ শ্বশুরগৃহ-গমনের পূর্ব্বে, কিছুই কি জানিতে পারেন নাই ?

ব্রাহ্মণ। না,—মহারাজ! আমার দাদাশ্বশুরের জীবদ্দশায় যখন আমি সেই পল্লীগ্রামে শ্বশুরালয়ে যাইতাম, তখন বিপথ-গামিনী নিতান্ত বালিকা ছিলেন ; নয় দশ

বৎসর বয়ঃক্রমের অধিক হইবে না। তার পর আমার পিতৃদেবের পরলোক-প্রাপ্তি ঘটিল। তখন বিপথ-গামিনীর বয়স দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ হইবে। পীড়ার ভাণ করিয়া তিনি পিতৃশ্রাদ্ধের সময় ঘরে আসিলেন না। আমি পিতার শ্রাদ্ধান্তে গয়া, কাশী প্রয়াগ, বৃন্দাবন পর্য্যটন করিলাম। বৃন্দাবনে যে ঘটনা ঘটে, তাহাও আপনার অবিদিত নাই। অবশেষে প্রায় চারি বৎসর কাল ভয়ঙ্কর রোগভোগ করিলাম; প্রাণসঙ্কট পীড়ায় অস্থির হইলাম। শেষে আরোগ্য লাভ করিয়া পঞ্চম বৎসরে স্ত্রীকে ঘরে আনিবার জন্য শ্বশুরগৃহে গেলাম। মহারাজ! বলুন,—আমি কেমন করিয়া জানিব যে, স্ত্রী বিপথ-গামিনী হইয়াছেন? হিন্দু পিতা-মাতার স্নেহযত্নে কন্যা লালিত, পরিবৰ্দ্ধিত—সে কন্যা যে এমন বিপথগামিনী হইতে পারেন, ইহা আমি কল্পনায়ও আঁকিতে পারি নাই। মহারাজ! সকলি অদ্ভুত, সকলি বিষম! সে সব ভীষণ কথা শুনিলে আপনার বিশ্বাস করিতে হয়ত প্রবৃত্তি হইবে না। হয়ত উপকথা বলিয়া উপহাস করিতে ইচ্ছা জন্মিবে। এই কলির আরম্ভ—এখনি এই দশা,—না জানি ভবিষ্যতে কি আছে?—

রাজা। ঘটনা কিরূপ?—

ব্রাহ্মণ। সে সব পাপকাহিনী কীর্ত্তন করিয়া আর ফল নাই। কেবল এই মাত্র বুঝিয়া রাখুন,—সে ঘটনা অপূর্ব্ব, অনমুমেয়, অলৌকিক। ব্যাপার অলৌকিক হইলেও, কলিকাতা প্রভৃতি সহর-অঞ্চলে এরূপ ঘটনা নাকি নিতান্ত বিরল নহে। কৈলাসচন্দ্র কল্যকার পত্রে লিখিয়াছেন,—"গুরুদেব! আমি ত বাঁচিব না,—বাঁচিবার আর সাধও নাই! কলঙ্কিনী কামিনী এবং পিশাচ প্রকৃতিক পুরুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে বলিয়া মনে হয়। দুঃখ এই, ইহারা পাপের সমর্থন করিয়া থাকে। সমাজে সুসভ্য বলিয়া সম্মানিত হয়। বেশ্যা, সকল সমাজেই আছে;—কিন্তু বারাঙ্গনার আবাস-ভূমি স্বতন্ত্র নির্দ্দিষ্ট। কিন্তু এখন অনেক সময় 'কুলকামিনী' ও কলঙ্কিনীতে কোন প্রভেদ নাই।"—হরিবোল, হরিবোল!—হরিবোল!

রাজা। সেই বিপথ-গামিনীর কোন সংবাদ কৈলাস লিখিয়াছেন কি?

ব্রাহ্মণ। আজ পাঁচমাস পূর্ব্বে কৈলাসচন্দ্র তাঁহার সমগ্র ইতিবৃত্তই লিখিয়াছেন। কিন্তু সে কথা শুনিয়া আর লাভ কি?

রাজা। লাভ বিশেষ কিছুই নাই ;—পাপের সমুচিত দণ্ড হইয়াছে কি না,—ইহাই জানিবার সাধ।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! আপনি ভুল বুঝিতেছেন। পাপের দণ্ড যে সঙ্গে সঙ্গে হইবে, তাহা কে বলিল? মহারাজ! আপনি কি এমন লোক দেখেন নাই,—যিনি চিরদিন দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবন যাপন করিয়াছেন,—অথচ একদিনের তরেও তাঁহাকে কোন সামাজিক দণ্ড বা রাজদণ্ড ভোগ করিতে হয় নাই? সকল পাপের ফল সকল সময়েই যে ইহকালে দৃষ্ট হইবে, তাহা নহে। সেই বিপথ-গামিনীকে ইহজন্মে যে নিশ্চয়ই নিতান্ত নিদারুণ বিষময় পাপ-ফল ভোগ করিতে হইবে, তাহা নহে।

রাজা। পণ্ডিতজি! একথা আমি বুঝি,—আমার জিজ্ঞাস্য এই,—সেই বিপথ-গামিনী ফলভোগ কি ইহজন্মেই করিতেছেন, না পরজন্মে করিবেন?

ব্রাহ্মণ। তাহা কেমন করিয়া বলিব? বিপথ-গামিনী এখন যে ফলভোগ করিতেছেন,—তাহাই তাঁহার সমুচিত দণ্ড কি না, তাহা আমি জানি না। তাঁহার পাপ গুরুতর। সম্ভবত পরজন্মে তিনি পশুযোনি প্রাপ্ত হইবেন। বোধ হয়, তাঁহাকে নরকের কৃমি-কীট হইয়া বহুকাল থাকিতে হইবে।

রাজা। এখন সেই বিপথ-গামিনীর অবস্থা কিরূপ, বলুন,—

ব্রাহ্মণ। আমাকে কিছুই বলিতে হইবে না। কৈলাসচন্দ্রের এই পত্র পাঠ করিতেছি, শ্রবণ করুন —

দশম পরিচ্ছেদ।

১। গুরুদেব! পাপীয়সীর ইতিবৃত্ত না দিয়া থাকিতে পারিলাম না; সম্ভবত ইহা আপনার বিরক্তিকর হইবে। কিন্তু মন মানিল না, তাই লিখিলাম।

২। একাদশ-বর্ষ বয়ঃক্রম হইতেই সেই পাপিনী রোগের ভাণ করিতে শিখিয়া-ছিল। মূর্চ্ছারোগটা তাহার যেন হাত-ধরা ছিল। কিন্তু চৌরঙ্গীর বাটীতে শেষে তাহার প্রকৃতই মূর্চ্ছারোগ জন্মিল ইহা ব্যতীত তখন হইতেই কামিনী সহিত

মুখ দিয়া অল্প অল্প রক্ত উঠিতে লাগিল। শরীর বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িল : হাতের পয়সাও কমিয়া আসিতে লাগিল। সেই সময় তাহার বন্ধুবর্গ একে একে সরিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। কপিল-খানসামা সর্ব্বাগ্রে পলাইল।

৩। পাপীয়সী চৌরঙ্গী ছাড়িল। মুসলমান পাড়ায় এক ক্ষুদ্র বাড়ী ভাড়া করিল। রোগ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইল। সর্ব্বাঙ্গ ঘায়ে ক্ষত বিক্ষত হইল। ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ তাঁহার সহিত দেখা করা বন্ধ করিলেন। পাপীয়সী কতবার তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য চিঠি লিখিল, কিন্তু তিনি আসিলেন না।

৪। নগেন্দ্র কিন্তু এখনও ছাড়িলেন না; মাসিক ২০৲ টাকার হিসাবে নগেন্দ্র তাহাকে দিতে লাগিল। দিবার কারণও ছিল। পাপীয়সী দুই বৎসর পূর্ব্বে নগেন্দ্রকে সংবাদপত্র প্রকাশ করিবার জন্য পাঁচ হাজার টাকা দিয়াছিল। প্রায় ছয়মাস কাল কুড়ি টাকা করিয়া মাসে মাসে দিয়া, তৎপরে নগেন্দ্র মাসিক দশ টাকা ধরিলেন। ক্রমে পাঁচ। শেষে তাহাও বন্ধ হইল। পাপীয়সী তখন উত্থানশক্তি-বিরহিতা।

৫। ঘায়ের জ্বালায় এবং বাতের কামড়ে সে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। আমি যোগাড় করিয়া তাহাকে তখন মেডিকেল-কলেজ-হাঁসপাতালে পাঠাইলাম। সেখানে দুই মাস কাল চিকিৎসিত হইয়া রোগ আরাম না হউক, সে কিঞ্চিৎ সবল হইল। এই সময় হাঁসপাতালে এক ঘটনা ঘটে। একজন চিকিৎসকের সহিত তাহার হাঁসপাতালেই কলঙ্ক রটিল। বিচার হইল। সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দিল, "পাপীয়সী চিকিৎসকের মুখচুম্বন করিয়াছে!" পাপীয়সী বলিল, "আমরা মিথ্যা কথা জানিনা। সত্যই আমাদের ধর্ম্ম। চিকিৎসককে চুম্বন যথার্থ; কিন্তু তাহা ভ্রাতৃভাবে করিয়াছি।" চিকিৎসক বলিলেন, "আমি নিরপরাধ। এই স্ত্রীলোকটি উচ্চবংশো-দ্ভবা ভদ্র ঘরের অনাথা মেয়ে বলিয়াই, আমি উহাকে যত্নের সহিত দেখিতাম। আমাকে দেখিলে, সে ছাড়িত না; প্রায় প্রত্যহই ৫।৭ মিনিট ধরিয়া কথা কহিত;—কখন হাসিত, কখন কাঁদিত। ক্রমশ আমাকে ঠাট্টা তামাসা করিতে লাগিল। এইরূপ দুই একদিন করিয়া, হঠাৎ একদিন ঐ স্ত্রীলোকটী আমাকে 'প্রাণেশ্বর' বলিয়া আমার মুখ চুম্বন করিয়া ফেলিল।" বিচারে পাপীয়সী হাঁসপাতাল হইতে বহিষ্কৃতা হইল; চিকিৎসকের পদাবনতি ঘটিল।
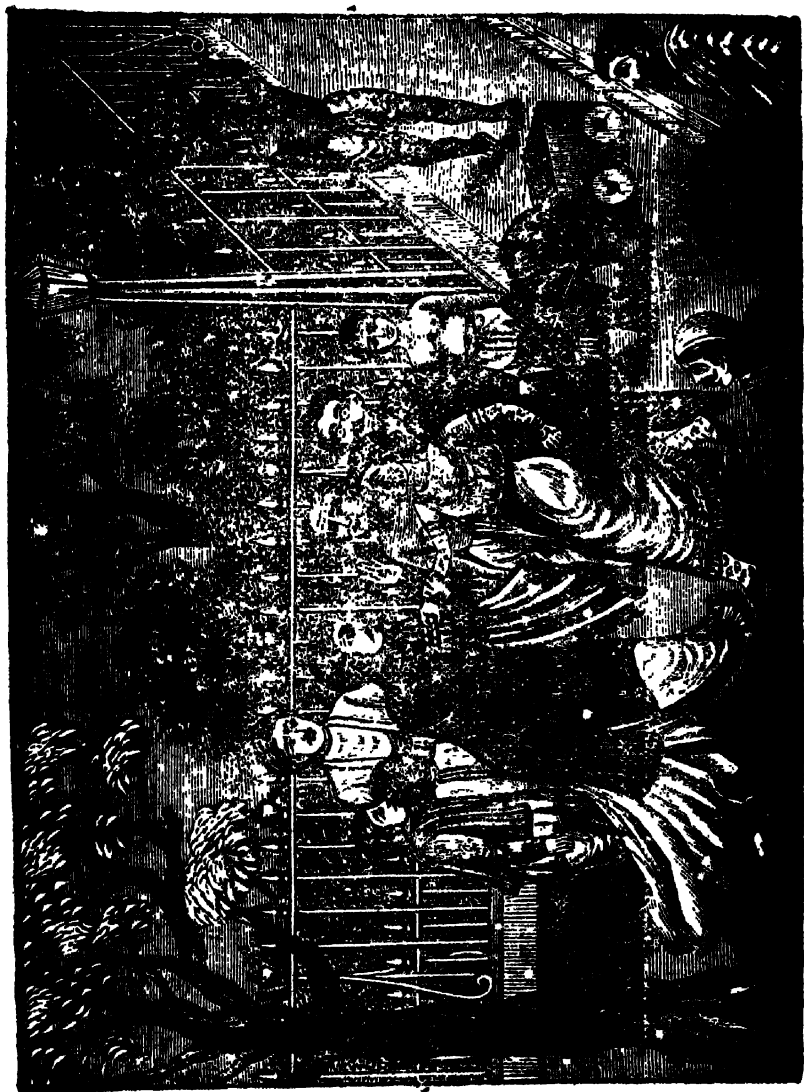
পাপীয়সী কমলিনী

৬। আবার বা ভাই, একদিন বৌবাজারের মোড়ে ফুটপাতের উপর পাপীয়সী
:তর কামড়ে এবং ক্ষুধার জ্বালায় গভীর আর্ত্তনাদে কাঁদিতেছে। আমি খানিক দুধ
।াইয়া খাওয়াইয়া তাহাকে কাম্বেল হাঁসপাতালে পাঠাইলাম।

৭। পাপীয়সী সেখানে একমাসের অধিক টিকিতে পারিল না। একটু ভাল
।ই সেস্থান হইতে পলায়ন করিল। একমাস কাল তাহার কোন সন্ধান পাইলাম না।

৮। শেষে একদিন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারিটী চাকার
কখানি ক্ষুদ্র গাড়ী। গাড়ীখানি চৌকা। একটী মাত্র লোক তাহার ভিতর কষ্টে
সিতে পারে। কয়েকখানি পুরাণ কাঠে গজাল আঁটিয়া গাড়ীটী তৈয়ার হইয়াছে।
কটী গরু সেই গাড়ী টানিতেছে; আর সেই পাপীয়সী গাড়ীর ভিতর বসিয়া, সেই
র লাগাম ধরিয়া আছে। মুখে মাছি ভন্ ভন্ করিতেছে। একটী চক্ষু দিয়া পুঁজ
পড়িতেছে। তথাচ এখনও সে ফিরিঙ্গি খোঁপা ছাড়ে নাই। আমি দেখিয়াই
শুনিলাম, কয়েকজন "উন্নতবন্ধু" পাপীয়সীর জন্য এক সভা করিয়াছিল।
ভায় বক্তৃতার পর, কেহ ॥০ কেহ ।০ আনা চাঁদা দিয়া এই গাড়ীখানি তৈয়ার করিয়া
য়াছে। আর, মাসে মাসে কেহ কেহ, উহার ভরণপোষণের জন্য, ছয় পয়সা বা আট
য়সা চাঁদা দিতে স্বীকৃত হইয়াছে। পাপীয়সী একখানি খোলার ঘরে থাকে; আর
ই গাড়ী করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বন্ধুগণের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিয়া বেড়ায়।

৯। পাপীয়সীর বড়ই কঠোর প্রাণ। অন্য কেহ হইলে এতদিন পঞ্চত্ব পাইত:
তাহার শরীরে আর কিছুই নাই—রোগ দশ পনর খানার কম নহে। জ্বর, কাস,
কুউঠা খা, চক্ষে পুঁজ পড়া, নাক বসিয়া যাওয়া—কত নাম করিব?—কিন্তু তথাচ
তাহার কথার তেজ কমে নাই; গলার সুর সেই রূপই তীব্র আছে।

১০। এই অবস্থায় কলেজষ্ট্রীটের মোড়ে নগেন্দ্রনাথের সহিত তাহার একদিন
মারামারি হয়। বেলা তখন দশটা। নগেন্দ্রনাথ পদব্রজে কলেজে অধ্যাপনা করিতে
যাইতেছেন। পাপীয়সী হঠাৎ সেই গরুর গাড়ী করিয়া কোন্ দিক্ হইতে যে নগেন্দ্রের
সম্মুখে আসিয়া পড়িল, তাহা কেহই দেখিল না। সে, গাড়ী হইতে নামিয়াই, নগেন্দ্রের
পা দুটা জড়াইয়া ধরিল। কাঁদিয়া পথ কাঁপাইয়া তুলিল। প্রায় দুইশত দর্শক উভয়কে
ঘেরিয়া ব্যাপার দেখিতে লাগিল। নগেন্দ্র বলিলেন, "কে তুমি, কে তুমি,—কি চাও!"

তখন পাপীয়সী, বাঘিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া, পা ছাড়িয়া, নগেন্দ্রের সোণার চেন সজোরে জড়াইয়া ধরিল,—তীব্র-কণ্ঠে বলিল, "পাপিষ্ঠ নরাধম! হয়, আমার পাঁচ হাজার টাকা দে, না হয় আমার একটা কিনারা কর্—নচেৎ তোকে আজ্ ছাড়বো না। বাড়ীতে গেলে তুই দরোয়ান দিয়ে আমাকে মার খাওয়াইয়াছিলি নয়? এখন তোকে কে রাখে?—এই রাস্তার মাঝখানে নেঙ্‌ট ক'রে, তোর্ এখনি কাপড় কেড়ে লব? তোকে কে রাখে রাখুক দেখি?" পুলিস আসিল। নগেন্দ্র মুক্তি পাইলেন।

১১। আজ কাল তাহার গায়ে একটা বিষম দুর্গন্ধ উঠিয়াছে। সে, যে রাস্তা দিয়া চলিয়া যায়, মনুষ্যমাত্রেই তাহার সেই পচাগন্ধে নাকে কাপড় দিতে বাধ্য হয়। ভিক্ষার জন্য, কাহারও দ্বারে গেলে, গৃহস্থ তাহাকে দূর্‌দূর্ করিয়া তাড়াইয়া দেয়। চেহারাটাও কেমন একটা বিতিকিচ্ছি হইয়াছে! মুখটা ফুলিয়াছে। ঠোঁটে ঘা দগ্ দগ্ করিতেছে। দাঁত সব পড়িয়া গিয়াছে। একটা চোক কাণা হইয়াছে। তথাচ এখনও মুচ্‌কি হেসে আড়নয়নে চাহিয়া দেখাটুকু ঘুচে নাই।

পত্র শুনিয়া রাজা বলিলেন, "প্রায়শ্চিত্ত উপযুক্তই হইতেছে।"

ব্রাহ্মণ উত্তর করিলে, "না, মহারাজ!—এ দণ্ড অতি সামান্য।"

বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণের চক্ষু দিয়া বারিধারা বিগলিত হইতে লাগিল।

রাজা। পণ্ডিতজি! শান্ত হউন।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! পূর্ব্বজন্মে আমি কত পাপই না করিয়াছিলাম?—ফলভোগের এখনও শেষ হয় নাই।—যাক্ সে কথা।—কৈলাসকে দেখিবার জন্য কল্যই আমি কলিকাতায় যাইব।

রাজা। অদ্য এই খানে অবস্থিতি করুন। আপনার সহিত শাস্ত্রপ্রসঙ্গে দিন অতিবাহিত করিব, স্থির করিয়াছি।

ব্রাহ্মণ। তাহাই হউক।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কৈলাসচন্দ্রের প্রতিজ্ঞা ছিল যে, তাঁহার পাপপূর্ণ কালামুখ, ব্রাহ্মণকে আর দেখাইবেন না। কিন্তু অন্তিমে সে প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারিলেন না।

কৈলাসচন্দ্রের চিন্তাজ্বর। গুরুপত্নী কমলিনীর সহিত তিনি মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন,—এইজন্যই তাঁহার চিন্তাজ্বর। এইরূপ ক্রমান্বয়ে ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার দেহে কাসরোগ জন্মিল। রোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইল। ডাক্তারে জবাব দিল। যখন বাঁচিবার কোনও আশা রহিল না, তখন তিনি গুরুদেব ব্রাহ্মণকে আনাইলেন।

কলিকাতা নিমতলার ঘাটে ব্রাহ্মণের উরুদেশোপরি মাথা রাখিয়া কৈলাসচন্দ্র অর্দ্ধস্ফুটস্বরে "হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল" করিতেছেন।

এমন সময় সেই আলুলায়িতকেশা, ছিন্ন-ভিন্ন-মলিন-বসনা, সর্ব্বাঙ্গ-ক্ষত-বিক্ষতা, দুর্গন্ধে গো-মানুষ-অস্থিরীকৃতা কমলিনী সেই ক্ষুদ্র-গোশকটে চড়িয়া নিমতলার ঘাটে উপস্থিত হইলেন। গাড়ী হইতে নামিয়াই উলঙ্গিনী পাগলিনীবৎ কমলিনী ব্রাহ্মণের সম্মুখে নিপতিত হইয়া এক বিকট চীৎকার করিলেন। ব্রাহ্মণ দেখিলেন, একটী স্ত্রীলোক মূর্চ্ছিত হইয়াছে। মুখে জল দেওয়ায়, কিছুক্ষণ পরে তাঁহার চেতনা হইল। কমলিনী বলিলেন, "আপনি আমার স্বামী। আমি আপনার স্ত্রী। আমি পাপীয়সী কলঙ্কিনী। আমাকে ছুঁইবেন না। আমার অপরাধের আদিও নাই, অন্তও নাই। স্বামী যে কিরূপ বস্তু, এ সংসারে তাহা আমি কখন শিখি নাই, কখন জানি নাই। হাতে হাতে তাহার ফল ভোগ করিতেছি। আমার মৃত্যু নিকট,—আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমি কল্য স্বপ্ন দেখিয়াছি, আপনি ক্ষমা না করিলে আমার আর পরিত্রাণের উপায় নাই।"

ব্রাহ্মণ। আমি ক্ষমা করিলে যদি তোমার পরিত্রাণ হয়, তবে এখনি ক্ষমা করিলাম।

কমলিনী ব্রাহ্মণের পদযুগল মাথায় রাখিয়া, "আমি ক্ষমা পাইলাম" বলিতে বলিতে গলদশ্রু নয়নে ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

দেখিতে দেখিতে কৈলাসের মৃত্যু ঘটিল।

ব্রাহ্মণ উভয়কে দগ্ধ করিয়া গঙ্গাস্নান করিলেন। পরে কেবল "হরিবোল হরিবোল" বলিতে বলিতে,—সেই সুধাময় নামে দিগন্ত অভিষিক্ত করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণ লোকালয় ছাড়িয়া বিজন-বনে গমন করিয়া তপস্যায় নিরত হইলেন।

সমাপ্ত